উদ্বোধন।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।

রামকৃষ্ণ মিশনের বাঙ্গালা-পাক্ষিক-পত্র।

ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প,

সাহিত্য, ইতিহাস, ভ্রমণ প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ক।

তৃতীয় বর্ষ।

১৩০৭ মাঘ হইতে ১৩০৮ পৌষ।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি লেখক।

স্বামী ত্রিগুণাতীত—সম্পাদক।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য—, সডাক ২৲।

পুরাতন বর্ষের সমগ্র উদ্বোধন একত্রে বাঁধাই ২।০, [illegible]

চারি আনা, [illegible]

কলিকাতা, বাগবাজার [illegible]

[illegible] কর্তৃক [illegible]

সূচীপত্র।

উদ্বোধন—তৃতীয় বর্ষ।

১। বিষয়ের আদ্যবর্ণানুক্রমিক সূচী।

২। লেখকগণের নামের আদ্যবর্ণানুক্রমিক সূচী।

৩। ভাবানুসারে সূচী।

নবানুরাগ।

আজ আমাদের শুভ দিন—উদ্বোধনের নববর্ষারম্ভ। আজ আশীর্ব্বাদ করুন, নূতন উদ্যমের সহিত যেন ইহাকে চালাইতে পারি; উদ্বোধন যেন নববর্ষে নবানুরাগের ভরে অধিকতর বেগে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে থাকে। আজ একটু মঙ্গল কামনা করুন, যেন সকলে নব উৎসাহে, নব উদ্যমে স্ব স্ব কার্য্যে রত হইতে থাকেন; নব প্রেমে, নব অনুরাগে যেন সকলে নির্ম্মল আনন্দ-ময় মূর্ত্তি হইয়া বিচরণ করিতে থাকেন। আজ একটু শুভেচ্ছা করুন, যেন ঘরে ঘরে দীপমালা জ্বলিয়া উঠে; অন্তরে অন্তরে, প্রতি অন্তরে, প্রতি হৃদয়ে, যেন আজ তড়িৎ-তন্ত্র উদ্দীপিত হইয়া উঠে—নবানুরাগে সকলে যেন মত্ত হইতে থাকেন; ইন্দ্র বায়ু বরুণ প্রভৃতি দেবগণ, মুনি ঋষি রাজা প্রজা প্রভৃতি মনুষ্যগণ, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণিগণ, যিনি যেখানে আছেন, সকলে যেন আজ একতানে নবানুরাগে গাইতে থাকেন—"জয় বঙ্গের জয়, জয় ভারতের জয়, জয় সকলের জয়।"

'নবানুরাগ' শব্দটী অনেকেরই পক্ষে অতি শ্রুতি-সুখকর; শ্রবণমাত্রই অনেকের আনন্দ ও আশা-সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠে। ভগবদ্ভক্ত, বিশেষতঃ, তদ্গত বৈষ্ণবগণ, এই অর্থ ও ভাবপূর্ণ শব্দের বর্ণে বর্ণে অমৃতাস্বাদন করেন। কেবলই যে পরমার্থ-পথে, তাহা নহে; সকল পথের সকল বিষয়েই নবানুরাগের অদ্ভুত ক্রিয়া ও সামর্থ্য প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। যে আধারে ইনি ক্রীড়া করিতে থাকেন,—যে ভাগ্যবান্ এই স্বর্গীয় পদার্থের কণামাত্রও লাভ করিতে পারিয়াছেন,—যে সুকৃতি-ব্যক্তির অন্তরে এই অমৃতোপম নবানুরাগ কিঞ্চিন্মাত্রও উদ্রিক্ত হইয়াছে,—তিনি সাধুই হউন বা তদন্যই হউন, তিনি পরমার্থ-পিপাসুই হউন বা মানবীয় প্রেমরাজ্যের পথিকই হউন, অথবা অন্য কোনও বিষয়ের প্রতি অনুধাবনেচ্ছুক হউন,—জানিবেন, নিশ্চয়ই অনন্ত উন্নতি-পথের দ্বার আজ তাঁহার সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইল; জানিবেন, তিনি অচিরাৎ নানাপ্রকার সত্যের আলোক প্রতিপদ-বিক্ষেপেই দেখিতে পাইবেন। আর তাঁহাকে অন্ধকার রাজ্যে বন্দী করিয়া রাখে কাহার সাধ্য? কাহার সাধ্য আর কেহ তাঁহার সে জ্যোতির্ম্ময় পথে, কণ্টক স্বরূপ আচরণ করিতে পারে?

'নবানুরাগ'—"নব-রাগে রঞ্জিত," "কোটী শশিবিনিন্দিত,"—স্বর্গ হইতে

স্রোতস্বিনীতে ঝম্প প্রদান করিলেন। তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য। কিছুপরে, দেখি যে এক স্থানে ভাসিয়া উঠিয়া ভীষণ হাবু ডুবু খাইতেছেন; এমন সময়ে, বোধ হইল, যেন এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ ভাসিয়া যাইতেছিল, তাহার একটী স্থূল শাখার উপর শ্যাম আশ্রয় লইলেন। শাখাগুলির অগ্রভাগ একটু একটু দেখিতে পাইলাম বটে, কিন্তু সে বৃহৎ বৃক্ষের মূল যে কোথা—তাহা দেখিতে পাইলাম না। অত বড় যে প্রকাণ্ড বৃক্ষ, স্রোত তাহাকেও বেগে লইয়া যাইতে লাগিল। শ্যাম তাহার এক শাখায় অতি ধীরাৎ ধীরতর রূপে প্রশান্ত ও আনন্দময় মূর্ত্তিতে, বসিয়া স্রোতের সহিত কোথায় চলিয়া গেলেন বুঝিতে পারিলাম না।

নবানুরাগের এমনি স্রোত—এমনি টান যে, তাহাতে একবার পড়িলে আর ফিরিবার সম্ভব থাকে না। নবানুরাগ এমনি ছোঁয়াচে—এমনি সংক্রামক, এবং এমনি তার আকর্ষণ শক্তি যে, নবানুরাগীর সহিত যিনি একটু মিশিয়াছেন, যাঁর গায়ে একটু নবানুরাগের হাওয়া লাগিয়াছে, আর তাঁহাকে খুজিয়া পাইবার যো নাই—অমনি তাঁহাকে একেবারে ডুবিতে হইয়াছে। কেবল যে, ছোঁয়াচে, তাহা নহে; নবানুরাগ মধ্যে মধ্যে দীর্ঘব্যাপী হইয়া পড়ে। তখন ত, দেশকে দেশই, ডুবিয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্যদেব প্রভৃতি, এক একবার আসিলেই, দেশ ঐরূপ যেন বন্যা-প্লাবিত হইয়া যায়। মানুষ ত দূরের কথা; শুনিয়াছি, চৈতন্যদেবের সময়, হিংস্রক পশু পর্যন্তও নাকি, নবানুরাগে মত্ত হইয়াছিল।

নবানুরাগে মত্ত হইলে ঐহিক ব্যাপার বা ঐহিক জ্ঞান ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া যায়। শ্রীপতি-জ্ঞানে তমালকে অবলাগণ আলিঙ্গন করেন; বৃহৎ কাঠজ্ঞানে গলিত মৃত দেহের উপর আরোহণ করিয়া ব্রাহ্মণ, নদী পার হইয়া যান। এমন কি, হিংস্রক পশুও হিংসা পর্য্যন্ত ত্যাগ করে।

ঐহিক ব্যাপার নষ্ট হইয়া যায় যাক; ঐহিক জ্ঞান লুপ্ত হইয়া যায় যাক। দুই দিনের অকিঞ্চিৎকর মরীচিকায় ভ্রমণ করিবার আবশ্যক কি? লুক্কায়িত-বিপদ্ স্বর্ণের মায়া-মৃগকে ধরিবার জন্য ভ্রান্ত স্ত্রীলোকের ন্যায় অনর্থক অত ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন কি? লোকে ক্ষিপ্ত বলে বলুক—ব্যারাম বা বায়ু-গ্রস্ত বলে বলুক; লোকে কি না বলে? আমার সঙ্গে না মেশেন, কিছু ক্ষতি নাই, বরং শতগুণে ভাল—অপবিত্র হাওয়াটা কিছু কম লাগিবে; জাতে ঠেলেন—সো ভি আচ্ছা, নির্ব্বিপাকে অগ্রসর হইতে পারিব; গালাগালি দিয়া ভূত ভাগান—ত কথাই নাই, পাপরাজ্য হইতে আরও শীঘ্র দৌড়িয়া পলাইতে পারিব। (একটী গান মনে পড়িতেছে।)

কে বলে?—শ্যামা আমার কালো?
(যদি কালো) তবে, কেন হৃদয় করে আলো?
আমার মা, যদি কালো হ'ত
তবে কি ডাকিতাম এত?
যার কালো, তার কালো শ্যামা,
আমার সে যে ভাল।
গগণ কালো, সিন্ধু কালো,
কালো সে অনন্ত কালো;
তবু কালো নয়, সে কালো মাণিক,
আঁধার করে যে আলো।

তাঁহাদেরই বা দোষ কি? যাঁহারা সে জিনিষ আস্বাদন করেন নাই, তাহার সম্বন্ধে ত যা তাই তাঁহারা বলিবেনই—তাহার আর আশ্চর্য্য কি? যিনি যাহা লইয়া পড়িয়া আছেন, তিনি তাহা সমর্থন করিবার জন্য ত স্বর্গ-মর্ত্ত্য সংগ্রাম করিবেন—এ ত ধরা কথা আছেই। তবে, মাঝখান থেকে আমি কেন নির্ব্বোধের মত নিজেকে স্বর্গসুখ হ'তে বঞ্চিত করি? আমার অদৃষ্টে যদি এখন "ওপ্‌ন্ সিসেম" (চিচিঙ্‌ ফাঁক) হইয়া যায়, আমি রত্ন কেন লুণ্ঠন না করি? অপরের জন্য চেষ্টা করিলেও তাহা কি অপরের ভাগ্যে কখন ঘটাইতে পারিব? যিনি নবানুরাগ আস্বাদন করেন নাই, তাঁহাকে হাজার বুঝাইলেও তিনি বুঝিতে পারিবেন না। যাঁহার অদৃষ্টে সে সুখ রাজ্য নাই, কাহার সাধ্য, তাঁহাকে সে রাজ্য ভোগ করাইতে পারে?

তবে কি নবানুরাগ অদৃষ্ট-গত? সকলকার অদৃষ্টে কি নবানুরাগ ঘটে না? তবে, নবানুরাগের জন্য এত সাধনা করিবার প্রয়োজন? নবানুরাগ তাহা হইলে ছোঁয়াচে বা সংক্রামক হইল কি রূপে?—

যদি পুনর্জ্জন্মবাদ বা কর্ম্মবাদ মানেন ত আর কথাই নাই, উত্তর হইয়াই রহিয়াছে। পূর্ব্বসুকৃতিবশতঃ নবানুরাগ যাঁহার ভাগ্যে অদৃষ্টভাবে সঞ্চিত থাকে, তাঁহারই ইহ জন্মে সেইটী প্রস্ফুটিত হয়। যাঁহার ভাগ্যে নবানুরাগের অগ্নি বেশী পরিমাণে সঞ্চিত থাকে, তাঁহার ভাগ্যে উহা এক ফুঁয়েই জ্বলিয়া উঠে। আর যাঁহার ভাগ্যে খুব কম পরিমাণে থাকে, তাঁহার ভাগ্যে ফুঁ পাড়িতে পাড়িতে জান অন্ত হয়। তবে কি জানেন, কাঠ যদি হাজার ভিজেও থাকে, ত, আগুনের কাছে থাকিলেই ক্রমশঃ কাঠ

শুকাইয়া শুকাইয়া শেষে চাই কি দপ ক'রে একেবারে জলিয়াও উঠিতে পারে। তাই বলি, নবানুরাগ ছোঁয়াচে ব্যামো। নবানুরাগীর নিকট থাকিতে থাকিতে নবানুরাগের উদ্রেক হইতে পারে। অবশ্য, তাই বলিয়া যে, যার তার হবে, তা নয়। বিসূচিকা সংক্রামক; কিন্তু যাঁরা বিসূচিকার নিকট থাকেন, তাঁদের সকলকারই কি বিসূচিকা শীঘ্র হয়? যাঁহাদের শরীর মোটা, মন মোটা, মস্তিষ্ক মোটা, বুদ্ধি মোটা, হৃদয় মোটা,তাঁহাদের ব্যূহ ভেদ করিতে, নবানুরাগের একটু বিলম্ব লাগে। সাধনার দ্বারা সেইগুলি মার্জ্জিত করিয়া ক্রমশঃ সূক্ষ্ম ও সাত্ত্বিক করিতে হয়, তবে তাহাতে নবানুরাগের উদয় হয়। যাঁহাদিগের ভিতর নবানুরাগের উদয় হয়, তাঁহারা ধন্য হন।

তাহা হইলে ত দেখিতেছি আমাদের আর গতি নাই। নবানুরাগী না হইতে পারিলে ত ধন্য হইতে পারিব না? নবানুরাগী হইতে হইলে ঈশ্বরকে মানিতে হবে, ধার্ম্মিক হইতে হইবে, ভক্ত হইতে হইবে,—তবে ত? বাবাঃ—তাহা হইলেই ত গেছি!—

নবানুরাগ স্বর্গীয় পদার্থ—অতি পবিত্র; ঠাকুর ঘরেই থাকুক, আর আঁচ্-তাকুড়েই থাকুক, ইহা নিজেও কখন অপবিত্র হয় না অপর কাহাকেও অপবিত্র করিতেও জানে না। ইহা সদা পাবক-রত্ন স্বরূপ; ইহা অগ্নি স্বরূপ। ঈশ্বরেই হউক, বা মনুষ্যেই হউক, অথবা কোন জড় পদার্থ সম্বন্ধেই হউক, 'নবানুরাগ' কথাটী সর্ব্বত্র প্রযুজ্য হইতে পারে। কাহারও, ঈশ্বরে নবানুরাগ হয়, কাহারও বা কোন মনুষ্যে নবানুরাগ হয়, কাহারও বা কোনও কার্য্য করিতেই অত্যন্ত নবানুরাগ হইতে দেখা যায়। নবানুরাগ সর্ব্বত্রই প্রশংসনীয়। নবানুরাগ—এই গুণ থাকিলেই যথেষ্ট উপকার হইল।

কোনও কার্য্য অত্যন্ত আগ্রহের সহিত করার নাম—অনুরাগের সহিত কার্য্য করা। অত্যন্ত আগ্রহের নাম অনুরাগ। ঈশ্বর বা মনুষ্যের প্রতি অনুরাগের মানে—ঈশ্বর বা মনুষ্যের প্রতি অত্যন্ত ভালবাসা। সেই অনুরাগ কোন কোন স্থলে প্রথম অবস্থায় অতি তীব্র থাকে; সেই অবস্থার নাম 'নবানুরাগ'। যেমন, কোন কোন গেঁদা ফুলের বোঁটা—খুব মোটা, কিন্তু ফুল—একটু খানি; আবার কোন কোন গেঁদা ফুলের বোঁটা—খুব সরু, কিন্তু ফুল—এত বড়। তেমনি, আধার অনুসারে কোথাও নবানুরাগের বেশী বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়; কোথাও বা কম দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও বিষয়ে নবানুরাগ হইলে মন আপনা হইতেই ক্রমশঃ একাগ্র হইয়া

আসিতে থাকে, অন্তর শুদ্ধ হইয়া আসিতে থাকে, হৃদয় প্রশস্ত হইয়া আসিতে থাকে। এইরূপ-হৃদয়ে, ঈশ্বর বা পরমার্থ-চিন্তার উদয় হইতে বিলম্ব হয় না। যাঁহার চক্ষু আছে, তিনি সবই দেখিতে পান; যাঁর হৃদয়ে ভালবাসা আছে, তিনি ইচ্ছা করিলে বা আবশ্যক পড়িলে, সকলকেই ভাল-বাসিতে পারেন। তেমনি যাঁর হৃদয়ে অনুরাগ আছে, তিনি সকল বিষয়েই সেই অনুরাগের চালনা করিতে পারেন।

ঈশ্বরকে না মানিলে যে, অনুরাগী হইতে পারিব না, তাহার কিছু মানে নাই। ঈশ্বরকে মানিবার কিছু আবশ্যক নাই। অনুরাগ থাকিলেই ঈশ্বর নিজেকে নিজে মানাইয়া লইবেন, কিছু চিন্তা নাই। কেবল, নৌকার পাল খাটাইয়া রাখুন; হাওয়া আপনা হইতেই তাহাতে লাগিবে এবং আরোহী সমেত নৌকাকে বহন করিয়া লইয়া যাইবে; হাওয়াকে ডাকিয়া আনিতে হইবে না—ওগো হাওয়া আইস, ওগো হাওয়া আইস। আর যদি হাওয়া থাকে, এবং পাল না খাটান্, বোঝাই নৌকা কি চলিবে? ঈশ্বর স্বতঃই সদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান; অনুরাগ না থাকিলে কি-চক্ষুতে আপনি তাঁকে দেখিবেন? তাই বলি, নবানুরাগ অভ্যাস করুন, যে কোনও গতিকে হউক। নবানুরাগী হউন—যে বিষয়েই হউক। নবা-নুরাগের পথ অতি আশাপ্রদ। এ পথের পথিকগণ নানা ধনে ধনী হন। নবানুরাগ কল্পতরু বিশেষ; ইহার মূলে থাকিলে, না চাহিতেই নানাপ্রকার সত্যের আলোক দেখিতে পাওয়া যায়; অবশেষে, এমন কি, নিরপেক্ষ পরম সত্য পর্য্যন্তও লাভ করা যায়।

তবে নাকি, শুনিয়াছি, যাঁহারা নবানুরাগী, তাঁহাদিগকে নানাপ্রকার আপদ্ বিপদ্ সহ্য করিতে হয়?—

নদীর তীরে দাঁড়াইয়া থাকিলে বেশী শীত করিবে, এমন কি ঠক্ঠক্ করিয়া কাঁপিতে হইবে; অনেককে, হয় ত, ঠাণ্ডা দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিতেও হয়, স্নান করা আর হয় না। কিন্তু, নদীতে নামুন, ভরসা করিয়া এক ডুব দিন, দেখিবেন আর তত শীত নাই; আর তত ভয় নাই; শরীর মন, অপেক্ষাকৃত সুস্থ ও পবিত্র হইয়াছে। বাহির থেকে দেখিতে, না জানি, নবানুরাগে কতই বিপদ্; কিন্তু সে পথের পথিক যিনি, তিনি তত বিপদ্ অনুভব করেন না, অনুভব করিতে অবসরও পান না—এত তাঁর অনুরাগ। সে পথের প্রহরী—সর্ব্ববিঘ্নবিনাশক যে ঈশ্বর তিনিই।

তিনি স্বয়ং পথিকের হস্ত ধারণ করিয়া, কেমন সুন্দর,নানা প্রকার আলোক দেখাইতে দেখাইতে, নানা প্রকার সত্য দেখাইতে দেখাইতে, অতি যত্নের সহিত, অতি স্নেহের সহিত. লইয়া যান! হায়, আমাদের সে দিন কবে হবে? আজ শুভদিনে আশীর্ব্বাদে করুন, আমরা যেন সেই নবানুরাগে রঞ্জিত হইতে পারি; সেই রঙে যেন সকলকে রঙাইতে পারি; সকলের শরীর মন প্রাণ, যেন লালে লাল হইয়া যায়। আজ আমাদের নববর্ষের শুভদিনে আশীর্ব্বাদ করুন, নবানুরাগের পিচকারি লইয়া, মন খুলিয়া সকলে যেন পরস্পর পরস্পরের সহিত সে অমিয়-খেলা খেলিতে পারি, সুপ্তোত্থিত হইয়া দেখিতে পাই—দেশ যেন নবানুরাগের গোরি-ময় হইয়া গিয়াছে।

গঙ্গা-বক্ষে।

(স্বামী শুদ্ধানন্দ।)

বৈশাখের বিকালেতে জাহ্নবীর কোলে,
বহে মৃদু মন্দ বায়, লহরী নাচিয়া ধায়,
রঙ্গে ভঙ্গে কি মধুর সুন্দর দোলে!

সুনীল আকাশ—সব নীরব নীথর,
প্রকৃতির সৌম্য মূর্ত্তি প্রশান্ত-দর্শনা,
যেন স্নেহময়ী মাতা, আনন্দেতে প্রফুল্লিতা,
সন্তানের স্নেহে যেন ব্যাকুল-অন্তর,
সন্তানের শুভ যেন নিয়ত কামনা।

এখনো তপন নিজ কার্য্য-অবসানে,
যান নাই অন্তঃপুরে বিশ্রাম আগারে,
এখনো তেজেতে তাঁর সবে শোভা পায়,
এখনো পতন তাঁর, হয় নাই রে আবার,
এখনো প্রচণ্ডভাবে উদিত গগনে।

কিন্তু নিম্নগতি তাঁর—ক্রমে অস্তাচলে,
চলিছেন নিজ রশ্মি করি সংবরণ,
দেখাছেন যেন এই জগতীমণ্ডলে,
চিরৈরাজ্য কারো কভু হয় না কখন।

জাহ্নবীর বক্ষে সব কাতারে কাতারে,
বিবিধ বিচিত্রবর্ণা ভাসিছে তরণী,
দণ্ডবলে চলে কেহ, কেহ পালভরে,
চলিতেছে নয়নের আনন্দদায়িনী।

যাইতেছে ওই দেখি প্রশস্ত তরণী,
ঝপাঝপ পড়ে দাঁড়, আনন্দেতে চলে,
মধ্যে তার দুই জন,　　　　পরস্পরে আলাপন,
'আজন্ম প্রণয়বদ্ধ আমরা যুগলে,'
পুরুষ পুরুষ—নহে পুরুষ রমণী।

চলে যায়—বহিতেছে দক্ষিণ পবন,
ধীরে ধীরে মৃদু মন্দ অতি মন্দ চলে,
আকাশে নাহিক মেঘ, নাহি কোন স্বন,
যেন গো প্রকৃতি সুমধুর ভাষ বলে।

সহসা সকল স্তব্ধ—নাহিক বাতাস—
গুমটে অবশ তনু—স্বেদ অঙ্গে ঝরে,
বাহিরি বসিলা দোঁহে আনন্দ অন্তরে—
দেখে সে সুনীলবর্ণ—নীল—নীলাকাশ।

অনন্ত দেখিয়া দোঁহা দোঁহে বিস্মরণ,
অনন্তের ভাবে দোঁহে হইল বিভোরা,
ভুলিল দেহের প্রেম—ভুলে গেল মন,
অনন্তের ভাবে দোঁহে হ'ল মাতোয়ারা।

ভাবেতে বিহ্বল স্তব্ধ—নাহি সংজ্ঞা জ্ঞান,
ধীরে ধীরে ধীরে বায়ু বহে নাসিকায়,
সমাধিস্থ যোগিমত,　　　　ভাবেতে হইয়া গত,
প্রকৃতির কোলে দুটী বালক ঘুমায়।

কড়—কড়—কড়, ওকি—সহসা জাগিয়া,
দেখিলেন বন্ধুদ্বয় অতি সসম্ভ্রমে,

পূর্ণিমা চাঁদিনী সব মেঘেতে ভরিয়া,
সোঁ সোঁ সোঁ সোঁ বহে বায়ু পীড়িয়া মরমে।

চমকে চপলা—আঁখি সবার ধাঁধিয়া,
কত বর্ণ বাহিরায় চপলা ভিতরে,
এ দিকে—গোঁ গোঁ গোঁ রবে গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া,
বহিতেছে ঝড় হায় জাহ্নবী-মাঝারে।

বায়ুর সঙ্গেতে রঙ্গে ক্রীড়া করে জল,
উচ্চ উচ্চ বীচিকম্পে গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া ;
তরণীটী হায়, করিতেছে টলমল—
কভু উঠে, কভু পড়ে থাকিয়া থাকিয়া।

'গেল বুঝি'—চীৎকারিল মাঝি ত্রস্তমন,
উলটিল বুঝি হায় সুন্দর এ তরী—
না— না—পুন স্থির হয়—কিন্তু ত্রস্ত মন—
চলাচ্চল—চলাচ্চল উঠে শুধু বারি।

'রাখিতে নারিনু বুঝি', উঠিল চীৎকার—
উলটিয়া গেল হায় তরণী সুন্দর,
মাঝি দাঁড়ি লম্ফ দিল—কোথা গেল চলি!
কোথা গেল যুবাদ্বয় ভাবুকপ্রবর ?

এক ক্ষীণকায়, কিন্তু পটু সন্তরণে,
অন্য হায় সুবলিষ্ঠ—সাঁতার না জানে।

সন্তরণপটু চায় উদ্ধারে অপরে,
বলিষ্ঠ সে—নিয়তই নিবারণ করে ;
এ উহার পানে চায়, উভয়ে ডুবিয়া যায়,
অতল জাহ্নবীগর্ভে, অতল ভিতরে।

কিন্তু পুন দেখি জ্যোতির্ম্ময় দেহ লয়ে,
সংসারেতে বিচরণ, করে দুই মহাজন,
'স্বার্থত্যাগ,' এই ব্রত জগতে শিখায়ে—
উভয়েতে অমরতা অমূল্য লভিয়ে।

পরিব্রাজক।

(স্বামী বিবেকানন্দ।)

আমাদের দেশে বলে, পায়ে চক্কর থাক্‌লে, সে লোক ভবঘুরে হয়। আমার পায়ে বোধ হয় সমস্তই চক্কর। বোধ হয় বলি কেন? পা নিরীক্ষণ করে, চক্কর আবিষ্কার করবার অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু সে চেষ্টা একেবারে বিফল—সে শীতের চোটে পা কেটে খালি চৌ-চাকলা, তায় চক্কর ফক্কর বড় দেখা গেল না। যা হক্‌—যখন কিম্বদন্তী রয়েছে, তখন মেনে নিলুম যে, আমার পা চক্করময়। ফল কিন্তু সাক্ষাৎ—এত মনে কর্‌লুম যে, পারিসে বসে, কিছুদিন ফরাসী ভাষা, সভ্যতা, আলোচনা করা যাবে। পুরাণ বন্ধু বান্ধব ত্যাগ করে, এক গরীব ফরাসী নবীন বন্ধুর বাসায় গিয়ে বাস কর্‌লুম; তিনি না জানেন ইংরাজি, আমার ফরাসী সে এক অদ্ভুত ব্যাপার; বাসনা যে, বোবা হয়ে বসে থাকার না-পারকতায়, কাজে কাজেই ফরাসী বল্‌বার উদ্যোগও ত হবে—আর গড় গড়িয়ে ফরাসী ভাষা এসে পড়্‌বে;—কোথায় চল্লুম, ভিয়েনা, তুরকী, গ্রীস্, ইজিপ্ত, জিরুসালম, পর্য্যটন কর্ত্তে! ভবিতব্য কে ঘোচায় বল। তোমায় পত্র লিখ্‌ছি, মুসলমান প্রভুত্বের অবশিষ্ট রাজধানী কন্‌স্টাণ্টিনোপল হ'তে!!

সঙ্গের সঙ্গী তিন জন—দু জন ফরাসী, একজন আমেরিক। আমেরিক তোমাদের পরিচিতা মিস্ ম্যাক্‌লউড্; ফরাসী পুরুষ বন্ধু মস্যিয় জুল্ বোওয়া—একজন ফ্রান্সের সুপ্রতিষ্ঠিত দার্শনিক ও সাহিত্যলেখক; আর এক ফরাসিনী বন্ধু জগদ্বিখ্যাত গায়িকা মাদ্‌মোয়াজেল্ কাল্‌ভে। ফরাসী ভাষায় "মিষ্টর" হচ্চেন "মস্যিয়," আর "মিস্" হচ্ছেন "মাদ্‌মোয়াজেল্"—"জ"টা পূর্ব্ব-বাঙ্গলার জ। মাদ্‌মোয়াজেল্ কাল্‌ভে আধুনিক কালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা গায়িকা—অপেরা-গায়িকা। এঁর গীতের এত সমাদর যে, এঁর তিন লক্ষ, চার লক্ষ টাকা বাৎসরিক আয়, খালি গান গেয়ে। এঁর সহিত আমার পরিচয় পূর্ব্ব হতে। পাশ্চাত্য দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী মাদাম্ সারা বার্ন্‌হার্ড, আর সর্ব্বশ্রেষ্ঠা গায়িকা কাল্‌ভে, দুজনেই ফরাসী, দুজনেই ইংরাজী ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা, কিন্তু ইংলণ্ড ও আমেরিকায় মধ্যে মধ্যে যান্, ও, অভিনয় আর গীত গেয়ে লক্ষ লক্ষ ডলার (Dollar) সংগ্রহ করেন। ফরাসী ভাষা সভ্যতার ভাষা, পাশ্চাত্য জগতের ভদ্রলোকের চিহ্ন, সকলেই জানে,—কাজেই এঁদের ইংরাজী শেখবার অবকাশ এবং প্রবৃত্তিও নাই। মাদাম্ বার্ন্‌হার্ড বর্ষীয়সী; কিন্তু সেজে মঞ্চে

যখন ওঠেন,—তখন যে বয়স, যে লিঙ্গ, অভিনয় করেন, তারই হুবহু নকল। বালিকা, বালক, যা বল তাই,—হুবহু;—আর সে আশ্চর্য্য আওয়াজ্! এরা বলে, তাঁর কণ্ঠে রূপার তার বাজে। বার্ন্‌হার্ডের অনুরাগ—বিশেষ ভারতবর্ষের উপর; আমায় বারম্বার বলেন,"তোমাদের দেশ"ত্রে জাঁসিএন্","ত্রে সিভিলিজে'", অতি প্রাচীন, অতি সুসভ্য। এক বৎসর ভারতবর্ষসংক্রান্ত এক নাটক অভিনয় করেন; তার মঞ্চের উপর বেলকুল এক ভারতবর্ষের রাস্তা খাড়া করে দিয়েছিলেন—মেয়ে, ছেলে, পুরুষ, সাধু, নাগা, বেলকুল ভারতবর্ষ!! আমায় অভিনয়ান্তে বলেন যে, "আমি মাসাবধি প্রত্যেক মিউজিয়ম বেড়িয়ে, ভারতের পুরুষ, মেয়ে, পোষাক, রাস্তা, ঘাট, পরিচয় করেছি।" বার্ন্‌হার্ডের ভারত দেখবার ইচ্ছা বড়ই প্রবল—"সে মঁর‍্যাভ্" (ce mon rave) "সে মঁ র‍্যাভ্"—সে আমার জীবন-স্বপ্ন! আবার প্রিন্স অফ্ ওয়েলস্ তাঁকে বাঘ হাতী শিকার করাবেন, প্রতিশ্রুত আছেন। তবে বার্ন্‌হার্ড বল্লেন—সে দেশে যেতে গেলে, দেড় লাখ দুলাখ টাকার খরজ না কর্‌লে কি হয়? টাকার অভাব তাঁর নাই,—"লা দিভীন্ সারা!!" (La divine Sara), "দৈবী সারা";—তাঁর আবার টাকার অভাব কি? যাঁর স্পেসাল ট্রেণ ভিন্ন গতায়াত নাই,—সে ধূম বিলাস ইয়ুরোপের অনেক রাজা রাজড়া পারে না,—যাঁর থিয়েটারে মাসাবধি আগে থেকে দুনো দামে টিকিট কিনে রাখলে তবে স্থান হয়, তাঁর টাকার বড় অভাব নাই। তবে, সারা বার্ন্‌হার্ড বেজায় খরজে। তাঁর ভারতভ্রমণ কাজেই এখন রইল।

মাদ্‌মোয়াজেল্ কাল্‌ভে এ শীতে গাইবেন না, বিশ্রাম কর্‌বেন,—ইজিপ্ত প্রভৃতি নাতিশীত দেশে চলেছেন। আমি যাচ্ছি—এঁর অতিথি হয়ে। কাল্‌ভে যে সুধু সঙ্গীতের চর্চ্চা করেন তা নয়; বিদ্যা যথেষ্ট, দর্শনশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্রের বিশেষ সমাদর করেন। অতি দরিদ্র অবস্থায় জন্ম হয়; ক্রমে নিজের প্রতিভাবলে, বহু পরিশ্রমে, বহু কষ্ট সয়ে, এখন প্রভূত ধন,—রাজা, বাদসার সম্মানের ঈশ্বরী।

মাদাম্ মেল্‌বা, মাদাম্ এমা এমস্, প্রভৃতি বিখ্যাত গায়িকা সকল আছেন; জাঁ দরেজ্‌কি, প্লাঁসঁ, প্রভৃতি অতি বিখ্যাত গায়ক সকল আছেন; এঁরা সকলেই দুই তিন লক্ষ টাকা বাৎসরিক রোজগার করেন;—কিন্তু কাল্‌ভির বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে এক অভিনব প্রতিভা। অসাধারণ রূপ, যৌবন, প্রতিভা, আর দৈবী কণ্ঠ—এ সব একত্র সংযোগে কাল্‌ভেকে গায়িকামণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় করেছে।

কিন্তু দুঃখ, দারিদ্র অপেক্ষা শিক্ষক আর নেই। সে শৈশবের অতি কঠিন দারিদ্র, দুঃখ, কষ্ট,— যার সঙ্গে দিন রাত যুদ্ধ করে কাল্ভের এই বিজয় লাভ, সে সংগ্রাম তাঁর জীবনে এক অপূর্ব্ব সহানুভূতি, এক গভীর ভাব এনে দিয়েছে। আবার এদেশে উদ্যোগ যেমন, উপায়ও তেমন। আমাদের দেশে উদ্যোগ থাকলেও, উপায়ের একান্ত অভাব। বাঙ্গালীর মেয়ের বিদ্যা শিখ্বার সমধিক ইচ্ছা থাক্‌লেও, উপায়াভাবে বিফল,—বাঙ্গলা ভাষায় আছে কি শিখ্‌বার? বড় জোর পচা নভেল নাটক!! আবার বিদেশী ভাষায়, বা সংস্কৃত ভাষায় আবদ্ধ বিদ্যা, দু চার জনের জন্য মাত্র। এ সব দেশে নিজের ভাষায় অসংখ্য পুস্তক; তার উপর যখন যে ভাষায় একটা নূতন কিছু বেরুচ্ছে, তৎক্ষণাৎ তার অনুবাদ করে সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত কর্‌ছে।

মসিয়ঁ জুল্ বোওয়া প্রসিদ্ধ লেখক; ধর্ম্ম সকলের, কুসংস্কার সকলের ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কারে বিশেষ নিপুণ। মধ্যযুগে ইউরোপে যে সকল সয়তান-পূজা, জাদু, মারণ, উচাটন, ছিটে ফোঁটা, মন্ত্র তন্ত্র ছিল এবং এখনও যা কিছু আছে, সে সকল ইতিহাসবদ্ধ করে এঁর এক প্রসিদ্ধ পুস্তক। ইনি সুকবি এবং ভিক্তর হ্যুগো, লা মার্টিন্ প্রভৃতি ফরাসী মহাকবি এবং গেটে, সিলার প্রভৃতি জর্ম্মান্ মহাকবিদের ভেতর যে ভারতের বেদান্তি-ভাব প্রবেশ করেছে, সেই ভাবের পোষক। বেদান্তের প্রভাব ইউরোপে কাব্য এবং দর্শনশাস্ত্রে সমধিক। ভাল কবি মাত্রই দেখছি বেদান্তী; দার্শনিক তত্ত্ব লিখতে গেলেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বেদান্ত। তবে কেউ কেউ স্বীকার করতে চায় না, নিজের সম্পূর্ণ নূতনত্ব বাহাল রাখতে চায়,—যেমন হারবার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি। কিন্তু অধিকাংশরাই স্পষ্ট স্বীকার করে। এবং না করে যায় কোথা—এ তার, রেলওয়ের, খবর-কাগজের দিনে? ইনি অতি নিরভিমানী, শান্তপ্রকৃতি, এবং সাধারণ অবস্থার লোক হলেও, অতি যত্ন করে আমায় নিজের বাসায় পারিসে রেখেছিলেন। এখন একসঙ্গে ভ্রমণে চলেছেন।

কন্স্টান্টিনোপল্ পর্য্যন্ত পথের সঙ্গী আর এক দম্পতী—পেয়র হিয়াসান্থ এবং তাঁর সহধর্ম্মিণী। পেয়র, অর্থাৎ পিতা হিয়াসান্থ ছিলেন—ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের, এক কঠোর তপস্বী-শাখাভুক্ত সন্ন্যাসী। পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ বাগ্মিত্ব-গুণে, এবং তপস্যার প্রভাবে, ফরাসী দেশে এবং সমগ্র ক্যাথলিক সম্প্রদায়ে, ইঁহার অতিশয় প্রতিষ্ঠা ছিল। মহাকবি ভিক্তর হ্যুগো দুজন লোকের ফরাসী ভাষায় প্রশংসা কর্ত্তেন। তার মধ্যে পেয়র হিয়াসান্থ

একজন। চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পেয়র হিয়াসান্থ এক আমেরিক নারীর প্রণয়াবদ্ধ হয়ে, তাকে করে ফেল্লেন বে—মহা হুলুস্থুল পড়ে গেল ;—অবশ্য ক্যাথলিক সমাজ তৎক্ষণাৎ তাঁকে ত্যাগ কর্ল্লে। শুধু পা, আলখেল্লা-পরা-তপস্বী-বেশ ফেলে, পেয়র হিয়াসান্থ গৃহস্থের হ্যাট্ কোট্ বুট্ পরে হলেন—মস্যিয় লইসন্। আমি কিন্তু তাঁকে তাঁর পূর্ব্বের নামেই ডাকি। সে অনেক দিনের কথা—ইউরোপ-প্রসিদ্ধ হ'ঙ্গাম, প্রোটেষ্টাণ্টরা তাঁকে সমাদরে গ্রহণ করলে, ক্যাথলিকরা ঘৃণা করতে লাগ্‌লো, পোপ লোকটার গুণাতিশয্যে তাঁকে ত্যাগ করতে না চেয়ে, বল্লেন যে, "তুমি গ্রীক্ ক্যাথলিক্ পাদ্রী হয়ে থাক, (সে শাখার পাদ্রী একবার মাত্র বে করতে পায়, কিন্তু বড় পদ পায় না), কিন্তু রোমান চার্চ্চ ত্যাগ করো না" ; কিন্তু লয়জন্-গেহিনী তাঁকে টেনে হিঁচড়ে পোপের ঘর থেকে বার করলে। ক্রমে পুত্র পৌত্র হলো ; এখন অতি স্থবির লয়জন্ জিরুসালমে চলেছেন,—ক্রিশ্চান্ আর মুষলমানের মধ্যে যাতে সদ্ভাব হয়, সেই চেষ্টায়। তাঁর গেহিনী বোধ হয় অনেক স্বপ্ন দেখেছিলেন, যে লয়জন্ বা দ্বিতীয় মার্টিন্ লূথার হয়, পোপের সিংহাসন উল্টে বা ফেলে দেয়,—ভূমধ্যসাগরে। সে সব ত কিছুই হলো না ; হলো—ফরাসীরা বলে, "ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ"। কিন্তু মাদাম্ লয়জনের সে নানা দিবা স্বপ্ন চলেছে !! বৃদ্ধ লয়জন অতি মিষ্টভাষী, নম্র, ভক্ত প্রকৃতির লোক। আমার সঙ্গে দেখা হলেই কত কথা, নানা ধর্ম্মের, নানা মতের ; কেবল ভক্ত মানুষ—অদ্বৈতবাদে একটু ভয় খাওয়া আছে। গিন্নির ভাবটা বোধ হয় আমার উপর কিছু বিরূপ। বৃদ্ধের সঙ্গে যখন আমার ত্যাগ, বৈরাগ্য, সন্ন্যাসের চর্চ্চা হয়, স্থবিরের প্রাণে সে চিরদিনের ভাব জেগে ওঠে, আর গিন্নির বোধ হয় গা কন্ কন্ করে। তার উপর মেয়ে মদ্দ সমস্ত ফরাসীরা যত দোষ গিন্নির উপর ফেলে ; বলে, "ও মাগী, আমাদের এক মহাতপস্বী সাধুকে নষ্ট করে দিয়েছে !!" গিন্নির কিছু বিপদ্ বই কি,—আবার বাস্ হচ্ছে পারিসে, ক্যাথলিকের দেশে। বে করা পাদ্রীকে ওরা দেখলে ঘৃণা করে ; মাগ ছেলে নিয়ে ধর্ম্ম প্রচার, এ ক্যাথলিক্ আদতে সহ্য করবে না। গিন্নির আবার একটু ঝাঁজ্ আছে কি না। একবার গিন্নি এক অভিনেত্রীর উপর ঘৃণা প্রকাশ করে বল্লেন, "তুমি বিবাহ না করে অমুকের সঙ্গে বাস্ করছো, তুমি বড় খারাপ"। সে অভিনেত্রী ঝট্ জবাব দিলে যে, "আমি তোমার চেয়ে লক্ষ গুণে ভাল। আমি একজন সাধারণ মানুষের সঙ্গে বাস করি,

আইন মত বে না হয় নাই করেছি; আর তুমি মহাপাপী—এত বড় একটা সাধুর ধর্ম্ম নষ্ট করলে!! যদি তোমার প্রেমের ঢেউ এতই উঠেছিলো কি, না হয় সাধুর সেবা-দাসী হয়ে থাকৃতে; তাকে বে করে, গৃহস্থ করে, তাকে উৎসন্ন কেন দিলে?" "পচাকুমড়ো শরীরের" কথা যে দেশে শুনে হাঁসতুম, তার আর এক দিক্ দিয়ে মানে হয় দেখ্‌ছো?

যাক্, আমি সমস্ত শুনি, চুপ করে থাকি। মোদ্দা বৃদ্ধ পেয়র হিয়াসান্থ বড়ই প্রেমিক, আর শান্ত; সে খুসি আছে, তার মাগ ছেলে নিয়ে, দেশশুদ্ধ লোকের তাতে কি? তবে গিন্নিটী একটু শান্ত হলেই, বোধ হয় সব মিটে যায়। তবে কি জান ভায়া, আমি দেখছি যে পুরুষ আর মেয়ের মধ্যে সব দেশেই বোঝবার, বিচার করবার, রাস্তা আলাদা। পুরুষ এক দিক্ দিয়ে বুঝ্‌বে, মেয়ে মানুষ আর এক দিক্ দিয়ে বুঝ্‌বে; পুরুষের যুক্তি এক রকম, মেয়ে-মানুষের আর এক রকম। পুরুষে মেয়েকে মাফ করে, আর পুরুষের ঘাড়ে দোষ দেয়; মেয়েতে পুরুষকে মাফ করে, আর সব দোষ মেয়ের ঘাড়ে দেয়।

এমন সঙ্গে আমার বিশেষ লাভ যে, ঐ এক আমেরিক ছাড়া এরা কেউ ইংরাজী জানে না, এবং ইংরাজী ভাষা এক দম বন্ধ, কাজেই কোনও রকম করে, আমায় কইতে হচ্ছে ফরাসী এবং শুনতে হচ্ছে ফরাসী।

প্যারিসনগরী হতে বন্ধুবর ম্যাক্সিম্ নানা স্থানে চিঠি পত্র যোগাড় করে দিয়েছেন, যাতে দেশ গুলো যথাযথ রকমে দেখা হয়। ম্যাক্সিম্—বিখ্যাত "ম্যাক্সিম্-গনে"র নির্ম্মাতা, যে তোপে ক্রমাগত গোলা চল্‌তে থাকে, আপনি ঠাসে, আপনি ছোঁড়ে, বিরাম নাই। ম্যাক্সিম্ আদিতে আমেরিকান্; এখন ইংলণ্ডে বাস, তোপের কারখানা ইত্যাদি। ম্যাক্সিম্ তোপের কথা বেশী কইলে বিরক্ত হয়, বলে, "আরে বাপু, আমি কি আর কিছুই করিনি,—খালি ঐ মানুষ মারা কল্‌টা ছাড়া?" ম্যাক্সিম্ চীনভক্ত, ভারত-ভক্ত, ধর্ম্ম ও দর্শনাদি সম্বন্ধে সুলেখক। আমার বই পত্র পড়ে অনেকদিন হতে আমার উপর বিশেষ অনুরাগ, বেজায় অনুরাগ। আর ম্যাক্সিম্ সব রাজা রাজড়াকে তোপ বেচে, সব দেশে জানা শুনা; কিন্তু তাঁর বিশেষ বন্ধু লি-হুং-চাঙ্গ, বিশেষ শ্রদ্ধা চীনের উপর, ধর্ম্মানুরাগ কংফুছে মতে। চীনে নাম নিয়ে মধ্যে মধ্যে কাগজে কৃশ্চান পাদ্রীদের বিপক্ষে লেখা হয়; তারা চীনে কি করতে যায়, কেন বা যায়,—এ ম্যাক্সিম্ আদতে সহ্য কর্‌তে পারে না। ম্যাক্সি-

মের গিন্নিটীও ঠিক অনুরূপ, চীন-ভক্তি, কৃশ্চানী-ঘৃণা; ছেলে পিলে নেই, বুড়ো মানুষ,—অগাধ ধন।

যাত্রার ঠিক হলো পারিস্ থেকে রেলযোগে ভিয়েনা, তার পর কনষ্টান্‌টিনোপল্, তার পর জাহাজে এথেন্স, গ্রীস্, তার পর ভূমধ্যসাগর-পার ইজিপ্ত, তার পর আসি-মিনর, জিরুসালেম্, ইত্যাদি। "ওরিআঁতাল এক্স্প্রেস্ ট্রেণ" পারিস্ হতে স্তাম্বুল পর্য্যন্ত ছোটে, প্রতিদিন। তায় আমেরিকার নকলে শোবার, বসবার, খাবার স্থান। ঠিক আমেরিকার গাড়ীর মত সুসম্পন্ন না হলেও, কতক বটে। সে গাড়ীতে চড়ে ২৪শে অক্টোবর পারিস্ ছাড়তে হচ্ছে। (ক্রমশঃ)

পাঁচ কথা।

খোয়া ফেলবো না ত কি? রাস্তাটা ত মোটা হ'ক। রাস্তায় না জল দাঁড়ালেই হ'ল; লোকের উঠোন নীচু হবে, লোকের ঘরে জল সেঁধুবে, শোবার ঘরের তক্তাপোষ ভেসে উঠ্‌বে, তা আমি ক'রব কি? যাও যাও—রাস্তায় না জল দাঁড়ালেই হ'ল। ফেলরে ফেল্, রাস্তার ওপরেই ফেল্—গাড়ি গাড়ি ফেল্! আর, পারিশ ত এই নেড়া বোঝাই মুটার.................. ।

মোরে যায় যাক্, আবরু ত রক্ষে হবে। বলি, অত ঘেরাটোপের দরকারটা কি? একে পাল্কিতে যাচ্চে, তার ওপর দুপাশে দুই-লাঠি-হাতে দরোয়ান; তার ওপর, আবার ঘেরাটোপের দরকার কি? একটু দরজাটা ফাঁক ক'রে রাখলে, পাল্‌কির খড় খড়িটা একটু খুলে রাখলে,—হাওয়া খেলতে পায়; তা নইলে যখন হাঁপিয়ে পেট ফুলে অসুখ ক'রবে, ডাক্তার এসে এগজামিন করবে, তখন আবরুটা কোথায় থাকবে? পোয়াতীর হাঁপিয়ে ওঠার দরুন, যখন পেটের ছেলেটার হাঁপানির ব্যারাম হবে, তখন কুলে বাতী জ্বালবে কে?

প্রাপ্তি-স্বীকার।—"The Bench and Bar Diary, 1901," by M. N. Banerjee, Esqr., B. L., Govt. Pleader, Darjeeling. উপহার স্বরূপ পাইয়াছি। বিজ্ঞলোকের প্রণীত। উকীল-বাবুদিগের বিশেষ উপকারে আসিবে। গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য। মূল্য সাত সিকা।

বাবু বটকৃষ্ট পাল এণ্ড কোং, (৭, বনফিল্ডস্ লেন, কলিকাতা) ও বাবু বনার্জ্জি এণ্ড মল্লিক কোম্পানির (৩৫০, আপার চিৎপুর রোড) শিট্ ক্যালেণ্ডার এবং প্রাত্যাহিক দিন-পরিবর্ত্তনের ক্যালেণ্ডার। ক্যালেণ্ডার গুলি দেখিতে অতি সুন্দর ও প্রশংসনীয় হইয়াছে।

তদনুকরণ না করিয়া, 'ঋতক' এইরূপ শুদ্ধ করিয়া উচ্চারণ করা)। ন্যায্য 'ঋতক' শব্দেরই, সংজ্ঞাদিতে কল্পনা করা, সাধু (সঙ্গত) বলিয়া মনে করিতে হইবে। সুতরাং ইহা 'ঋতক'ই যথার্থ শব্দ, '৯তক' কদাচ নহে।

ভাষ্যমূল।—অপর আহ। ন্যায্য ঋতক শব্দঃ শাস্ত্রান্বিতোঽস্তি স কল্পয়িতব্যঃ সাধু সংজ্ঞাদিষু ঋতক এবাসৌ ন ৯তকঃ।

বঙ্গানুবাদ।—অন্য কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ন্যায্য 'ঋতক' শব্দই হই-য়াছে যথার্থ শাস্ত্রসিদ্ধ, (যদিও কালক্রমে অনভিজ্ঞ লোকদ্বারা উহা অপভ্রংশ হইয়া থাকে, তথাপি শাস্ত্রজ্ঞ অনুকরণ-কারী ব্যক্তির), সুতরাং সেই পরিশুদ্ধ 'ঋতক' শব্দই, বিশুদ্ধ সংজ্ঞাদিতে, প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য; '৯তক' কদাচ নহে।

ভাষ্যমূল।—অয়ং তর্হি যদৃচ্ছাশব্দঃ অপরিহার্য্যঃ। ৯ফিডঃ ৯ফিড্ডশ্চেতি। এষোঽপি ঋফিডঃ ঋফিড্ডশ্চ। কথম্। অর্ত্তিপ্রবৃত্তিশ্চৈব হি লোকে লক্ষ্যতে। ফিড ফিড্ডৌ চৌণাদিকৌ প্রত্যয়ৌ।

বঙ্গানুবাদ।—(অশক্তিজানুকরণ স্থলে, এই ৯কারের অনাবশ্যকতা প্রমাণিত হইলেও,) এই যদৃচ্ছা শব্দ কিন্তু পরিহারের (পরিত্যাগের) অযোগ্য। যথা;— ৯ফিড এবং ৯ফিড্ড, ইত্যাদি (প্রয়োগ ত হইয়া থাকে)।

(না, ইহাও মূল শব্দ নহে, অপভ্রংশ শব্দমাত্র)। ইহাও (মূল শব্দ) ঋফিডঃ এবং ঋফিড্ড ই। (যদি ঋফিড, ঋফিড্ড শব্দ শাস্ত্রসিদ্ধ হয়, তাহা কোন্ ধাতু হইতে উৎপন্ন?) কিরূপে সিদ্ধ?

('ঋ' গতৌ, এই জুহোত্যাদিগণীয় ধাতুর উত্তর, [এই ধাতু শ্রুতিনিহিত হইলেও,] ডিপ্ প্রত্যয় করিয়া, অর্ত্তি পদ লোক মধ্যে ব্যবহার আছে।) অর্ত্তি অর্থাৎ 'ঋ' ধাতুর প্রবৃত্তি (বেদবৎ), লৌকিক ব্যবহারেও দৃষ্ট হয়। অতএব সেই 'ঋ' ধাতুর উত্তর, উণাদিতে বিহিত ফিড বা ফিড্ড প্রত্যয় করিলে, অবশ্য ঋফিড বা ঋফিড্ড পদ সিদ্ধ হইবে। (উণাদয়ো বহুলম্ ।৩।৩।১। এই সূত্রানুসারে উণাদি প্রকরণে বহুবিধ প্রত্যয় ই বিধান হইতে পারে, সুতরাং ফিড, ফিড্ড প্রত্যয় অসঙ্গত নহে। ঋফিডাদি পদসিদ্ধিও অসঙ্গত নহে)।

ভাষ্যমূল।—ত্রয়ী চ শব্দানাং প্রবৃত্তিঃ। জাতিশব্দা গুণশব্দাঃ ক্রিয়াশব্দা ইতি। ন সন্তি যদৃচ্ছাশব্দাঃ।

বঙ্গানুবাদ।—(ঋফিডাদি প্রয়োগ সিদ্ধ হইলেও, অসংখ্য অসংখ্য যদৃচ্ছা শব্দের ব্যুৎপত্তি করা অসম্ভব। আর যদি একান্তই সম্ভব হয়, তবে অত্যন্ত

বৃহৎ এক প্রকাণ্ড গ্রন্থ প্রণয়ন প্রয়োজন। সুতরাং এইরূপ অসম্ভব বা গৌরব হেতু বলিতে হইবে যে) তিন প্রকার শব্দের প্রবৃত্তি (স্থিতি)। যথা;—জাতি শব্দ, গুণ শব্দ এবং ক্রিয়াশব্দ। কিন্তু যদৃচ্ছা শব্দ বলিয়া কোন শব্দই নাই।

ভাষ্যমূল।—অন্যথা কৃত্বা প্রয়োজনমুক্তমন্যথা কৃত্বা পরিহারঃ। সন্তি যদৃচ্ছা-শব্দা ইতি কৃত্বা প্রয়োজনমুক্তং ন সন্তীতি পরিহারঃ। সমানে চার্থে শাস্ত্রান্বিতোঽশাস্ত্রান্বিতস্য নিবর্ত্তকো ভবতি। তদ্‌যথা। দেবদত্তশব্দো দেবদিন্ন শব্দং নিবর্ত্তয়তি। ন গাব্যাদীন্।

বঙ্গানুবাদ।—এ কিরূপ হইল? অন্য প্রকারে ('ঌ'কারের) প্রয়োজন স্বীকার করিয়া আর এক প্রকারে তাহার পরিহার (খণ্ডন) করা হইল? যদৃচ্ছা শব্দ আছে, এই বলিয়া, 'ঌ'কারের প্রয়োজন স্বীকার করিয়া, যদৃচ্ছা-শব্দ নাই, এই বলিয়া তাহার খণ্ডন করা হইল? (অর্থাৎ যাহারা যদৃচ্ছা শব্দ লইয়া, চারিপ্রকার শব্দের প্রবৃত্তি মানে, তাহাদের মতে প্রয়োজন দেখাইয়া, "আমি তাহা মানি না, আমি তিন প্রকারই মানি," এই বলিয়া খণ্ডন করা কি সঙ্গত হয়? কোনও একদলের লোকগণ, স্বীকার করিলেই শাস্ত্রের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।

(আর তোমরা যাহা পূর্ব্বে বলিয়াছিলে যে, "ঋতক" শব্দই অপভ্রংশ হইয়া 'ঌতক' শব্দ হইয়াছে," যদি 'ঋতক' এবং 'ঌতক', এই উভয় শব্দের সমান অর্থ হইত, তবে এইরূপ বলিয়া 'ঌতক' শব্দের বারণ করা সঙ্গত হইত; কেন না,) সমান অর্থেতেই শাস্ত্রসঙ্গত শব্দ, শাস্ত্রবহির্ভূত শব্দকে নিবারণ করে। যেমন, শাস্ত্রবিহিত 'দেবদত্ত' শব্দ অশাস্ত্রীয় 'দেবদিন্ন' শব্দকে নিবারণ করে। (কেন না এই উভয় শব্দ সমান অর্থবাচক)। কিন্তু সেই দেবদত্ত শব্দ, ভিন্নার্থ বোধক গাব্য প্রভৃতি শব্দকে নিবারণ করে না। (বরং গো শব্দ গাব্য প্রভৃতি অপভ্রংশ শব্দকে নিবারণ করে। এই স্থলেও সেইরূপ 'ঋতক' শব্দের ছায়া বা আভাস মাত্র 'ঌতক' শব্দে না থাকাতে, ['ঋতক' শব্দ ধাতু প্রত্যয় নিষ্পন্ন অর্থবান্, গমনকারী লোক, আর 'ঌতক' শব্দ ধাতুপ্রত্যয়বর্জ্জিত সংজ্ঞা মাত্র] 'ঋতক' শব্দ, 'ঌতক' শব্দের নিবর্ত্তক হইতে পারে না, অতএব 'ঌ'কার উপদেশ কর্ত্তব্য।)

ভাষ্যমূল।—নৈষ দোষঃ। পক্ষান্তরৈরপি পরিহারা ভবন্তি। অনুকরণং শিষ্টাশিষ্টাপ্রতিষিদ্ধেষু যথা লৌকিক বৈদিকেষু।* অনুকরণং হি শিষ্টস্য সাধু

ভাতি। অশিষ্টাপ্রতিষিদ্ধস্থ বা নৈব তদ্দোষায় ভবতি নাভ্যুদয়ায়। যথা লৌকিক বৈদিকেষু।*। যথা লৌকিকেষু বৈদিকেষু চ কৃতান্তেষু।

লোকে তাবদ্। য এবমসৌ দদাতি, য এবমসৌ যজতে, য এবমসাবধীত ইতি তস্যানুকুর্ব্বন্ দদ্যাচ্চ যজেত চাধীয়ীত চ সোঽপ্যভ্যুদয়েন যুজ্যতে।

বেদেঽপি য এবং বিশ্বসৃজঃ সত্রাণ্যধ্যাসত ইতি তেষামনুকুর্ব্বন্ তদ্বৎ সত্রাণ্যধ্যাসীত সোপ্যভ্যুদয়েন যুজ্যতে। অশিষ্টাপ্রতিষিদ্ধং যথা। য এবমসৌ হিক্কতি, য এবমসৌ হসতি, য এবমসৌ কণ্ডূয়তীতি, তস্যানুকুর্ব্বন্ হিক্কেচ্চ হসেচ্চ কণ্ডূয়েচ্চ নৈব তদ্দোষায় স্যান্নাভ্যুদয়ায়।

বঙ্গানুবাদ।—পুনঃ উত্তর এই যে. ইহা দোষ নহে। প্রকারান্তরেও ‘৯কার’ পরিহার হইতেছে। শিষ্ট, অশিষ্ট, এবং অনিষিদ্ধ শব্দ সমূহেরই অনুকরণ করা কর্ত্তব্য ; যেমন লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারে হইয়া থাকে। *

অনুকরণও, শিষ্ট (শাস্ত্রসঙ্গত) শব্দেরই করা সঙ্গত। আর শাস্ত্রে যাহা বিধান নাই,· অথচ নিষেধও নাই, তাহা প্রয়োগ করাতে, কোন দোষও হয় না, অথবা অভ্যুদয়ও (উন্নতি বা মঙ্গলও) হয় না। যেরূপ লৌকিক বৈদিকেতে। * যেমন লৌকিক সিদ্ধান্ত এবং বৈদিক সিদ্ধান্ত সমূহে অনুকরণ হইয়া থাকে।

লোকে, (স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস, শিষ্ট মনুষ্য প্রভৃতির ব্যবহারে) যথা ;—কোনও ব্যক্তি, “যে এই রূপে ইহা দান করে, যে এইরূপে এই যজ্ঞ করে, যে এইরূপে ইহা অধ্যয়ন করে.” এই কথা বলিয়া তাহাদের অনুকরণ দেখাইতে গিয়া, সত্য সত্যই কিছু দান করে, কোনও যজ্ঞ (১) করে এবং কোন কোন শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, সেও (অনুকারী দাতারাও) অভ্যুদয়.(স্বর্গাদি) লাভ করে।

বেদেতেও সেইরূপ, যে ব্যক্তি “ব্রহ্মা (বিশ্বসৃষ্টিকর্ত্তা) এই প্রকারে সত্র (২) সমূহ নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন,” এই বলিয়া তাহার অনুকরণ করিতে করিতে, নিজেও সেই ব্রহ্মার ন্যায়, সত্র (বৃহৎ যজ্ঞ) সমূহের অনুষ্ঠান করে, সেও অভ্যুদয় (স্বর্গাদি) লাভ করে। শাস্ত্রে অবিহিত অনিষিদ্ধ কর্ম্ম, যথা ;—ইনি এইরূপে ঢেকুর (হিক্কা) তোলেন, ইনি এইরূপে হাসেন, ইনি এইরূপে গা চুল্কান (কণ্ডূয়ন করেন) ; এই বলিয়া যিনি, তদ্রূপ অনুকরণ

(১) স্মৃতি শাস্ত্র বিহিত যজ্ঞ। (২) তিনদিনের অধিক কালব্যাপী যজ্ঞকে সত্র কহে।

করিতে করিতে, নিজেও ঢেকুর তোলেন, হাসেন, চুল্কান, এই কর্ম্ম সকল (শাস্ত্রে বিধি বা নিষেধ না থাকাতে) তাহার দোষের জন্যও হয় না, অথবা উন্নতির জন্যও হয় না।

ভাষ্যমূল।—যস্তু খল্বেবমসৌ ব্রাহ্মণং হন্তি, এবমসৌ সুরাং পিবতীতি তস্যানুকুর্ব্বন্ ব্রাহ্মণং হন্যাৎ, সুরাং বা পিবেৎ, সোপি মন্যে পতিতঃ স্যাৎ।

বঙ্গানুবাদ।—"এই ব্যক্তি এইরূপে ব্রহ্মহত্যা করে, এই ব্যক্তি এইরূপে সুরাপান করে," এই বলিয়া যে ব্যক্তি তাহার অনুকরণ করিতে করিতে, নিজেও সত্য সত্যই ব্রাহ্মণকে বধ করে, অথবা সুরাপান করে, সেও পতিত হয় বলিয়াই মানিতে হয়। (সুতরাং অশুদ্ধের অনুকরণও অশুদ্ধ হইয়া থাকে।)

ভাষ্যমূল।—বিষম উপন্যাসঃ। যশ্চৈবং হন্তি, যশ্চানুহন্তি উভৌ তৌ হতঃ। যশ্চাপি পিবতি, যশ্চানুপিবতি উভৌ তৌ পিবতঃ। যস্তু খল্বেবমসৌ ব্রাহ্মণং হন্তি, এবমসৌ সুরাং বা পিবতীতি অস্যানুকুর্ব্বন্ স্নাতানুলিপ্তো মাল্যগুণকণ্ঠঃ কদলীস্তম্ভং ছিন্দ্যাৎ পয়ো বা পিবেৎ ন সমন্যে পতিতঃ স্যাৎ। এবামিহাপি য এবমসাবপশব্দং প্রযুঙ্ক্তে ইতি তস্যানুকুর্ব্বন্নপশব্দং প্রযুঞ্জীত সোঽপ্যপশব্দভাক্ স্যাৎ।

বঙ্গানুবাদ।—অসমান দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইল, (কারণ এই স্থলে ত অনুকরণ হয় নাই;) কেন না, যে ব্যক্তি (ব্রাহ্মণ) হত্যা করিল, এবং যে ব্যক্তি পশ্চাৎ (তাহার অনুকরণ করিতে গিয়া ব্রাহ্মণ) হত্যা করিল, ব্রাহ্মণহত্যা ত তাহারা দুই জনেই করিল। যে সুরাপান করে, (তাহার অনুকরণ করিয়া) পশ্চাৎ যে ব্যক্তি সুরাপান করে, সুরাপান কার্য্যটী ত তাহারা দুই জনেই করিল। কিন্তু যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণহত্যা বা সুরাপানের অনুকরণ করণ করিতে গিয়া, প্রকৃতপক্ষে সুরাপান না করিয়া, "এই ব্যক্তি এইরূপে ব্রাহ্মণ বধ করে, অথবা এই ব্যক্তি এইরূপে সুরাপান করে," এই বলিয়া, তাহার (প্রকৃত হত্যাকারীর) অনুকরণ করিতে করিতে, (ঠিক্ সেই ব্রহ্মহত্যাকারীর ন্যায়), স্নান করিয়া, চন্দনাদি সুগন্ধি দ্রব্য বা রক্তচন্দন গায়ে কপালে লেপিয়া, সূতার গাঁথা মালা গলায় ঝুলাইতে ঝুলাইতে, কলাগাছের স্তম্ভ (থামের ন্যায় কলাগাছের মধ্যভাগ), ছেদন করে, (মদ্যপানের ঢং করিয়া) দুগ্ধ বা জল পান করে, সে পতিত বলিয়া গণ্য হয় না। সেইরূপ এই স্থলেও যে ব্যক্তি, "ইনি এইরূপে অপশব্দ প্রয়োগ করেন," এই বলিয়া তাহার অনুকরণ করিতে করিতে, নিজেও অপশব্দ প্রয়োগ করে,

সেও (প্রয়োগকারীর ন্যায় অনুকরণকারীও) অপশব্দ প্রয়োগ ভাগী হয় (অপ-শব্দপ্রয়োগজনিত দোষভাগী হয়)।

ভাষ্যমূল।—অয়ং ত্বন্যোঽপশব্দপদার্থকঃ শব্দো যদর্থ উপদেশঃ কর্ত্তব্যঃ। ন চাপশব্দ পদার্থকঃ শব্দোঽপশব্দ ভবতীতি। অপশব্দ ইত্যেব তস্যাপশব্দঃ স্যাৎ। ন চৈষোপশব্দঃ।

বঙ্গানুবাদ।—এই স্থলে কিন্তু অন্য প্রকার (অর্থাৎ 'কুমার্য্যৡতক' এইরূপ বলাতে, অনুকরণকারী বক্তা যে, সর্ব্বত্রই 'ঋতক' বলিতে অসমর্থা কুমারীর [বালিকার] ন্যায়, 'ৡতক' শব্দ বলিবে তাহা নহে ; তবে ''বালিকাগণ 'ঋতক' স্থানে অস-মর্থতাহেতু 'ৡতক' বলিয়া থাকে,'' ইহা অন্যকে বুঝাইবার জন্য 'কুমার্য্যৡতক' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছে ;) অপশব্দ প্রয়োগের প্রয়োজন বুঝাইবার জন্য, এই স্থলে অপশব্দ প্রয়োগ করিয়াছে ; (সুতরাং ইহা অপশব্দ হইতে পারে না ;) এই হেতুই 'ৡকার' উপদেশ করা কর্ত্তব্য। অপশব্দ প্রয়োগের প্রয়োজন বুঝাইবার জন্য যে শব্দ, তাহা অপশব্দ হইতে পারে না ; ইহা এইরূপ জানিতে, অবশ্যই বাধ্য হইবে। নতুবা, যে ব্যক্তি ইহা মনে করে যে, অপশব্দ (অশুদ্ধশব্দ বা অপভ্রংশ শব্দ) পদের প্রয়োজন বুঝাইবার জন্য, যে শব্দ প্রয়োগ করা হয়, তাহাও অপশব্দই হয় ; তবে সে যে 'অপশব্দ,' এই শব্দটী (আমাদের শব্দকে অপশব্দ বলিবার জন্য) প্রয়োগ করিল, তাহাও ত তাহার অপশব্দ হইয়াছে। কিন্তু ইহা অপশব্দ নহে।

ভাষ্যমূল।—অয়ং খল্বপি ভূয়োঽনুকরণশব্দোঽপরিহার্য্যঃ। যদর্থ উপদেশঃ কর্ত্তব্যঃ। সাধ্বৡকারমধীতে, মধ্বৡকারমধীত ইতি। কস্যস্য পুনরেতদনু-করণম্।

কৢপিস্থস্য। যদি কৢপিস্থস্য। কৢপেশ্চ'ল'ত্বমসিদ্ধম্। তস্যাসিদ্ধত্বাদৃকার এবাচ্ কার্য্যাণি ভবিষ্যন্তি।

বঙ্গানুবাদ।—এইস্থলে এইরূপ হইলেও, এই যে রাশি রাশি অনুকরণ শব্দ তাহা পরিত্যাগের উপায় নাই। যাহার জন্য 'ৡ'কার উপদেশ, অবশ্যই করিতে হইবে। যেমন, এই বালক, সাধু (পরিশুদ্ধ) 'ৡ'কারটী পাঠ করিতেছে। সুমধুর 'ৡ'কারটী পাঠ করিতেছে। (এইরূপ অনুকরণ করিতে গিয়াও ত 'ৡ'কার পাঠ করা হয়।) (পূর্ব্বে 'ৡ'কার উপদেশের প্রয়োজন নাই দেখান হইয়াছে) পুনরায় এই অনুকরণ (কৃত 'ৡ'কার) কোথা হইতে আসিল।

'কৢপি' ধাতু হইতে আসিয়াছে।

যদি 'কৢপি' ধাতু হইতেই আসিয়া থাকে; তবে কৢপি ধাতুর 'ল'ত্ব ('ঋ' স্থানে, 'ঌ' বিধান সন্ধির পরে বলিয়া, পর শব্দের নিকট পূর্ব্বশাস্ত্র অসিদ্ধত্ব-হেতু) অসিদ্ধ, তাহার অসিদ্ধতা প্রযুক্ত, 'ঋ'কারেতেই অচ্‌ত্ব ধর্ম্ম মানিয়া (ইক্ এর স্থানে, যণ্ হয়, অচ্ পরে থাকিলে) সন্ধি প্রভৃতি (ই স্থানে 'য', উ স্থানে 'ব' ইত্যাদি) কার্য্য হইবে। (কেন না, "কৃপোরোলঃ।" এই সূত্রের দৃষ্টিতে, "ইকো যণ চি" সূত্র অসিদ্ধ।)

ভাষ্যমূল।—ভবেত্তদর্থেন নার্থঃ স্যাৎ। অয়ং তুন্যঃ কৢপিস্থপদার্থকঃ শব্দঃ যদর্থ উপদেশঃ কর্ত্তব্যঃ।

বঙ্গানুবাদ।—এইরূপ হউক যে, সেই প্রয়োজনের জন্যে (কৢপি ধাতুর 'ঌ' কারেতে অচ্‌ত্ব ধর্ম্ম মানিয়া, সন্ধি করিয়া 'য'কারাদি কার্য্য হইবার জন্য), ইহার ('ঌ'কার উপদেশের) প্রয়োজন নাই। এখানে 'ঌ'কার উচ্চারণের অন্য উদ্দেশ্য, কৢপি এই ধাতুটির পদার্থ নির্ণয়ের জন্য (অর্থাৎ এই ধাতুটী কোথা হইতে আসিল, কিরূপে উৎপন্ন হইল ইত্যাদির জন্য) যে,কৢপি উচ্চারণের প্রয়োজন; যাহার (যে কৢপি উচ্চারণের) জন্য 'ঌ' কারের উপদেশ করা কর্ত্তব্য।

ভাষ্যমূল।—ন কর্ত্তব্যঃ। ইদং অবশ্যং কর্ত্তব্যং প্রকৃতিবদনুকরণং ভবতীতি। কিং প্রয়োজনম্। দ্বিঃ পচন্ত্বিত্যাহ। তিঙ্ঙতিঙ ইতি নিঘাতো যথাস্যাৎ। অগ্নী ইত্যাহ। ঈদূদেদ্দ্বিবচনং প্রগৃহ্য সংজ্ঞং ভবতীতি প্রগৃহ্যসজ্ঞা যথাস্যাৎ।

বঙ্গানুবাদ।—ঌ কার উপদেশ কর্ত্তব্য নহে; কেননা ইহা অবশ্যই স্বীকার করা কর্ত্তব্য যে, প্রকৃতির (মূল শব্দের) ন্যায়, অনুকরণ শব্দও হইয়া থাকে। কি হেতু প্রকৃতির ন্যায় অনুকরণ শব্দও হইয়া থাকে? দ্বিঃ পচন্তু (দুইবার পাক হউক), এই স্থলে উক্ত হইয়াছে যে, যেমন প্রথমবার "দ্বিঃ পচন্তু," এই স্থলে "তিঙ্ঙতিঙ" (অতিঙন্তশব্দের পরে তিঙন্ত নিষ্পন্ন পদ থাকিলে, তাহার অর্থাৎ সেই অতিঙ্‌-অন্তের, অনুদাত্ত স্বর হয়) সূত্র দ্বারায় যেমন "দ্বিঃ" অনুদাত্ত স্বর-বিশিষ্ট হয়, তদ্রূপ সেই "দ্বিঃ" শব্দের অনুকরণার্থ পুনঃ পাঠেও নিঘাত (অনুদাত্ত) স্বর হইবে।

এইরূপ, অগ্নী ইত্যাহ (অগ্নি এই শব্দ বলিয়াছিল), এই স্থলে, এই পূর্ব্ব উচ্চারিত শব্দের যেমন, "ঈদূদে দ্বিবচনম্ প্রগৃহ্যম্"। ১।১।১১। (দ্বিবচন নিষ্পন্ন ঈকারান্ত, উকারান্ত এবং একারান্ত শব্দের প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হয়), (প্লুত এবং প্রগৃহ্যসংজ্ঞক শব্দের পরেতে স্বরবর্ণ থাকিলে, প্রকৃতি ভাব হয় অর্থাৎ যেমন

অবস্থা ছিল,তেমনই থাকে, সন্ধি হয় না),এই সূত্রানুসারে প্রগৃহ্য সংজ্ঞা হওয়াতে, প্রকৃতি-ভাব হইয়াছিল ; পরবর্ত্তী অনুকরণ "অগ্নীত্যাহ"শব্দেও তাহাই হইয়াছে, সন্ধি হয় নাই। সুতরাং অনুকরণ শব্দও প্রকৃতিগত শব্দের ন্যায় হয়, এইরূপ বলা যাইতে পারে।

ভাষ্যমূল।—যদি প্রকৃতিবদনুকরণং ভবতীত্যুচ্যতে। অপশব্দ এবাসৌ ভবতি কুমার্য্ ৯তক ইত্যাহ। ব্রাহ্মণ্য্ ৯তক ইত্যাহ। অপশব্দো হ্যস্য প্রকৃতিঃ।

ন চাপশব্দঃ প্রকৃতিঃ। নহ্যপশব্দা উপদিশ্যন্তে। ন চানুপদিষ্টা প্রকৃতিরস্তি।

বঙ্গানুবাদ।—যদি অনুকরণ শব্দও প্রকৃতির ন্যায়ই হয়, এইরূপ বলা যায়, তাহা হইলে এই যে "কুমার্য্ ৯তক ইত্যাহ" (কুমারী '৯তক' এই কথা বলিয়াছিল), "ব্রাহ্মণ্য্ ৯তক ইত্যাহ" (ব্রাহ্মণী '৯তক' এই কথা বলিয়াছিল), এইরূপ অনুকরণীকৃত শব্দ সমূহও কুমারী-উক্ত প্রকৃতি-গত শব্দের ন্যায়, অপশব্দই হইবে। কেন না অপশব্দই ইহার প্রকৃতি।

অপশব্দ কাহারও প্রকৃতি হইতে পারে না। যে হেতু পাণিনি কোনও অপশব্দ উপদেশ করেন নাই; আর যাহা পাণিনি উপদিষ্ট নহে, তাহা কখনও প্রকৃতি হইতে পারে না। অতএব ৯তক শব্দ যদি প্রকৃতি না হইল, তবে ৯কার উপদেশ সঙ্গতই হইল।

ভাষ্যমূল।—একদেশবিকৃতমনন্যবৎ প্লুত্যাদয়ঃ।*। একদেশবিকৃতমনন্যবদ্ভবতীতি প্লুত্যাদয়োঽপি ভবিষ্যন্তি।

যদ্যেকদেশবিকৃতমনন্যবদ্ভবতীত্যুচ্যতে। রাজ্ঞঃ ক চ। রাজকীয়ম্। অল্লোপোঽন ইতি লোপঃ প্রাপ্নোতি।

একদেশবিকৃতমনন্যবৎ ষষ্ঠী নির্দ্দিষ্টস্য।

বঙ্গানুবাদ।—এক অংশ বিকৃত হইলেও,সেই শব্দ অনন্য হয় বলিয়া, প্লুতি প্রভৃতি কার্য্য হইবে।*। কোনও শব্দের একটী অংশ বিকৃত হইলেও, সেই শব্দ অন্য শব্দ বলিয়া পরিগণিত হয় না; সুতরাং প্লুত্যাদি কার্য্য (অর্থাৎ ঋব, রকারের স্থানে ল কার হইয়া ৯ হইলেও, ঋকার নিমিত্ত, যে স্থানে প্লুত, প্রকৃতি ভাব প্রভৃতি কার্য্য হইত, ৯কার নিমিত্তও তাহাই হইবে) বিকৃতাবস্থায়ও হইবে।

"যদি এক অংশ বিকৃত হইলেও রূপান্তর না হয়," এইরূপ বলা যায়, তবে রাজ্ঞঃ ক চ।৪।২।১৪০। (বৃদ্ধির পরে ছ প্রত্যয় সিদ্ধি হইলে, তাহার

সহিত মিলিত হইয়া, রাজন্ শব্দের উত্তর 'ক'কার আদেশ হইয়া থাকে), এই সূত্রানুসারে রাজকীয় শব্দ সিদ্ধ হইয়া, "অল্লোপোঽনঃ," এই সূত্রানুসারে অকারের লোপ প্রাপ্তি হইবে: (অর্থাৎ "রাজকীয়" এই অশুদ্ধ প্রয়োগ হইবে।)

তাহা হইবে না; যে হেতু, ষষ্ঠী বিভক্তি নির্দ্দিষ্ট শব্দেরই, একদেশ বিকৃত হইলেও, রূপান্তর হয় না, এইরূপ জানিতে হইবে। (কৃপ্ ধাতুর ঋকার যখন. "কৃপোরোলঃ" এই সূত্রে ষষ্ঠী বিভক্তি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, তখন এই স্থলে, ঋকারের রূপান্তর প্রাপ্তি হইবে: আর "রাজ্ঞঃ কচ," এই সূত্রটীর সমস্ত রাজন শব্দেতেই ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে। কিন্তু কেবল মাত্র রাজন্ শব্দের অন্ ভাগেতে ষষ্ঠী বিভক্তি হয় নাই; সুতরাং "অল্লোপোনঃ এই সূত্রানুসারে অকারের লোপ হইবে না।)

ভাষ্যমূল।—যদি ষষ্ঠী নির্দ্দিষ্টস্যেত্যুচ্যতে ক্লৃ৩প্তশিখ ইতি প্লুতো ন প্রাপ্নোতি নহ্যত্র ঋকারঃ ষষ্ঠীনির্দ্দিষ্টঃ। কস্তর্হি। রেফঃ। ঋকারোপ্যত্র ষষ্ঠীনির্দ্দিষ্টঃ। কথম্। অবিভক্তিকোনির্দ্দেশঃ। কৃপ উঃ রঃ লঃ কৃপোরোল ইতি।

বঙ্গানুবাদ।—যদি ষষ্ঠী বিভক্তির দ্বারা নির্দ্দিষ্ট বর্ণেরই একদেশ বিকৃত হইলে, রূপান্তর হয় না,এইরূপ বলা যায়; তবে ক্লৃ৩প্তশিখ এই স্থলেও,ঌকার প্লুত হইবে না, যে হেতু এই স্থানে ঋকার ষষ্ঠী বিভক্তির দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই (অর্থাৎ কৃপ ধাতুর ঋকার স্থানে যে ঌকার আদেশ হইয়াছে, সেই ঋকারের র্ মাত্র অংশেরই, ল্ আদেশ হইয়া ঌকার হইয়াছে; সমস্ত ঋকার (১) অবয়বের স্থানে, সমস্ত ঌকার (২) আদেশ হয় নাই, যখন সুতরাং ঋকার ষষ্ঠী নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, তখন তাহার একদেশ বিকৃত হইয়া যে, রূপান্তরিত হইবে না, তাহাও নহে; অতএব "ক্লৃ৩প্ত শিখ" (৩) এই স্থলে ঌকার প্লুতও হইবে না।) তবে ষষ্ঠীনির্দ্দিষ্ট কোন্ বর্ণ? রেফ অর্থাৎ রেকার মাত্র বর্ণ। না, এই স্থলে কেবল মাত্র রেফই ষষ্ঠী বিভক্তি নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। পরন্তু ঋকারও এই স্থানে ষষ্ঠী বিভক্তির দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিরূপে ষষ্ঠী বিভক্তি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট

---

(১) ঋকারের এক অংশ (র্) ব্যঞ্জন, এবং এক অংশ স্বর ('ই'বং কোনও বর্ণ) জানিবে।

(২) ঌবর্ণের একভাগ ব্যঞ্জন (ল্) এবং একভাগ স্বর ('ই'বং কোনও বর্ণ) জানিবে।

(৩) যে সকল স্থানে স্বরবর্ণের পরে, '৩' থাকিবে, তাহাকে প্লুত স্বর বিশিষ্ট জানিবে। যেমন ক্লৃ৩প্তশিখ।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য।

স্বামী বিবেকানন্দ।] [৫৮৩ পৃষ্ঠার পর।

খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে ত এই মোট কথা শুনলে। এখন পাশ্চাত্যেরা কি খায় এবং তাদের আহারের ক্রমশঃ কেমন পরিবর্ত্তন হয়েছে, তাও কিছু বলি।

গরীব অবস্থায় সকল দেশের খাওয়াই ধান্য বিশেষ; এবং শাক তরকারি, মাছ মাংস বিলাসের মধ্যে এবং চাটনির মত ব্যবহৃত হয়। যে দেশে যে শস্য প্রধান ফসল, গরীবদের প্রধান খাওয়া তাই; অন্যান্য জিনিস আনুসঙ্গিক। যেমন বাঙ্গালা, ও উড়িষ্যা, ও মান্দ্রাজ উপকূলে ও মালাবার উপকূলে ভাত প্রধান খাদ্য; তার সঙ্গে ডা'ল তরকারি, কখন কখন মাছ মাংস চাটনিবৎ।

ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশে অবস্থাপন্ন লোকের জন্য গমের রুটি ও ভাত; সাধারণ লোকের নানা প্রকার বজ্‌রা, মড়ুয়া, জনার, ঝিঙ্গোরা প্রভৃতি ধান্যের রুটি প্রধান খাদ্য।

শাক,তরকারি, দা'ল,মাছ, মাংস,সমস্তই সমগ্র ভারতবর্ষে,ঐ রুটি বা ভাতকে সুস্বাদ কর্‌বার জন্য ব্যবহার—তাই ওদের নাম ব্যঞ্জন। এমন কি, পঞ্জাব, রাজপুতানা ও দাক্ষিণাত্য দেশে, অবস্থাপন্ন অমিষাশী লোকেরা, ও এমন কি রাজারাও, যদিও নিত্য নানা প্রকার মাংস ভোজন করে, তথাপি রুটি বা ভাতই প্রধান খাদ্য। যে ব্যক্তি আধ্‌সের মাংস নিত্য খায়, সে এক সের রুটি তার সঙ্গে নিশ্চিৎ খায়।

পাশ্চাত্য দেশে এখন যে সকল গরীব দেশ আছে এবং ধনী দেশের গরীবদের মধ্যে, ঐ প্রকার রুটি এবং আলু'ই প্রধান খাদ্য; মাংসের চাট্‌নি মাত্র—তাও কালে ভদ্রে। স্পেন, পোর্ত্তুগাল, ইতালি প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত উষ্ণ দেশে যথেষ্ট দ্রাক্ষা জন্মায় এবং দ্রাক্ষা-ওয়াইন্‌ অতি সস্তা। সে সকল ওয়াইনে মাদকতা নাই (অর্থাৎ পিপেখানেক না খেলে ত আর নেসা হবে না এবং তা কেউ খেতেও পারে না) এবং যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য। সে দেশের দরিদ্র লোকে এজন্য মাছ মাংসের জায়গায় ঐ দ্রাক্ষা-রস দ্বারা পুষ্টি সংগ্রহ করে। কিন্তু উত্তরাঞ্চল, যেমন রুসিয়া, সুইডেন, নরওয়ে প্রভৃতি দেশে দরিদ্র লোকের আহার প্রধানতঃ রাই-নামক ধান্যের রুটি ও এক আধ্‌ টুক্‌রা শুঁট্‌কি মাছ ও আলু।

ইউরোপের অবস্থাপন্ন লোকের এবং আমেরিকার আবালবৃদ্ধবনিতার খাওয়া আর এক রকম, অর্থাৎ রুটি, ভাত প্রভৃতি চাট্‌নি এবং মাছ মাংসই হচ্ছে খাওয়া। আমেরিকায় রুটি খাওয়া নাই বল্লেই হয়। মাছ মাছই এলো, মাংস মাংসই এলো, তাকে অমনি খেতে হবে, ভাত রুটির সংযোগে নয়। এবং এজন্য প্রত্যেক বারেই থালা বদ্‌লান হয়। যদি দশটা খাবার জিনিস থাকে, ত দশবার থালা বদ্‌লাতে হয়। যেমন মনে কর, আমাদের দেশে প্রথমে শুধু শুক্ত এলো, তার পর থালা বদ্‌লে শুধু ডা'ল এলো, আবার থালা বদ্‌লে শুধু ঝোল এলো, আবার থালা বদ্‌লে দুটি ভাত, নয় ত দুখান লুচি ইত্যাদি। এর লাভের মধ্যে এই যে, নানা জিনিস অল্প অল্প খাওয়া হয়, পেট বোঝাই করা হয় না। ফরাসী চা'ল সকালবেলা "কাফি" এবং এক আদ্ টুক্‌রা রুটি-মাখুম; দুপর বেলা মাছ মাংস ইত্যাদি মধ্যবিৎ; রাত্রে লম্বা খাওয়া। ইতালি, স্পেন প্রভৃতি জাতিদের ঐ এক রকম। জর্ম্মান্‌রা ক্রমাগত খাচ্ছে,--পাঁচ বার, ছ বার, প্রত্যেক বারেই অল্প বিস্তর মাংস। ইংরাজরা তিনবার; সকালে অল্প, কিন্তু মধ্যে মধ্যে কফি-যোগ, চা-যোগ আছে। আমেরিকান্‌দের তিনবার—উত্তম ভোজন, মাংস প্রচুর। তবে এ সকল দেশেই "ডিনার"টা প্রধান খাদ্য—ধনী হলে, তার ফরাসী রাঁধুনি এবং ফরাসী চা'ল। প্রথমে একটু আদ্‌টু নোনা মাছ বা মাছের ডিম, বা কোনও চাট্‌নি বা সব্‌জি। এটা হচ্ছে ক্ষুধাবৃদ্ধি। তার পর স্থপ; তার পর আজকাল ফ্যাসান—একটা ফল; তার পর মাছ; তার পর মাংসের একটা তরকারি; তার পর থান্ মাংস শূল্য, সঙ্গে কাঁচা সব্‌জি; তার পর আরণ্য মাংস মৃগপক্ষ্যাদি; তার পর মিষ্টান্ন; শেষ কুল্পী—মধুরেণ সমাপয়েৎ। ধনী হলে প্রায় প্রত্যেক বার থাল বদ্‌লাবার সঙ্গে সঙ্গে মদ বদ্‌লাচ্ছে,—সেরি, ক্লারেট্, স্থামপাঁ ইত্যাদি এবং মধ্যে মধ্যে মদের কুল্পী একটু আধ্‌টু। থাল বদ্‌লাবার সঙ্গে সঙ্গে কাঁটা চামচ্ সব বদ্‌লাচ্ছে। আহারান্তে "কাফি"—বিনা দুগ্ধ, আসব মদ্য খুদে খুদে গ্লাসে এবং ধূমপান। খাওয়ার রকমারির সঙ্গে মদের রকমারি দেখাতে পার্‌লে, তবে বড়মানসি চা'ল বল্‌বে। একটা খাওয়ায় আমাদের দেশের একটা মধ্যবিৎ লোক সর্ব্বস্বান্ত হতে পারে, এমন খাওয়ার ধূম এরা করে।

আর্য্যারা একটা পীঠে ব'সত, একটা পীঠ ঠেসান দিত এবং একটা জলচৌকীর উপর থালা রেখে, এক থালাতেই সকল খাওয়া খেত। ঐ চা'ল্ এখনও পঞ্জাব,

রাজপুতানা, মহারাষ্ট্র ও গুর্জ্জর দেশে বিদ্যমান। বাঙ্গালী, উড়ে, তেলিঙ্গি, মালাবারি প্রভৃতি মাটিতেই "সাপ্‌ড়ান"। মহীশূরের মহারাজও মাটিতে আঙ্গট্‌ পাতে ভাত ডাল খান। মুসলমানেরা চাদর পেতে খায়। বর্ম্মি, জাপানী প্রভৃতি উপু হয়ে বসে মাটিতে থাল রেখে খায়। চীনেরা টেবিলে খায়; চেয়ারে বসে, কাটি ও চামচ্‌ যোগে খায়। রোমান ও গ্রীক্‌রা কোচে শুয়ে, টেবিলের উপর থেকে হাত দিয়ে খেত। ইউরোপীরা টেবিলের উপর হতে, কেদারায় বসে, হাত দিয়ে পূর্ব্বে খেত; এখন নানা প্রকার কাঁটা চামচ্‌।

চীনের খাওয়াটা কসরৎ বটে—যেমন আমাদের পানওয়ারীরা দুখানা সম্পূর্ণ আলাদা লোহার পাতকে হাতের কায়দায় কাঁচির কাজ করায়, চীনেরা তেমনি দুটো কাটিকে ডা'ন হাতের দুটো আঙ্গুল আর মুটোর কায়দায় চিম্‌টের মত ক'রে শাকাদি মুখে তোলে। আবার দুটোকে একত্র করে, এক বাটি ভাত মুখের কাছে এনে, ঐ কাটিদ্বয়নির্ম্মিত খোন্তা-যোগে ঠেলে ঠেলে মুখে পোরে।

সকল জাতিরই আদিম পুরুষ নাকি প্রথম অবস্থায় যা পেত তাই খেত। একটা জানোয়ার মারলে, সেটাকে এক মাস ধরে খেত; পচে উঠ্‌লেও তাকে ছাড়ত না। ক্রমে সভ্য হয়ে উঠ্‌লো চাস্‌ বাস্‌ শিখ্‌লে; আরণ্য পশুকুলের মত একদিন বেদম্‌ খাওয়া, আর দু পাঁচ দিন অনশন ঘুচ্‌লো; আহার নিত্য যুট্‌তে লাগ্‌ল; কিন্তু পচা জিনিস্‌ খাবার চা'ল একটা দাঁড়িয়ে গেল। পচা দুর্গন্ধ একটা যা হয় কিছু আবশ্যক ভোজ্য হতে নৈমিত্তিক, আদরের চাট্‌নি হয়ে দাঁড়াল।

এস্কুইমো জাতি বরফের মধ্যে বাস করে। শস্য সে দেশে একদম্‌ জন্মায় না; নিত্য ভোজন—মাছ মাংস; ১০।১৫ দিনে অরুচি বোধ হলে, এক টুক্‌রা পচা মাংস খায়—অরুচি সারে।

ইউরোপীরা এখনও বন্য পশু পক্ষীর মাংস না পচ্‌লে খায় না। তাজা পেলেও, তাকে টাঙ্গিয়ে রাখে—যতক্ষন না প'চে দুর্গন্ধি হয়। কল্‌কেতায় পচা হরিণের মাংস পড়্‌তে পায় না; রসা ভেট্‌কির উপাদেয়তা প্রসিদ্ধ। ইংরেজদের পনীর যত পচ্‌বে, যত পোকা বিল্‌বিল করবে, ততই উপাদেয়। পলায়মান পনীর-কীটকেও তাড়া করে ধরে মুখে পুরবে—তা নাকি বড়ই সুস্বাদ!! নিরামিষাশী হয়েও প্যাঁজ লসুনের জন্য ছোঁক ছোঁক করবে। দক্ষিণী বামুনের প্যাঁজ লসুন নইলে খাওয়াই হবে না। শাস্ত্রকারেরা সে পথও বন্ধ করে দিলেন। প্যাঁজ, লসুন, গেঁও শোর, গেঁয়ো মুরগি খাওয়া এক-

জাতের পাপ, সাজা—জাতিনাশ। যারা শুনলে এ কথা, তারা ভয়ে প্যাঁজ লসুন্‌ ছাড়্‌লে, কিন্তু তার চেয়ে বিষমদুর্গন্ধ হিঙ্গ খেতে আরম্ভ কর্‌লে!! পাহাড়ি গোঁড়া হিঁদু লসুনে-ঘাস প্যাঁজ লসুনের জায়গায় ধর্‌লে। ও দুটোর নিষেধ ত আর পুঁথিতে নেই!!

সকল ধর্ম্মেই খাওয়া দাওয়ার একটা বিধি নিষেধ আছে; নাই কেবল ক্রিশ্চানি ধর্ম্মে। জৈন, বৌদ্ধয় মাছ মাংস খাবেই না। জৈন আবার যা মাটির নীচে জন্মায়, আলু মুলো প্রভৃতি, তাও খাবে না। খুঁড়তে গেলে পোকা মর্‌বে, রাত্রে খাবে না—অন্ধকারে পাছে পোকা খায়।

য়াহুদীরা যে মাছে আঁশ নেই তা খাবে না, শোর খাবে না, যে জানোয়ার দ্বিশফ নয় এবং জাগর কাটে না, তাকেও খাবে না। আবার বিষম কথা, দুধ বা দুগ্ধোৎপন্ন কোনও জিনিস যদি হেঁসেলে ঢোকে, যখন মাছ মাংস রান্না হচ্ছে, ত সে সব রান্না ফেলে দিতে হবে। এ বিধায় গোঁড়া য়াহুদী অন্য কোনও জাতির রান্না খায় না। আবার হিঁদুর মত য়াহুদীরা বৃথা-মাংস খায় না। যেমন বাঙ্গালা দেশ ও পঞ্জাবে মাংসের নাম "মহাপ্রসাদ"। য়াহুদীরা সেই প্রকার মহাপ্রসাদ অর্থাৎ যথা নিয়মে বলিদান না হলে, মাংস খায় না। কাজেই হিঁদুর মত, য়াহুদীদেরও যে সে দোকান হতে মাংস কেনবার অধিকার নাই। মুসলমানেরা য়াহুদীদের অনেক নিয়ম মানে, তবে অত বাড়াবাড়ি করে না; দুধ মাছ মাংস একসঙ্গে খায় না এই মাত্র, ছোঁয়া ছুঁয়ি হলেই যে সর্ব্বনাশ, অত মানে না। য়াহুদীদের আর হিঁদুদের অনেক সৌসাদৃশ্য—খাওয়া সম্বন্ধে; তবে য়াহুদীরা বুনো শোরও খায় না, হিঁদুরা খায়। পঞ্জাবে মুসলমান হিঁদুর বিষম সংঘাত থাকায়, বুনো শোর আবার হিঁদুদের একটা অত্যাবশ্যক খাওয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজপুতদের মধ্যে বুনো শোর শিকার করে খাওয়া একটা ধর্ম্মবিশেষ। দক্ষিণ দেশে ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যান্য জাতের মধ্যে গেঁও শোরও যথেষ্ট চলে। হিঁদুরা বুনো মুরগী খায়; গেঁও খায় না। বাঙ্গলা দেশ থেকে নেপাল ও আকাশ্মীর হিমালয় এক রকম চালে চলে। মনুক্ত খাওয়ার প্রথা এই অঞ্চলেই সমধিক বিদ্যমান আজও।

কিন্তু কুমায়ুন হতে আরম্ভ করে কাশ্মীর পর্য্যন্ত, বাঙ্গালী, বেহারী, প্রয়াগী ও নেপালীর চেয়েও মনুর আইন বিশেষ প্রচার। যেমন বাঙ্গালী, মুরগী বা মুরগীর ডিম খায় না, কিন্তু হাঁসের ডিম খায়, নেপালীও তাই, কিন্তু কুমায়ুন হতে তাও চলে না। কাশ্মীরীরা বুনো হাঁসের ডিম পেলে সুখে খায়, গ্রাম্য নয়।

আলাহাবাদের পর হতে, হিমালয় ছাড়া, ভারতবর্ষের অন্য সমস্ত দেশে যে ছাগল খায়, সে মুরগীও খায়।

এই সকল বিধি নিষেধের মধ্যে অধিকাংশই যে স্বাস্থ্যের জন্য, তার সন্দেহ নাই। তবে সকল জায়গায় সমান পারে না। শোর মুরগী যা তা খায়, অতি অপরিষ্কার জানোয়ার, কাজেই নিষেধ ; বুনো জানোয়ার কি খায় কে দেখ্‌তে যায় বল। তা ছাড়া রোগ,বুনো জানোয়ারে কম। দুধ্, পেটে অম্লাধিক্য হ'লে একেবারেই দুষ্পাচ্য, এমন কি একদমে এক গ্লাস দুধ খেয়ে কখন কখন সদ্যঃ মৃত্যু ঘটেছে।

দুধ যেমন শিশুতে মাতৃস্তন্য পান করে, তেম্‌নি ঢোকে ঢোকে খেলে তবে শীঘ্র হজম হয়, নতুবা অনেক দেরী লাগে। দুধ একটা গুরুপাক জিনিস, মাংসের সঙ্গে হজমে আরও গুরুপাক, কাজেই এ নিষেধ য়াহুদীদের মধ্যে। মূর্খ মাতা কচিছেলেকে জোর করে ঢক্ ঢক্ করে দুধ খাওয়ায়, আর দু ছ মাসের মধ্যে মাথায় হাত দিয়ে কাঁদে!! এখনকার ডাক্তারেরা পূর্ণবয়স্কের জন্যও একপোয়া দুধ আস্তে আস্তে আধ ঘণ্টায় খাওয়ার বিধি দেন ; কচিছেলের জন্য "ফিডিং বটল্" ছাড়া উপায়ান্তর নাই। মা ব্যস্ত কাজে—দাসী একটা ঝিনুকে করে, ছেলেটাকে চেপে ধরে সাঁ সাঁ দুধ খাওয়াচ্ছে!! লাভের মধ্যে এই, যে রোগা-পট্‌কা গুলো আর বড়, বড় হচ্ছে না, তারা ঐ খানেই জন্মের মত দুধ খাচ্ছে ; আর যে গুলো এ বিষম খাওয়ার মধ্য দিয়ে ঠেলে ঠুলে উঠ্‌ছে, সে গুলো প্রায় সুস্থকায় এবং বলিষ্ঠ।

সে কেলে আঁতুড় ঘর, দুধ খাওয়ান প্রভৃতির হাত থেকে যে ছেলেপিলে গুলো বেঁচে উঠ্‌তো, সে গুলো একরকম সুস্থ সবল আজীবন থাক্‌ত। মা ষষ্ঠীর সাক্ষাৎ বরপুত্র না হলে কি আর সে কালে একটা ছেলে বাঁচতো!! সে তাপসেঁক, দাগা, ফোঁড়া প্রভৃতির মধ্য দিয়ে বেঁচে ওঠা, প্রসূতি ও প্রসূত উভয়েরই পক্ষে দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। হরিল্লুঠের, তুলসীতলার খোকা ও মা দুই প্রায় বেঁচে যেত, সাক্ষাৎ যমরাজের দূত চিকিৎসকের হাত এড়াত বলে।

(কাপড়ে সভ্যতা।)

সকল দেশেই কাপড় চোপড়ে কিছু না কিছু ভদ্রতা লেগে থাকে। "বেতন না জান্‌লে বোদ্র অবদ্র বুঝবো ক্যাম্‌নে ?" শুধু ব্যাতনে নয়, "কাপড় না দেখলে, ভদ্র অভদ্র বুঝ্‌বো ক্যাম্‌নে" সর্ব্বদেশে কিছু না কিছু চলন। আমাদের দেশে শুধু গায়ে ভদ্রলোক রাস্তায় বেরুতে পারে না ; ভারতের

অন্যান্য প্রদেশে আবার পাগড়ী না মাথায় দিয়ে কেউই রাস্তায় বেরোয় না। পাশ্চাত্য দেশে ফরাসীরা বরাবর সকল বিষয়ে অগ্রণী,—তাদের খাওয়া, তাদের পোষাক সকলে নকল করে। এখনও ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিশেষ বিশেষ পোষাক বিদ্যমান, কিন্তু ভদ্র হলেই, দুপয়সা হলেই, অমনি সে পোষাক অন্তর্দ্ধান হন, আর ফরাসী পোষাকের আবির্ভাব। কাবুলি-পাজামা-পরা ওলন্দাজি চাষা, ঘাঘরা-পরা গ্রীক্, তিব্বতি-পোষাক-পরা রুষ, যেমন "বোদ্র" হওয়া, অম্‌নি ফরাসী কোট প্যাণ্টালুনে আবৃত হয়। মেয়েদের ত কথাই নাই, তাদের পয়সা হয়েছে কি পারি রাজধানীর পোষাক পরতে হবেই হবে। আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জর্ম্মানী এখন ধনী জাত ; ও সব দেশে সকলেরই একরকম পোষাক—সেই ফরাসী নকল। তবে আজকাল পারি অপেক্ষা লণ্ডনে পুরুষদের পোষাক ভব্যতর, তাই পুরুষের পোষাক "লণ্ডন মেড্", আর মেয়েদের পারিসিয়েন নকল। যাদের বেশী পয়সা, তারা ঐ দুই স্থান হতে তৈয়ারী পোষাক বারমাস ব্যবহার করে। আমেরিকা বিদেশী আমদানী পোষাকের উপর ভয়ানক মাশুল বসায়, সে মাশুল দিয়েও পারি লণ্ডনের পোষাক পর্ত্তে হবে। এ কাজ একা আমেরিকান্‌রা পারে—আমেরিকা এখন কুবেরের প্রধান আড্ডা।

প্রাচীন আর্য্যজাতিরা ধুতি চাদর পরত ; ক্ষত্রিয়দের ইজার ও লম্বা জামা, লড়ায়ের সময়। অন্য সময় সকলেরই ধুতি চাদর। কিন্তু পাগড়ীটা ছিল। অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে মেয়ে মদ্দে পাগড়ী পরত। এখন যেমন বাঙ্গালা ছাড়া অন্যান্য প্রদেশে কপ্‌নি মাত্র থাক্‌লেই শরীর ঢাকার কাজ হলো, কিন্তু পাগড়ীটা চাই ; প্রাচীনকালেও তাই ছিল, মেয়ে মদ্দে। বৌদ্ধদের সময়ের যে সকল ভাস্কর্য্য-মূর্ত্তি পাওয়া যায়, তার মেয়ে মদ্দে কৌপীন-পরা। বুদ্ধদেবের বাপ্ কপ্‌নি পরে বসেছেন সিংহাসনে ; তদ্বৎ মাও বসেছেন—বাড়ার ভাগ, এক-পা মল ও একহাত বালা ; কিন্তু পাগড়ী আছে !! সম্রাট্ ধর্ম্মাশোক ধুতি পরে, চাদর গলায় ফেলে, আদুড় গায়ে, একটা ডমরু-আকার আসনে বসে নাচ দেখছেন। নর্ত্তকীরা দিব্যি উলঙ্গ ; কোমর থেকে কতক গুলো ন্যাক্‌ড়ার ফালি ঝুল্‌ছে। মোদ্দা পাগড়ী আছে। নেবু টেবু সব ঐ পাগড়ীতে। তবে রাজ-সামন্তরা ইজার ও লম্বা জামা পরা—চুস্ত ইজার ও চোগা। সারথি নলরাজ এমন রথ চালালেন যে, রাজা ঋতুপর্ণের চাদর কোথায় পড়ে রইল ; রাজা ঋতুপর্ণ আদুড় গায়ে বে করতে চললেন। ধুতি

চাদর আর্য্যদের চিরন্তন পোষাক, এই জন্যই ক্রিয়া কর্ম্মের বেলায় ধুতি চাদর পরতেই হয়।

প্রাচীন গ্রীক্ ও রোমানদের পোষাক ছিল ধুতি চাদর; একখান বৃহৎ কাপড় ও চাদর—নাম ছিল "তোগা", তারি অপভ্রংশ এই "চোগা"। তবে কখন কখনও একটা পিরহানও পরা হত। যুদ্ধকালে ইজার জামা। মেয়েদের একটা খুব লম্বা চৌড়া চারকোণা জামা, যেমন দুখানা বিছানার চাদর লম্বা লম্বি সেলাই করা, চওড়ার দুদিক খোলা। তার মধ্যে ঢুকে, কোমরটা বাঁদলে দুবার,—একবার বুকের নীচে, একবার পেটের নীচে। তার পর, উপরের খোলা দুপাট দু হাতের উপর দু জায়গায় তুলে মোটা ছুঁচ দিয়ে আট্‌কে দিলে, যেমন উত্তরাখণ্ডের পাহাড়িরা কম্বল পরে। সে পোষাক অতি সুন্দর ও সহজ। ওপরে একখান চাদর।

কাটা কাপড় এক ইরাণীরা প্রাচীনকাল হতে পরত। বোধ হয় চীনেদের কাছে শেখে। চীনেরা হচ্ছে সভ্যতার অর্থাৎ ভোগ বিলাসের, সুখস্বচ্ছন্দতার আদ্‌গুরু। অনাদি কাল হতে চীনে টেবিলে খায়, চেয়ারে বসে, যন্ত্র তন্ত্র কত খাওয়ার জন্য, এবং কাটা পোষাক নানা রকম, ইজার, জামা, টুপি, টাপা পরে।

সিকন্দর সা ইরাণ জয় করে, ধুতি চাদর ফেলে ইজার পরতে লাগলেন। তাতে তাঁর স্বদেশী সৈন্যরা এমন চটে গেল যে বিদ্রোহ হবার মত হয়েছিল। যোদ্ধা সিকন্দর নাছাড় পুরুষ, ইজার জামা চালিয়ে দিলেন।

গরমদেশে কাপড়ের দর্কার বড় হয় না। কোপীনমাত্রেই লজ্জানিবারণ, বাকি কেবল অলঙ্কার। ঠাণ্ডাদেশে শীতের চোটে অস্থির, অসভ্য অবস্থায় জানোয়ারের ছাল টেনে পরে, ক্রমে কম্বল পরে, ক্রমে জামা পাজামা ইত্যাদি নানান্ খানা হয়। তারপর আদুড় গায়ে গয়না পরতে গেলেই ত ঠাণ্ডায় মৃত্যু, কাজেই অলঙ্কার-প্রিয়তাটা ঐ কাপড়ের উপর গিয়ে পড়ে। যেমন আমাদের দেশে গয়নার ফ্যাসান্ বদলায়, এদের তেমন ঘড়ি ঘড়ি বদ্‌লাচ্ছে কাপড়ের ফ্যাসন্।

ঠাণ্ডাদেশমাত্রেই এজন্য সর্ব্বদা সর্ব্বাঙ্গ না ঢেকে কারু সাম্‌নে বেরুবার যো নাই। বিলেতে ঠিক ঠিক পোষাকটি না পরে ঘরের বাইরে যাবার যো নাই। পাশ্চাত্যদেশের মেয়েদের পা দেখান বড়ই লজ্জা; কিন্তু গলা ও বুকের খানিকটা দেখান যেতে পারে। আমাদের দেশে মুখ দেখান বড়ই লজ্জা; কিন্তু সে ঘোমটা টানার চোটে সাড়ি কোমরে ওঠেন উঠুন, তায় দোষ নাই। রাজপুতানার ও হিমাচলের অষ্টাঙ্গ ঢেকে তলপেট দেখান!

পাশ্চাত্য দেশের নর্ত্তকী ও বেশ্যারা লোক ভুলাবার জন্য অনাচ্ছাদিত। এদের নাচের মানে, তালে তালে শরীর অনাবৃত করে দেখান। আমাদের দেশের আদুড় গা ভদ্রলোকের মেয়ের ; নর্ত্তকী বেশ্যা সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা। পাশ্চাত্য দেশে মেয়েছেলে সর্ব্বদাই গা-ঢাকা, গা আদুড় করলে আকর্ষণ বেশী হয় ; আমাদের দেশে দিন রাত আদুড় গা, পোষাক পরে ঢেকে ঢুকে থাকলেই আকর্ষণ অধিক। মালাবার দেশে মেয়ে মদ্দ কৌপীনের উপর বহির্ব্বাসমাত্র, আর বস্ত্রমাত্রই নাই। বাঙ্গালিরও তাই, তবে কোপীন নাই এবং পুরুষদের সাক্ষাতে মেয়েরা গাটা মুড়ি ঝুড়ি দিয়ে ঢাকে।

পাশ্চাত্য দেশে পুরুষে পুরুষে সর্ব্বাঙ্গ অক্লেশে উলঙ্গ হয়—আমাদের মেয়েদের মত। বাপে ছেলেয় সর্ব্বাঙ্গ উলঙ্গ করে স্নানাদি করে, দোষ নাই। কিন্তু মেয়েদের সাম্‌নে, বা রাস্তা ঘাটে, বা নিজের ঘর ছাড়া, সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা চাই।

এক চীনে ছাড়া সর্ব্বদেশেই এ লজ্জা সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত বিষয় দেখ্‌ছি—কোনও বিষয়ে বেজায় লজ্জা, আবার তদপেক্ষা অধিক লজ্জাকর বিষয়ে আদতে লজ্জা নাই। চীনে মেয়ে মদ্দে সর্ব্বদা আপাদমস্তক ঢাকা। চীনে কন্‌ফুছের চেলা, বুদ্ধের চেলা, বড় নীতি দুরস্ত। খারাপ কথা, চাল, চলন—তৎক্ষণাৎ সাজা। ক্রিশ্চান পাদ্রী গিয়ে চীনে ভাষায় বাইবেল ছাপিয়ে ফেল্‌লে। এখন বাইবেল পুরাণ হচ্ছেন হিঁদুর পুরাণের চোদ্দ পুরুষ—সে দেবতা-মানুষের অদ্ভুত কেলেঙ্কার পড়ে চীনে ত চটে অস্থির, বল্‌লে, "এ বই কিছুতেই এদেশে চালান হবে না, এ—ত—অতি অশ্লীল কেতাব" ; তার উপর পাদ্রিনী বুকখোলা সান্ধ্য পোষাক পরে, পর্দ্দার বার হয়ে, চীনেদের নিমন্ত্রণে আহ্বান করলেন। চীনে মোটা-বুদ্ধি, বল্‌লে—"সর্ব্বনাশ! এই খারাপ বই পড়িয়ে, আর এই মাগীদের আদুড় গা দেখিয়ে, আমাদের ছোঁড়া বইয়ে দিতে, এ ধর্ম্ম এসেছে।" এই হচ্ছে চীনের ক্রিশ্চানের উপর মহাক্রোধ। নতুবা চীনে কোনও ধর্ম্মের উপর আঘাত করে না। শুন্‌ছি যে, পাদ্রীরা এখন অশ্লীল অংশ ত্যাগ করে বাইবেল ছাপিয়েছে ; কিন্তু চীনে তাতে আরও সন্দিহান।

আবার এ পাশ্চাত্য দেশে, দেশ বিশেষে লজ্জা-ঘেন্নার তারতম্য আছে। ইংরেজ, আমেরিকানের লজ্জা সরম একরকম ; ফরাসীর আর একরকম ; জর্ম্মানের আর এক রকম। রুষ আর তিব্বতি বড় কাছাকাছি ; তুরুস্কের আর এক ঢোল ; ইত্যাদি। (ক্রমশঃ)

উপনিষদের বিষয়।

(স্বামী সচ্চিদানন্দ।)

উপনিষদ্যতে ব্রহ্মবিদ্যা অনয়া ইতি উপনিষদ্ ;—যাহার দ্বারা ব্রহ্মসম্বন্ধীয় তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নাম উপনিষদ্। সাধারণতঃ মানুষ যে সমুদয় বিষয় লইয়া নাড়া চাড়া করে, সে সমুদয় বিষয় দুই ভাগে বিভক্ত,—জড়-জগৎ ও চিত্ত-জগৎ। যে সমস্ত বিষয় অনুভূত করিতে হইলে, চক্ষুঃ, শ্রোত্র ইত্যাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের, এবং যে সমস্ত বিষয়ের সহিত মানুষের কোনও ব্যবহারিক সম্পর্ক স্থাপিত করিতে হইলে, বাক্, পাণি ইত্যাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের, একটীর অথবা ততোধিকের, কার্য্যকারিতার আবশ্যক, তৎসমুদয়ের সমষ্টি—জড়-জগৎ। পুরাতন হিন্দু পদার্থবিদ্ দার্শনিকগণের ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চ স্থূল ভূত, ও আধুনিক পাশ্চাত্য পদার্থবিদ্-গণের লৌহ, অঙ্গার,অক্সিজেন ইত্যাদি বহুতর ভূত সমূহের পরস্পর সংমিশ্রণে, যে জগৎ গঠিত, তাহাই জড়-জগৎ। আর যে জগতের কার্য্যকলাপ জ্ঞান বা কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ সম্বন্ধী সাহায্য ব্যতিরেকে, কেবলমাত্র অন্যতম অন্তরিন্দ্রিয় মনের দ্বারা সম্পন্ন, তাহার নাম চিত্ত জগৎ। অবশ্য বলিতে হইবে, দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদি এবং কথন, গ্রহণ ইত্যাদি কোন কার্য্যই তত্তদিন্দ্রিয়ে মনঃ-সংযোগ ভিন্ন নিষ্পন্ন হয় না. আবার মনও কখনও জ্ঞান বা কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা পূর্ব্বগৃহীত বিষয় ছাড়া অভিনব বিষয়ের ধারণা করিতে পারে কি না, সন্দেহ। একাগ্রচিত্ত হইয়া পুস্তকপাঠে অবহিত থাক, পাশে ঘড়ি বাজিয়া যাইল, তুমি শুনিতে পাইলে না ; শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিদ্যমত্তা সত্ত্বেও, সে ইন্দ্রিয়ে তোমার মনের অসংযোগই ঘড়ির শব্দ শুনিতে না পাইবার কারণ। অনেকে চক্ষুঃ মুদ্রিত না করিয়াই, নিদ্রা যান ; অথচ, সুষুপ্তি-হেতু অবসন্ন মনের চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত যোগ না থাকায়, বহির্জগতের কোনও বিষয়ই সে নিদ্রাবস্থায় তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। অপর দিকে, চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া ধ্যান করিবার চেষ্টা কর, নিরবচ্ছিন্ন চিন্তাস্রোতে ভাসিতে যাও, দেখিবে—কেবল অন্ধকার ; আর দেখিতে পাও যদি কিছু, দেখিবে—যা বাহিরে পূর্ব্বে অন্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দেখিয়াছিলে, তাহাই এখন অন্তরিন্দ্রিয় মনের বিষয়ীভূত হইয়াছে। এই জন্য, জড় ও চিত্ত জগতের ঠিক্ ঠিক্ পার্থক্যবোধক সংজ্ঞা করা অসম্ভব। এই জন্যই, সাংখ্যকার বলেন, জড়-জগৎ চিত্ত-জগতের পরিণাম মাত্র ; একটী স্থূল, অপরটী সূক্ষ্ম ; একটী কার্য্য, অপরটী কারণ ; বরফ যেরূপ জলের পরিণাম, তেমনি স্থূল ভূতাকাশ সূক্ষ্ম চিত্তাকাশের পরিণাম ; বস্তুতঃ

স্বরূপতঃ, ঐ উভয়ই এক। এ দুই জগৎ ছাড়া আর কোন জগৎ আছে কি না? ও যদি থাকে, মানুষের সহিত সে জগতের কি সম্পর্ক,—সে জগৎ মানবীয় মনের গ্রাহ্য বিষয় কি না? কিরূপেই বা সে জগৎ মানবমনের আয়ত্তাধীন হইতে পারে? আয়ত্তাধীন হইলেই বা আমাদের ফল কি?—এই সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্বের মীমাংসা উপনিষদের বিষয়।

অধিকাংশ লোকই জড়-জগৎ লইয়া ব্যাপৃত। ক্ষুৎপিপাসা নিবারণের জন্য বিবিধ আহার্য্য ও পানীয় সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ভূতসমষ্টিকে ভাঙ্গিতেছে,গড়িতেছে। পরিধেয় ভূষণাদির বিলাসেচ্ছা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য, কামক্রোধাদি রিপুকুলের তীব্র তৃষ্ণা শান্ত করিতে গিয়া, জড় জগৎকে কত ছাঁচে ঢালিয়া নিজের ব্যবহারোপযোগী করিয়া ফেলিতেছে। আবার, কেহ কেহ মানবসুলভ সত্যানুসন্ধিৎসা চরিতার্থ করিতে যাইয়া, জড়জগতের বিভিন্ন অংশের গুণ ও অন্যোন্য সাপেক্ষতা, স্থিতি ও গতির কারণ, পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ ও বিক্ষেপণ শক্তির খেলা আবিষ্কার করিতেছেন, ইঁহারাই পদার্থ-বিদ, জ্যোতির্বিদ, রসায়ন-তত্ত্ববিদ্, ভূ-তত্ত্ববিদ্, প্রভৃতি। যে কৌশলে পৃথিবী আমাদের সহজ ও সুখ উপভোগ্যা হইতে পারে, যে আলোচনার পথ অনুসরণ করিলে, আমরা জড়ের গুণ ও ক্রিয়া-নিবহ সুস্পষ্ট বুঝিতে পারি, তৎসমুদায় সুশৃঙ্খলভাবে সমাবেশিত করিয়া গুরু, একটীর পর আর একটী, পরদার পর পরদা তুলিয়া, জ্ঞানপিপাসু শিষ্যের সম্মুখে উপস্থিত করান; শিষ্যও স্বীয় অনুধাবনশক্তির ক্রমোৎকর্ষ বলে একটার পর অপরটী বুঝিয়া লইয়া, আপনার জিনিষ করিয়া লন,—এই আদান-প্রদানের নাম বিদ্যাচর্চ্চা। বিদ্যাচর্চ্চা করিতে হইলে শিষ্যের দুইটী সহায়ের আবশ্যক,—নিজের স্বতন্ত্র বিচার, ও যে ক্ষেত্রে তিনি সত্য লাভ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, সেই ক্ষেত্রে তাঁহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণ কি কি সত্য আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, তৎসকলের বৃত্তান্ত। এই বৃত্তান্তই শিষ্যের গন্তব্য স্থানের পথপ্রদর্শক। সেই সমস্ত বৃত্তান্ত তিনি প্রথমে, 'সত্য বলিয়া মানিয়া লয়েন,' পরে স্বীয় স্বাধীন বিচার দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখেন, তৎসমুদয় 'প্রকৃত সত্য কিনা'। যতদিন তিনি নিজের জীবনে ঐ সমস্ত সত্য প্রত্যক্ষ না করিতেছেন, ততদিন সে সমুদয়কে অন্ধবিশ্বাসাপন্ন হইয়া মানিয়া লইলে, তাঁহাকে কপট বলিতে হইবে। অম্লজান ও উদ্‌জান, এই দুই বাষ্প সম্যক্ মিশ্রিত হইলে, জল উৎপন্ন হয়,—এই সত্যটী কোন পূর্ব্বতন রসায়নবিদ্ প্রত্যক্ষ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। তুমি যদি রসায়ন-বিদ্যা শিখিতে চাও, তা হ'লে তোমাকে প্রথম এটী সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে

হইবে; পরে অম্লজান ও উদ্‌জান বাষ্প আনিয়া, যেরূপ ভাবে তিনি মিশ্রিত করিতে বলিয়াছেন, সেইরূপ ভাবে উহাদিগকে মিশ্রিত করিয়া দেখিতে হইবে; মিশ্রিত করিবার পর যদি দেখ, জল উৎপন্ন হইল, তখন তুমি বলিতে পার, "তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য"। সত্য বটে, পূজ্যপাদ আচার্য্যদিগের কথায় অবিশ্বাস স্থাপন করা ধৃষ্টতার পরিচায়ক; কিন্তু, নিজের জীবনে সত্য প্রত্যক্ষ করিতে নিশ্চেষ্ট থাকিয়া, কেবল পরের কথায় সায় দিয়ে যাওয়াও অলস ও মূর্খের কার্য্য। পুস্তকেও ত সে সব বৃত্তান্ত লিখিত থাকে; তাহাদিগকে কণ্ঠস্থ করিলেই যদি জ্ঞানার্জ্জন হয়, তবে জড় পুস্তক আর চেতন মানুষে প্রভেদ কি? জড়-জগৎ মানুষের সহজবোধ্য, জড় জগতের ব্যাপারে মানুষ সর্ব্বদা অভ্যস্ত; তাই এই প্রত্যক্ষানুভূতিরূপ প্রমাণ অবলম্বনে জড় জগতের সত্যের দিকে অগ্রসর হইতে শিষ্যের বেশী কষ্ট হয় না। আচার্য্য কাঠ খড় জোগাড় করিয়া, হাতে কলমে শিষ্যের সম্মুখে যা করিবার, দেখাইবার, তা করেন ও দেখান; শিষ্যও যে সমস্ত বিষয় রাত্রিদিন দেখিতেছে, শুনিতেছে, সেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সমূহেরই ব্যাপার বলিয়া, সে সকল বিনাক্লেশে বুঝিতে পারে। মানসিক জগতেও ঐ এক নিয়ম,—প্রথমে বিশ্বাস, পরে স্বাধীন বিচার। মনস্তত্ত্ববিদ্ উদ্দালক আরুণি শিষ্য শ্বেতকেতুকে বলিলেন, "অন্নময়ং হি সৌম্য মনঃ,"—অশিত অন্নের অণিষ্ঠ অংশের দ্বারা মন গঠিত। শ্বেতকেতু প্রথমে বিশ্বাস করিলেন, পরে বলিলেন," ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু,"—আমাকে এ বিষয় বিশদরূপে বুঝাইয়া দিন। উদ্দালক শ্বেতকেতুকে পঞ্চদশাহ উপবাসী থাকিতে বলিলেন। উপবাসের পর প্রত্যাগত শ্বেতকেতু পূর্ব্বপঠিত বেদাদি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া দেখিলেন, তৎ সমুদায় কিছুই তাঁহার মনে প্রতিভাত হইতেছে না। তার পর, আচার্য্য কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া অন্ন-অশনের পর দেখিলেন, সমস্ত প্রশ্নের বিষয় একে একে স্মৃতিপথে ফিরিয়া আসিতেছে; তখন বুঝিলেন, মন ভুক্ত অন্নেরই পরিণাম-বিশেষ। এই প্রত্যক্ষ-জ্ঞানই সমস্ত সত্যের মূল ভিত্তি। জড়-জগৎ ও চিত্ত-জগৎ ছাড়া অন্য জগৎ যদি থাকে, যদি আত্মা, ভগবান্ বলিয়া কোনও অতীন্দ্রিয় সত্য থাকে, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। উপনিষদ্ স্নিগ্ধগভীর স্বরে বলিতেছেন, "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ,"—আত্মাকে দেখিতে হইবে।

বিশুদ্ধসত্ত্ব ঋষি-হৃদয়ে কতকগুলি ইন্দ্রিয়াতীত সত্য প্রতিফলিত হইয়াছিল। ঋষিগণ দেখিয়াছিলেন, জড় ও চিত্ত জগতের পশ্চাতে আর এক অতীন্দ্রিয় জগৎ আছে, যেখানে পবিত্র মনবুদ্ধির গতিবিধি হইতে পারে। এই জগতের

নাম চিৎ-জগৎ ; ভগবান্, আত্মা, ব্রহ্ম, মুক্তি, ঐ জগৎস্থ সত্যের জ্ঞাপক ভাষা। উপনিষদ্ সেই ঋষিগণের প্রত্যক্ষীকৃত সত্যনিচয়ের বৃত্তান্ত। ধর্ম্ম মানে—সেই সমস্ত ঋষিদৃষ্ট চিৎ-জগতের সত্যসমূহের প্রত্যক্ষ অনুভূতি। ধর্ম্মরাজ্যে বিচরণেচ্ছু নবীন সাধক যখন সন্দেহের গুরুভারে পীড়িত হইয়া, ধর্ম্ম কি সত্য, না বিকৃতমস্তিষ্কের মিথ্যা কল্পনামাত্র, ঠিক করিতে না পারিয়া হতাশ হইয়া পড়েন, নাস্তিক যখন স্পর্দ্ধা করিয়া ভগবানের অসত্তা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করে, তখন উপনিষদ্ আশ্বাস দিয়া বলেন, "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ,"—আমি সেই অন্ধকারের পার, আদিত্যবর্ণ মহান্ পুরুষকে দেখিয়াছি ; আমাকে বিশ্বাস কর ; আমার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হও, তুমিও তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। তাই উপনিষদের নাম—আপ্তবাক্য।

কিন্তু, ধর্ম্মরাজ্যে উপনিষদের কাজ ঐ খানেই শেষ। উপনিষদ্ কেবল বলিয়া দিলেন, "ধর্ম্ম বলিয়া, যথার্থ একটা জিনিস আছে, ঋষিরা তাহা দেখিয়াছেন, এই লও তাঁহাদের প্রমাণ-বাক্য।" দেখিয়াছি, জড় ও চিত্ত জগৎ সম্পর্কীয় বিদ্যার চর্চ্চা করিতে হইলে, শিষ্য প্রথমে সে বিদ্যাবিষয়ে তাঁহার পূর্ব্বতন আচার্য্যগণ যে যে সত্য জানিয়া গিয়াছেন, সে সকল মানিয়া লইয়া তৎ-সহায়ে অগ্রসর হইতে থাকেন ; চিৎ-জগতের সত্য ধর্ম্মের চর্চ্চা সম্বন্ধেও সেই এক নিয়ম। ধর্ম্মজিজ্ঞাসমান শিষ্যকে যাহা প্রথমে মানিয়া লইতে হয়, তাহাই উপনিষদ্।

কেবল মানিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। নিজের জীবনে ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। হাজার উপনিষদ্ হাজার-বার পড়, "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো—ন বহুনা শ্রুতেন,"—মহা পণ্ডিত হও, উপনিষদের প্রত্যেক শ্লোক জিহ্বাগ্রে থাকুক, যদি তোমার কিছু না কিছু অতীন্দ্রিয় সত্যের সাক্ষাৎ উপলব্ধি না হইয়া থাকে, তুমি ধর্ম্মরাজ্যের অনেক দূরে। নাস্তিকের ক্ষমা আছে। আস্তিক! তুমি "ভগবান্, ভগবান্," করিয়া চীৎকার করিতেছ—যদি সেই "প্রেয়ঃ পুত্রাৎ, প্রেয়োবিত্তাৎ, প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ," নিখিল বিশ্ব অপেক্ষা প্রিয়তম পুরুষকে জানিবার জন্য প্রাণ অবধি পণ না কর, তুমি নাস্তিকেরও অধম!

তবে মাফ্ আছে।

"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গম্পথস্তৎ,"—সে জগতে যাইবার পথ

শানিত ক্ষুরধারের ন্যায়, প্রতিপদে পতনের সম্ভাবনা, প্রতিপদে ক্ষতবিক্ষত হইতে হইবে। যদি যাইতে পারেন, লক্ষ, কোটী যত্নকারী লোকের মধ্যে এক জনও,--তিনি ধন্য! মানুষের অপরাধ কি?

এই ভগবদনুভূতি, ভাসা ভাসা, অস্পষ্ট, স্বপ্নের ছায়া-দৃশ্যের ন্যায় নহে। মন যখন জড় ও চিত্ত-জগৎ পশ্চাৎ ফেলিয়া, ইন্দ্রিয়াতীত চিৎ-জগতে ক্রীড়া করিতে থাকে ও তথাকার সত্য অনুভব করে, সে অনুভব, এই যে স্থূল ভূত-জগতের ইন্দ্রিয়গৃহীত অনুভব, তদপেক্ষা সহস্র সহস্র গুণ পরিষ্কার ও ঘন। "যথা আদর্শে,"—আর্শিতে যে রূপ নিজের চেহারা সুস্পষ্ট দেখা যায়, এ দর্শনও তদ্রূপ নির্ম্মল।

উপনিষদের ভাষা মহাকবিত্বের পরিচায়ক। যে ঋষি-হৃদয়ের সর্ব্বসংশয়, সর্ব্বগ্রন্থি, পরাবরের সাক্ষাৎ দর্শনে ছিন্ন ভিন্ন, ভূমানন্দের মধুর হিল্লোলে যে হৃদয়-পুণ্ডরীক নিয়ত নিত্যপর, যোগদৃষ্টি সহায়ে যাঁহারা সর্ব্বভূত আত্মায়, "সর্ব্বভূতেষু চাত্মানম্" জাজ্বল্যমান প্রত্যক্ষ করিতেছেন, সে হৃদয়োত্থিত অশেষকল্যাণকরী বাণী ওজঃস্বরূপের ঐশ্বরিক বলে বলীয়ান্। বক্তার ভাষার দিকে লক্ষ্য নাই—অথচ উপনিষদের প্রত্যেক অক্ষর প্রাণস্পন্দনে অধীর। "রসো বৈ সঃ",—সে মহাকবির অনন্তরসের প্রস্রবণে উপনিষদ্ স্নাত। অন্তেবাসী উপনিষদের স্নেহময় ক্রোড়ে শয়ান;—মাতৃরূপা উপনিষদ্ ধর্ম্মশিশুকে কত কথা বলিতেছেন, কত খেলা দেখাইতেছেন, জড়ভূমি হইতে চিত্তভূমিতে, চিত্তভূমি হইতে চিৎ-ভূমিতে উঠাইলেন,—শিশু অমৃতপীযূষপানে মাতোয়ারা, জননী শান্ত, স্থির, স্তন্যদানে হাস্যমুখী;—সহসা সব ভাসিয়া——? নাম-রূপ পরাৎ-পর ব্রহ্ম-সমুদ্রের অতল গর্ভে চিরকালের জন্য ডুবিয়া গেল, "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি, ন চন্দ্রতারকং,"—চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, ত্রিজগৎ ঘূর্ণায়মান, ত্রিজগৎ শত খণ্ডে বিভক্ত, শূন্যে বিলীন;—শিশু ভীত, স্তম্ভিত, মায়ের সে শান্তমূর্ত্তি কোথায়? কোথায় শিশু? কোথায় জননী? সব "নেতি, নেতির"র—কঠোর আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ,—"যত্র নান্যৎ পশ্যতি, যত্র নান্যৎ শৃণোতি, নান্যৎ বিজানাতি, স ভূমা, যো বৈ ভূমা তদমৃতম্," সেখানে একমাত্র আত্মা,—কে কাহাকে দেখিবে? কে কাহাকে শুনিবে? কে কাহাকে জানিবে?—তাহাই অমৃত। এ কবিত্ব আর কোথাও নাই। মানবমনের তত্ত্ব সম্যক্ জানিয়া, তাহাকে নামান, উঠান, আশে পাশে খেলান, একবার ছেড়ে দেওয়া, আবার ধরা,—ইহাই কবিত্ব। অগ্নি, বায়ু ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণ সম্মুখে

প্রাদুর্ভূত ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝিতে অসমর্থ হইয়া, "কিমিদং যক্ষমিতি,"—এ অপূর্ব্বদৃষ্ট ব্যাপার কি! ভাবিয়া আকুল হইতেছেন,—তৎক্ষণাৎ দৃশ্যের পরিবর্ত্তন—আকাশে বহুশোভমানা হৈমবতী স্ত্রীরূপী উমা—বলিলেন, "আমিই সেই ব্রহ্ম"। বালক নচিকেতা পিতৃসত্যপালনে মৃত্যুমুখে পতিত,—কি কঠোর অভিনয়! ফিরিয়া দেখি, সে বালক নচিকেতা মৃত্যুমুখাৎ প্রত্যাগত, ব্রহ্মানন্দে অতুলসুখে পিতার সম্মুখে দণ্ডায়মান!!

মুসলমানদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ কোরান, খৃষ্টানদের বাইবেল; তেমনি হিন্দু ধর্ম্মের মূল গ্রন্থ উপনিষদ্। এই উপনিষদ্ অবলম্বন করিয়া ব্যাস হইতে শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব, প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্মপ্রচারকগণ স্বীয় স্বীয় মত স্থাপিত করিয়াছেন। সাংখ্য, পাতঞ্জল, গীতা, তন্ত্র, পুরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়ের বীজ উপনিষদের উর্ব্বরা ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত। স্থূল পাথর-পূজা হইতে ধর্ম্মরাজ্যের চরম আবিষ্ক্রিয়া "অহম্ ব্রহ্মাস্মি"—কর্ম্মী, যোগী, ভক্ত, জ্ঞানী, সকল সম্প্রদায়ের প্রমাণস্থানীয় একমাত্র উপনিষদ্। আচার্য্যগণ উপনিষদ্‌কে এত সম্মানের চক্ষে দেখিতেন যে, ভগবানে বিশ্বাস থাকুক, না থাকুক, তাহাতে আসে যায় না, কিন্তু যাহার উপনিষদে বিশ্বাস নাই, সে নাস্তিক। নিরীশ্বরবাদী সাংখ্যকারের ভগবানে বিশ্বাস না থাকিলেও, তিনি উপনিষদের প্রামাণ্য স্বীকার করিতেন বলিয়া, নাস্তিক বলিয়া গণ্য হন নাই।

এখন উপনিষদের রচয়িতা কে? কেহই নহে,—কোন বিশেষ উপনিষদ্ যে কোন বিশেষ ঋষিকর্ত্তৃক রচিত, এরূপ কোন নিদর্শনই পাওয়া যায় না। উপনিষদ্ স্বয়ং বলিতেছেন,—"ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে," আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণের নিকট হইতে এই জ্ঞান এই রূপ শুনিয়াছি।

আর, অন্য ধর্ম্মগ্রন্থের ন্যায় উপনিষদের ঐতিহাসিক ভিত্তি না থাকাই হিন্দু-ধর্ম্মের গৌরবের বিষয়। বাইবেল খৃষ্টের কথা; আজ যদি প্রমাণ হয়, খৃষ্ট বলিয়া কোনও ব্যক্তি বিশেষ কখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই, ছিলেন না, তাহা হইলে তাঁহার উক্তি বাইবেল, খৃষ্টধর্ম্মের মূল অবলম্বন, সঙ্গে সঙ্গে ভূমিসাৎ হইবে। যদি ভবিষ্যৎ কালের গতিতে মহম্মদের মানবলীলার অস্তিত্ব সন্দেহের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়, মুসলমান-ধর্ম্ম-স্তম্ভেরও, সঙ্গে সঙ্গে ভাঙ্গিবার কথা। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের সে ভয় নাই। হিন্দুধর্ম্ম কোনও ব্যক্তি বিশেষের উপর নির্ভর করে না। ঋষিরা হিন্দুধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক নহেন; উপনিষদুক্ত সনাতন জ্ঞানের উপরই হিন্দুধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত; তবে ঋষিরা সেই জ্ঞান

প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, এই মাত্র। শত যাজ্ঞবল্ক্য, জনক, সনৎকুমার, নারদ, গার্গী ছিলেন, বা না ছিলেন, তাতে হিন্দুধর্ম্মের ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। ইঁহারা উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান দর্শন করিয়াছিলেন, সে জন্য হিন্দু তাঁহাদিগকে পূজা করিতে প্রস্তুত; হিন্দু বিশেষ বিশেষ আচার্য্যকে অবতার বলিয়া পূজা করেন, কারণ তাঁহাদের ন্যায় অন্য কেহ উপনিষদের বিশদ ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু যে কোন মহাচার্য্য হউন না, যদি তিনি উপনিষদের যথোচিত সম্মান করিতে দ্বিরুক্তি করেন, তিনি হিন্দুর পূজাস্থানীয় নহেন। (ক্রমশঃ)

সমালোচনা।

"প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী"।

সকল দেশেই প্রাচীন দ্রব্যের আদর চিরকালই হইয়া থাকে। উপস্থিত-রুচি বিরুদ্ধ হইলেও, প্রাচীন দ্রব্য সর্ব্বত্রই প্রশংসনীয়; ভগ্নাংশমাত্রও অতি যত্ন ও ভক্তি সহকারে সকলে রক্ষা করিয়া থাকেন। ভাষার সম্বন্ধেও এইরূপ; সকলদেশে সকলকালে সকল লোকেই প্রাচীন ভাষার সমাদর করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের দেশে অদৃষ্টক্রমে সবই বিপরীত। ভাষা অর্থ-করী এবং রাজভাষা বিজাতীয় হওয়ার দরুনই আমাদের দেশে প্রাচীন ভাষার উপর সকলকার আর আদর নাই। ইংরাজী শিখিতে পারিলেই পয়সা আসিবে—অন্নপ্রাশন হইতে ইংরাজীই শিখিতেছি। ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষের মনে যদি কখন দয়া হইল (অথবা যদি কখন তাঁহাদিগের সুবিধা হইল) ত, সভ্যতার পোষাক পরিয়া, কেহ তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, দু দশ দিন একবার প্রাচীন দ্রব্যাদির জন্য দু-এক দিক্ ঘুরিয়া আসিলেন মাত্র। যাঁহাদের জাতীয় জিনিষ,যাঁহাদের নিজের দেশের জিনিষ—নিজের পৈত্রিক জিনিষ, তাঁহাদের যে, সে বিষয়ে চাড়্ বা খোঁজ-খবর লওয়া একটা আবশ্যকতা মনে করা—তা কিছুই নাই বলিলেই হয়; যা ঐ দু-চারজন বুড়ো-বুড়ী বৈকাল বেলা পবিত্র-ধর্ম্মভাবে পাঠ গান কথকতা বা কীর্ত্তন প্রভৃতি আকারে যৎকিঞ্চিৎ শুনিতেন মাত্র। ইংরাজি সভ্যতার অসদ্ব্যবহারে, তাও আজকাল লোপ পাইয়া আসিতেছে। একেবারেই সমস্ত লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছিল, ভাগ্যিস ! আজ সাহিত্য-পরিষদের সৃষ্টি হইয়াছিল—তাই রক্ষা। বোধ হয়, বঙ্গের যাবতীয় শিক্ষিত নর নারী শুনিয়া থাকিবেন, এবং শুনিয়া পরমানন্দিত হইয়া থাকিবেন যে, কলিকাতার "সাহিত্য-পরিষৎ"নামক সভা, বঙ্গীয় সাহিত্যের "অঙ্গং গলিতং

পলিতমুণ্ডং দণ্ডবিহীনং জাতং তুণ্ডং" এমন যে বৃদ্ধপিতামাতা, তাঁহাদিগের সেবা কতদূর কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, বঙ্গীয় প্রাচীন সাহিত্য উদ্ধারের জন্য কতদূর তাঁহারা যত্ন করিতেছেন। সম্প্রতি তাঁহারা "বাঙ্গালা প্রাচীন গ্রন্থাবলী" নামে বঙ্গের অমূল্য ভাষা-কীর্ত্তি সকল আবিষ্কার করিয়া বঙ্গের সকলকেই কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিতেছেন। ইহার এক খণ্ড বাহির হইয়াছে। তাহার সূচী,—(১) বিদ্যাপতির পদাবলী; সম্ভবতঃ বিদ্যাপতির সময়কার; ইহা নেপাল-রাজ হইতে বহুযত্নে আনীত। (২) ছুটি খাঁ'র মহাভারত:—মুসলমান-রাজগণ যে কেবল পীড়ন করিতেন তাহা নহে; তাঁহাদিগের মধ্যে কোন কোন মহাশয়ের কতদূর হিন্দুর প্রতি শ্রদ্ধা ছিল, তাহা ইহার ভূমিকা পাঠে কিঞ্চিৎ অবগত হইতে পারিবেন; বঙ্গের সুলতান আলা-উদ্দীন-হুসেন-সাহের সময়ে এই মহাভারত রচিত—অদ্য ৪০০ বৎসরের কথা; (৩) বনমালিদাসের জয়দেবচরিত—৩৫০ বৎসরের পুরাতন পুঁথি। (৪) বাসুদেব ঘোষের পদাবলী—৪০০ বৎসরের। এ চারখানি গ্রন্থই ইতিপূর্ব্বে আর কখনও মুদ্রিত হয় নাই।

"প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাবলীর" বাৎসরিক ছইটাকা মাত্র সাহায্য; দুই মাস অন্তর একখানি করিয়া বহি বাহির হয়। আশা করি, বঙ্গের প্রত্যেক সাহিত্যানুরাগী সাধ্যমত ইঁহাদিগকে সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। এ মহৎকার্য্যে সকলেরই যথাসাধ্য আন্তরিক সাহায্য করা একান্ত কর্ত্তব্য।

সহৃদয় স্বদেশীর নিকট আর অধিক কি লিখিব। "প্রাচীন গ্রন্থাবলী" (বিশেষ স্বদেশের) সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়, সুন্দর ও শ্রদ্ধেয়; ইহা সদসৎসমালোচনার পারের দ্রব্য; পুস্তক-পৃষ্ঠে "ফর রিভিউ" (For Review) লেখা থাকিলেও, সেইজন্য ইহার বিশেষ সমালোচনা হইতে বিরত রহিলাম।

ইঁহাদিগের উপস্থিত ঠিকানা—১৩৭।১ কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নিমন্ত্রণ-পত্র।

উদ্বোধন-গ্রাহক মহাশয়েষু—

সবিনয় নিবেদন,—১২ই ফাল্গুন, রবিবার, গঙ্গাতীরস্থ বেলুড়-মঠ ঠাকুরবাটীতে ভগবান্ শ্রীমৎ রামকৃষ্ণদেবের অষ্টষষ্টিতম জন্মোৎসব হইবে। গ্রাহক মহাশয়গণ, আপনারা সবান্ধবে যোগদান করিয়া আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন। ইতি।—মঠাধ্যক্ষ।

কলিকাতা আহিরীটোলার ঘাট হইতে, হোরমিলার কোম্পানীর বড় বড় জাহাজ, সমস্ত দিন এক ঘণ্টা অন্তর উক্ত মঠে যাত্রীগণকে লইয়া যাতায়াত করিবে।

বুদ্ধিরও পশ্চাতে আত্মা। প্রথম যেন আমরা পাইলাম, আত্মা শরীর হইতে পৃথক্, মন হইতেও পৃথক্। এই স্থান হইতেই ধর্ম্মজগতের মতভেদ দেখা যায়। দ্বৈতবাদী বলেন, আত্মা সগুণ অর্থাৎ ভোগ, সুখ, দুঃখ সবই যথার্থতঃ আত্মার ধর্ম্ম; অদ্বৈতবাদী বলেন, উহা নির্গুণ।

আমরা প্রথমে দ্বৈতবাদীদের মত,—আত্মা ও উহার গতি সম্বন্ধে তাঁহাদের মত বর্ণন করিয়া, তার পর যে মত উহা সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করে, তাহা বর্ণন করিব। অবশেষে অদ্বৈতবাদের দ্বারা উভয় মতের সামঞ্জস্য সাধন করিতে চেষ্টা করিব। এই মানবাত্মা শরীর-মন হইতে পৃথক্ বলিয়া এবং আকাশপ্রাণে গঠিত নয় বলিয়া অমর। কেন? মরত্বের বা বিনশ্বরত্বের অর্থ কি? যাহা বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়, তাহাই বিনশ্বর। আর যে দ্রব্য কতকগুলি পদার্থের সংযোগ-লব্ধ, তাহাই বিশ্লিষ্ট হইবে। কেবল যে পদার্থ অপর পদার্থের সংযোগোৎপন্ন নয়, তাহা কখন বিশ্লিষ্ট হয় না, সুতরাং তাহার বিনাশ কখন হইতে পারে না। তাহা অবিনাশী। তাহা অনন্ত কাল ধরিয়া রহিয়াছে, তাহার কখন সৃষ্টি হয় নাই। সৃষ্টি কেবল সংযোগমাত্র; শূন্য হইতে সৃষ্টি কেহ কখন দেখে নাই। সৃষ্টি সম্বন্ধে আমরা কেবল এই মাত্র জানি যে, উহা পূর্ব্ব হইতে অবস্থিত কতক গুলি বস্তুর নূতন নূতন রূপে একত্র মিলন মাত্র। তাহা যদি হইল, তবে এই মানবাত্মা ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর সংযোগোৎপন্ন নয় বলিয়া অবশ্য অনন্ত কাল ধরিয়া ছিল এবং অনন্ত কাল ধরিয়া থাকিবে। এই শরীর পাত হইলেও আত্মা থাকিবেন। বেদান্তবাদীদের মতে যখন এই শরীর পতন হয়, তখন তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ মনে লয় হয়, মন প্রাণে লয় হয়, প্রাণ আত্মায় প্রবেশ করে, আর তখন সেই মানবাত্মা যেন সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গ শরীররূপ বসন পরিধান করিয়া যান। এই সূক্ষ্ম শরীরেই মানুষের সমুদয় সংস্কার বাস করে। সংস্কার কি? মন যেন হ্রদের তুল্য, আর আমাদের প্রত্যেক চিন্তা যেন সেই হ্রদে তরঙ্গতুল্য। যেমন হ্রদে তরঙ্গ উঠে, আবার পড়ে, পড়িয়া অন্তর্হিত হইয়া যায়, সেইরূপ মনে এই চিন্তাতরঙ্গগুলি ক্রমাগত উঠিতেছে, আবার অন্তর্হিত হইতেছে। কিন্তু উহারা একেবারে অন্তর্হিত হয় না। উহারা ক্রমশঃ সূক্ষ্মতর হইয়া যায়, কিন্তু বর্ত্তমান থাকে, আবশ্যক হইলে আবার উদয় হয়। যে চিন্তাগুলি সূক্ষ্মতর রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহারই কতকগুলিকে আবার তরঙ্গাকারে আনয়ন করাকেই স্মৃতি বলে। এইরূপে আমরা যাহা কিছু চিন্তা করিয়াছি, যে কোন কার্য্য আমরা করিয়াছি, সবই মনের মধ্যে

অবস্থিত আছে। সবগুলিই সূক্ষ্মভাবে অবস্থিতি করে এবং মানুষ মরিলেও এই সংস্কারগুলি তাহার মনে বর্ত্তমান থাকে—উহারা আবার সূক্ষ্ম শরীরের উপর কার্য্য করিয়া থাকে। আত্মা, এই সকল সংস্কার এবং সূক্ষ্ম শরীর রূপ বসন পরিধান করিয়া চলিয়া যান, ও এই বিভিন্নসংস্কাররূপ বিভিন্ন শক্তির সমবেত ফলই আত্মার গতি নিয়মিত করে। তাঁহাদের মতে আত্মার ত্রিবিধ গতি হইয়া থাকে।

যাহারা অত্যন্ত ধার্ম্মিক, তাঁহাদের মৃত্যু হইলে তাঁহারা সূর্য্যরশ্মির অনুসরণ করেন; সূর্য্যরশ্মি অনুসরণ করিয়া তাঁহারা সূর্য্যলোকে উপনীত হন; তথা হইতে চন্দ্রলোক এবং চন্দ্রলোক হইতে বিদ্যুল্লোকে উপস্থিত হন; তথায় তাঁহাদের সহিত আর একজন মুক্তাত্মার সাক্ষাৎ হয়; তিনি ঐ জীবাত্মাগণকে সর্ব্বোচ্চ ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। এইস্থানে উঁহারা সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বশক্তিমত্তা লাভ করেন; তাঁহাদের শক্তি ও জ্ঞান প্রায় ঈশ্বরের তুল্য হয়; আর দ্বৈতবাদীদের মতে তাঁহারা তথায় অনন্তকাল বাস করেন, অথবা, অদ্বৈতবাদীদের মতে কল্পাবসানে ব্রহ্মের সহিত একত্ব লাভ করেন। যাহারা সকাম ভাবে সৎকার্য্য করে, তাহারা মৃত্যুর পর চন্দ্রলোকে গমন করে। এখানে নানাবিধ স্বর্গ আছে। তাহারা এখানে সূক্ষ্ম শরীর—দেবশরীর লাভ করে। তাহারা দেবতা হইয়া তথায় বাস করে ও দীর্ঘকাল ধরিয়া স্বর্গসুখ উপভোগ করে। এই ভোগের অবসানে আবার তাহাদের প্রাচীন কর্ম্ম বলবান্ হয়, সুতরাং পুনরায় তাহাদের মর্ত্তলোকে পতন হয়। তাহারা বায়ুলোক, মেঘলোক, প্রভৃতি লোকের ভিতর দিয়া আসিয়া অবশেষে বৃষ্টি-ধারার সহিত পৃথিবীতে পতিত হয়। বৃষ্টির সহিত পতিত হইয়া তাহারা কোন শস্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে। তৎপরে সেই শস্য কোন ব্যক্তি ভোজন করিলে, তাহার ঔরসে সেই জীবাত্মা পুনরায় কলেবর পরিগ্রহ করে। যাহারা অতিশয় দুর্ব্বৃত্ত, তাহাদের মৃত্যু হইলে তাহারা ভূত বা দানব হয় এবং চন্দ্রলোক ও পৃথিবীর মাঝামাঝি কোন স্থানে বাস করে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মনুষ্যগণের উপর নানাবিধ অত্যাচার করিয়া থাকে, কেহ কেহ আবার মানুষের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন। তাহারা কিছুকাল ঐ স্থানে থাকিয়া পুনরায় পৃথিবীতে আসিয়া পশুজন্ম গ্রহণ করে। কিছুদিন পশুদেহে নিবাস করিয়া তাহারা আবার মানুষ হয়, আর একবার মুক্তিলাভ করিবার উপযোগী অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তাহা হইলে আমরা দেখিলাম,

যাঁহারা মুক্তির নিকটতম সোপানে পঁহুছিয়াছেন, যাঁহাদের ভিতরে খুব অল্পপরিমাণে অপবিত্রতা অবশিষ্ট আছে, তাঁহারাই সূর্য্যকিরণ ধরিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন। যাঁহারা মাঝারি রকমের লোক, যাঁহারা স্বর্গে যাইবার কামনা রাখিয়া কিছু সৎকার্য্য করেন, চন্দ্রলোকে গমন করিয়া সেই সকল ব্যক্তি সেই স্থানস্থ স্বর্গে বাস করেন, তথায় তাঁহারা দেবদেহ প্রাপ্ত হন, কিন্তু তাঁহাদিগকে মুক্তিলাভ করিবার জন্য আবার মনুষ্যদেহ ধারণ করিতে হইবে। আর যাহারা অত্যন্ত অসৎ, তাহারা ভূত দানব প্রভৃতি রূপে পরিণত হয়, তার পর তাহারা পশু হয়; তৎপরে মুক্তিলাভের জন্য তাহাদিগকে আবার মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিতে হয়। এই পৃথিবীকে কর্ম্মভূমি বলে। ভাল মন্দ কর্ম্ম সবই এখানে করিতে হয়। মানুষ স্বর্গকাম হইয়া সৎকার্য্য করিলে তিনি স্বর্গে গিয়া দেবতা হন; এই অবস্থায় আর তিনি কোন নূতন কর্ম্ম করেন না, কেবল পৃথিবীতে তাঁহাকর্ত্তৃক কৃত সৎকর্ম্মের ফলভোগ করেন। আর এই সৎকর্ম্ম যাই শেষ হইয়া যায়, অমনি তিনি জীবনে যে সকল অসৎ কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহার সমবেত ফল তাঁহার উপর বেগে আইসে, তাহাতে তাঁহাকে পুনর্ব্বার এই পৃথিবীতে টানিয়া আনে। এইরূপে, যাহারা ভূত হয়, তাহারা সেই অবস্থায় কোনরূপ নূতন কর্ম্ম না করিয়াই কেবল ভূতকর্ম্মের ফলভোগ করে, তার পর পশুজন্মগ্রহণ করিয়া তথায়ও কোন নূতন কর্ম্ম করে না, তার পর তাহারা আবার মানুষ হয়।

মনে কর, কোন ব্যক্তি সারা জীবন অনেক মন্দ কায করিল, কিন্তু একটী খুব ভাল কায করিল, তাহা হইলে সেই সৎকার্য্যের ফল তৎক্ষণাৎ প্রকাশ পাইবে, আর ঐ কার্য্যের ফল শেষ হইয়া যাইবামাত্রই, অসৎকর্ম্ম গুলিও তাহাদের ফল প্রদান করিবে। যে সব লোক কতকগুলি ভাল ভাল বড় বড় কায করিয়াছে, কিন্তু যাহাদের সারা জীবনের গতিটা ভাল নহে, তাহারা দেবতা হইবে। দেবদেহসম্পন্ন হইয়া দেবতাদের শক্তি কিছু কাল সম্ভোগ করিয়া আবার তাহাদিগকে মানুষ হইতে হইবে। যখন সৎকর্ম্মের শক্তি ক্ষয় হইয়া যাইবে, তখন আবার সেই পুরাতন অসৎকার্য্য গুলির ফল হইতে থাকিবে। যাহারা অতিশয় অসৎকর্ম্ম করে, তাহাদিগকে ভূতযোনি দানবযোনি গ্রহণ করিতে হইবে, আর যখন ঐ অসৎকার্য্যগুলির ফল শেষ হইয়া যায়, তখন যে সৎকর্ম্মটুকু অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে তাহাদিগকে আবার মানুষ করিবে। যে পথে ব্রহ্মলোকে যাওয়া যায়, যথা হইতে

পতন বা প্রত্যাবর্ত্তনের সম্ভাবনা নাই, তাহাকে দেবযান বলে, আর চন্দ্রলোকের পথকে পিতৃযান বলে।

অতএব বেদান্তদর্শনের মতে মানুষই জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী, আর এই পৃথিবীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান, কারণ, এইখানেই মুক্ত হইবার একমাত্র সম্ভাবনা। দেবতা প্রভৃতিকেও মুক্ত হইতে হইলে মানবজন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। এই মানবজন্মেই মুক্তির সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুবিধা।

এক্ষণে এই মতের বিরোধী মতের আলোচনা করা যাউক। বৌদ্ধগণ এই আত্মার অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করে। বৌদ্ধগণ বলেন, এই শরীর-মনের পশ্চাতে আত্মা বলিয়া একটী পদার্থ আছে মানিবার আবশ্যকতা কি? ইহা মানিবার আবশ্যকতা কি? এই শরীর ও মনোরূপ যন্ত্র কি স্বতঃসিদ্ধ বলিলেই যথেষ্ট ব্যাখ্যা হইল না? আবার আর একটী তৃতীয় পদার্থ কল্পনার প্রয়োজন কি? এই যুক্তিগুলি খুব প্রবল। যতদূর পর্য্যন্ত অনুসন্ধান চলে, ততদূর বোধ হয়, এই শরীর ও মনোযন্ত্র স্বতঃসিদ্ধ; অন্ততঃ আমরা অনেকে এই তত্ত্বটী এই ভাবেই দেখিয়া থাকি। তবে শরীরও মনাতিরিক্ত, অথচ শরীরমনের আশ্রয়ভূমিস্বরূপ আত্মা-নামক একটী পদার্থের অস্তিত্ব কল্পনায় আবশ্যক কি? শুধু শরীর, মন, বলিলেই ত যথেষ্ট হয়। নিয়তপরিণামশীল জড়স্রোতের নাম শরীর, আর নিয়তপরিণামশীল চিন্তা-স্রোতের নাম মন। তবে এই যে একত্বের প্রতীতি হইতেছে, তাহা কিসে হয়? বৌদ্ধ বলেন, এই একত্ব বাস্তবিক নাই। একটী জলন্ত মশাল লইয়া ঘুরাইতে থাক। ঘুরাইলে একটী অগ্নির বৃত্তস্বরূপ হইবে। বাস্তবিক কোন বৃত্ত হয় নাই, কিন্তু মশালের নিয়ত ঘূর্ণনে উহা ঐ বৃত্তের আকার ধারণ করিয়াছে। এইরূপ আমাদের জীবনেও একত্ব নাই। জড়ের রাশি ক্রমাগত চলিয়াছে, সমুদয় জড়রাশিকে এক বলিতে ইচ্ছা কর বল, কিন্তু তদতিরিক্ত বাস্তবিক কোন একত্ব নাই। মনের সম্বন্ধেও তদ্রূপ; প্রত্যেক চিন্তা অপর চিন্তা হইতে পৃথক্. এই প্রবল চিন্তাস্রোতেই এই ভ্রমাত্মক একত্বের ভাব রাখিয়া যাইতেছে; সুতরাং তৃতীয় পদার্থের আর আবশ্যকতা কি? এই যাহা কিছু দেখা যাইতেছে, এই জড়স্রোত ও এই চিন্তাস্রোত—কেবল ইহাদেরই অস্তিত্ব আছে; ইহাদের পশ্চাতে আর কিছু ভাবিবার আবশ্যকতা কি? আধুনিক অনেক সম্প্রদায় বৌদ্ধদের এই মত গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা সকলেই এই মতকে তাঁহাদের নিজ আবিষ্কার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে

ইচ্ছা করেন। অধিকাংশ বৌদ্ধদর্শনেরই মোট কথাটা এই যে, এই পরিদৃশ্যমান জগৎই পর্য্যাপ্ত; ইহার পশ্চাতে আর কিছু আছে কিনা, তাহা অনুসন্ধান করিবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই। এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতই সর্ব্বস্ব; কোন বস্তুকে এই জগতের আশ্রয়রূপে কল্পনা করিবার আবশ্যক কি? সমুদয়ই গুণসমষ্টি। এমন অনুমানিক পদার্থ কল্পনা করিবার কি আবশ্যকতা আছে, যাহাতে সেগুলি লাগিয়া থাকিবে? পদার্থের জ্ঞান আইসে, কেবল গুণরাশির বেগে স্থানপরিবর্ত্তনবশতঃ, কোন অপরিণামী পদার্থ বাস্তবিক উহাদের পশ্চাতে আছে বলিয়া নয়। আমরা দেখিলাম, এই যুক্তিগুলি অতি প্রবল, আর উহা সাধারণ মানবের অনুভূতির সপক্ষে খুব সাক্ষ্য দিয়া থাকে; বাস্তবিকও লক্ষে একজনও এই দৃশ্য জগতের অতীত কিছুর ধারণা করিতে পারে কি না সন্দেহ। অধিকাংশ লোকের পক্ষে প্রকৃতি নিত্যপরিণামশীল মাত্র। আমাদের মধ্যে খুব অল্প লোকই আমাদের পশ্চাদ্দেশস্থ সেই স্থির সমুদ্রের অত্যল্প আভাসও পাইয়াছেন। আমাদের পক্ষে এই জগৎ কেবল তরঙ্গপূর্ণমাত্র। তাহা হইলে আমরা দুইটী মত পাইলাম। একটী এই,— এই শরীর মনের পশ্চাতে এক অপরিণামী সত্তা রহিয়াছে; আর একটী মত এই,—এই জগতে নিশ্চলত্ব বলিয়া কিছুই নাই, সবই চঞ্চল, সবই কেবল পরিণাম, অদ্বৈতবাদেই এই দুই মতের সামঞ্জস্য পাওয়া যায়।

অদ্বৈতবাদী বলেন, জগতের একটী অপরিণামী আশ্রয় আছে, দ্বৈতবাদীর এই বাক্য সত্য; অপরিণামী কোন পদার্থ কল্পনা না করিলে আমরা পরিণামই কল্পনা করিতে পারি না। কোন অপেক্ষাকৃত অল্পপরিণামী পদার্থের তুলনায় কোন পদার্থকে পরিণামিরূপে চিন্তা করা যাইতে পারে, আবার তাহা অপেক্ষাও অল্পপরিণামী পদার্থের সহিত তুলনায় উহাকেও আবার পরিণামিরূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, যতক্ষণ না একটী সম্পূর্ণ অপরিণামী পদার্থ বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হয়। এই জগৎপ্রপঞ্চ অবশ্য এমন এক অবস্থায় ছিল, যখন উহা স্থিরশান্ত ছিল, যখন উহা শক্তিদ্বয়ের সামঞ্জস্যস্বরূপ ছিল, অর্থাৎ কোন শক্তিরই অস্তিত্ব ছিল না, কারণ বৈষম্য না হইলে শক্তির বিকাশ হয় না। এই ব্রহ্মাণ্ড আবার সেই সাম্যাবস্থা প্রাপ্তির জন্য চলিয়াছে। যদি আমাদের কোন বিষয় সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান থাকে, তাহা এই। দ্বৈতবাদীরা যখন বলেন, কোন অপরিণামী পদার্থ আছে, তখন তাঁহারা ঠিকই বলেন, কিন্তু উহা যে শরীরমনের সম্পূর্ণ অতীত, শরীরমন

হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌, এ কথা ভুল। বৌদ্ধেরা যে বলেন, সমুদয় জগৎ কেবল পরিণামপ্রবাহমাত্র, এ কথাও সত্য, কারণ যতদিন আমি জগৎ হইতে পৃথক্‌, যতদিন আমি আমার অতিরিক্ত আর কিছুকে দেখি, মোট কথা, যতদিন দ্বৈত ভাব থাকে, ততদিন এই জগৎ পরিণামশীল বলিয়াই প্রতীত হইবে। কিন্তু প্রকৃত কথা এই,জগৎ পরিণামীও বটে,অপরিণামীও বটে। আত্মা, মন ও শরীর, তিনটী পৃথক্‌ বস্তু নহে, উহারা একই। একই বস্তু কখন দেহ, কখন মন, কখন বা দেহমনের অতীত আত্মা বলিয়া প্রতীত হয়। যিনি শরীরের দিকে দেখেন, তিনি মন পর্য্যন্ত দেখিতে পান না; যিনি মন দেখেন, তিনি আত্মা দেখিতে পান না; আর যিনি আত্মা দেখেন, তাঁহার পক্ষে শরীর মন উভয়ই কোথা চলিয়া যায়! যিনি কেবল গতি দেখেন, তিনি সম্পূর্ণ স্থিরভাব দেখিতে পান না, আর যিনি সেই সম্পূর্ণ স্থিরভাব দেখেন, তাঁহার পক্ষে গতি কোথায় চলিয়া যায়! সর্পে রজ্জুভ্রম হইল। যে ব্যক্তি রজ্জুকে সর্প দেখিতেছে, তাহার পক্ষে রজ্জু কোথায় চলিয়া যায়, আর যখন ভ্রান্তি দূর হইয়া সে ব্যক্তি রজ্জুই দেখিতে থাকে, তাহার পক্ষে সর্পও কোথা চলিয়া যায়!

তাহা হইলে দেখা গেল, একটীমাত্র বস্তুই আছে, তাহাই নানারূপ বলিয়াই প্রতীত হইতেছে। ইহাকে আত্মাই বল, আর বস্তুই বল, বা আর কিছুই বল, জগতে কেবল একমাত্র ইহারই অস্তিত্ব আছে। অদ্বৈতবাদের ভাষায় বলিতে গেলে এই আত্মাই ব্রহ্ম, কেবল নামরূপ-উপাধিবশতঃ বহু প্রতীত হইতেছে। সমুদ্রের তরঙ্গগুলির দিকে দৃষ্টিপাত কর; একটী তরঙ্গও সমুদ্র হইতে পৃথক্‌ নহে। তবে তরঙ্গকে পৃথক্‌ দেখাইতেছে কেন? নামরূপ—তরঙ্গের আকৃতি,—আর আমরা উহাকে 'তরঙ্গ' এই যে নাম প্রদান করিয়াছি, তাহাতেই উহাকে সমুদ্র হইতে পৃথক্‌ করিয়াছে। নামরূপ চলিয়া গেলেই, উহা যে সমুদ্র ছিল, সেই সমুদ্রই রহিয়া যায়। তরঙ্গ ও সমুদ্রের মধ্যে কে প্রভেদ করিতে পারে? অতএব এই সমুদয় জগৎ একস্বরূপ হইল। নামরূপই যত পার্থক্য রচনা করিয়াছে। যেমন সূর্য্য লক্ষ লক্ষ জলকণার উপরে প্রতিবিম্বিত হইয়া প্রত্যেক জলকণার উপরেই সূর্য্যের একটী পূর্ণ প্রতিকৃতি সৃষ্টি করে, তদ্রূপ সেই এক আত্মা, সেই এক সত্তা ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে প্রতিবিম্বিত হইয়া নানারূপে উপলব্ধ হইতেছেন। কিন্তু বাস্তবিক উহা এক। বাস্তবিক 'আমি' বা 'তুমি' বলিয়া কিছুই নাই—সবই এক। হয় বল সবই আমি, না হয় বল সবই তুমি। এই দ্বৈতজ্ঞান সম্পূর্ণ মিথ্যা, আর সমুদয় জগৎ এই দ্বৈতজ্ঞানের

ফল। যখন বিবেকের উদয়ে মানুষ দেখিতে পায়, দুইটী বস্তু নাই, একটী বস্তু আছে, তখন তাঁহার উপলব্ধি হয়, তিনিই এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-স্বরূপ হইয়াছেন। আমিই এই পরিবর্ত্তনশীল জগং, আমিই আবার অপরিণামী, নির্গুণ, নিত্যপূর্ণ, নিত্যানন্দময়।

অতএব নিত্যশুদ্ধ, নিত্যপূর্ণ, অপরিণামী, অপরিবর্ত্তনীয় এক আত্মা আছেন; তাঁহার কখন পরিণাম হয় নাই, আর এই সকল বিভিন্ন পরিণাম সেই একমাত্র আত্মাতেই প্রতীত হইতেছে মাত্র। উহার উপরে নামরূপ এই সকল বিভিন্ন স্বপ্নচিত্র অঙ্কিত করিয়াছে। আকৃতিই তরঙ্গকে সমুদ্র হইতে পৃথক্ করিয়াছে। মনে কর, তরঙ্গটী মিলাইয়া গেল, তখন কি ঐ আকৃতি থাকিবে? না, উহা একেবারে চলিয়া যাইবে। তরঙ্গের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে সাগরের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে, কিন্তু সাগরের অস্তিত্ব তরঙ্গের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে না। যতক্ষণ তরঙ্গ থাকে, ততক্ষণ রূপ থাকে, কিন্তু তরঙ্গ নিবৃত্ত হইলে ঐ রূপ আর থাকিতে পারে না। এই নামরূপকেই মায়া বলে। এই মায়াই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি সৃজন করিয়া এক জনকে আর একজন হইতে পৃথক্ বোধ করাইতেছে। কিন্তু ইহার অস্তিত্ব নাই। মায়ার অস্তিত্ব আছে, বলা যাইতে পারে না। রূপের অস্তিত্ব আছে, বলা যাইতে পারে না, কারণ উহা অপরের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে। আবার উহা নাই, তাহাও বলা যাইতে পারে না, কারণ উহাই এই সকল ভেদ করিয়াছে। অদ্বৈতবাদীর মতে এই মায়া বা অজ্ঞান বা নামরূপ, অথবা ইয়ুরোপীয়গণের মতে দেশকালনিমিত্ত, এই এক অনন্ত সত্তা হইতে এই বিভিন্নরূপ জগৎসত্তা দেখাইতেছে; পরমার্থতঃ এই জগং এক অখণ্ডস্বরূপ। যতদিন পর্য্যন্ত কেহ দুইটী বস্তুর কল্পনা করেন, তিনি ভ্রান্ত। য ন তিনি জানিতে পারেন, একমাত্র সত্তা আছে, তখনই তিনি যথার্থ জানিয়াছেন। যতই দিন যাইতেছে, ততই আমাদের নিকট এই সত্য প্রমাণিত হইতেছে। কি জড়জগতে, কি মনোজগতে, কি অধ্যাত্ম জগতে, সর্ব্বত্রই এই সত্য প্রমাণিত হইতেছে। এখন প্রমাণিত হইয়াছে যে, তুমি, আমি, সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, এ সবই এক জড়সমুদ্রের বিভিন্ন অংশের নামমাত্র। এই জড়রাশি ক্রমাগত পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে। যে শক্তিকণা কয়েক মাস পূর্ব্বে সূর্য্যে ছিল, তাহা আজ মনুষ্যের ভিতর হয়ত আসিয়াছে; কাল হয়ত উহা পশুর ভিতরে, আবার পরশ্ব হয়ত কোন উদ্ভিদে প্রবেশ করিবে। সর্ব্বদাই আসিতেছে যাইতেছে। উহা একমাত্র অখণ্ডজড়রাশি—কেবল নামরূপে

পৃথক্‌। উহার এক বিন্দুর নাম সূর্য্য, এক বিন্দুর নাম চন্দ্র, এক বিন্দু তারা, একবিন্দু মানুষ, একবিন্দু পশু, একবিন্দু উদ্ভিদ, এইরূপ। আর এই যে বিভিন্ন নাম, ইহা ভ্রমাত্মক, কারণ, এই জড়রাশির ক্রমাগত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। এই জগৎকেই আর এক ভাবে দেখিলে চিন্তাসমুদ্ররূপে প্রতীয়মান হইবে, উহার এক একটী বিন্দু এক একটী মন; তুমি একটী মন, আমি একটী মন, প্রত্যেকেই এক একটী মনমাত্র। আবার এই জগৎ জ্ঞানের দৃষ্টি হইতে দেখিলে, অর্থাৎ যখন চক্ষু হইতে মোহাবরণ অপসারিত হইয়া যায়, যখন মন শুদ্ধ হইয়া যায়, তখন উহাকেই নিত্যশুদ্ধ, অপরিণামী, অবিনাশী, অখণ্ড, পূর্ণস্বরূপ পুরুষ বলিয়া প্রতীত হইবে। তবে দ্বৈতবাদীর পরলোকবাদ—মানুষ মরিলে স্বর্গে যায়, অথবা অমুক অমুক লোকে যায়, অসৎলোকে ভূত হয়, পরে পশু হয়, এসব কথার কি হইল? অদ্বৈতবাদী বলেন, কেহ আসেও না, কেহ যায়ও না। তোমার পক্ষে যাওয়া আসা কিসে সম্ভব? তুমি অনন্তস্বরূপ, তোমার পক্ষে যাইবার স্থান আর কোথায়?

কোন বিদ্যালয়ে কতকগুলি ছোট বালক বালিকার পরীক্ষা হইতেছিল। পরীক্ষক ঐ ছোট ছেলেগুলিকে নানারূপ কঠিন প্রশ্ন করিতেছিলেন। অন্যান্য প্রশ্নের মধ্যে তাঁহার এই প্রশ্নও ছিল, পৃথিবী পড়িয়া যায় না কেন? অনেকেই প্রশ্নটীই বুঝিতে পারে নাই, সুতরাং যাহার যাহা মনে আসিতে লাগিল, সে সেইরূপ উত্তর দিতে লাগিল। একটী বুদ্ধিমতী বালিকা আর একটী প্রশ্ন করিয়া ঐ প্রশ্নটীর উত্তর করিল,—"কোথায় উহা পড়িবে?"ঐ প্রশ্নটীই ত ভুল। জগতে উঁচু নীচু বলিয়া ত কিছুই নাই। উঁচু নীচু বলা কেবল আপেক্ষিক মাত্র। আত্মাসম্বন্ধেও তদ্রূপ; জন্মমৃত্যু সম্বন্ধে প্রশ্নই ভুল। কে যায়, কে আসে? তুমি কোথায় নাই? এমন স্বর্গ কোথায় আছে, যেখানে তুমি পূর্ব্ব হইতেই অবস্থিত নহ? মানুষের আত্মা সর্ব্বব্যাপী। তুমি কোথায় যাইবে? কোথায় যাইবে না? আত্মা ত সর্ব্বত্র। সুতরাং সম্পূর্ণ জীবন্মুক্ত ব্যক্তির পক্ষে এই বালকসুলভ স্বপ্ন, এই জন্মমৃত্যুরূপ বালকসুলভ ভ্রম, স্বর্গ নরক প্রভৃতি স্বপ্ন—সবই একেবারে অন্তর্হিত হইয়া যায়; যাহাদের ভিতরে কিঞ্চিৎ অজ্ঞান অবশিষ্ট আছে, তাহাদের পক্ষে উহা ব্রহ্মলোকান্ত নানাবিধ দৃশ্য দেখাইয়া অন্তর্হিত হয়; অজ্ঞানীর পক্ষে উহা থাকিয়া যায়।

সমুদয় জগৎ, স্বর্গে যাইবে, মরিবে, জন্মিবে, এ কথা বিশ্বাস করে কেন? আমি একখানি গ্রন্থ পাঠ করিতেছি, উহার পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পঠিত হইতেছে

এবং ওল্টান হইতেছে। আর এক পৃষ্ঠা আসিল—উহাও ওল্টান হইল। পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে কে? কে যায় আসে? আমি নই,—ঐ পুস্তকেরই পাতা ওল্টান হইতেছে। সমুদয় প্রকৃতিই আত্মার সম্মুখস্থ একখানি পুস্তক স্বরূপ। উহার অধ্যায়ের পর অধ্যায় পড়া হইয়া যাইতেছে ও ওল্টান হইতেছে, নূতন দৃশ্য সম্মুখে আসিতেছে। উহাও পড়া হইয়া গেল ও ওল্টান হইল। আবার নূতন অধ্যায় আসিল, কিন্তু আত্মা যেমন তেমনিই, অনন্তস্বরূপ। প্রকৃতিই পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছেন, আত্মা নহেন। উঁহার কখন পরিণাম হয় না। জন্মমৃত্যু প্রকৃতিতে, তোমাতে নহে। তথাপি অজ্ঞেরা ভ্রান্ত হইয়া মনে করে, আমরা জন্মাইতেছি, মরিতেছি, প্রকৃতি নহেন, যেমন আমরা ভ্রান্তিবশতঃ মনে করি, সূর্য্যই চলিতেছেন, পৃথিবী নহে। এ সকল, সুতরাং, ভ্রান্তিমাত্র, যেমন আমরা ভ্রমবশতঃ রেলগাড়ীর পরিবর্ত্তে মাঠকে সচল বলিয়া মনে করি। জন্মমৃত্যুভ্রান্তি ঠিক এইরূপ। যখন মানুষ কোন বিশেষরূপ ভাবে থাকে, তখন সে ইহাকেই পৃথিবী, সূর্য্য, চন্দ্র, তারা প্রভৃতি বলিয়া দেখে, আর যাহারা ঐরূপ মনোভাবসম্পন্ন, তাহারাও ঠিক তাহাই দেখে। তোমার আমার মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোক থাকিতে পারে, যাহারা বিভিন্নপ্রকৃতিসম্পন্ন। তাহারাও আমাদিগকে কখন দেখিবে না, আমরাও তাহাদিগকে কখন দেখিতে পাইব না। আমরা একরূপচিত্তবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণীকেই দেখিতে পাই। সেই যন্ত্রগুলিই পরস্পর পরস্পরকে দেখিতে পায়, যে গুলি একপ্রকার কম্পনবিশিষ্ট। মনে কর, আমরা এক্ষণে যেরূপ প্রাণকম্পনসম্পন্ন, উহাকে আমরা মানব-কম্পন নাম প্রদান করিতে পারি;—যদি উহা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, তবে আর মনুষ্য দেখা যাইবে না, উহার পরিবর্ত্তে অন্যরূপ দৃশ্য আমাদের সমক্ষে আসিবে,—হয়ত দেবতা ও দেবজগৎ, কিম্বা অসৎ লোকের পক্ষে দানব ও দানবজগৎ; কিন্তু ঐ সকলগুলিই এই এক জগতেরই বিভিন্ন ভাব মাত্র। এই জগৎ মানবদৃষ্টিতে পৃথিবী, সূর্য্য, চন্দ্র, তারা প্রভৃতিরূপে, আবার দানবের দৃষ্টিতে দেখিলে ইহাই নরক বা শাস্তিস্থানরূপে প্রতীত হইবে, আবার যাহারা স্বর্গে যাইতে চাহে, তাহারা এই স্থানকেই স্বর্গ বলিয়া দেখিবে। যাহারা সারা জীবন ভাবিতেছে, আমরা স্বর্গসিংহাসনারূঢ় ঈশ্বরের নিকট গিয়া সারা জীবন তাঁহার উপাসনা করিব, তাহাদের মৃত্যু হইলে তাহারা তাহাদের চিত্তস্থ ঐ বিষয়ই দেখিবে। এই জগতই একটী বৃহৎ স্বর্গে পরিণত হইয়া যাইবে; তাহারা দেখিবে, নানাপ্রকার অপ্সর কিন্নর চতুর্দ্দিকে উড়িয়া বেড়াইতেছে, আর দেবতারা

সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন। স্বর্গাদি সমুদয়ই মানুষেরই কৃত। অতএব অদ্বৈতবাদী বলেন, দ্বৈতবাদীর কথা সত্য, কিন্তু ঐ সকল তাহার নিজেরই রচিত। এই সব লোক, এই সব দেব দৈত্য, পুনর্জন্ম প্রভৃতি সবই রূপক, মানবজীবনও তাহাই। ঐগুলি কেবল রূপক, আর মানবজীবন সত্য, তাহা হইতে পারে না। মানুষ সর্ব্বদাই এই ভুল করিতেছে। অন্যান্য জিনিষ, যথা স্বর্গ নরক প্রভৃতিকে রূপক বলিলে, তাহারা বেশ বুঝিতে পারে, কিন্তু তাহারা নিজেদের অস্তিত্বকে রূপক বলিয়া কোন মতে স্বীকার করিতে চায় না। এই আপাতপ্রতীয়মান সমুদয়ই রূপকমাত্র, আর সর্ব্বাপেক্ষা মিথ্যা এই যে, আমরা শরীর, যাহা আমরা কখনই নই এবং কখন হইতেও পারি না। আমরা কেবল মানুষ, ইহাই ভয়ানক মিথ্যা কথা। আমরাই জগতের ঈশ্বর। ঈশ্বরের উপাসনা করিতে গিয়া আমরা নিজেদের অব্যক্ত আত্মারই উপাসনা করিয়া আসিতেছি। তুমি জন্ম হইতে পাপী বা অসৎ পুরুষ, এইটী ভাবাই সর্ব্বাপেক্ষা মিথ্যা কথা। যিনি নিজে পাপী, তিনিই কেবল অপরকে পাপী দেখিয়া থাকেন। মনে কর, এখানে একটী শিশু রহিয়াছে, আর তুমি টেবিলের উপর এক মোহরের থলি রাখিলে। মনে কর, একজন দস্যু আসিয়া ঐ মোহর লইয়া গেল। শিশুর পক্ষে ঐ মোহরের থলির অবস্থান ও অন্তর্দ্ধান, উভয়ই সমান; তাহার ভিতরে চোর নাই, সুতরাং সে বাহিরেও চোর দেখে না। পাপী ও অসৎ লোকই বাহিরে পাপ দেখিতে পায়, কিন্তু সাধু লোকের পক্ষে তাহা বোধ হয় না। অত্যন্ত অসাধু পুরুষের এই জগৎকে নরকস্বরূপ দেখে, যাহারা মাঝামাঝি লোক, তাহারা ইহাকে স্বর্গস্বরূপ দেখে, আর যাঁহারা পূর্ণ সিদ্ধ পুরুষ, তাঁহারা উহাকে সাক্ষাৎ ভগবান্-স্বরূপে দর্শন করেন। তখনই কেবল তাঁহার চক্ষু হইতে আবরণ পড়িয়া যায়, আর তখন সেই ব্যক্তি পবিত্র ও শুদ্ধ হইয়া দেখিতে পান, তাঁহার দৃষ্টি একেবারে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। যে সকল দুঃস্বপ্ন তাঁহাকে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া উৎপীড়ন করিতেছিল, তাহা একেবারে চলিয়া যায়, আর যিনি আপনাকে এতদিন মানুষ, দেবতা দানব প্রভৃতি বলিয়া মনে করিতেছিলেন, যিনি আপনাকে কখন ঊর্দ্ধে, কখন অধোতে, কখন পৃথিবীতে, কখন স্বর্গে, কখন বা অন্য স্থানে অবস্থিত বলিয়া ভাবিতেছিলেন, তিনি দেখিতে পান, তিনি বাস্তবিক সর্ব্বব্যাপী, তিনি কালের অধীন নন, কাল তাঁহার অধীন, সমুদয় স্বর্গ তাঁহার ভিতরে, তিনি কোনরূপ স্বর্গে অবস্থিত নহেন, আর

মানুষ কোন না কোন কালে যে কোন দেবতা উপাসনা করিয়াছে, সবই তাঁহার ভিতরে, তিনি কোন দেবতায় অবস্থিত নহেন। তিনিই দেবাসুর, মানুষ, পশু, উদ্ভিদ্ প্রস্তর প্রভৃতির সৃষ্টিকর্তা, আর তখন মানুষের প্রকৃত স্বরূপ তাঁহার নিকট এই জগৎ হইতে শ্রেষ্ঠতর, স্বর্গ হইতে শ্রেষ্ঠতর এবং সর্ব্বব্যাপী আকাশ হইতে অধিক সর্ব্বব্যাপীরূপে প্রকাশ পায়। তখনই মানুষ নির্ভয় হইয়া যায়, তখনই মানুষ মুক্ত হইয়া যায়। তখন সব ভ্রান্তি চলিয়া যায়, সব দুঃখ দূর হইয়া যায়, সব ভয় একেবারে চিরকালের জন্য শেষ হইয়া যায়। তখন জন্ম কোথায় চলিয়া যায়, তার সঙ্গে মৃত্যুও চলিয়া যায়; দুঃখ চলিয়া যায়, তার সঙ্গে সুখও চলিয়া যায়। পৃথিবী উড়িয়া যায়, তাহার সঙ্গে স্বর্গও উড়িয়া যায়; শরীর চলিয়া যায়, তাহার সঙ্গে মনও চলিয়া যায়। সেই ব্যক্তির পক্ষে সমুদয় জগতই যেন অব্যক্ত ভাব ধারণ করে। এই যে শক্তিরাশির নিয়ত সংগ্রাম, নিয়ত সংঘর্ষ, ইহা একেবারে স্থগিত হইয়া যায়, আর যাহা শক্তি ও ভূতরূপে, প্রকৃতির বিভিন্ন চেষ্টারূপে প্রকাশ পাইতেছিল, যাহা স্বয়ং প্রকৃতিরূপে প্রকাশ পাইতেছিল, যাহা স্বর্গ, পৃথিবী, উদ্ভিদ্, পশু, মানুষ, দেবতা প্রভৃতিরূপে প্রকাশ পাইতেছিল, সেই সমুদয়ই এক অনন্ত অচ্ছেদ্য, অপরিণামী সত্তারূপে পরিণত হইয়া যায়, আর জ্ঞানী পুরুষ দেখিতে পান, তিনি সেই সত্তার সহিত অভেদ। "যেমন আকাশে নানাবর্ণের মেঘ আসিয়া খানিক ক্ষণ খেলা করিয়া পরে অন্তর্হিত হইয়া যায়," সেইরূপ এই আত্মার সম্মুখে পৃথিবী, স্বর্গ, চন্দ্রলোক, দেবতা, সুখ দুঃখ প্রভৃতি আসিতেছে; কিন্তু উহারা সেই এক অনন্ত অপরিণামী নীলবর্ণ আকাশকে আমাদের সম্মুখে রাখিয়া অন্তর্হিত হয়। আকাশ কখন পরিণাম প্রাপ্ত হয় না, মেঘই কেবল পরিণাম প্রাপ্ত হয়। ভ্রমবশতঃ আমরা মনে করি, আমরা অপবিত্র, আমরা সান্ত, আমরা জগৎ হইতে পৃথক্। প্রকৃত মানুষ এই এক অখণ্ড সত্তাস্বরূপ।

এক্ষণে দুইটী প্রশ্ন আসিতেছে। প্রথমটী এই, "এই অদ্বৈতজ্ঞান উপলব্ধি করা কি সম্ভব? এতক্ষণ পর্য্যন্ত মতের কথা হইল, ইহার অপরোক্ষানুভূতি কি সম্ভব?" হাঁ, সম্পূর্ণই সম্ভব। এমন অনেক লোক সংসারে এখনও জীবিত, যাঁহাদের পক্ষে অজ্ঞান চিরকালের জন্য চলিয়া গিয়াছে। ইহাঁরা কি এই সত্য উপলব্ধি করিবার পরক্ষণেই মরিয়া যান? আমরা যত শীঘ্র মনে করি, তত শীঘ্র নয়। এককাষ্ঠখণ্ডসংযোজিত দুইটী চক্র একত্রে চলিতেছে। যদি আমি একখানি চক্র ধরিয়া সংযোজক কাষ্ঠখণ্ডটিকে কাটিয়া ফেলি, তবে আমি যে

চক্রখানি ধরিয়াছি, তাহা থামিয়া যাইবে, কিন্তু অপর চক্রের উপর পূর্ব্বপ্রদত্ত বেগ রহিয়াছে, সুতরাং উহা কিছুক্ষণ গিয়া তবে পড়িয়া যায়। পূর্ণ ও শুদ্ধস্বরূপ আত্মা যেন একখানি চক্র, আর এই শরীরমনরূপ ভ্রান্তি আর একটী চক্র, কর্ম্মরূপ কাষ্ঠদণ্ড দ্বারা যোজিত। জ্ঞানই সেই কুঠার, যাহা ঐ দুইটীর সংযোগদণ্ড ছেদন করিয়া দেয়। তখন আত্মারূপ চক্র স্থগিত হইয়া যাইবে, তখন আত্মা, আসিতেছেন যাইতেছেন অথবা তাঁহার জন্মমৃত্যু হইতেছে, এ সকল অজ্ঞানের ভাব পরিত্যাগ করিবেন, আর প্রকৃতির সহিত তাঁহার মিলিতভাব, এবং অভাব বাসনা সব চলিয়া যাইবে, তখন আত্মা দেখিতে পাইবেন, তিনি পূর্ণ, বাসনারহিত। কিন্তু শরীরমনরূপ অপর চক্রে প্রাক্তন কর্ম্মের বেগ থাকিবে। সুতরাং যতদিন না এই প্রাক্তন কর্ম্মের বেগ একেবারে নিবৃত্তি হয়, ততদিন উহারা থাকিবে। ঐ বেগ নিবৃত্তি হইলে শরীরমনের পতন হইবে, তখন আত্মা মুক্ত হইবেন। তখন আর স্বর্গে যাওয়া বা স্বর্গ হইতে জগতে ফিরিয়া আসা, এমন কি, ব্রহ্মলোকে গমন পর্য্যন্ত স্থগিত হইয়া যাইবে, কারণ তিনি কোথা হইতে আসিবেন, কোথায়ই বা যাইবেন? যে ব্যক্তি এই জীবনেই এই অবস্থা লাভ করিয়াছেন, যাঁহার পক্ষে, অন্ততঃ এক মিনিটের জন্যও এই সংসারদৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়া সত্য প্রতিভাত হইয়াছে, তিনি জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হন। এই জীবন্মুক্তি অবস্থা লাভ করাই বেদান্তীর লক্ষ্য।

এক সময়ে আমি ভারত মহাসাগরের উপকূলে ভারতের পশ্চিমভাগস্থ মরুখণ্ডে ভ্রমণ করিতেছিলাম। আমি অনেক দিন ধরিয়া পদব্রজে মরুতে ভ্রমণ করিলাম, কিন্তু প্রতিদিন এই দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতাম যে, চতুর্দ্দিকে সুন্দর সুন্দর হ্রদ রহিয়াছে, তাহাদের সকলগুলির চতুর্দ্দিকেই বৃক্ষরাজি বিরাজিত, আর ঐ জলে বৃক্ষসমূহের ছায়া বিপরীত ভাবে পড়িয়া নড়িতেছে। কি অদ্ভুত দৃশ্য! ইহাকে আবার লোকে মরুভূমি বলে? আমি একমাস ভ্রমণ করিলাম, ভ্রমণ করিতে করিতে এই অদ্ভুত হ্রদ সকল ও বৃক্ষরাজি দেখিতে লাগিলাম। একদিন অতিশয় তৃষ্ণার্ত্ত হওয়ায় আমার একটু জল খাইবার ইচ্ছা হইল, সুতরাং আমি ঐ সকল সুন্দর নির্ম্মল হ্রদ সকলের মধ্যে একটীর দিকে অগ্রসর হইলাম। অগ্রসর হইবামাত্র হঠাৎ উহা অদৃশ্য হইল, আর আমার মস্তিষ্কে হঠাৎ এই জ্ঞান আসিল, 'যে মরীচিকা সম্বন্ধে সারা জীবন পুস্তকে পড়িয়া আসিতেছি, এ সেই মরীচিকা।' আর তাহার সহিত এই জ্ঞানও আসিল,

এই সারা মাসের মধ্যে প্রত্যহই আমি মরীচিকাই দেখিয়া আসিতেছি, কিন্তু জানিনা যে, ইহা মরীচিকা। তার পর দিন আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। পূর্ব্বের মতই হ্রদ দেখা যাইতে লাগিল, কিন্তু ঐ সঙ্গে সঙ্গে এই জ্ঞানও আসিতে লাগিল যে, উহা মরীচিকা, সত্য হ্রদ নহে। এই জগৎসম্বন্ধেও তদ্রূপ। আমরা প্রতিদিন, প্রতি মাস, প্রতি বৎসর, এই জগন্মরুতে ভ্রমণ করিতেছি, কিন্তু মরীচিকাকে মরীচিকা বলিয়া বুঝিতে পারিতেছি না। একদিন এই মরীচিকা অদৃশ্য হইবে, কিন্তু উহা আবার আসিবে। শরীর প্রাক্তন কর্ম্মের অধীন থাকিবে, সুতরাং ঐ মরীচিকা ফিরিয়া আসিবে। যতদিন আমরা কর্ম্ম দ্বারা বদ্ধ, ততদিন জগৎ আমাদের সম্মুখে আসিবে। নরনারী পশু উদ্ভিদ্ আসক্তি, কর্ত্তব্য, সব আসিবে, কিন্তু উহারা পূর্ব্বের ন্যায় আমাদের উপর শক্তিবিস্তারে সমর্থ হইবে না। এই নব জ্ঞানের প্রভাবে কর্ম্মের শক্তি নাশ হইবে, উহার বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া যাইবে। জগৎ আমাদের পক্ষে একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে, কারণ যেমন জগৎ দেখা যাইবে, তেমনি উহার সহিত সত্য ও মরীচিকার প্রভেদের জ্ঞানও আসিবে।

তখন এই জগৎ আর সেই পূর্ব্বের জগৎ থাকিবে না। তবে একটী বিপদ্ আছে। আমরা দেখিতে পাই, প্রতি দেশেই লোকে এই বেদান্তদর্শনের মত গ্রহণ করিয়া বলে, "আমি ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত, আমি বিধিনিষেধের অতীত, সুতরাং আমি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারি।" এই দেশেই দেখিবে, অনেক অজ্ঞান বলিয়া থাকে, 'আমি বদ্ধ নহি, আমি স্বয়ং ঈশ্বরস্বরূপ; আমি যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিব।' ইহা ঠিক নহে, যদিও ইহা সত্য যে, আত্মা ভৌতিক মানসিক বা নৈতিক সর্ব্বপ্রকার নিয়মের অতীত। নিয়মের মধ্যে বন্ধন, নিয়মের বাহিরে মুক্তি। ইহাও সত্য যে, মুক্তি আত্মার জন্মগত স্বভাব, উহা তাঁহার জন্মপ্রাপ্ত সত্ব, আর আত্মার যথার্থ মুক্তস্বভাব ভৌতিক আবরণের মধ্য দিয়া মানুষের আপাতপ্রতীয়মান মুক্তস্বভাবরূপে প্রতীত হইতেছে। তোমার জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তই তুমি আপনাকে মুক্ত বলিয়া অনুভব করিতেছ। আমরা আপনাকে মুক্ত না অনুভব করিয়া এক মুহূর্ত্তও জীবিত থাকিতে পারি না, কথা কহিতে পারি না, কিম্বা শ্বাসপ্রশ্বাসও ফেলিতে পারি না। কিন্তু আবার, অল্প চিন্তায় ইহাও প্রমাণিত হয় যে, আমরা যন্ত্রতুল্য—মুক্ত নহি। তবে কোন্‌টী সত্য? এই যে 'আমি মুক্ত' এই ধারণাটীই কি ভ্রমাত্মক? একদল বলেন, 'আমি মুক্ত-স্বভাব' এই ধারণা ভ্রমাত্মক, আবার অপর দল বলেন,

'আমি বদ্ধভাবাপন্ন' এই ধারণাই ভ্রমাত্মক। তবে এই দ্বিবিধ অনুভূতি কোথা হইতে আসিয়া থাকে? মানুষ প্রকৃত পক্ষে মুক্ত, মানুষ পরমার্থতঃ যাহা, তাহা মুক্ত ব্যতীত আর কিছু হইতে পারে না, কিন্তু যখনই তিনি মায়ার জগতে আসেন, যখনই তিনি নামরূপের মধ্যে পড়েন, তখনই তিনি বদ্ধ হইয়া পড়েন। 'স্বাধীন, ইচ্ছা' ইহা বলাই ভুল। ইচ্ছা কখন স্বাধীন হইতেই পারে না। কি করিয়া হইবে? যখন প্রকৃত মানুষ যিনি, তিনি বদ্ধ হইয়া যান, তখনই তাঁহার ইচ্ছার উদ্ভব হয়, তাহার পূর্ব্বে নহে। মানুষের ইচ্ছা বদ্ধভাবাপন্ন, কিন্তু উহার মূল যাহা, তাহা নিত্যকালের জন্য মুক্ত। সুতরাং বন্ধনের অবস্থাতেও—এই মনুষ্যজীবনেই হউক, দেব-জীবনেই হউক, স্বর্গে অবস্থান কালেই হউক, আর মর্ত্ত্যে অবস্থান কালেই হউক, আমাদের বিধিদত্ত অধিকারস্বরূপ এই, মুক্তির স্মৃতি থাকিয়া যায়। আর জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আমরা সকলেই ঐ মুক্তির দিকেই চলিয়াছি। যখন মানুষ মুক্তিলাভ করে, তখন সে নিয়মের দ্বারা কিরূপে বদ্ধ হইতে পারে? জগতের কোন নিয়মই তাহাকে বদ্ধ করিতে পারে না, কারণ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার।

তিনিই তখন সমুদয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ। হয় বল, তিনিই সমুদয় জগৎ, না হয় বল, তাঁহার পক্ষে জগতের অস্তিত্বই নাই। তবে তাঁহার লিঙ্গ, দেশ, ইত্যাদির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব কিরূপে থাকিবে? তিনি কিরূপে বলিবেন, আমি পুরুষ, আমি স্ত্রী, অথবা আমি বালক? এগুলি কি মিথ্যা কথা নহে? তিনি জানিয়াছেন, সেগুলি মিথ্যা। তখন তিনি এই গুলি পুরুষের অধিকার, এই গুলি স্ত্রীর অধিকার, কিরূপে বলিবেন? কাহারও কিছুই অধিকার নাই, কাহারই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। পুরুষ নাই, স্ত্রীও নাই; আত্মা লিঙ্গহীন, নিত্যশুদ্ধ। আমি পুরুষ বা স্ত্রী বলা, অথবা আমি অমুক দেশবাসী বলা, মিথ্যাবাদ মাত্র। সমুদয় জগতই আমার দেশ, সমুদয় জগতই আমার, কারণ, সমুদয় জগতের দ্বারা যেন আমি আপনাকে আবৃত করিয়াছি। সমুদয় জগৎ যেন আমার শরীর হইয়াছে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, অনেক লোকে বিচারের সময় এই সব কথা বলিয়া কার্য্যের সময় অপবিত্র কার্য্য সকল করিয়া থাকে। আর যদি আমরা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, কেন তাহারা এইরূপ করিতেছে, তাহারা উত্তর দিবে, 'এ তোমাদের বুঝিবার ভ্রম। আমাদের দ্বারা কোন অন্যায় কার্য্য

হওয়া অসম্ভব।' এই সকল লোককে পরীক্ষা করিবার উপায় কি? উপায় এই, —

যদিও সদসৎ উভয়ই আত্মার খণ্ড প্রকাশমাত্র, তথাপি অসদ্ভাবই আত্মার বাহ্য আবরণ, আর 'সৎ' ভাব—মানুষের প্রকৃত স্বরূপ যে আত্মা, তাঁহার অপেক্ষাকৃত নিকটতম আবরণ। যতদিন না মানুষ 'অসৎ'এর স্তর ভেদ করিতে পারিতেছেন, ততদিন তিনি সতের স্তরে পঁহুছিতেই পারিবেন না, আর যতদিন না তিনি সদসৎ উভয় স্তর ভেদ করিতে পারিতেছেন, ততদিন তিনি আত্মার নিকট পঁহুছিতে পারিবেন না। আত্মার নিকট পঁহুছিলে তাঁহার কি অবশিষ্ট থাকে? অতি সামান্য কর্ম্ম ভূত জীবনের কার্য্যের অতি সামান্য বেগই অবশিষ্ট থাকে, কিন্তু এ বেগ—শুভকর্ম্মেরই বেগ। যত দিন না অসদ্বেগ একেবারে রহিত হইয়া যাইতেছে, যতদিন না পূর্ব্ব অপবিত্রতা একেবারে দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, ততদিন কোন ব্যক্তির পক্ষে সত্যকে প্রত্যক্ষ এবং উপলব্ধি করা অসম্ভব। সুতরাং, যিনি আত্মার নিকট পৌঁছিয়াছেন, যিনি সত্যকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহার কেবল ভূত-জীবনের শুভ সংস্কার, শুভ বেগগুলি অবশিষ্ট থাকে। শরীরে বাস করিলেও এবং অনবরত কর্ম্ম করিলেও তিনি কেবল সৎকর্ম্ম করেন; তাঁহার মুখ সকলের প্রতি কেবল আশীর্ব্বচন বর্ষণ করে, তাঁহার হস্ত কেবল সৎকার্য্যই করিয়া থাকে, তাঁহার মন কেবল সৎ চিন্তা করিতেই সমর্থ; তাঁহার উপস্থিতিই, তিনি যেখানেই যান না কেন, সর্ব্বত্রই মানবজাতির মহাকল্যাণকর। এরূপ ব্যক্তি দ্বারা কোন অসৎ কর্ম্ম কি সম্ভব? তোমাদের স্মরণ রাখা উচিত, 'প্রত্যক্ষানুভূতি' এবং 'শুধু মুখে বলার' ভিতর বিস্তর তফাত। অজ্ঞান ব্যক্তিও নানা জ্ঞানের কথা কহিয়া থাকে। তোতাপক্ষীও এইরূপ বকিয়া থাকে। মুখে বলা এক, আর উপলব্ধি আর এক। দর্শন, মতামত, বিচার, শাস্ত্র, মন্দির, সম্প্রদায় প্রভৃতি কিছু মন্দ নয়, কিন্তু এই প্রত্যক্ষানুভূতি হইলে ও-সব আর থাকে না। মানচিত্র অবশ্য উপকারী, কিন্তু মানচিত্রে অঙ্কিত দেশ স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়া, তার পর আবার সেই মানচিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত কর, তখন তুমি কত প্রভেদ দেখিতে পাও। সুতরাং যাহারা সত্য উপলব্ধি করিয়াছে, তাহাদিগকে আর উহা বুঝিবার ন্যায়যুক্তি তর্কবিতর্ক প্রভৃতির আশ্রয় লইতে হয় না। তাহাদের পক্ষে উহা তাহাদের অন্তরাত্মার মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়াছে। প্রত্যক্ষেরও

প্রত্যক্ষ হইয়াছে। বেদান্তবাদীদের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, উহা যেন তাহার করামলকবৎ হইয়াছে। প্রত্যক্ষ উপলব্ধিকারীরা অসঙ্কুচিতচিত্তে বলিতে পারেন, 'এই যে, আত্মা রহিয়াছেন।' তুমি তাঁহাদের সহিত যতই তর্ক কর না কেন, তাঁহারা তোমার কথায় হাসিবেন মাত্র, তাঁহারা উহা আবোল তাবোল বাক্য বলিয়া মনে করিবেন। শিশু যা তা বলুক না কেন, তাঁহারা তাহাতে কোন কথা কহেন না। তাঁহারা সত্য উপলব্ধি করিয়া "ভরপুর" হইয়া আছেন। মনে কর, তুমি একটী দেশ দেখিয়া আসিয়াছ, আর একজন ব্যক্তি তোমার নিকট আসিয়া এই তর্ক করিতে লাগিল যে, ঐ দেশের কখন অস্তিত্বই ছিল না; এইরূপ সে ক্রমাগত তর্ক করিয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহার প্রতি তোমার মনের ভাব এইরূপ হইবে যে, সে ব্যক্তি বাতুলালয়ের উপযুক্ত। এইরূপ যিনি ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি বলেন, "জগতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্মের কথা কেবল বালকের কথা মাত্র। প্রত্যক্ষানুভূতি ধর্ম্মের সার-কথা।" ধর্ম্ম উপলব্ধি করা যাইতে পারে। প্রশ্ন এই, তুমি কি প্রস্তুত আছ? তোমার কি ধর্ম্মের আবশ্যক আছে? যদি তুমি যথার্থ চেষ্টা কর, তবে তোমার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইবে, তখনই তুমি প্রকৃত পক্ষে ধার্ম্মিক হইবে। যতদিন না তোমার এই উপলব্ধি হইতেছে, ততদিন তোমাতে এবং নাস্তিকে কোন প্রভেদ নাই। নাস্তিকেরা তবু অকপট, কিন্তু যে বলে 'আমি ধর্ম্মবিশ্বাস করি', অথচ কখন উহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করে না, সে অকপট নহে।

তার পরের প্রশ্ন এই—এই উপলব্ধির পরে কি হয়? মনে কর, আমরা জগতের এই অখণ্ড ভাব (আমরাই যে, সেই একমাত্র অনন্ত পুরুষ, তাহা) উপলব্ধি করিলাম; মনে কর, আমরা জানিতে পারিলাম, আত্মাই একমাত্র আছেন, আর তিনিই বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পাইতেছেন; এইরূপ জানিতে পারিলে তার পর আমাদের কি হয়? তাহা হইলে আমরা কি নিশ্চেষ্ট হইয়া এক কোণে বসিয়া মরিয়া যাইব? জগতে ইহা দ্বারা কি উপকার হইবে? সেই প্রাচীন প্রশ্ন আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া! প্রথমতঃ, উহা দ্বারা জগতের উপকার হইবে কেন? ইহার কি কোন যুক্তি আছে? লোকের এই প্রশ্ন করিবার কি অধিকার আছে, 'ইহাতে জগতের কি উপকার হইবে?' ইহার অর্থ কি? ছোট ছেলে মিষ্ট দ্রব্য ভাল বাসে।

মধ্যে যাহা শ্রেয়ঃ, তাহা আমাকে বল, এই প্রকার অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলে পর ভগবান এইপ্রকার নির্ণয় করিয়াছেন যে, জ্ঞানী সন্ন্যাসীগণের মোক্ষপ্রাপ্তি কেবল জ্ঞানযোগের দ্বারাই হয়, কর্ম্মযোগীগণের মোক্ষপ্রাপ্তির প্রতি প্রথম কারণ কর্ম্মযোগ (কর্ম্মযোগদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে তাহারা জ্ঞানলাভে সমর্থ হইয়া মোক্ষলাভ করিতে পারে), "নচ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি" (কেবল সংন্যাসের দ্বারাই সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না) এই প্রকার বাক্যের দ্বারাও ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, জ্ঞানের সহিত সন্ন্যাসই সিদ্ধির কারণ (এবং জ্ঞানের উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ম্মযোগই কর্ত্তব্য)। ইহার প্রকৃত বিবেক অবধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া অর্জ্জুন "জ্ঞানরহিত সংন্যাস শ্রেয়ঃ কিংবা কর্ম্মযোগ শ্রেয়ঃ, ইহাই জানিবার ইচ্ছায় বলিতেছেন যে, সংন্যাসমিত্যাদি। "সংন্যাস" অর্থাৎ শাস্ত্রীয় কতকগুলি বিশেষ কর্ম্মের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ, (তাহাই করিবার উপদেশ দিতেছ, অথচ আবার সেই সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান যে অবশ্যকর্ত্তব্য, তাহাও বলিতেছ, সুতরাং এই দুইটীর মধ্যে কোনটী শ্রেয়ঃ (অর্থাৎ কর্ম্ম শ্রেয়ঃ কিংবা কর্ম্ম পরিত্যাগ করা শ্রেয়ঃ (এইরূপ সংশয় হইতেছে; দুইটী উপায়ের মধ্যে যাহা উৎকৃষ্টতর, তাহারই অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য, অতএব কর্ম্মসংন্যাস ও কর্ম্মযোগ এই দুইটীর মধ্যে যাহা উৎকৃষ্টতর অর্থাৎ যাহার অনুষ্ঠান করিলে আমার শ্রেয়োলাভ হয়, তাহাই তুমি নিশ্চয় করিয়া, তোমার যাহা অভিলষিত, তাহা বল, কারণ এই দুইটী উপায় এককালে একটী পুরুষের অনুষ্ঠেয় হইতে পারে না॥ ১॥

শ্রীভগবানুবাচ। - সংন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥২॥

অন্বয়।—সংন্যাসঃ কর্ম্মযোগঃ চ (ইতি) উভৌ (যদ্যপি) নিঃশ্রেয়সকরৌ তু (তথাপি) তয়োঃ মধ্যে সংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥২॥

মূলানুবাদ।—সংন্যাস এবং কর্ম্মযোগ এই দুইটীই মোক্ষসাধন, কিন্তু এই দুইটীর মধ্যে কর্ম্মযোগই সংন্যাস হইতে উৎকৃষ্টতর। ২॥

ভাষ্য।—স্বাভিপ্রায়মাচক্ষাণো নির্ণয়ায় (শ্রীভগবানুবাচ) সংন্যাসঃ কর্ম্মণাং পরিত্যাগঃ কর্ম্মযোগশ্চ তেষামনুষ্ঠানং তাবুভাবপি নিঃশ্রেয়সকরৌ নিঃশ্রেয়সং মোক্ষং কুর্ব্বাতে জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বেন উভৌ যদ্যপি নিঃশ্রেয়সকরৌ তথাপি তয়োস্তু নিঃশ্রেয়সহেত্বোঃ কর্ম্মসংন্যাসাৎ কেবলাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যত ইতি কর্ম্মযোগং স্তৌতি॥ ২॥

ভাষ্যানুবাদ।—অর্জ্জুনের নিশ্চয় উৎপন্ন করিবার জন্য নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া ভগবান্ বলিতেছেন যে, সংন্যাস (অর্থাৎ) কতকগুলি বিহিত কর্ম্মের পরিত্যাগ এবং কর্ম্মযোগ অর্থাৎ সেই কতকগুলি কর্ম্মের অনুষ্ঠান, এই দুইটী উপায়ই নিঃশ্রেয়সকর, (অর্থাৎ) জ্ঞানের উৎপত্তির প্রতি কারণ, এই জন্য মোক্ষের পরম্পরায় সাধন স্বরূপ হইয়া থাকে, তথাপি মোক্ষের কারণ এই দুইটীর মধ্যে জ্ঞানহীন কর্ম্মসংন্যাস হইতে কর্ম্মযোগই বিশিষ্ট অর্থাৎ উৎকৃষ্ট এই বাক্যের দ্বারা কর্ম্মযোগের স্তুতি করা হইতেছে ॥ ২ ॥

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসংন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩॥

অন্বয়।—স (কর্ম্মযোগী নিত্যসন্ন্যাসী (ইতি) জ্ঞেয়ঃ, যঃ ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি, হি (যস্মাৎ) নির্দ্বন্দ্বঃ হে মহাবাহো, সুখং (অনায়াসেন) বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদ।—যাহার দ্বেষ বা আকাঙ্ক্ষা নাই, সে ব্যক্তি কর্ম্মযোগী হইলেও তাহাকে নিত্যসংন্যাসী বলিয়াই জানিবে, কারণ হে মহাবাহো, যে ব্যক্তি অভিলাষ ও দ্বেষ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব হইতে বিমুক্ত, সে অনায়াসেই সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

ভাষ্য।—কস্মাদিত্যাহ জ্ঞেয়ইতি জ্ঞেয়ো জ্ঞাতব্যঃ স কর্ম্মযোগী নিত্যসংন্যাসীতি যো ন দ্বেষ্টি কিঞ্চিন্ন কাঙ্ক্ষতি দুঃখসুখে তৎসাধনে চ এবম্বিধো যঃ কর্ম্মণি বর্ত্তমানোঽপি স নিত্যসংন্যাসীতি জ্ঞাতব্য ইত্যর্থঃ। নির্দ্বন্দ্বঃ দ্বন্দ্ববর্জ্জিতোহি যস্মাৎ মহাবাহো সুখং বন্ধাদনায়াসেন প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—কেন এই প্রকার বলা হইল, তাহার কারণ বলা যাইতেছে যে, জ্ঞেয় ইত্যাদি, জ্ঞেয় (এই শব্দটীর অর্থ) জ্ঞাতব্য (অর্থাৎ) সেই কর্ম্মযোগীকেও নিত্যসন্ন্যাসী বলিয়া জানিবে (কাহাকে তাহাই বলা যাইতেছে) যে ব্যক্তি দুঃখ ও তাহার সাধনের উপায়ে দ্বেষ করে না এবং সুখ ও তাহার সাধনে যাহার আকাঙ্ক্ষা নাই, এই প্রকার ব্যক্তি কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও সে নিত্যসংন্যাসী ইহা জানিবে। হে মহাবাহো, যে ব্যক্তি নির্দ্বন্দ্ব অর্থাৎ দ্বন্দ্ববর্জ্জিত, সেই সুখে (অর্থাৎ) অনায়াসে সংসারবন্ধ হইতে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়। ৩ ॥

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।

একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্ব্বিন্দতে ফলম্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়।—বালাঃ (এব) সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ বদন্তি ন পণ্ডিতাঃ। একমপি উভয়োরাস্থিতঃ সম্যক্ ফলং বিন্দতে।৪।

মূলানুবাদ।—যাহারা অনভিজ্ঞ, তাহারাই সাংখ্য ও যোগকে পৃথক্ বলিয়া থাকে, কিন্তু পণ্ডিতগণ বলেন না; এই সাংখ্য ও যোগের মধ্যে যে কোন একটীরও অনুষ্ঠান করিলে সম্যগ্ ফল লাভ করিতে পারা যায়। ৪ ॥

ভাষ্য।—সংন্যাসকর্ম্মযোগয়োর্ভিন্নপুরুষানুষ্ঠেয়য়োঃ ফলেঽপি বিরোধো যুক্তোনতূভয়োর্নিঃশ্রেয়সকরত্বমবেতিপ্রাপ্তইদমুচ্যতে। সাংখ্যযোগাবিতি সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ বিরুদ্ধফলৌ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ। পণ্ডিতাস্তু জ্ঞানিন একং ফলমবিরুদ্ধমিচ্ছন্তি। কথং একমপি সাংখ্যযোগয়োঃ সম্যগাস্থিতঃ সম্যগনুষ্ঠিতবান্ ইত্যর্থঃ। উভয়োর্বিন্দতে ফলমুভয়োস্তদেব হি নিঃশ্রেয়সং ফলমতোন ফলে বিরোধোঽস্তি। নন্ন সংন্যাসকর্ম্মযোগশব্দেন প্রস্তুত্য সাংখ্যযোগশব্দয়োঃ ফলৈকত্বং কথমিহাপ্রকৃতং ব্রবীতি? নৈষদোষঃ যদ্যপ্যর্জ্জুনেন সংন্যাসং কর্ম্মযোগঞ্চ কেবলমভিপ্রেত্য প্রশ্নঃ কৃতো ভগবাংস্তু তদপরিত্যাগেন স্বাভিপ্রেতং চ বিশেষং সংযোজ্য শব্দান্তরবাচ্যতয়া প্রতিবচনং দদৌ সাংখ্যযোগাবিতি। তাবেব সংন্যাসকর্ম্মযোগৌ জ্ঞানতদুপায়সমবুদ্ধিত্বাদিসংযুক্তৌ সাংখ্যযোগশব্দবাচ্যৌ ইতি ভগবতোমতমিতি নাপ্রকৃতপ্রক্রিয়া। ৪।

ভাষ্যানুবাদ।—সংন্যাস ও কর্ম্মযোগ এই দুইটী একলালে একই পুরুষের অনুষ্ঠেয় হইতে পারে না, এই কারণ এই দুইটী যেমন পরস্পর বিরুদ্ধ, এইরূপ এই দুইটী উপায়ের ফলও পরস্পর বিরুদ্ধ হওয়া উচিত, এই দুইটী উপায়ের ফল যে একই মোক্ষ হইবে, ইহা কখনও সম্ভবপর নহে, এই প্রকার শঙ্কা উপস্থিত হইলে, তাহার নিবারণ করিবার জন্য এই বলা যাইতেছে যে, সাংখ্যযোগাবিতি। অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণই বলিয়া থাকে যে, সাংখ্য ও যোগ পৃথক্, (অর্থাৎ) ইহাদের ফল পরস্পর বিরুদ্ধ, কিন্তু পণ্ডিতগণ এ প্রকার বলেন না, তাহারা এই উভয় উপায় দ্বারা একই ফলকে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন। কেন (এমন হয় তাহাই বলা যাইতেছে যে) সাংখ্য ও যোগ এই উভয়ের মধ্যে সম্যক্ প্রকারে একটীরও অনুষ্ঠান করিলে, উভয়ের যাহা ফল তাহাই লাভ করিতে পারা যায়। সাংখ্য ও যোগ এই উভয়েরই ফল মোক্ষ একরূপ। সুতরাং এই উপায়দ্বয়ের ফলে কোন প্রকার বিরোধ নাই। এইস্থলে এই

প্রকার আশঙ্কা হইতে পরে যে, সংন্যাস ও কর্ম্মযোগ শব্দের দ্বারা সাংখ্য ও যোগের প্রস্তাব করিয়া এই দুইটীর ফলের একতা এক্ষণে কেন অপ্রকৃত-ভাবে প্রতিপাদন করিতেছেন? ইহার উত্তর এই হইতেছে যে, এই প্রকার দোষ হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ যদ্যপি অর্জ্জুন কেবল সংন্যাস ও কর্ম্মযোগের অভিপ্রায় করিয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ভগবান্ কিন্তু তাহা পরিত্যাগ না করিয়া তাহাতে নিজের অভিপ্রেত পদার্থ বিশেষের সংযোজন পূর্ব্বক শব্দান্তরের দ্বারা প্রতিপাদন করিয়া সাংখ্যযোগাবিত্যাদি বচনের দ্বারা প্রতিবচন দিয়াছেন। সেই সংন্যাস ও কর্ম্মযোগ, জ্ঞান এবং জ্ঞানের উপায় সমবুদ্ধিত্বাদির সহিত যুক্ত হইলে সাংখ্য ও যোগ শব্দের বাচ্য হইয়া থাকে ইহাই ভগবানের মত, সুতরাং এই স্থলে কোন প্রকার অপ্রাসঙ্গিক বলা হয় নাই॥ ৪॥

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যং চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ ৫॥

অন্বয়।—সাংখ্যৈর্যৎস্থানং প্রাপ্যতে, তৎ যোগৈরপি গম্যতে, সাংখ্যং যোগঞ্চ একং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ ৫॥

মূলানুবাদ।—জ্ঞাননিষ্ঠসংন্যাসীগণও যে স্থান প্রাপ্ত হন, ফলাভিসন্ধান-বর্জ্জিত কর্ম্মযোগীগণও সেই স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সাংখ্য ও যোগ এই দুইটী উপায়কে যে ব্যক্তি এক বলিয়া জানে, সেই যথার্থ বস্তু দর্শন করিয়া থাকে॥ ৫॥

ভাষ্য। একস্যাপি সম্যগনুষ্ঠানাৎ কথমুভয়োঃ ফলং বিন্দত ইত্যুচ্যতে যদিতি। যৎ সাংখ্যৈর্জ্ঞাননিষ্ঠৈঃ সংন্যাসিভিঃ প্রাপ্যতে স্থানং মোক্ষাখ্যং, তদ্‌যোগৈরপি জ্ঞানপ্রাপ্ত্যুপায়ত্বেন ঈশ্বরে সমর্প্য কর্ম্মাণি আত্মনঃ ফলমনভিসন্ধায় অনুতিষ্ঠন্তি যে তে যোগিনঃ, তৈরপি পরমার্থজ্ঞানসংন্যাসপ্রাপ্তি-দ্বারেণ গম্যত ইত্যভিপ্রায়ঃ, অত একং সাংখ্যং যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি ফলৈ-কত্বাৎ স সম্যক্ পশ্যতি ইত্যর্থঃ॥ ৫॥

ভাষ্যানুবাদ।—একটীরই সম্যক্ প্রকারে অনুষ্ঠান করিলে, উভয়েরই ফল লাভ করে, তাহা বলা যাইতেছে, যে যদিত্যাদি। সাংখ্য (অর্থাৎ) জ্ঞাননিষ্ঠ সংন্যাসীগণ, যে মোক্ষ নামক স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা যোগের দ্বারাও লব্ধ হয়। জ্ঞানপ্রাপ্তির উপায়, এই কারণ ঈশ্বরে কর্ম্মের অর্পণ করিয়া এবং নিজের ফলাভিসন্ধান না করিয়া, যাহারা কর্ম্মানুষ্ঠান

করে, তাহারাই যোগী, সেই যোগীগণ এই যোগের দ্বারা পরমার্থজ্ঞান ও সংন্যাস লাভ করিয়া ক্রমে মোক্ষফল লাভ করিয়া থাকে। ইহাই অভিপ্রায়। এই কারণেই (বলা হইয়াছে যে,) সাংখ্য ও যোগ এই দুইটীকে যে একই বলিয়া জানে অর্থাৎ এই দুইটীর একই ফল, এই প্রকার জানে, সেই সম্যক্ জ্ঞানবান্ হয়। ইহাই অর্থ ॥ ৫ ॥

সংন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তোমুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬ ॥

অন্বয়।—হে মহাবাহো, সংন্যাসঃ অযোগতঃ (যোগং বিনা) তু (কেবলং) দুঃখমাপ্তুং (ভবতি), যোগযুক্তো মুনিঃ ন চিরেণ (পরং) ব্রহ্ম অধিগচ্ছতি ॥ ৬ ॥

মূলানুবাদ।—হে মহাবাহো, যোগব্যতিরেকে সংন্যাসাশ্রম কেবল দুঃখলাভের হেতু হইয়া থাকে। যোগযুক্তমুনি শীঘ্রই পরব্রহ্মের স্বরূপ নিশ্চয় করিতে সমর্থ হয় ॥ ৬ ॥

ভাষ্য।—এবং তর্হি যোগাৎ সংন্যাস এব বিশিষ্যতে, কথং তর্হি ইদমুক্তং তয়োস্তু কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ইতি। শৃণু তত্র কারণং; ত্বয়া পৃষ্টং কেবলং কর্ম্মসংন্যাসং কর্ম্মযোগঞ্চাভিপ্রেত্য তয়োরন্যতরঃ কঃ শ্রেয়ান্? তদনুরূপং প্রতিবচনং ময়োক্তং কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যত ইতি জ্ঞানমনপেক্ষ্য। জ্ঞানাপেক্ষস্তু সংন্যাসঃ সাংখ্যমিতি ময়া অভিপ্রেতঃ। পরমার্থযোগশ্চ স এব। যস্তু কর্ম্মযোগো বৈদিকঃ স তাদর্থ্যাৎ যোগঃ সংন্যাস ইতি চোপচর্য্যতে কথং তাদর্থ্যমিত্যুচ্যতে ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—এই প্রকারই যদি হয় তাহা হইলে যোগ হইতে সংন্যাসই ত উৎকৃষ্ট হইয়া উঠিল। কেন তবে বলা হইয়াছে যে, "সেই উভয়ের মধ্যে কর্ম্মসংন্যাস হইতে কর্ম্মযোগই উৎকৃষ্ট?" কেন এই প্রকার বলা হইয়াছে, তাহার কারণ শুন। তুমি কেবল (অর্থাৎ) জ্ঞানরহিত কর্ম্মসংন্যাস এবং কর্ম্মযোগ এই দুইটীকে মনে করিয়া, তাহাদের মধ্যে কোন্‌টী উৎকৃষ্ট তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহারই অনুরূপ প্রতিবচনও আমি বলিয়াছি যে, কর্ম্মসংন্যাস হইতে কর্ম্মযোগ উৎকৃষ্ট। জ্ঞানকে অপেক্ষা না করিয়াই, আমি সংন্যাস হইতে কর্ম্মযোগের উৎকৃষ্টত্ব বর্ণন করিয়াছি। জ্ঞানের উদয় হইলে যে সংন্যাস হয়, তাহাই সাংখ্য, ইহাই আমার অভিপ্রেত। সেই সংন্যাসকেই পরমার্থ-যোগ কহা যায়। যে কর্ম্মযোগ বেদবিহিত, তাহাও সেই

পরমার্থ-কর্ম্মযোগ-প্রাপ্তির উপায়, এই জন্যই তাহাকেও কর্ম্মযোগ ও সংন্যাস-শব্দের দ্বারা লক্ষণাবৃত্তির সাহায্যে প্রতিপাদন করা গিয়াছে। কেন কর্ম্মযোগ সংন্যাসপ্রাপ্তির কারণ, তাহা বলা যাইতেছে॥ ৬॥

ভাষ্য।—সংন্যাসস্তু পারমার্থিকো দুঃখমাপ্তুমযোগতো যোগেন বিনা, যোগযুক্তো বৈদিকেন কর্ম্মযোগেন ঈশ্বরসমর্পিতরূপেণ ফলনিরপেক্ষেণ যুক্তো মুনির্মননাদীশ্বরস্বরূপস্য মুনির্ব্রহ্মপরমার্থজ্ঞাননিষ্ঠত্বাৎ প্রকৃতঃ সংন্যাসো ব্রহ্মোচ্যতে, "ন্যাস ইতি ব্রহ্মা", "ব্রহ্মা হি পর" ইতি শ্রুতেঃ ব্রহ্মপরমার্থ-সংন্যাসং পরমাত্মজ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণং নচিরেণ ক্ষিপ্রমেবাধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি, অতো ময়োক্তং কর্ম্মযোগো বিশিষ্যত ইতি॥ ৬॥

ভাষ্যানুবাদ।—যোগ না হইলে পারমার্থিক সংন্যাস কেবল দুঃখপ্রাপ্তিরই কারণ হইয়া থাকে। যোগযুক্তঃ (অর্থাৎ) ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত, ঈশ্বর-সমর্পিত, বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান রূপ যোগ যাহার আছে, সেই যোগযুক্ত এবং মুনি অর্থাৎ ঈশ্বরের মননকর্ত্তা যে ব্যক্তি, সে অতিশীঘ্রই পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আত্মজ্ঞানেরই স্বরূপ সংন্যাস, এই কারণে এই স্থানে পরব্রহ্ম-শব্দের দ্বারা সংন্যাসই প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে যে, ন্যাস (অর্থাৎ) সংন্যাসই ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মাই পর (শব্দের প্রতিপাদ্য), এই কারণেই বলিয়াছি যে কর্ম্মযোগই (জ্ঞানরহিত সংন্যাস হইতে) উৎকৃষ্ট॥ ৬॥

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে॥ ৭॥

অন্বয়।—(যঃ) যোগযুক্তঃ বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা (সঃ) কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে॥ ৭॥

মূলানুবাদ।—যে ব্যক্তি যোগযুক্ত, বিশুদ্ধাত্মা, বিজিতাত্মা, জিতেন্দ্রিয় ও সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা, সে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও লিপ্ত হয় না॥ ৭॥

ভাষ্য।—যদা পুনঃ সম্যগ্দর্শনপ্রাপ্ত্যুপায়ত্বেন যোগেন যুক্তো যোগ-যুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিশুদ্ধসত্ত্বো বিজিতাত্মা বিজিতদেহো জিতেন্দ্রিয়শ্চ সর্ব্বভূতাত্ম-ভূতাত্মা সর্ব্বেষাং ব্রহ্মাদীনাং স্তম্বপর্য্যন্তানাং ভূতানামাত্মভূত আত্মা সম্যগ্দর্শী ইত্যর্থঃ। স তত্রৈবং বর্ত্তমানো লোকসংগ্রহায় কর্ম্ম কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ন কর্ম্মভির্বধ্যত ইত্যর্থঃ॥ ৭॥

ভাষ্যানুবাদ।—যেকালে এই (সাধক) সম্যগ্দর্শন প্রাপ্তির উপায়

পূর্ব্বোক্ত যোগের অনুষ্ঠাতা (ইহাই যোগযুক্ত শব্দের অর্থ), (যে ব্যক্তি) বিশুদ্ধাত্মা (অর্থাৎ) বিশুদ্ধসত্ত্ব, (যে ব্যক্তি) বিজিতাত্মা (অর্থাৎ) বশীকৃতদেহ এবং জিতেন্দ্রিয়, (যে ব্যক্তি) সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা (অর্থাৎ) ব্রহ্ম হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত সকল ভূতের আত্মাই যাহার আত্মা হইয়াছে, অর্থাৎ যে ব্যক্তি সম্যগ্ জ্ঞানবান, সেই ব্যক্তি এইরূপ হইয়াও কেবল লোকসংগ্রহের জন্য কর্ম্ম করিলেও লিপ্ত হয় না, অর্থাৎ কর্ম্ম দ্বারা বদ্ধ হয় না॥ ৭॥

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্॥ ৮॥
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্ উন্মিষন্ নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন॥ ৯॥

অন্বয়।—তত্ত্ববিৎ যুক্তঃ পশ্যন শৃণ্বন জিঘ্রন্ অশ্নন্ স্বপন শ্বসন প্রলপন উন্মিষন্ নিমিষন অপি ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্তে ইতি ধারয়ন নৈব কিঞ্চিৎ করোমি ইতি মন্যেত॥ ৮।৯॥

মূলানুবাদ।—দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, ভোজন, গমন, স্বপ্ন, শ্বাস, প্রলাপ, বিসর্গ, গ্রহণ, উন্মেষ ও নিমেষ প্রভৃতি কার্য্য করিয়াও তত্ত্বজ্ঞানী যুক্তব্যক্তি বিবেচনা করিয়া থাকে যে, ইন্দ্রিয় সকল (স্বভাবের বশে) ইন্দ্রিয়ার্থে প্রবৃত্ত হইতেছে, (আমার ইহাতে কোন বিকার নাই), সুতরাং ইহাই ভাবিবে যে, আমি কিছুই করিতেছি না॥ ৮।৯॥

ভাষ্য।— ন চাসৌ পরমার্থতঃ করোতি, অতঃ নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তঃ সমাহিতঃ সন মন্যেত চিন্তয়েৎ। তত্ত্ববিদ্ আত্মনো যাথাত্ম্যং তত্ত্বং বেত্তি ইতি তত্ত্ববিৎ পরমার্থদর্শী ইত্যর্থঃ। কদা কথং বা তত্ত্বমবধারয়ন্ মন্যেত ইত্যুচ্যতে, মন্যেতেতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। যস্যৈবং তত্ত্ববিদঃ সর্ব্বকার্য্যকরণচেষ্টাসু কর্ম্মসু অকর্ম্মৈব পশ্যতঃ সম্যগ্‌দর্শিনস্তস্য সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাস এবাধিকারঃ কর্ম্মণোঽভাবদর্শনাৎ। নহি মৃগতৃষ্ণায়াং উদকবুদ্ধ্যাপানায় প্রবৃত্ত উদকাভাবজ্ঞানেঽপি তত্রৈব পানপ্রয়োজনায় প্রবর্ত্ততে॥ ৮।৯॥

ভাষ্যানুবাদ।—এই তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি পরমার্থতঃ কোন কার্য্যই করে না, এই জন্য তত্ত্ববিৎ (অর্থাৎ) পরমার্থদর্শী সমাহিতচেতা হইয়া চিন্তা করিবে যে, আমি কিছুই করি না; আত্মার যাথাত্ম্য যে ব্যক্তি জানে, তাহাকেই তত্ত্ববিৎ বলা যায়। কখন, কোন সময়ে, আত্মার তত্ত্ব অবধারণ পূর্ব্বক এইভাবে

বিচার করিবে, তাহাই বলা যাইতেছে যে ; এই শ্লোকেও অন্তে এই ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ আছে। যে ব্যক্তি এই প্রকার তত্ত্ববিদ্ (অর্থাৎ) সকল প্রকার কার্য্য ও করণের চেষ্টাতে যে ব্যক্তি অকর্ম্ম ব্রহ্মের স্বরূপ দর্শন করিয়া থাকে, সেই সম্যগ্দর্শীর সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসেই অধিকার আছে, কারণ তাহার কর্ম্মের অভাব দর্শন হইয়াছে। যে ব্যক্তি মৃগতৃষ্ণায় জলভ্রান্তিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহার পরে তাহাতে জলের অভাব জ্ঞান হইলে, তাহাতেই আবার তাহার পানাদি প্রয়োজনের জন্য প্রবৃত্তি কখনও সম্ভবপর নহে ॥ ৮ ৯ ॥

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ ১০ ॥

অন্বয়।—যঃ ব্রহ্মণি আধায় সঙ্গং ত্যক্ত্বা কর্ম্মাণি করোতি, সঃ অম্ভসা পদ্মপত্রমিব পাপেন ন লিপ্যতে ॥ ১০ ॥

মূলানুবাদ।—যে ব্যক্তি ঈশ্বরে নিক্ষেপ করিয়া সঙ্গত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সে পাপে লিপ্ত হয় না, যেমন পদ্মপত্র জলে লিপ্ত হয় না। ১০ ॥

ভাষ্য।—যস্তু পুনরতত্ত্ববিৎ প্রবৃত্তশ্চ কর্ম্মযোগে ব্রহ্মণি ঈশ্বরে আধায় নিক্ষিপ্য, তদর্থং করোমীতি ভৃত্যইব স্বাম্যর্থং সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি মোক্ষেঽপি ফলে সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি, লিপ্যতে ন স পাপেন সম্বধ্যতে পদ্মপত্রমিব অম্ভসা উদকেন ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে নাই, অথচ কর্ম্মযোগে প্রবৃত্ত, সে ব্যক্তি ব্রহ্মে (অর্থাৎ) ঈশ্বরে নিক্ষেপ করিয়া, মোক্ষরূপ ফলেতেও সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, (ও) সে পাপের দ্বারা লিপ্ত হয় না, যেমন পদ্মপত্র জলের দ্বারা লিপ্ত হয় না ॥ ১০ ॥

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥ ১১ ॥

অন্বয়।—যোগিনঃ সঙ্গং ত্যক্ত্বা আত্মশুদ্ধয়ে কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদ।—যোগিগণ আসক্তি পরিহার করিয়া চিত্তশুদ্ধির জন্য, দেহ, মন, বুদ্ধি ও কেবল ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে ॥ ১১ ॥

পরমহংসদেবের উপদেশ।

(স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রদত্ত)

১। আমি ছেলেদের এত ভালবাসি কেন জান? ছেলেবেলা তাদের মন ষোল আনা নিজের কাছে থাকে, ক্রমে ভাগ হয়ে পড়ে। বে হলে আট আনা স্ত্রীর উপর যায়, ছেলে হলে আবার চার আনা তাদের প্রতি যায়, বাকী চার আনা মা, বাপ, মান সম্ভ্রম, বেশভুষা ইত্যাদিতে চলে যায়; এই জন্য ছেলেবেলায় যারা ঈশ্বর লাভের চেষ্টা করে, তারা সহজে তাঁকে লাভ করতে পারবে। বুড়োদের হওয়া বড় কঠিন।

২। যেমন টীয়া পাখীর গলায় কাঁটী উঠলে আর পড়ে না, ছানা বেলায় শেখালে শীঘ্র পড়ে, তেমনি বুড়ো হলে সহজে ঈশ্বরে মন যায় না, ছেলে বেলায় তাদের মন অল্পেতেই স্থির হয়।

৩। যেমন কচি বাঁশ অতি সহজে নোয়ান যায়, পাকা বাঁশ নোয়াতে গেলে ভেঙ্গে যায়, তেমনি ছেলেদের মন সহজে ঈশ্বরে নিয়ে যাওয়া যায়; কিন্তু বুড়োদের মন ঈশ্বরের দিকে টানতে গেলে ছেড়ে পালায়।

৪। এক সের দুধে এক ছটাক জল থাকলে, সহজে অল্প জ্বাল দিয়ে ক্ষীর করা যায়, কিন্তু একসের দুধে তিন পোয়া জল থাকলে সহজে ক্ষীর হয় না, অনেক কাট খড় পুড়িয়ে জ্বাল দিতে হয়, তবে হয়; সেই রকম বালকের মনে বিষয় বাসনা খুব কম, এইজন্য একটুতে ঈশ্বরের দিকে যায়, কিন্তু বুড়োদের মনে বিষয় বাসনা গজ গজ করে, তাইতে তাদের মন সহজে তাঁর দিকে যায় না।

৫। মানুষের মন যেন সরসের পুঁটলী। সরসের পুঁটলী একবার ছড়িয়ে গেলে যেমন কুড়ান ভার হয়ে ওঠে, তেমনি মানুষের মন একবার সংসারে ছড়িয়ে গেলে, তখন স্থির করা বড় কঠিন হয়ে পড়ে। বালকের মন ছড়ায় নি, অল্পেতেই স্থির হয়, কিন্তু বুড়োদের ষোল আনা মন সংসারে ছড়িয়ে রয়েছে, সংসার থেকে মন তুলে ঈশ্বরে স্থির হওয়া বড় শক্ত।

—— ——

প্রীতি উপহার।

(শ্রীযুক্ত গিরীশ চন্দ্র ঘোষ।)

সম্পদে বিপদে মতি অটল যাহার,—
ধনমদে নহে মত্ত, সত্য তার মনুষ্যত্ব,
তুষ্ট-রুষ্ট ভাষে মনে, না জন্মে বিকার,—
কার্য্য হেতু কার্য্যে রত, যেই জন মহাব্রত,
কার্য্যের বাসনা মাত্র কার্য্যে অধিকার—
ভুবন-তিলক,—জন্ম সার্থক তাহার!

ভাসমান এ সংসার রোদন-ধারায়,
যেই জন স্বার্থত্যাগী, পর দুঃখে হয়ে ভাগী,
অনাথ বিধবা অশ্রু যতনে মুছায়,—
দুর্জ্জন শাসনে বল, সুজনের শান্তি স্থল,
বুভুক্ষু, তাপিত, ভীত—আশ্রিত যথায়?
পর-ভার-বাহী তার তুলনা কোথায়?

বাল্য প্রেম, বাল্যবন্ধু, বাল্য-সংস্কার—
যেই জন উচ্চাসনে, বাল্যদিন রাখি মনে,
বাল্য-বন্ধু সনে করে বালক ব্যাভার,
সেইরূপ একান্তর, নাহি কভু ভাবান্তর,
নিরন্তর সরল নির্ম্মল প্রেম ধার,—
প্রেম পুষ্পে সুবাসিত হৃদয়-আগার!

সুধীর-সুজন-ব্রজ-নিয়ত-বেষ্টিত,
বহি গুরু রাজ্যভার, সদসদ্ সুবিচার,
প্রজার মঙ্গল ব্রত সতত যে চিত,—
প্রিয় পুত্র জননীর, স্বদেশ-বৎসল ধীর,
জয় জয় রাজ্যেশ্বর মহিমা-মণ্ডিত!
প্রীতি-পুলকিত নট করে স্তুতি-গীত॥

পরিব্রাজক।

স্বামী বিবেকানন্দ।]   [১৬ পৃষ্ঠার পর।

আজ ২৩শে অক্টোবর; কাল সন্ধ্যার সময় পারিস হতে বিদায়। এ বৎসর এ পারিস সভ্য জগতের এক কেন্দ্র, এ বৎসর মহা প্রদর্শনী। নানা দিক্ দেশ সমাগত সজ্জন সঙ্গম। দেশ দেশান্তরের মনীষিগণ নিজ নিজ প্রতিভা প্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তার করছেন, আজ্ এ পারিসে। এ মহা কেন্দ্রের ভেরী-ধ্বনি আজ যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, সে নাদ তরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বদেশকে সর্ব্বজন সমক্ষে গৌরবান্বিত করবে। আর আমার জন্মভূমি—এ জর্ম্মান্, ফরাসী, ইংরাজ, ইতালী প্রভৃতি বুধমণ্ডলী-মণ্ডিত মহারাজধানীতে তুমি কোথায়, বঙ্গভূমি? কে তোমার নাম নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে? সে বহু গৌরবর্ণ প্রাতিভ মণ্ডলীর মধ্য হতে এক যুবা যশস্বী বীর বঙ্গভূমির, আমাদের মাতৃভূমির, নাম ঘোষণা করলেন,—সে বীর জগৎপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে, সি, বোস। একা যুবা বাঙ্গালী বৈদ্যুতিক, আজ বিদ্যুৎবেগে পাশ্চাত্য মণ্ডলীকে নিজের প্রতিভা মহীমায় মুগ্ধ করলেন, সে বিদ্যুৎসঞ্চার মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবন তরঙ্গ সঞ্চার করলে। সমগ্র বৈদ্যুতিক মণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আজ জগদীশ বসু—ভারতবাসী, বঙ্গবাসী! ধন্য বীর! বসুজ ও তাঁহার সতী, সাধ্বী, সর্ব্বগুণ-সম্পন্না গেহিনী যে দেশে যান, সেথায়ই ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেন—বাঙ্গালীর গৌরব বর্দ্ধন করেন। ধন্য দম্পতী!

আর মিঃ লেগেট প্রভূত অর্থব্যয়ে তাঁর পারিসস্থ প্রাসাদে ভোজনাদি-ব্যপদেশে নিত্য নানা যশস্বী যশস্বিনী নর নারীর সমাগম সিদ্ধ করেছেন—তারও আজ শেষ।

কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, নৈতিক, সামাজিক, গায়ক, গায়িকা, শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী, চিত্রকর, শিল্পী, ভাস্কর, বাদক—প্রভৃতি নানা জাতের গুণীগুণ-সমাবেশ, মিষ্টর লেগেটের আতিথ্য সমাদর আকর্ষণে, তাঁর গৃহে। সে পর্ব্বত-নির্ঝরবৎ কথাচ্ছটা, অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ চতুর্দ্দিক্‌সমুত্থিত ভাববিকাশ, মোহিনী-সঙ্গীত, মনীষি-মনঃসংঘর্ষ-সমুত্থিত-চিন্তামন্ত্রপ্রবাহ, সকলকে দেশ কাল ভুলিয়ে মুগ্ধ করে রাখত,—তারও শেষ।

সকল জিনিসেরই অন্ত আছে। আর আজ আর একবার, পুঞ্জীকৃত-ভাবরূপ স্থির সৌদামিনী, এই অপূর্ব্ব ভূস্বর্গ-সমাবেশ পারিস্ একস্‌হিবিজন্, দেখে এলুম।

আজ দু তিন দিন ধরে পারিসে ক্রমাগত বৃষ্টি হচ্ছে। ফ্রান্সের প্রতি সদা সদয় সূর্য্যদেব আজ কদিন বিরূপ। নানাদিক্‌দেশাগত শিল্প শিল্পী, বিদ্যা ও বিদ্বানের পশ্চাতে গূঢ়ভাবে প্রবাহিত ইন্দ্রিয় বিলাসের স্রোত দেখে, ঘৃণায় সূর্য্যের মুখ মেঘকলুষিত হয়েছে, অথবা কাষ্ঠ, বস্ত্র ও নানা রাগ রঞ্জিত এ মায়া অমরাবতীর, আশু বিনাশ ভেবে, তিনি দুঃখে মেঘাবগুণ্ঠনে মুখ ঢাক্‌লেন।

আমরাও পালিয়ে বাঁচি, একজিবিসন ভাঙ্গা এক বৃহৎ ব্যাপার। এই ভূস্বর্গ, নন্দনোপম পারিসের রাস্তা, এক হাটু কাদা চুন বালিতে পূর্ণ হবেন। দু একটা প্রধান ছাড়া, এক্সিবিজনের সমস্ত বাড়ি ঘর দোরই, কাঠ, কুঠরো, ছেঁড়া ন্যাতা, আর চূণকামের খেলা বইত নয়—যেমন সমস্ত সংসার। তা যখন ভাঙ্গতে থাকে, সে চুণের গুঁড়ো উড়ে দম আট্‌কে দেয়,—ন্যাতা চোতায়, বালি প্রভৃতিতে পথ ঘাট কদর্য্য করে তোলে, তার উপর বৃষ্টি হলেই সে বিরাট্ কাণ্ড।

২৪শে অক্টোবর সন্ধ্যার সময় ট্রেন পারিস ছাড়লে, অন্ধকার রাত্রি; দেখবার কিছুই নাই; আমি আর মক্ষিয় বোয়া এক কামরায়। শীঘ্র শীঘ্র শয়ন করলুম। নিদ্রা হতে উঠে দেখি,—আমরা ফরাসী সীমানা ছাড়িয়ে, জর্ম্মান্ সাম্রাজ্যে উপস্থিত। জর্ম্মানি পূর্ব্বে বিশেষ করে দেখা আছে, তবে ফ্রান্সের পর জর্ম্মানি—বড়ই প্রতিদ্বন্দ্বী ভাব। যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীনাং—একদিকে ভুবনস্পর্শী ফ্রান্স প্রতিহিংসানলে পুড়ে পুড়ে আস্তে আস্তে খাক্ হয়ে যাচ্ছে; আর একদিকে কেন্দ্রীকৃত নূতন, মহাবল জর্ম্মানি মহাবেগে উদয়-শিখরাভিমুখে চলেছে। কৃষ্ণকেশ, অপেক্ষাকৃত খর্ব্বকায়, শিল্পপ্রাণ, বিলাসপ্রিয়, অতি সুসভ্য ফরাসীর শিল্প বিন্যাস, আর একদিকে হিরণ্যকেশ, দীর্ঘাকার, দিঙ্‌নাগ জর্ম্মানির স্থূল-হস্তাবলেপ। পারিসের পর পাশ্চাত্য জগতে আর নগরী নাই; সব সেই পারিসের নকল, অন্ততঃ চেষ্টা। কিন্তু ফরাসীতে সে শিল্প সুষমার সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য; জর্ম্মাণে, ইংরাজে, আমেরিকে, সে অনুকরণ স্থূল। ফরাসীর বল বিন্যাসও যেন রূপপূর্ণ; জর্ম্মাণীর রূপবিকাশ-চেষ্টাও বিভীষণ। ফরাসী প্রতিভার, মুখমণ্ডল ক্রোধাক্ত হলেও সুন্দর; জর্ম্মান্ প্রতিভার মধুর

হাস্য-বিমণ্ডিত আননও যেন ভয়ঙ্কর। ফরাসীর সভ্যতা স্নায়ুময়, কর্পূরের মত, কস্তুরীর মত, এক মুহূর্ত্তে উড়ে ঘর দোর ভরিয়ে দেয়; জর্ম্মাণ সভ্যতা পেশীময়, সীসার মত, পারার মত ভারি, যেখানে পড়ে আছে, ত পড়েই আছে। জর্ম্মানের মাংসপেশী ক্রমাগত, অশ্রান্তভাবে ঠুক্ ঠাক্ হাতুড়ি আজন্ম মারতে পারে; ফরাসীর নরম শরীর, মেয়ে মানুষের মত; কিন্তু যখন কেন্দ্রীভূত হয়ে আঘাত করে, সে কামারের এক ঘা; তার বেগ সহ্য করা বড়ই কঠিন।

জর্ম্মান্ ফরাসীর নকলে বড় বড় বাড়ি অট্টালিকা বনাচ্ছেন,—বৃহৎ বৃহৎ মূর্ত্তি, অশ্বারোহী, রথী, সে প্রাসাদের শিখরে স্থাপন কর্‌ছেন। কিন্তু, জর্ম্মানের দোতলা বাড়ি দেখ্‌লেও, জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়,—এ বাড়ি কি মানুষের বাসের জন্য, না হাতি উটের "তবেলা"? আর ফরাসীর পাঁচতলা, হাতি ঘোড়া রাখ্‌বার বাড়ি দেখে ভ্রম হয় যে, এ বাড়িতে বুঝি পরীতে বাস কর্‌বে।

আমেরিকা জর্ম্মান্ প্রবাহে অনুপ্রাণিত, লক্ষ লক্ষ জর্ম্মান্ প্রত্যেক সহরে। ভাষা ইংরাজি হলে কি হয়,—আমেরিকা আস্তে আস্তে জর্ম্মাণিত হয়ে যাচ্ছে। জর্ম্মাণির প্রবল বংশবিস্তার, জর্ম্মান্ বড়ই কষ্টসহিষ্ণু। আজ জর্ম্মাণি ইউ-রোপের আদেশ-দাতা; আর সকলের উপর, অন্যান্য জাতের অনেক আগে, জর্ম্মাণি, প্রত্যেক নর নারীকে, রাজদণ্ডের ভয় দেখিয়ে, বিদ্যা শিখিয়েছে। আজ সে বৃক্ষের ফল ভোজন হচ্ছে। জর্ম্মাণির সৈন্য, প্রতিষ্ঠায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; জর্ম্মাণি প্রাণপণ করেছে, যুদ্ধ পোতেও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হতে; জর্ম্মাণির পণ্য-নির্ম্মাণ ইংরাজকেও পরাভূত করেছে। ইংরাজের উপনিবেশেও জর্ম্মাণ-পণ্য, জর্ম্মান্-মনুষ্য, ধীরে ধীরে একাধিপত্য লাভ কর্‌ছে; জর্ম্মাণির সম্রাটের আদেশে, সর্ব্ব-জাতি, চীনক্ষেত্রে, অবনত মস্তকে, জর্ম্মান্ সেনাপতির অধীনতা স্বীকার কর্‌ছেন।

সারাদিন ট্রেণ জর্ম্মাণির মধ্য দিয়ে চল্‌লো; বিকাল বেলা জর্ম্মান্ আধি-পত্যের প্রাচীন কেন্দ্র, এখন পর-রাজ্য, অষ্ট্রিয়ার সীমানায় উপস্থিত। এ য়ুরোপে বেড়াবার কতকগুলি হাঙ্গামা আছে। প্রত্যেক দেশেতেই, কতকগুলি জিনিসের উপর, বেজায় শুল্ক; অথবা কোনও কোনও পণ্য সরকারের এক চেটে, যেমন তামাক। আবার রুষ ও তুর্কিতে, তোমার রাজার ছাড়্‌পত্র না থাক্‌লে, একেবারে প্রবেশ নিষেধ; ছাড় পত্র অর্থাৎ পাশ্ পোর্ট একান্ত আব-শ্যক। তা ছাড়া, রুষ এবং তুর্কিতে, তোমার বই পত্র কাগজ সব কেড়ে নেবে; তারপর, তারা পড়ে শুনে, যদি বোঝে যে তোমার কাছে তুর্কি বা রুষের

রাজত্বের বা ধর্ম্মের বিপক্ষে কোনও বই কাগজ নাই, তা'হলে তা তখন ফিরিয়ে দেবে। নতুবা সে সব বই পত্র জপ্ত করে নেবে। অন্য অন্য দেশে এ পোড়া তামাকের হাঙ্গামা বড়ই হাঙ্গামা। সিন্দুক, প্যাঁটরা, গাঁটরি, সব খুলে দেখাতে হবে, তামাক প্রভৃতি আছে কি না। আর কন্‌স্টাণ্টিনোপল্ আস্‌তে গেলে, দুটো বড়, জর্ম্মাণি আর অষ্ট্রিয়া, এবং অনেকগুলো ক্ষুদে দেশ মধ্য দিয়ে আস্‌তে হয় ;—ক্ষুদেগুলো পূর্ব্বে তুরস্কের পরগণা ছিল, এখন স্বাধীন কৃশ্চান রাজারা একত্র হয়ে, মুসলমানের হাত থেকে, যতগুলো পেরেছে, কৃশ্চান-পূর্ণ পরগণা ছিনিয়ে নিয়েছে। এ ক্ষুদে পিঁপড়ের কামড়, ও ডেওদের চেয়ে অনেক অধিক।

২৫এ অক্টোবর সন্ধ্যার পর ট্রেণ অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা নগরীতে পৌঁছুল। অষ্ট্রিয়া ও রুসিয়ায় রাজবংশীয় নর নারীকে আর্কডুাক ও আর্ক-ডচেস্ বলে। এ ট্রেণে দুজন আর্কডুাক ভিয়েনায় নাববেন ; তাঁরা না নাবলে অন্যান্য যাত্রীর আর নাববার অধিকার নাই। আমরা অপেক্ষা করে রইলুম। নানাপ্রকার জরিবুটার উর্দ্দিপরা জনকতক সৈনিক পুরুষ এবং পর-লাগান টুপি মাথায় জনকতক সৈন্য আর্কডুাকদের জন্য অপেক্ষা করছিল। তাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আর্কডুাকদ্বয় নেমে গেলেন। আমরাও বাঁচলুম—তাড়াতাড়ি নেমে, সিন্দুকপত্র পাশ্ করাবার উদ্যোগ করতে লাগলুম। যাত্রী অতি অল্প ; সিন্দুক পত্র দেখিয়ে ছাড়্ করাতে বড় দেরি লাগ্‌লো না। পূর্ব্বে হতে এক হোটেল ঠিকানা করা ছিল ; সে হোটেলের লোক গাড়ী নিয়ে অপেক্ষা কর্‌ছিল। আমরাও, যথাসম্ভব সময়ে, হোটেলে উপস্থিত হলুম। সে রাত্রে আর দেখা শুনা কি হবে ; পরদিন প্রাতঃকালে সহর দেখ্‌তে বেরুলুম। সমস্ত হোটেলেই এবং ইউরোপের ইংলণ্ড ও জর্ম্মাণি ছাড়া প্রায় সকল দেশেই ফরাসী চাল। হিঁদুদের মত দুবার খাওয়া। প্রাতঃকালে দুপ্রহরের মধ্যে ; সায়ংকালে ৮টার মধ্যে। প্রত্যুষে অর্থাৎ ৮।৯টার সময় একটু কাফি পান করা। চায়ের চাল, ইংলণ্ড ও রুসিয়া ছাড়া, অন্যত্র বড়ই কম। দিনের ভোজনের ফরাসী নাম—"দেজুনে", অর্থাৎ উপবাসভঙ্গ, ইংরাজী ব্রেক্‌ফাষ্ট। সায়ং ভোজনের নাম—"দিনে", ইং "ডিনার"। চা-পানের ধূম রুসিয়াতে অত্যন্ত—বেজায় ঠাণ্ডা, আর চীন সন্নিকট। চীনের যা খুব উত্তম চা, তার অধিকাংশ যায়, রুষে। রুষের চা-পানও চীনের অনুরূপ, অর্থাৎ দুগ্ধ মিশান নেই। দুধ মেশালে চা বা কাফি বিষের ন্যায় অপকারক। আসল চা-পায়ী জাতি চীনে, জাপানি, রুষ, মধ্য-আসিয়া-বাসী, বিনা দুগ্ধে চা পান করে ; তদ্বৎ

আবার তুর্ক প্রভৃতি আদিম কাফি-পায়ী জাতি বিনা দুগ্ধে কাফি পান করে। তবে রুষিয়ায় তার মধ্যে এক টুক্‌রা পাতি নেবু এবং এক ডেলা চিনি চায়ের মধ্যে ফেলে দেয়। গরীবেরা এক ডেলা চিনি মুখের মধ্যে রেখে, তার উপর দিয়ে চা পান করে এবং এক জনের পান শেষ হলে, আর একজনকে সে চিনির ডেলা বার্ করে দেয়। সে ব্যক্তিও সে ডেলা মুখের মধ্যে রেখে পূর্ব্ববৎ চা পান করে।

ভিয়েনা সহর পারিসের নকল ছোট সহর। তবে অষ্ট্রিয়ানরা হচ্ছে জাতিতে জর্ম্মান্। অষ্ট্রিয়ার বাদ্‌সা এতকাল প্রায় সমস্ত জর্ম্মাণীর বাদ্‌সা ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে, প্রুষরাজ ভিলহেলেমের দূরদর্শিতায়, মন্ত্রীবর বিষ্‌মার্কের অপূর্ব্ববুদ্ধিকৌশলে, আর সেনাপতি ফন্‌মল্টকির যুদ্ধপ্রতিভায়, প্রুষরাজ অষ্ট্রিয়া ছাড়া সমস্ত জর্ম্মাণীর একাধিপতি বাদ্‌সা। হতশ্রী হতবীর্য্য অষ্ট্রিয়া কোনও মতে পূর্ব্বকালের নাম গৌরব রক্ষা করছেন। অষ্ট্রীয় রাজবংশ—হ্যাপ্‌স্‌বর্গ বংশ, ইয়ুরোপের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও অভিজাত রাজবংশ। যে জর্ম্মান্ রাজন্য-কুল ইয়ুরোপের প্রায় সর্ব্বদেশেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, যে জর্ম্মাণীর ছোট ছোট করদ রাজা, ইংলণ্ড ও রুষিয়াতেও, মহাবল সাম্রাজ্যশীর্ষে সিংহাসন স্থাপন করেছে, সেই জর্ম্মাণীর বাদ্‌সা এতকাল ছিল এই অষ্ট্রীয় রাজবংশ। সে মান, সে গৌরবের ইচ্ছা, সম্পূর্ণ অষ্ট্রিয়ার রয়েছে,—নাই শক্তি। তুর্ককে ইয়ুরোপের আতুর বৃদ্ধ পুরুষ বলে; অষ্ট্রিয়াকে, আতুরা বৃদ্ধা স্ত্রী বলা উচিত। অষ্ট্রিয়া ক্যাথলিক সম্প্রদায় ভুক্ত; সেদিন পর্য্যন্ত অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যের নাম ছিল—"পবিত্র রোম সাম্রাজ্য"। বর্ত্তমান জর্ম্মাণী প্রটেষ্টাণ্ট-প্রবল। অষ্ট্রীয় সম্রাট্ চিরকাল পোপের দক্ষিণ হস্ত, অনুগত শিষ্য, রোমক সম্প্রদায়ের নেতা। এখন ইউরোপে ক্যাথলিক বাদ্‌সা কেবল এক অষ্ট্রীয় সম্রাট্; ক্যাথলিক সঙ্ঘের বড় মেয়ে ফ্রান্স এখন প্রজাতন্ত্র; স্পেন, পোর্ত্তুগাল অধঃপাতিত; ইটালি পোপের সিংহাসন মাত্র স্থাপনের স্থান দিয়েছে; পোপের ঐশ্বর্য্য, রাজ্য সমস্ত কেড়ে নিয়েছে; ইতালীর রাজা, আর রোমের পোপে, মুখ দেখাদেখি নাই, বিশেষ শত্রুতা। রোম, পোপের রাজধানী, এখন ইতালীর রাজধানী; পোপের প্রাচীন প্রাসাদ দখল করে, রাজা বাস করছেন; পোপের প্রাচীন ইতালী রাজ্য এখন পোপের ভ্যাটিকান্ (Vatican) প্রাসাদের চতুঃসীমানায় আবদ্ধ। কিন্তু পোপের ধর্ম্মসম্বন্ধে প্রাধান্য এখনও অনেক—সে ক্ষমতার বিশেষ সহায় অষ্ট্রিয়া। অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে, বহুকালব্যাপী, ও পোপ-সহায়

অষ্ট্রিয়ার দাসত্বের বিরুদ্ধে নব্য ইতালীর অভ্যুত্থান। অষ্ট্রিয়া কাজেই বিপক্ষ, ইতালী খুইয়ে বিপক্ষ। মাঝখান থেকে ইংলণ্ডের কুপরামর্শে নবীন ইতালী, মহাসৈন্যবল, রণপোত-বল সংগ্রহে বদ্ধকর হলো। সে টাকা কোথায়? ঋণজালে জড়িত হয়ে, ইতালী উৎসন্ন যাবার দশায় পড়েছে; আবার কোথা হতে উৎপাৎ—আফ্রিকায় রাজ্য বিস্তার করতে গেলো। হাবসি বাদসার কাছে হেরে, হতশ্রী হতমান হয়ে, বসে পড়েছে। এ দিকে প্রুসিয়া মহা-যুদ্ধে হারিয়ে অষ্ট্রিয়াকে বহুদূর হঠিবে দিলে। অষ্ট্রিয়া ধীরে ধীরে মরে যাচ্ছে, আর ইতালী নব জীবনের অপব্যবহারে তদ্ধৎ জালবদ্ধ হয়েছে।

অষ্ট্রিয়ার রাজবংশের এখনও ইয়ুরোপের সকল রাজবংশের অপেক্ষা গুমর। তাঁরা অতি প্রাচীন, অতি বড় বংশ। এ বংশের বে থা বড় দেখে শুনে হয়। ক্যাথলিক না হয়ে, সে বংশের সঙ্গে বে থা হয়ই না। এই বড় বংশের ভাঁওতায় পড়ে, মহাবীর নেপলঅঁর অধঃপতন!! কোথা হতে তাঁর মাথায় ঢুক্‌লো, যে বড় রাজবংশের মেয়ে বে করে, পুত্র পৌত্রাদিক্রমে এক মহাবংশ স্থাপন করবেন। যে বীর, "আপনি কোন্ বংশে অবতীর্ণ?", এ প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে, "আমি কারুর বংশের সন্তান নই—আমি মহাবংশের স্থাপক", অর্থাৎ আমা হতে মহীমান্বিত বংশ চল্‌বে. আমি কোনও পূর্ব্বপুরুষের নাম নিয়ে বড় হতে জন্মাইনি, সেই বীরের এ বংশ-মর্যাদারূপ অন্ধকূপে পতন হলো।

রাজ্ঞী জোসেফিন্‌কে পরিত্যাগ, যুদ্ধে পরাজয় করে অষ্ট্রিয়ার বাদ্‌সার কন্যা গ্রহণ, মহা সমারোহে অষ্ট্রীয় রাজকন্যা মারি লুইসের সহিত বোনাপার্টের বিবাহ, পুত্রজন্ম, সদ্যজাত শিশুকে রোমরাজ্যে অভিষিক্ত করণ, ন্যাপোলয়ঁর পতন, শ্বশুরের শত্রুতা, লাইপজিস্, ওয়াটারলু, সেণ্টহেলেনা, রাজ্ঞী মেরি লুইসের সপুত্র পিতৃগৃহে বাস, সামান্য সৈনিকের সহিত বোনাপার্টি-সাম্রাজ্ঞীর বিবাহ, একমাত্র পুত্র রোমরাজের মাতামহ গৃহে মৃত্যু, এ সব ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কথা।

ফ্রান্স এখন অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল অবস্থায় পড়ে প্রাচীন গৌরব স্মরণ করছে,—আজকাল ন্যাপলঅঁ সংক্রান্ত পুস্তক অনেক। সার্দ্দু প্রভৃতি নাট্যকার গত নেপোলঅঁ সম্বন্ধে অনেক নাটক লিখ্‌ছেন; মাদাম্ বারন্‌হার্ড, রেজাঁ প্রভৃতি অভিনেত্রী, কফেলাঁ প্রভৃতি অভিনেতাগণ, সে সব পুস্তক অভিনয় করে, প্রতি রাত্রে থিয়েটার ভরিয়ে ফেলছে। সম্প্রতি "লেগ্‌লঁ"—"গরুড় শাবক"—নামক

এক পুস্তক অভিনয় করে, মাদাম্ বারন্‌হার্ড পারিস নগরীতে মহা আকর্ষণ উপস্থিত করেছেন।

গরুড়-শাবক হচ্ছে বোনাপার্টের একমাত্র পুত্র, মাতামহ গৃহে ভিয়েনার প্রাসাদে এক রকম নজরবন্দী। অষ্ট্রীয় বাদ্‌সার মন্ত্রী, চাণক্য মেটারনিক, বালকের মনে পিতার গৌরবকাহিনী যাতে একেবারে না স্থান পায়, সে বিষয়ে সদা সচেষ্ট। কিন্তু দুজন পাঁচজন বোনাপার্টের পুরাতন সৈনিক নানা কৌশলে সামবোর্ণ প্রাসাদে অজ্ঞাতভাবে বালকের ভৃত্যত্বে গৃহীত হলো; তাদের ইচ্ছা কোনও রকমে বালককে ফ্রান্সে হাজির করে এবং সমবেত-ইয়ুরোপীয়-রাজন্যগণ-পুনঃস্থাপিত বুর্বঁ বংশকে তাড়িয়ে দিয়ে বোনাপার্ট বংশ স্থাপন করা। শিশু—মহাবীর পুত্র; পিতার রণ-গৌরব-কাহিনী শুনে, সে সুপ্ত তেজ অতি শীঘ্রই জেগে উঠলো। চক্রান্তকারীদের সঙ্গে বালক সামবোর্ণ প্রাসাদ হতে একদিন পলায়ন করলে; কিন্তু মেটারনিকের তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি পূর্ব্ব হতেই টের পেয়েছিল; সে যাত্রা বন্ধ করে দিলে। বোনাপার্ট-পুত্রকে সামবোর্ণ প্রাসাদে ফিরিয়ে আনলে;—বদ্ধপক্ষ গরুড়-শিশু ভগ্নহৃদয়ে অতি অল্পদিনেই প্রাণ ত্যাগ করলে।

এ সামবোর্ণ প্রাসাদ সাধারণ প্রাসাদ; অবশ্য ঘর দোর খুব সাজান বটে, কোনও ঘর খালি চীনের কাজ, কোনও ঘর খালি হিন্দু হাতের কাজ, কোনও ঘর অন্য দেশ, এই প্রকার, এবং প্রাসাদস্থ উদ্যান অতি মনোরম বটে; কিন্তু যত লোক এ প্রাসাদ দেখ্‌তে যাচ্ছে, এখন সব ঐ বোনাপার্ট-পুত্র যে ঘরে শুতেন, যে ঘরে পড়তেন, যে ঘরে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল, সেই সব দেখ্‌তে যাচ্ছে। অনেক আহাম্মক্ ফরাসী ফরাসিনী রক্ষী পুরুষকে জিজ্ঞাসা করছে, "এগলঁ"র ঘর কোন্‌টা, কোন্ বিছানায় "এগ্‌লঁ" শুতেন!! মর্ আহাম্মক্, এরা জানে বোনাপার্টের ছেলে। এদের মেয়ে জুলুম করে কেড়ে নিয়ে বিয়ে হয়েছিল সম্বন্ধ; সে ঘৃণা এদের আজও যায় না। নাতি, রাখতে হয়, নিরাশ্রয়, রেখেছিল। তার রোমরাজ প্রভৃতি কোনও উপাধিই দিত না; খালি অষ্ট্রিয়ার নাতি, কাজেই ডুক্, বস্। তাকে এখন তোরা গরুড়-শিশু করে এক বই লিখেছিস্, আর, তার উপর নানা কল্পনা জুটিয়ে, মাদাম্ বারন্‌হার্ডের প্রতিভায়, সে একটা খুব আকর্ষণ হয়েছে: কিন্তু এ অষ্ট্রীয় রক্ষী সে নাম কি করে জান্‌বে বল? তার উপর সে বইয়ে লেখা হয়েছে যে, ন্যাপোলঅঁ-পুত্রকে

অষ্ট্রিয়ান্ বাদ্‌সা মেটারনিক্ মন্ত্রীর পরামর্শে একরকম মেরেই ফেল্‌লেন। রক্ষী "এগল" "এগল" শুনেও, মুখ হাঁড়ি করে, গোঁজ গোঁজ করতে করতে, ঘর দোর দেখাতে লাগ্‌লো ; কি করে, বক্সিস্ ছাড়া বড়ই মুস্কিল। তার উপর, এ সব অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশে সৈনিক বিভাগে বেতন নাই বল্লেই হলো, এক রকম পেট ভাতায় থাক্‌তে হয় ; অবশ্য কয়েক বৎসর পরে ঘরে ফিরে যাও। রক্ষীর মুখ অন্ধকার হয়ে স্বদেশপ্রিয়তা প্রকাশ কর্‌লে, হাত কিন্তু আপনা হতেই বক্সিসের দিকে চল্‌লো। ফরাসীর দল, রক্ষীর হাতকে রৌপ্য-সংযুক্ত করে, এগলের গল্প আর মেটারনিক্‌কে গাল দিতে দিতে ঘরে ফিরলো—রক্ষী লম্বা সেলাম করে দোর বন্ধ করলে। মনে মনে সমগ্র ফরাসী জাতির বাপন্ত পিতন্ত অবশ্যই করেছিল।

ভিয়েনা সহরে দেখবার জিনিস্ মিউসিয়ম, বিশেষ বৈজ্ঞানিক মিউ-সিয়ম। বিদ্যার্থীর বিশেষ উপকারক স্থান। নানা প্রকার প্রাচীন লুপ্ত জীবের অস্থ্যাদি সংগ্রহ অনেক। চিত্রশালিকায় ওলন্দাজ চিত্রকরদের চিত্রই অধিক। ওলন্দাজি সম্প্রদায়ে, রূপ বার্ করবার চেষ্টা বড়ই কম্ ; জীব প্রকৃতির অবিকল অনুকরণ এ সম্প্রদায়ের প্রাধান্য। একজন শিল্পী বছর কতক ধরে এক ঝুড়ি মাচ্ এঁকেছে, না হয় ত এক থান্ মাংস, না হয় ত এক গ্লাস্ জল, সে মাছ, মাংস, গ্লাসে জল, চমৎকার-জনক। কিন্তু সে ওলন্দাজ-সম্প্রদায়ের মেয়ে চেহারা যেন সব কুস্তীগীর পালোয়ান্ !!

ভিয়েনা সহরে জর্ম্মান্ পাণ্ডিত্য বুদ্ধিবল আছে, কিন্তু যে কারণে তুর্কী ধীরে ধীরে অবসন্ন হয়ে গেল, সেই কারণ এথায়ও বর্ত্তমান, অর্থাৎ নানা বিভিন্ন জাতি ও ভাষার সমাবেশ। আসল অষ্ট্রিয়ার লোক জর্ম্মান্-ভাষী ক্যাথলিক, হুঙ্গারির লোক, তাতার বংশীয়, ভাষা আলাদা, আবার কতক গ্রীক্‌ভাষী, গ্রীক্-মতের ক্রিশ্চান। এ সকল ভিন্ন সম্প্রদায়কে একীভূত করণের শক্তি অষ্ট্রিয়ার নাই। কাজেই অষ্ট্রিয়ার অধঃপতন।

বর্ত্তমানকাল ইয়ুরোপ খণ্ডে জাতীয়তার এক মহা তরঙ্গের প্রাদুর্ভাব। এক ভাষা, এক ধর্ম্ম, এক জাতীয় সমস্ত লোকের একত্র সমাবেশ। যেথায় ঐ প্রকার একত্র সমাবেশ সুসিদ্ধ হচ্ছে, সেথায়ই মহাবলের প্রাদুর্ভাব হচ্ছে ; যেথায় তা অসম্ভব, সেথায়ই নাশ। বর্ত্তমান অষ্ট্রীয় সম্রাটের মৃত্যুর পর, অবশ্যই জর্ম্মাণি অষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যের জর্ম্মান্‌ভাষী অংশটুকু উদরসাৎ করবার চেষ্টা করবে, রুষ প্রভৃতি অবশ্যই বাধা দেবে ; মহা

আহবের সম্ভব; বর্ত্তমান সম্রাট্ অতি বৃদ্ধ—সে দুর্য্যোগ আশু-সম্ভাবী। জর্ম্মান্ সম্রাট্ তুর্কির সুলতানের আজকাল সহায়; সে সময়ে যখন জর্ম্মাণি অষ্ট্রিয়া-গ্রাসে মুখ ব্যাদান করবে, তখন রুষ-বৈরী তুর্ক রুষকে কতক মতক বাধা ত দেবে, কাজেই জর্ম্মান্ সম্রাট্ তুর্কের সহিত বিশেষ মিত্রতা দেখাচ্ছেন।

ভিয়েনায় তিন দিন দিক্ করে দিলে। পারিসের পর ইয়ুরোপ দেখা, চর্ব্ব-চোষ্য খেয়ে তেঁতুলের চাট্‌নি চাকা। সেই কাপড় চোপড়, খাওয়া দাওয়া, সেই সব এক ঢঙ্গ, দুনিয়া শুদ্ধ সেই এক কিম্ভূত কালো জামা, সেই এক বিকট টুপি। তার উপর ওপরে মেঘ, আর নীচে পিল্ পিল্ করছে এই কাল টুপি, কাল জামার দল,—দম্ যেন আট্‌কে দেয়। ইয়ুরোপশুদ্ধ সেই এক পোষাক, সেই এক চাল চলন্ হয়ে আস্‌ছে—প্রকৃতির নিয়ম ঐ, সবই মৃত্যুর চিহ্ন। শত শত বৎসর কস্‌রত করে, আমাদের আর্য্যেরা আমাদের এমনি কাওয়াজ করিয়ে দেছেন, যে আমরা এক ঢঙ্গে দাঁত মাজি, মুখ ধুই, খাওয়া খাই, ইত্যাদি, ইত্যাদি,—ফল, আমরা ক্রমে ক্রমে যন্ত্রগুলি হয়ে গেছি, প্রাণ বেরিয়ে গেছে, খালি যন্ত্রগুলি ঘুরে বেড়াচ্ছি, যন্ত্রে 'না' বলে না, 'হুঁ' বলে না, নিজের মাথা ঘামায় না, যেনাস্য পিতরো যাতাঃ চলে যায়, তার পর পচে মরে যায়। এদেরও তাই হবে,—কালস্য কুটিলা গতিঃ, সব এক পোষাক, এক খাওয়া, এক ধাঁজে কথা কওয়া, ইত্যাদি, ইত্যাদি, হতে হতে ক্রমে সব যন্ত্র, ক্রমে সব যেনাস্য পিতরো যাতাঃ হবে, তার পর পচে মরা!!

উপনিষদের বিষয়।

স্বামী সচ্চিদানন্দ।] [৪৭ পৃষ্ঠার পর।

শাস্ত্র বলেন, শ্রুতি অপৌরুষেয় ও অনাদি। যদিও উপনিষদের রচয়িতা কোনও বিশেষ ঋষি-পুরুষের নাম পাওয়া যায় না, তাই বলিয়া যে মন্ত্ররাজি গুরুর মুখ হইতে শিষ্যপরম্পরা প্রথমে কেবল শুনিয়া আসিতেছেন, পরে লিপি-বদ্ধমাত্র থাকিয়া এখন মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হইতেছে, সে গুলিকে অপৌ-রুষেয় বা অনাদি বলা যুক্তিযুক্ত নয়। "ওঁ ব্রহ্মা বিশ্বস্য কর্ত্তা ব্রহ্মবিদ্যাং অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ",—বিশ্বকর্ত্তা ব্রহ্মা নিজের জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্বকে ব্রহ্মবিদ্যা

প্রদান করিলেন, এই মন্ত্র অবলম্বনে, শ্রুতি স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তার মুখনির্গতা, এরূপ অনুমান করা উচিত কি না, তাহাও বিবেচনার বিষয়। ফল কথা, "শ্রুতি অপৌরুষেয় ও অনাদি", ইহার অর্থ—"শ্রুতিবিষয়ক জ্ঞান অনাদি"। মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি অনাদি ভূতকালে বিদ্যমান ছিল, চিরকাল রহিয়াছে, ও অনন্ত ভবিষ্যৎ কালে থাকিবে; নিউটন্ সেই শক্তির আবিষ্কর্ত্তা। নিউটন্ সেই শক্তি আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়া, আজ সকলে জানিতে পারিতেছে, মাধ্যাকর্ষণ বলিয়া এক শক্তি। যদি অদ্যাপি ঐ শক্তির আবিষ্কার না হইত, তাহা হইলেও উহা বিদ্যমান থাকিত, ইহা নিশ্চিত। তেমনি, চিৎ-জগৎস্থ সত্য, জ্ঞান সমূহ অনাদি ভূত ও অনন্ত ভবিষ্যৎ কালে বর্ত্তমান; এই সনাতন জ্ঞানরাশির নাম বেদ; সুতরাং বেদও অনাদি ও অনন্ত। ঋষিগণ সেই অনাদ্যনন্ত বেদসংজ্ঞ জ্ঞানসমূহের দ্রষ্টা, আবিষ্কর্ত্তা। উপনিষদ্ সেই ঋষিদিগের ভাষা। মন্ত্রাত্মক ঋষিপুরুষমুখনিঃসৃত ভাষা অবশ্য অপৌরুষেয় নহে, সে ভাষাশ্রিত যে জ্ঞান, তাহাই অপৌরুষেয়।

অতি প্রাচীনকালে আর্য্য ঋষিগণ মুক্তি, ভগবান্, আত্মা প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়া বলিতেন, "এতদ্বৈতৎ"—এই সেই আত্মা; যেন করতলস্থিত আমলক-ফলবৎ শিষ্যকে দেখাইতেন, "এই সেই আত্মা"। ভারতের এ দুর্দ্দিনে হিন্দু-সন্তানের কি ঋষিত্ব লাভ সম্ভব? সম্ভব,—উপনিষদের আশা বাক্য বলিতেছেন, "অন্যোঽপ্যেবং", নচিকেতা ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইয়া বিমৃত্যু হইয়াছিলেন, অন্য যে কেহ এই অধ্যাত্মবিদ্যা জানিবেন, তিনিও নচিকেতার ন্যায় অমৃতত্ব পাইবেন। দেশকালব্যক্তিনির্বিশেষে এই ব্রহ্মজ্ঞান সকলেরই পাইবার অধিকার। মানুষের মধ্যে অনন্ত শক্তি নিহিত, এ বিশ্বাস যেন উপনিষদের মূলমন্ত্র। উপনিষদ্ মানুষকে, "অমৃতের পুত্র", বলিয়া সম্বোধন করেন,—বলেন, "তুমিই সেই পরমাত্মা", "এই নিখিল বিশ্ব তোমাতে জাত, তোমাতে প্রতিষ্ঠিত, কালে তোমাতেই লয়গত, তুমি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন"। হে পুরুষ! তোমার ভিতর বীর্য্যস্বরূপের অনন্ত বীর্য্য তোমার অজ্ঞাতসারে বিদ্যমান; আত্মায় বিশ্বাস কর, নিজের স্বরূপে বিশ্বাস কর, "আমি অনন্ত শক্তির আধার" —এই মন্ত্র দিনরাত জপ কর, বৃথা দুর্ব্বলতার অভিমান ফেলিয়া দেও, দেখিবে—মহাশক্তির আধার তুমি অজ্ঞানবশতঃ এত দিন আপনাকে দুর্ব্বল ভাবিয়া আসিতেছিলে, সিংহের কুমার তুমি নিজেকে শৃগাল শিশু ভাবিয়াছ। উপনিষদের ঐ বীজমন্ত্র ভুলিয়া যাওয়াতেই আমাদের এত অবনতি। আমরা

নিজেরে দুর্ব্বল কীটাণুকীটাধম ভাবি, হইও তাই। "খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষঃ",—এই পুরুষ নিজেকে যা ভাবেন, হন তাই। ক্রমাগত বল, "আমি দুর্ব্বল, আমি অধম, আমি পাপী", দেশের দুর্ব্বলতা তোমাকে আশ্রয় করিবে; বল, "আমি বীর্য্যময়, আমি অমৃতরূপ, আমি শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ," সব দুর্ব্বলতা ছুটিয়া যাইবে, শতসর্পগর্জ্জনে অন্তর্নিহিত ভগবৎ-শক্তি জাগিয়া উঠিবে। এটী সত্য, ধ্রুব সত্য। ইহাই ধর্ম্ম। অতীতকালে যদি দশজন ঋষি ভারতভূমি পবিত্র করিয়া থাকেন, বর্ত্তমানে সহস্র ঋষি আমাদের মধ্য হইতে উঠিবেন, নিশ্চয় উঠিবেন, এই দৃঢ় বিশ্বাস ধারণা কর, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বীরদর্পে তপস্যাক্ষেত্রে অগ্রসর হও, তুমিও ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইবে। নহিলে হাজার কাঁদ, হাজার আপনাকে দীনহীন ভাব, সারা জীবনটা মিছে কেঁদে কেটে যাবে। আছই ত সব দীনহীন,—তার উপর আবার "আমি দীনহীন", ব'লে বাহাদুরি কি? "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ",—দুর্ব্বল কখনই আত্মাকে লাভ করিতে পারে না। ভীরু, কাপুরুষ, দাসের মুক্তি কোথায়? অর্জ্জুন বীর ছিলেন বলিয়াই, ভগবান্ তাঁহাকে গীতা উপদেশ করিলেন।

"তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ", একমাত্র আত্মাকে জান, অন্য কথা পরিত্যাগ কর, "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ", কর্ম্ম, বিত্ত, পুত্রপৌত্র কিছুতেই অমৃতত্ব পাওয়া যায় না, ত্যাগই একমাত্র অমৃতত্বের হেতু, "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং", সমস্ত পৃথিবী বিত্তপূর্ণা আমার হইলেও, আমি অমৃত হইব না, "ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ" বিত্তের দ্বারা মানুষ কখনই তৃপ্তি লাভ করে না,—সংসারের অনিত্যতা অভিধান পূর্ব্বক অরণ্যাশ্রয়ী ঋষিগণ দিব্য পরমপুরুষে মগ্ন হইতেন। উপনিষদের তীব্রবৈরাগ্যরূপ অগ্নিশিখার তীক্ষ্ণ জ্যোতিঃ সংসারী লোকের দৃষ্টি ঝল্‌সাইয়া দেয়; আশে পাশে দৃশ্যমান কতকগুলি ধূমরেখা সে তীক্ষ্ণতার কোমলত্ব সাধন করে। বর্ত্তমান পূতিগন্ধময় ভারতজীবনের স্বাস্থ্য পুনরানয়ন করিবার জন্য ঐ ধূমরেখাগুলি একান্ত আবশ্যক। সংসার ছাড়িতে হইলে, সংসারী থাকিয়াই, সংসার সংগ্রামে কার্য্য করিয়াই, সংসার ছাড়িবার বল অর্জ্জন করিতে হইবে। তাই, কি করিয়া সাংসারিক কর্ম্মে গৃহী কৃতকার্য্য হইতে পারেন, তাহার উপায় উপনিষদ্—আত্মার দিক্ দিয়া—বলিতেছেন,—"এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ," আত্মার অসীম শক্তির গূঢ় রহস্য অবগত হইয়া যিনি যা ইচ্ছা করেন, তিনি তাহাই পান। মুমুক্ষু তুমি, নিজের আত্মার অনন্ত শক্তিতে

বিশ্বাস কর, মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। গৃহী তুমি, অর্থ উপার্জ্জন করিতে অভিলাষী, তোমার ভিতরে অনন্ত শক্তি বিদ্যমান, অর্থোপার্জ্জনরূপ উদ্দেশ্যে তাহা নিয়োজিত কর, তুমি অতুল ধনরাশির অধিকারী হইবে। পণ্ডিত তুমি মহাবিদ্বান্ হইতে ইচ্ছুক, ক্ষত্রিয় তুমি শত্রুকে পরাজয় করিতে চাও, আত্মার অনন্ত শক্তিতে বিশ্বাস করিয়া যে দিকে সে শক্তি চালাইবে, সেই দিকেই তুমি কৃতার্থ হইবে। পাশ্চাত্যেরা আত্মার মহাশক্তি ভোগের দিকে প্রয়োগ করিয়া মহোৎসাহে পৃথিবী উপভোগ করিতেছে; হীনবিশ্বাসাত্ম আমাদের না ইহকাল, না পরকাল,—ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছি। যার আত্মায় বিশ্বাস নাই, তার ভগবানে বিশ্বাস মিথ্যা কথা।

সকল বিদ্যারই উন্নতির এক সীমা আছে; সেই সীমায় উপনীত হইলে, নূতন আর কিছু আবিষ্কার করিবার থাকে না; তার পর, সে বিদ্যাবিষয়ে অন্য আর যা কিছুর আলোচনা হয়, তৎসমুদায়ই সেই সীমার মধ্যে হইতে থাকে। পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যা জড়জগতের ঘটনাবলী পর্য্যালোচনা ও তাহাদিগের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বাহির করে। আজ পর্য্যন্ত, বৈজ্ঞানিক জগৎকে বিশ্লিষ্ট করিয়া ঠিক করিয়াছেন, সমস্ত জগৎ চতুঃসপ্ততিসংখ্যক বিভিন্ন ভূতের পরস্পর মিশ্রণে গঠিত এবং সমস্ত জগতের স্থিতিগতিকার্য্যাদি মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি, তাড়িত-শক্তি, আলোক-শক্তি প্রভৃতি কতিপয় বিভিন্নজাতীয় শক্তির দ্বারা চালিত। বিজ্ঞানবিদ্ এখনও পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যার চরম সীমায় উপস্থিত হন নাই। পদার্থবিদ্ যখন এমন একটী শক্তি আবিষ্কার করিবেন, মাধ্যাকর্ষণাদি বিভিন্ন শক্তি সমূহ যে শক্তির সহিত স্বরূপতঃ এক, কেবল বিকাশকালে সেই শক্তির বিকার মাত্র, অবস্থান্তর মাত্র, রসায়নতত্ত্ববিদ্ যখন এমন একটী ভূত বাহির করিবেন, অন্যান্য সমুদয় ভূত যে ভূতের সহিত স্বরূপতঃ এক, কেবল অবস্থা ভেদে সেই ভূতের বিকারমাত্র, অবস্থান্তর মাত্র, তখন পদার্থবিদ্যার ও রসায়নবিদ্যার শেষ উন্নতি সাধিত হইবে। ইহার পর, আরও উন্নতি আমরা ধারণা করিতে পারি না। তার পর, পদার্থবিদ্যা সেই এক শক্তির ও রসায়নবিদ্যা সেই এক ভূতের বিভিন্ন পরিণাম, বিভিন্ন বিকার, নানাবিধ অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্তি, ইত্যাদি লইয়া বিচার বিতর্কে ব্যাপৃত থাকিবে। অধ্যাত্মবিদ্যা সম্বন্ধেও ঐ এক নিয়ম। উপনিষদ্ প্রথমে নিখিল জগৎ বিশ্লেষণ করিয়া বলিলেন, এক সর্ব্বব্যাপী জড়া প্রকৃতি, অনন্তসংখ্যক জীবাত্মা ও এক সর্ব্বনিয়ন্তা পরমাত্মা, এই তিন পরস্পর বিভিন্ন পৃথক্ সত্তা

অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল বর্ত্তমান। এটা দ্বৈতবাদ—অধ্যাত্মবিদ্যার প্রথম অবস্থা। দ্বিতীয় অবস্থায়, উপনিষদ্ আবার বলিলেন, প্রকৃতি, জীবাত্মা ও পরমাত্মা, এ তিনটী বিভিন্ন সত্তা নয়। কেবল একমাত্র পরমাত্মাই আছেন, প্রকৃতি তাঁহার স্থূলশরীর এবং জীবাত্মা সমূহ তাঁহার সূক্ষ্মশরীর; তিনি প্রকৃতি ও জীবাত্মারূপ স্বশরীরের দ্বারা দৃশ্যমান জগৎ ব্যাপিয়া, জগতের বাহিরেও অনন্ত পূর্ণরূপে বিদ্যমান—"বহিশ্চ"। "যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ", "যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ", যেরূপ উর্ণনাভি নিজের শরীর হইতে তন্তু বাহির করে, আবার গ্রহণ করে, যেরূপ বৃহৎ অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগ্নিকণা বাহির হয়, সেইরূপ পরমাত্মা হইতে জড় প্রকৃতি এবং অনন্তসংখ্যক জীবাত্মা নির্গত ও তাঁহাতে পুনর্গত হয়। ইহা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ—অধ্যাত্মবিদ্যার দ্বিতীয় অবস্থা। অবশেষে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ মার্জ্জিত করিয়া অদ্বৈতবাদ। অনন্তের আবার শরীর কি? অনন্তের আবার অংশ কি? অনন্তের আবার 'নির্গত', 'বহির্গত' কি? একমাত্র রসঘন দেশকালাতীত, কার্য্যকারণসম্বন্ধের পার, অংশরহিত, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বস্থানে পূর্ণভাবে বর্ত্তমান, স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত আছেন। তিনি ছাড়া কিছুই নাই। প্রকৃতিজীবাত্মা তাঁহারই নামরূপমাত্র। বিশ্বজগৎ সে অনন্ত অগাধ মহাম্বুনিধির তরঙ্গভঙ্গ—সে বিপুল সত্যরাজ্যের স্বপ্নময় অলীকতা। অধ্যাত্মবিদ্যার শেষ আবিষ্ক্রিয়া সমাপ্ত,—এক বই দুই নাই, আর উন্নতি অসম্ভব। অতীতে যা হইয়াছে, ভবিষ্যতে যা হইবে, সকলই এই মহান্ অসীম বৃত্তের, উপনিষদের, মধ্যে আবদ্ধ। তাই, উপনিষদ্ হিন্দুর পরম আদরের, তাহার মাথার অমূল্যমণি, হিন্দুর প্রাণসর্ব্বস্ব।

নামরূপাতীত, অবাঙ্মনসোগোচর, দেশকালপার একত্ব ছাড়া, নামরূপাত্মক জগতের মধ্যেও আর এক একত্ব আছে। "যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥",—যা এখানে তা সেখানে, যা সেখানে তা এখানে, মৃত্যু হইতে মৃত্যুমুখে পতিত হন, যিনি এই এ জগতে নানাত্ব দর্শন করেন। প্রত্যেক ব্যষ্টি অপর ব্যষ্টির সহিত একত্ব-সূত্রে গাঁথা। একের কল্যাণে অপরের কল্যাণ, একের অশুভ অপরের। পরের ভাল করা, আর নিজের ভাল করা, একই কথা। পরের মন্দ কর, তোমার উপর সে অমঙ্গলের প্রতিঘাত, আজ না হয় কাল, নিশ্চয়ই আসিবে। তুমি, আমি, তিনি যে এক। অবোধ আমরা জগৎ থেকে নিজেকে পৃথক্ করিতে চেষ্টা করি, যা হবার নয় তা চাই; ফল, অশেষ যন্ত্রণা। দেবদেব হইতে নরকের কীট-পর্য্যন্ত তোমারই

রূপ। "যো অন্যাং দেবতামুপাস্তে অন্যোঽসৌ অন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ', যে অন্য দেবতাকে উপাসনা করে, "দেবতা আমা হইতে ভিন্ন, আমি দেবতা ভিন্ন", এইরূপ মনে করিয়া, সে অজ্ঞান। বহুর পশ্চাৎ এক, ও একের মধ্যে অনন্ত,—এই দৃষ্টির নাম জ্ঞান। যোগী দিব্য ধ্যাননেত্রে এক ইষ্টদেবতার মধ্যে অনন্ত জগৎ ভাসমান দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে বলেন, "পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে, সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্"; জ্ঞানী "অশরীরং শরীরেষু, অনবস্থেষু অবস্থিতম্", পরিবর্ত্তনের পশ্চাৎ অপরিবর্ত্তন, অনিত্যের পশ্চাৎ নিত্য, মিথ্যার পশ্চাৎ সত্য অস্তি-ভাতি-প্রিয় সত্তা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া ভক্তি-প্রফুল্ল হৃদয়ে সকলকে আলিঙ্গন করেন।

এক সময়ে উপনিষদের একত্ব-জনিত ভালবাসার ভাবে ভারতবর্ষ টলমল করিত; সে প্রীতি আর আমাদের নাই। সে উপনিষদ্-প্রচারিত বলবীর্য্যও ভারতবর্ষ হারাইয়া ফেলিয়াছে। তবে, চিরদিন কখন সমান যায় না, দুঃখেরও অবসান আছে। আমরা ভবিষ্যতের গাঢ় অন্ধকারের দিকে একটীও জ্যোতি-রেখা দেখিতে উদ্গ্রীব রহিলাম। (সমাপ্ত)।

পাঁচ কথা।

দেখ, লিখ্বে, একটু তলিয়ে বুঝে সুঝে লিখো; সমালোচনা ক'রবে—খুব সমঝে ক'রো। সমালোচনা অতি পবিত্র জিনিষ। পবিত্র কায পবিত্র মনে, পবিত্র হাত দিয়ে, ক'রবে। সমালোচনা, বিচার প্রভৃতি অতি পবিত্র হ'য়ে ক'রতে হয়; ঈশ্বরকে স্মরণ ক'রে ক'রতে হয়। দ্বেষ হিংসা বশতঃ অমন ধারা কটু কাটব্য বের ক'রতে নেই। ছি, ছি! ভদ্রলোকের ছেলে, লেখাপড়া শিখেছো, একটা কাগজের ভার তুমি পেয়েছো—কোথায়, ধীর হবে, নম্র হবে, নিজের মর্য্যাদা রেখে কায করবে, পরের মান্য রেখে কথা কইবে, পরের যাতে মঙ্গল হয় তাই ক'রবে; তা না হ'য়ে, কার্ সঙ্গে লাগ্‌বো, কার্ ওপর পুরোণো রাগ ঝাড়্‌বো, কার্ মন্দ ক'রবো, কোথায় দু'পয়সা পাব—পেয়ে দু কলম লিখে কার সর্ব্বনাশ ক'রবো, এরূপ ক'রে বেড়ালে কি বাপু নিজের মঙ্গল হয়, না—দেশের হিত হয়? উচিত কথা ব'লবে—বলনা, খুব ব'লবে বই কি; কিন্তু মিষ্টি ক'রে ব'লবে,—যাতে কায হয়, যাতে ফল হয়, হিতে বিপরীত যাতে না হয়, দলাদলি যাতে না হয়।

মনে কর, তুমি তাড়িতের বিষয়ে কিছু গবেষণা করিতেছ। শিশু তোমাকে জিজ্ঞাসিতেছে, 'ইহাতে কি মিষ্টি কেনা যায়?' তুমি বলিলে, 'না'। 'তবে ইহাতে কি উপকার হইবে?' লোকেও এইরূপে দাঁড়াইয়া বলে, 'ইহাতে জগতের কি উপকার হইবে? ইহাতে কি আমাদের টাকা হইবে?' 'না'। 'তবে ইহাতে আর উপকার কি?' মানুষ জগতের হিত করা অর্থে এইরূপই বুঝিয়া থাকে। তথাপি ধর্ম্মের এই প্রত্যক্ষানুভূতিই জগতের সম্পূর্ণ উপকার করিয়া থাকে। লোকের ভয় হয়, যখন সে এই অবস্থা লাভ করিবে, যখন সে উপলব্ধি করিবে যে, সবই এক, তখন প্রেমের প্রস্রবণ শুকাইয়া যাইবে। জীবনের মূল্যবান যাহা কিছু সব চলিয়া যাইবে, এই জীবনে ও পরজীবনে তাহারা যাহা কিছু ভালবাসিত, সবই তাহাদের পক্ষে উড়িয়া যাইবে। লোকে এ বিষয় একবার ভাবিয়া দেখে না যে, যে সকল ব্যক্তি তাঁহাদের নিজের সম্বন্ধে খুব অল্প চিন্তা করিয়াছেন, তাঁহারাই জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্মী হইয়া গিয়াছেন। তখনই মানুষ যথার্থ ভালবাসে, যখন মানুষ দেখিতে পায়, তাহার ভালবাসার জিনিষ কোন ক্ষুদ্র মর্ত্ত্য জীব নহে। তখনই মানুষ যথার্থ ভালবাসিতে পারে, যখন সে দেখিতে পায়, তাহার ভালবাসার পাত্র—খানিকটা মৃত্তিকাখণ্ড নহে, স্বয়ং ভগবান। স্ত্রী স্বামীকে আরও অধিক ভাল বাসিবেন, যদি তিনি ভাবেন, স্বামী সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ। স্বামীও স্ত্রীকে অধিক ভালবাসিবেন, যদি তিনি জানিতে পারেন, স্ত্রী স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ। সেই মাতাও সন্তানগণকে বেশী ভাল বাসিবেন, যিনি সন্তানগণকে ব্রহ্মস্বরূপ দেখেন। সেই ব্যক্তি তাঁহার মহা শত্রুকেও প্রীতি করিবেন, যিনি জানেন, ঐ শত্রু সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ। সেই ব্যক্তিই সাধু ব্যক্তিকে ভাল বাসিবেন, যিনি জানেন সেই সাধু ব্যক্তি সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ। সেই লোকই আবার অতিশয় অসাধু ব্যক্তিকেও ভাল বাসিবেন, যিনি জানেন সেই অসাধুতম পুরুষেরও পশ্চাতে সেই প্রভু রহিয়াছেন। যাঁহার পক্ষে এই ক্ষুদ্র অহং একেবারে মৃত হইয়া গিয়াছে, এবং তৎস্থলে ঈশ্বর অধিকার করিয়া বসিয়াছেন, সেই ব্যক্তি জগৎকে ইঙ্গিতে পরিচালন করিতে পারেন। তাঁহার পক্ষে সমুদয় জগৎ সম্পূর্ণরূপে অন্য আকার ধারণ করে। দুঃখকর ক্লেশকর যাহা কিছু, সবই তাঁহার পক্ষে চলিয়া যায়; সকল প্রকার গোলমাল দ্বন্দ্ব মিটিয়া যায়। জগৎ তখন তাঁহার পক্ষে কারাগারস্বরূপ না হইয়া (যেখানে আমরা প্রতিদিন এক টুকরা রুটির জন্য ঝগড়া মারামারি করি) উহা আমাদের ক্রীড়াক্ষেত্ররূপে পরিণত হইবে।

তখন জগৎ অতি সুন্দরভাবে পরিণত হইবে। এইরূপ ব্যক্তিরই কেবল বলিবার অধিকার আছে যে, 'এই জগৎ কি সুন্দর!' তাঁহারই কেবল বলিবা অধিকার আছে যে, সবই মঙ্গলস্বরূপ। এইরূপ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হই জগতের এই মহান্ হিত হইবে যে, জগতের এই সকল বিবাদ গণ্ডগোল দূর হইয়া জগতে শান্তির রাজ্য হইবে—যদি জগতের সকল মানুষ আজ এই মহান্ সত্যের এক বিন্দুও উপলব্ধি করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে এই সমুদয় জগতই আর এক রূপ ধারণ করিবে, আর এই সব গণ্ডগোলের পরিবর্ত্তে শান্তির রাজত্ব আসবে। অসভ্যভাবে তাড়াতাড়ি করিয়া সকলকে ছাড়াইয়া যাইবার প্রবৃত্তি জগৎ হইতে চলিয়া যাইবে। উহার সঙ্গে সঙ্গেই সকল প্রকার অশান্তি, সকল প্রকার ঘৃণা, সকল প্রকার ঈর্ষা এবং সকল প্রকার অশুভ চিরকালের জন্য চলিয়া যায়। তখন দেবতারা এই জগতে বাস করিবেন। তখন এই জগৎই স্বর্গ হইয়া যাইবে, আর যখন দেবতায় দেবতায় খেলা, যখন দেবতায় দেবতায় কায, যখন দেবতা দেবতাকে ভালবাসে, তখন আর অশুভ কি থাকিতে পারে? ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির এই মহা সুফল। সমাজে তোমরা যাহা কিছু দেখিতেছ, সবই তখন পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্যরূপ ধারণ করিবে। তখন তোমরা মানুষকে আর খারাপ বলিযা দেখিবে না; ইহাই প্রথম মহা লাভ। তখন তুমি আর কোন অন্যায় কার্য্যকারী দরিদ্র নরনারীর দিকে ঘৃণাপূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করিবে না। হে মহিলাগণ, তোমরা আর, যে দুঃখিনী কামিনী রাত্রিতে পথে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, ঘৃণাপূর্ব্বক তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না, কারণ তুমি সেখানেও সাক্ষাৎ ঈশ্বরকে দেখিবে। তখন তোমার আর ঈর্ষা বা অপরকে শাস্তি দিবার ভাব উদয় হইবে না। ঐ সবই চলিয়া যাইবে, তখন প্রেম এত প্রবল হইবে যে, মানবজাতিকে সৎপথে পরিচালিত করিতে আর চাবুকের প্রয়োজন হইবে না।

যদি জগতের নরনারিগণের লক্ষভাগের এক ভাগও শুদ্ধ চুপ করিয়া বসিয়া থানিক ক্ষণের জন্যও বলেন, "তোমরা সকলেই ঈশ্বর। হে মানবগণ, হে পশুগণ, হে সর্ব্বপ্রকার জীবিত প্রাণী, তোমরা সকলেই এক জীবন্ত ঈশ্বরের প্রকাশ," তাহা হইলে অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যেই সমুদয় জগৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। তখন চতুর্দ্দিকে ঘৃণার বীজ প্রক্ষেপ না করিবা, ঈর্ষ্যা ও অসৎ চিন্তার প্রবাহ প্রক্ষেপ না করিয়া সকল দেশের লোকই চিন্তা করিবেন, সবই তিনি। যাহা কিছু দেখিতেছ বা অনুভব করিতেছ, সবই তিনি। তোমার মধ্যে অশুভ না

থাকিলে, তুমি অশুভ দেখিবে কিরূপে? তোমার মধ্যে চোর না থাকিলে, তুমি কেমন করিয়া চোর দেখিবে? তুমি নিজে খুনী না হইলে, খুনী দেখিবে কিরূপে? সাধু হও, তাহা হইলে অসাধু ভাব তোমার পক্ষে একেবারে চলিয়া যাইবে। এইরূপে সমুদয় জগৎ পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। ইহাই সমাজের মহৎ লাভ। মানুষের পক্ষে ইহা মহৎ লাভ। এই সকল ভাব ভারতে প্রাচীন কালে অনেক মহাত্মা আবিষ্কার ও কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। এই সকল আচার্য্যগণের সঙ্কীর্ণতা এবং দেশের পরাধীনতা প্রভৃতি নানাবিধ কারণে এই সকল চিন্তা চতুর্দ্দিকে প্রচার হইতে পায় নাই। তাহা না হইলেও এগুলি খুব মহাসত্য; যেখানেই এগুলি তাহাদের প্রভাব বিস্তার করিতে পাইয়াছে, সেই খানেই মানুষ দেবভাবাপন্ন হইয়াছে। এইরূপ একজন দেব-প্রকৃতিক মানুষের দ্বারা আমার সমুদয় জীবনটী পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে; ইঁহার সম্বন্ধে আগামী রবিবার তোমাদের নিকট বলিব। এক্ষণে এই সকল ভাব সমুদয় জগতে প্রচারিত হইবার সময় আসিয়াছে। মঠে আবদ্ধ না থাকিয়া, কেবল পণ্ডিতদের পাঠের জন্য দর্শনের পুস্তক সমূহে আবদ্ধ না থাকিয়া, কেবল কতকগুলি সম্প্রদায়ের এবং কতকগুলি পণ্ডিত ব্যক্তির এক-চেটিয়া অধিকার না থাকিয়া, উহা সমুদয় জগতে প্রচারিত হইবে, যাহাতে উহা সাধু পাপী, আবালবৃদ্ধবনিতা, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি হইতে পারে। তখন এই সকল ভাব জগতের বায়ুতে খেলা করিতে থাকিবে, আর আমরা যে বায়ু শ্বাসপ্রশ্বাস দ্বারা গ্রহণ করিতেছি, তাহার প্রত্যেক তালে তালে বলিবে, 'তত্ত্বমসি।' এই অসংখ্যচন্দ্রসূর্য্যপূর্ণ সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড, বাক্য উচ্চারণকারী প্রত্যেক পদার্থের ভিতর দিয়া বলিবে, 'তত্ত্বমসি।'

মায়া ও ঈশ্বরধারণার ক্রমবিকাশ।

আমরা দেখিয়াছি, অদ্বৈত বেদান্তের একতম মূলভিত্তিস্বরূপ মায়াবাদ অস্ফুটভাবে সংহিতাতেও দেখিতে পাওয়া যায়, আর প্রকৃতপক্ষে উপনিষদে যে সকল তত্ত্ব খুব পরিস্ফুট ভাব ধারণ করিয়াছে, সংহিতাতে তাহার সকলগুলিই অস্ফুটভাবে কোন না কোন আকারে বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। আপনারা অনেকেই এক্ষণে মায়াবাদের তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়াছেন এবং বুঝিতে পারিয়াছেন, অনেক সময় লোকে ভ্রান্তিবশতঃ মায়াকে 'ভ্রম' বলিয়া

ব্যাখ্যা করে, অতএব তাঁহারা যখন জগৎকে মায়া বলেন, তখন উহাকেও 'ভ্রম' বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হয়। মায়ার 'ভ্রম' এই অর্থ বড় ঠিক নহে। মায়া কোন বিশেষ মত নহে, উহা কেবল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ বর্ণনা মাত্র। এই মায়াকে বুঝিতে হইলে আমাদিগকে সেই সংহিতা পর্য্যন্ত যাইতে হইবে, এবং প্রথমে মায়া সম্বন্ধে কি ধারণা ছিল, তাহা পর্য্যন্ত দেখিতে হইবে। আমরা দেখিয়াছি, লোকের দেবতার জ্ঞান কিরূপে আসিল। কিন্তু বুঝিতে হইবে, এই দেবতারা প্রথমে কেবল শক্তিশালী পুরুষ মাত্র ছিলেন। আপনারা অনেকে গ্রীক্, হিব্রু, পারসী বা অপরাপর জাতির প্রাচীন শাস্ত্রে দেবতারা আমাদের দৃষ্টিতে যে সকল কার্য্য অতীব ঘৃণিত, সেই সকল কার্য্য করিতেছেন, এইরূপ বর্ণনা দেখিয়া ভীত হইয়া থাকেন; কিন্তু আমরা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যাই যে, আমরা উনবিংশ শতাব্দীর লোক, আর এই সব দেবতা অনেক সহস্র বর্ষ পূর্ব্বের জীব; আর আমরা ইহাও ভুলিয়া যাই যে, ঐ সকল দেবতার উপাসকেরা তাঁহাদের চরিত্রে কিছু অসঙ্গত দেখিতে পাইতেন না, বা তাঁহারা তাঁহাদের দেবতাদের যেরূপ বর্ণনা করিতেন, তাহাতে তাঁহারা কিছুমাত্র ভয় পাইতেন না, কারণ, সেই সকল দেবতারা তাঁহাদেরই মত ছিলেন। আমাদের সারা জীবনে আমাদের এই শিক্ষা করিতে হইবে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার নিজ নিজ আদর্শানুসারে বিচার করিতে হইবে, অপরের আদর্শানুসারে নয়। তাহা না করিয়া আমরা আমাদের নিজ আদর্শ দ্বারা অপরের বিচার করিয়া থাকি। এরূপ করা উচিত নয়। আমাদের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী লোকসকলের সহিত ব্যবহার করিবার সময় আমরা সর্ব্বদাই এই ভুল পড়ি, আর আমার ধারণা,—অপরের সহিত আমাদের যাহা কিছু বিবাদ বিসম্বাদ হয়, তাহা কেবল এই এক কারণ হইতে হয় যে, আমরা অপরের দেবতাকে আমাদের নিজ দেবতা দ্বারা, অপরাপর আদর্শ আমাদের আদর্শ দ্বারা এবং অপরের অভিসন্ধি আমাদের নিজ অভিসন্ধি দ্বারা বিচার করিতে চেষ্টা করিয়া থাকি। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় আমি হয়ত কোন বিশেষ কার্য্য করিতে পারি, আর যখন আমি দেখি, আর এক জন লোক সেইরূপ কার্য্য করিতেছে, আমি মনে করিয়া লই, তাহারও সেই অভিসন্ধি; আমার মনে একথা একবারও উদয় হয় না যে, যদিও ফল সমান হইতে পারে, তথাপি ভিন্ন ভিন্ন সহস্র সহস্র কারণ সেই একই ফল প্রসব করিতে পারে। আমি যে কারণে সেই কার্য্য করিতে প্রেরিত হইয়া থাকি, তিনি সেই কার্য্য অন্য অভিসন্ধিতে করিতে পারেন।

সুতরাং ঐ সকল প্রাচীন ধর্ম্ম বিচার করিবার সময়, আমরা যে ভাবে অপরের সম্বন্ধে বিচার করিয়া থাকি, সেরূপভাবে যেন বিচারে অগ্রসর না হই, কিন্তু আমরা যেন সেই প্রাচীন কালের চিন্তাপ্রণালীর ভাবে আপনাদিকে ভাবিত করিয়া বিচার করি।

ওল্ড টেষ্টামেণ্টের নিষ্ঠুর জিহোভার বর্ণনায় অনেকে ভীত হইয়া থাকেন, কিন্তু ভীত হইবার কারণ কি? লোকের ইহা কল্পনা করিবার কি অধিকার আছে যে, প্রাচীন য়াহুদীদিগের জিহোভা আজকালকার ঈশ্বরের মত হইবেন? আবার ইহাও আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, আমাদের পরে যাঁহারা আসিবেন, তাঁহারা, আমরা যে ভাবে প্রাচীনদের ধর্ম্ম বা ঈশ্বরের ধারণায় হাস্য করিয়া থাকি, আমাদের ধর্ম্ম বা ঈশ্বরের ধারণায়ও সেই ভাবে হাস্য করি- বেন। তাহা হইলেও এই সকল বিভিন্ন ঈশ্বর ধারণা সোণার সূতায় গ্রথিত, আর বেদান্তের উদ্দেশ্য এই সূত্র আবিষ্কার করা। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, ভিন্ন ভিন্ন মণি যেমন এক সূত্রে গথিত, সেইরূপ এই সকল বিভিন্ন ভাবের ভিতরেও এক সূত্র প্রবাহিত। আর আধুনিক ধারণানুসারে সেগুলি যতই বীভৎস, ভয়ানক বা ঘৃণিত বলিয়া প্রতীয়মান হউক না কেন, বেদান্তের কর্ত্তব্য ঐ সকল ধারণা এবং বর্ত্তমান ধারণা সকলের ভিতর এই সংযোগসূত্র আবিষ্কার করা। ভূতকালের অবস্থা লইয়া বিচার করিলে সে গুলি বেশ সঙ্গত দেখায়, আর বোধ হয়, আমাদের বর্ত্তমান ধারণা সকল হইতে অধিক বীভৎস ছিল না। যখন আমরা সেই প্রাচীনকালের সমাজের অবস্থা, প্রাচীনকালের লোকের নৈতিক ভাব, যাহার ভিতরে ঐ দেবতার ভাব বিকাশ পাইবার অবকাশ পাইয়াছিল, তাহা হইতে পৃথক্ করিয়া সেই ভাবগুলিকে দেখিতে যাই, তখনই তাহাদের বীভৎসতা প্রকাশ হইয়া পড়ে। প্রাচীনকালের সমাজের অবস্থা এখন ত আর নাই! যেমন প্রাচীন য়াহুদী বর্ত্তমান তীক্ষ্ণবুদ্ধি য়াহুদীতে পরিণত হইয়াছেন, যেমন প্রাচীন আর্য্যেরা আধুনিক বুদ্ধিমান হিন্দুতে পরিণত হইয়াছেন, সেই- রূপ জিহোভার ক্রমোন্নতি হইয়াছে, দেবতাদেরও হইয়াছে। আমরা ভুল করি এই যে, উপাসকের ক্রমোন্নতি স্বীকার করিয়া থাকি, ঈশ্বরের ক্রমোন্নতি স্বীকার করি না। তাঁহার উপাসকদিগকে আমরা উন্নতি করিতেছেন বলিয়া যেটুকু প্রশংসাবাদ প্রদান করি, ঈশ্বরকে তাহাও দিতে নারাজ। কথাটা এই, তুমি আমি যেমন কোন বিশেষ ভাবের প্রকাশক বলিয়া ঐ ভাবের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তোমার আমার উন্নতি হইয়াছে, সেইরূপ দেবতারাও বিশেষ বিশেষ

ভাবের দ্যোতক বলিয়া, ভাবের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেবতারও উন্নতি হইয়াছে। তোমাদের পক্ষে এইটী আশ্চর্য্য বোধ হইতে পারে যে, দেবতা বা ঈশ্বরের আবার উন্নতি হয় কি? এরূপভাবে ধরিলে ইহাও ত বলা যায় যে, মানুষেরও কখন উন্নতি হয় না। আমরা পরে দেখিব, এই মানুষের ভিতর যে প্রকৃত মানুষ রহিয়াছেন, তিনি অচল, অপরিণামী, শুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত যেমন এই মানুষ সেই প্রকৃত মানুষের ছায়া মাত্র, তদ্রূপ আমাদের ঈশ্বরধারণ কেবল আমাদের মনের সৃষ্টমাত্র—উহারা সেই প্রকৃত ঈশ্বরের আংশিক প্রকাশ, আভাসমাত্র। ঐ সকল আংশিক প্রকাশের পশ্চাতে প্রকৃত ঈশ্বর রহিয়াছেন, তিনি নিত্যশুদ্ধ, অপরিণামী। কিন্তু ঐ সকল আংশিক প্রকাশ সর্ব্বদাই পরিণামশীল—উহারা সেই পশ্চাতস্থ সত্যকে ক্রমশঃ ক্রমশঃ আরো প্রকাশ করিতেছে। যখন উহারা সেই সত্য অধিক পরিমাণে প্রকাশ করে, তখন উহাকে উন্নতি বলে, আর যখন উহা ঐ সত্যের অধিকাংশ আবৃত করিয়া রাখে, তখন উহাকে অবনতি বলে। এইরূপে যেমন আমাদের উন্নতি হয়, তেমনি দেবতারও উন্নতি হয়। মোটামুটী ধরিয়া গেলে, যেমন আমাদের উন্নতি হয়, আমাদের স্বরূপ যেমন প্রকাশ হয়, তেমনি দেবগণও তাঁহাদের স্বরূপ প্রকাশ করিতে থাকেন।

এক্ষণে আমরা মায়াবাদ বুঝিতে সমর্থ হইব। জগতের সকল ধর্ম্মই এই এক প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছেন, জগতে এই অসামঞ্জস্য কেন? জগতে এই অশুভ কেন? আমরা ধর্ম্মভাবের প্রথম আরম্ভের সময় এই প্রশ্ন পাই না, তাহার কারণ আদিম মনুষ্যের পক্ষে জগৎ অসামঞ্জস্যপূর্ণ বোধ হয় নাই। তাহার চতুর্দ্দিকে কোন অসামঞ্জস্য ছিল না, কোন প্রকার মতবিরোধ ছিল না, ভালমন্দের কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না। কেবল তাঁহাদের হৃদয়ে দুইটী জিনিষের সংগ্রাম হইত। একটী বলিত, এই কর, আর একটী তাহা করিতে নিষেধ করিত। প্রাথমিক মনুষ্য ভাবের দাস ছিলেন। তাঁহার মনে যাহা উদয় হইত, তাহাই তিনি করিতেন। তিনি নিজের এই ভাব সম্বন্ধে বিচার করিবার বা উহাকে সংযম করিবার চেষ্টা মোটেই করিতেন না। এই সকল দেবতা সম্বন্ধেও তদ্রূপ; ইঁহারাও উপস্থিত প্রবৃত্তির অধীন ছিলেন। ইন্দ্র আসিলেন, আর দৈত্যবল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন। জিহোভা কাহারও প্রতি সন্তুষ্ট, কাহারও প্রতি বা রুষ্ট; কেন—তাহা কেহ জানে না, জিজ্ঞাসাও করে না। ইহার কারণ, তখন অনুসন্ধানের প্রবৃত্তিই লোকের জাগরূক হয় নাই, সুতরাং তিনি

যাহা করেন, তাহাই ভাল। তখন ভালমন্দের কোন ধারণা নাই। আমরা যাহাকে মন্দ বলি, দেবতারা এমন অনেক কায করিতেছেন; বেদে দেখিতে পাই, ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতারা অনেক মন্দ কায করিতেছেন, কিন্তু ইন্দ্রের উপাসকদিগের দৃষ্টিতে পাপ বা অসৎ কার্য্য কিছু ছিল না, সুতরাং তাঁহারা সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিতেন না।

নৈতিক ভাবের উন্নতির সহিত মানুষের মনে এক যুদ্ধ বাধিল। মানুষের ভিতরে যেন একটী নূতন ইন্দ্রিয়ের আবির্ভাব হইল। ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন ভিন্ন জাতি উহাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করিয়াছেন; কেহ কেহ বলেন, উহা ঈশ্বরের বাণী, কেহ কেহ বলেন, উহা পূর্ব্ব শিক্ষার ফল; যাহাই হউক, উহা প্রবৃত্তির দমনকারী শক্তিরূপে কার্য্য করিয়াছিল। আমাদের মনের একটী প্রবৃত্তিতে বলে, এই কায কর, আর একটী বলে, করিও না। আমাদের ভিতরে কতকগুলি প্রবৃত্তি আছে, সেগুলি ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া বাহিরে যাইবার চেষ্টা করিতেছে, আর তাহার পশ্চাতে, যতই ক্ষীণ হউক না কেন, আর একটী স্বর বলিতেছে, বাহিরে যাইও না। এই দুইটী ব্যাপারের সংস্কৃত নাম—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। প্রবৃত্তিই আমাদের সকল কর্ম্মের মূল। নিবৃত্তি হইতেই ধর্ম্মের উদ্ভব। ধর্ম্ম আরম্ভ হয়, এই 'করিও না' হইতে; আধ্যাত্মিকতাও ঐ 'করিও না' হইতেই আরম্ভ হয়। যেখানে এই 'করিও না' নাই, সেখানে ধর্ম্মের আরম্ভই হয় নাই, বুঝিতে হইবে। এই 'করিও না'—এই নিবৃত্তির ভাব আসিল। মানুষের ধারণা তাহাদের যুদ্ধশীল পাশবপ্রকৃতি দেবতাসত্ত্বেও উন্নত হইতে লাগিল।

এক্ষণে মানুষের হৃদয়ে একটু ভালবাসা প্রবেশ করিল। অবশ্য খুব অল্প ভালবাসাই তাহাদের হৃদয়ে আসিয়াছিল, আর এখনও যে উহা বড় বেশী, তাহা নহে। প্রথম উহা জাতিতে বদ্ধ ছিল; এই দেবগণ কেবল তাঁহাদের সম্প্রদায়কেই মাত্র ভাল বাসিতেন। প্রত্যেক দেবতাই জাতীয় দেবতামাত্রই ছিলেন, কেবল সেই বিশেষ জাতির রক্ষক মাত্রই ছিলেন। আর অনেক সময় ঐ জাতির অঙ্গেরা আপনাদিগকে ঐ দেবতার বংশধর বলিয়া বিবেচনা করিত, যেমন ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিভিন্ন বংশীয়েরা আপনাদিগকে তাঁহাদের এক সাধারণ গোষ্ঠীপতির বংশধর বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। প্রাচীন কালে কতকগুলি জাতি ছিল, এখনও আছে, যাহারা আপনাদিগকে সূর্য্য ও চন্দ্রের বংশধর বলিয়া বিবেচনা করিত। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সকলে আপনারা সূর্য্য-

বংশের বড় বড় বীর সম্রাড়্গণের কথা পাঠ করিয়াছেন। ইঁহারা প্রথমে চন্দ্র সূর্য্যের উপাসক ছিলেন; ক্রমশঃ আপনাদিগকে ঐ চন্দ্রসূর্য্যদেবের বংশধর বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন। সুতরাং যখন এই জাতীয় ভাব আসিতে লাগিল, তখন একটু ভালবাসা আসিল, পরস্পরের প্রতি একটু কর্ত্তব্যের ভাব আসিল, একটু সামাজিক শৃঙ্খলার উৎপত্তি হইল, আর অমনি এই ভাবও আসিতে লাগিল, আমরা পরস্পরের দোষ সহ্য ও ক্ষমা না করিয়া, কিরূপে একত্রে বাস করিতে পারি? মানুষ কি করিয়া অন্ততঃ কোন না কোন সময়ে নিজ মনের প্রবৃত্তি সংযম না করিয়া, অপরের—এমন কি, এক জনেরও সহিত বাস করিতে পারে? উহা অসম্ভব। এইরূপেই সংযমের ভাব আইসে। এই সংযমের ভাবের উপর সমুদয় সমাজ গ্রথিত, আর আমরা জানি, যে নর বা নারী এই সহ্য বা ক্ষমারূপ মহান্ শিক্ষা না শিখিয়াছেন, তিনি অতি কষ্টের জীবন যাপন করেন।

অতএব যখন এইরূপ ধর্ম্মের ভাব আসিল, তখন মানুষের মনে কিছু উচ্চতর, অপেক্ষাকৃত অধিক নীতিসঙ্গত একটু ভাবের আভাস আসিল। প্রাচীন দেবগণ—চঞ্চল, সমর পরায়ণ, মদ্যপায়ী, গোমাংসভুক্ দেবগণ—যাঁহাদের দগ্ধ মাংসের গন্ধে এবং তীব্র সুরার আহুতিতেই পরম আনন্দ ছিল—তাঁহাদিগকে কেমন গোলমেলে ঠেকিতে লাগিল। কখন কখন ইন্দ্র হয় ত এত মদ্যপান করিতেছেন যে, তিনি মাটীতে পড়িয়া অবোধ্যভাবে বকিতে আরম্ভ করিলেন! এরূপ দেবতায় আর লোকের বিশ্বাস স্থাপন অসম্ভব হইল। তখন সকলেরই অভিসন্ধি অন্বেষিত—জিজ্ঞাসিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল—দেবতাদেরও কার্য্যের অভিসন্ধি জিজ্ঞাসিত হইতে লাগিল। অমুক দেবতার অমুক কার্য্যের হেতু কি? কোন হেতুই পাওয়া গেল না। সুতরাং লোকে এই সকল দেবতা পরিত্যাগ করিল, অথবা তাহারা দেবতার আরো উচ্চতর ধারণা করিতে লাগিল। তাহারা দেবতাদের কার্য্যগুলির মধ্যে যে গুলি ভাল, যে গুলি তাহারা বুঝিতে পারিল, সেগুলি সব একত্রিত করিল, আর যে গুলি বুঝিতে পারিল না বা যে গুলি তাহাদের ভাল বলিয়া বোধ হইল না, সে গুলিকেও পৃথক্ করিল; এই ভালগুলির সমষ্টিকে তাহারা দেবদেব এই আখ্যা প্রদান করিল। তাঁহাদের উপাস্য দেবতা তখন কেবলমাত্র শক্তির পরিচায়ক রহিলেন না, শক্তি হইতে আরও কিছু অধিক তাঁহাদের পক্ষে আবশ্যক হইল। তিনি নীতিপরায়ণ দেবতা হইলেন; তিনি মনুষ্যকে ভালবাসিতে লাগিলেন,

ভাষ্য।—কেবলং সত্ত্বশুদ্ধিমাত্রফলমেব তস্য কর্ম্মণঃ স্যাৎ যস্মাৎ কায়েন মনসা বুদ্ধ্যাচ কেবলৈর্ম্মমত্ববর্জ্জিতৈরীশ্বরায়ৈব কর্ম্ম করোমি ন মম ফলায় ইতি মমত্ববুদ্ধিশূন্যৈরিন্দ্রিয়ৈরপি কেবলশব্দঃ কায়াদিভিরপি প্রত্যেকমভিসম্বধ্যতে সর্ব্বব্যাপারেষু মমতাবর্জ্জনায় যোগিনঃ কর্ম্মিণঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলবিষয়মাত্মশুদ্ধয়ে সত্ত্বশুদ্ধয়ে ইত্যর্থঃ। তস্মাৎ তত্রৈব তবাধিকারঃ॥ ১১॥

ভাষ্যানুবাদ।—তাহার কর্ম্মের ফল কেবল চিত্তশুদ্ধিই হয়, যে হেতু দেহ মন বুদ্ধিদ্বারা এবং কেবল ইন্দ্রিয়নিচয়ের দ্বারা যোগী (অর্থাৎ) কর্ম্মিগণ সকল ব্যাপারেই মমতা বর্জ্জন করিবার জন্য সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া আত্মশুদ্ধি (অর্থাৎ) চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। এই শ্লোকে 'কেবল' এই শব্দটীর অর্থ মমত্ববুদ্ধিশূন্য (অর্থাৎ) মমতাবর্জ্জিত, আমি ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম করিতেছি, ইহার ফল আমার লক্ষ্য নহে, এই প্রকার বুদ্ধি দ্বারা যে ইন্দ্রিয় পরিচালিত হয়, তাহাকেই 'কেবল ইন্দ্রিয়' বলা যায়। দেহাদি প্রত্যেক পদার্থের সহিত 'কেবল' শব্দের অন্বয় করিতে হইবে। সেই কারণে সেই কর্ম্মেতেই তোমার অধিকার, এইজন্য তুমি কর্ম্মই কর॥ ১১॥

যুক্তঃ কর্ম্ম ফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে॥ ১২॥

অন্বয়।—যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা নৈষ্ঠিকীং শান্তিমাপ্নোতি, অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তঃ নিবধ্যতে॥ ১২॥

মূলানুবাদ।—ঈশ্বরার্থ কর্ম্মকর্ত্তা কর্ম্মফলকে ঈশ্বরে পরিত্যাগ করিয়া, নৈষ্ঠিকী শান্তি লাভ করিতে পারে। অযুক্ত (অর্থাৎ ঈশ্বরার্থ কর্ম্মের অনুষ্ঠান যে না করে, সেই অযুক্ত) ব্যক্তি কামনা বশে ফলে সক্ত হইয়া নিবদ্ধ হইয়া থাকে॥ ১১॥

ভাষ্য।—যস্মাচ্চ যুক্ত ঈশ্বরায় কর্ম্মাণি ন মম ফলায় ইত্যেবং সমাহিতঃ সন্ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা পরিত্যজ্য শান্তিং মোক্ষাখ্যাং আপ্নোতি নৈষ্ঠিকীং, নিষ্ঠায়াং ভবাং, সত্ত্বশুদ্ধিজ্ঞানপ্রাপ্তিসর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসজ্ঞাননিষ্ঠাক্রমেণ ইতি বাক্যশেষঃ। যস্তু পুনরযুক্তোঽসমাহিতঃ কামকারেণ করণং কারঃ কামস্য কারঃ কামকারঃ তেন কামকারেণ কামপ্রেরিততয়া ইত্যর্থঃ। মম ফলায় ইদং করোমি কর্ম্ম ইত্যেবং ফলে সক্তো নিবধ্যতে, অতস্ত্বং যুক্তো-ভবেত্যর্থঃ॥ ১২॥

ভাষ্যানুবাদ।—(আরও) যে কারণে যুক্ত, (অর্থাৎ) ঈশ্বরের জন্যই কর্ম্ম, আমার ফলের জন্য নহে, এই প্রকার নিশ্চয়বিশিষ্ট (কর্ম্মী) কর্ম্মফলকে পরিত্যাগ করিয়া, নৈষ্ঠিকী (অর্থাৎ) জ্ঞাননিষ্ঠার ফলস্বরূপ মোক্ষনামক শান্তিকে লাভ করিয়া থাকে, (অর্থাৎ) "কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি, জ্ঞানপ্রাপ্তি, সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাস ও জ্ঞাননিষ্ঠা লাভ করিয়া," (পরে মোক্ষ লাভ করিতে পারে), এতদূর পর্য্যন্ত বাক্যের শেষাংশ। যে ব্যক্তি কিন্তু অযুক্ত, (অর্থাৎ) অসমাহিত (যাহার ফলে কামনা আছে, ঈশ্বরার্থ কর্ম্মের অনুষ্ঠান নাই, তাহাকেই অসমাহিত বলা যায়), সে ব্যক্তি, কামকার দ্বারা, (অর্থাৎ) "আমি ফল লাভের জন্য কার্য্য করিতেছি," এই বুদ্ধিতে ফলে আসক্ত হইয়া নিবদ্ধ হয়। কার শব্দের অর্থ করণ, কামের করণ এই তাৎপর্য্যে কামকার শব্দটী এই স্থানে প্রযুক্ত হইয়াছে; কামকার দ্বারা এই প্রকার প্রয়োগ করিলে বুঝা যায় যে কামের প্রেরণায়। এই কারণে তুমি যুক্ত হও ইহাই অর্থ ॥ ১২ ॥

সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়।—বশী (জিতেন্দ্রিয়ঃ) দেহী সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্য নৈব কুর্ব্বন্, (নবা) কারয়ন্, নবদ্বারে পুরে সুখং (যথাস্যাৎ তথা) আস্তে ॥ ১৩ ॥

মূলানুবাদ।—জিতেন্দ্রিয় দেহী নিজে কোনপ্রকার কর্ম্ম না করিয়া, কিম্বা কাহারও দ্বারা না করাইয়া, বিবেকবুদ্ধিদ্বারা সকল প্রকার কর্ম্মের অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক নবদ্বার পুর স্বরূপ এই দেহে সুখে বিদ্যমান থাকে ॥ ১৩ ॥

ভাষ্য।—যস্তু পরমার্থদর্শী স সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সর্ব্বকর্ম্মাণি সংন্যস্য পরিত্যজ্য নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং প্রতিষিদ্ধং চ সর্ব্বকর্ম্মাণি তানি মনসা বিবেকবুদ্ধ্যা কর্ম্মাদাবকর্ম্মদর্শনেন সংত্যজ্যেত্যর্থঃ। আস্তে তিষ্ঠতি সুখং ত্যক্তবাঙ্মনঃকায়চেষ্টো নিরায়াসঃ প্রসন্নচিত্ত আত্মনোহন্যত্র নিবৃত্তবাহ্যসর্ব্বপ্রয়োজন ইতি সুখমাস্তে ইত্যুচ্যতে বশী জিতেন্দ্রিয় ইত্যর্থঃ ক্ব কথমাস্তে ইত্যাহ নবদ্বারে পুরে সপ্তশীর্ষণ্যানি আত্মন উপলব্ধিদ্বারাণি অর্ব্বাগ্ দ্বে মূত্রপুরীষবিসর্গার্থে তৈর্দ্বারৈর্নবদ্বারং পুরমুচ্যতে শরীরং পুরমিব পুরমাত্মৈকস্বামিকং তদর্থপ্রয়োজনৈশ্চেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিবিষয়ৈরনেকফলবিজ্ঞানস্যোৎপাদকৈঃ পৌরৈরিবাধিষ্ঠিতং তস্মিন্ নবদ্বারে পুরে দেহী সর্ব্বং কর্ম্ম সংন্যস্যাস্তে ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—যে ব্যক্তি কিন্তু পরমার্থদর্শী, সে ব্যক্তি সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ

করিয়া (অর্থাৎ) নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য ও প্রতিষিদ্ধ এই সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম, মনঃ (অর্থাৎ) বিবেকবুদ্ধির দ্বারা কর্ম্মাদিতে অকর্ম্মদৃষ্টির সাহায্যে পরিত্যাগ করিয়া, বশী, (অর্থাৎ) জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি, সুখে অবস্থিতি করে, (অর্থাৎ) বাক্য মনঃ ও কায়ের চেষ্টা পরিহারপূর্ব্বক, বিনা আয়াসে, প্রসন্নচিত্তে, আত্মব্যতিরিক্ত সকল বস্তুতে বাহ্য প্রয়োজন বুদ্ধির নিবৃত্তি করিয়া অবস্থিতি করাকেই, সুখের সহিত অবস্থান বলা যায়। কোথায়, কি প্রকারে অবস্থিতি করে? (তাহাই বলা হইতেছে) নবদ্বারযুক্ত পুরে। আত্মার উপলব্ধির দ্বারস্বরূপ সাতটী ছিদ্র শীর্ষে এবং মূত্র ও পুরীষের পরিত্যাগের জন্য নিম্নদেহে দুইটী ছিদ্র, এই নয়টী দ্বারের সহিত যুক্ত শরীরকে পুর বলা যায়, কারণ ইহাও পুরের ন্যায়, প্রভুস্থানীয় এক আত্মার ভোগের সাধন; ইন্দ্রিয় মন এবং বুদ্ধির বিষয়, আত্মার ভোগসাধন, নানাজাতীয় ফল ও বিজ্ঞানের উৎপাদক—শব্দস্পর্শাদিরূপ পুরবাসিজনও এই দেহরূপ পুরে বাস করিয়া থাকে; সেই নবদ্বারযুক্ত পুরে পূর্ব্বোক্ত জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সুখে বাস করিয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

ভাষ্য।—কিং বিশেষণেন? সর্ব্বোহি দেহী সংন্যাসী অসংন্যাসীবা দেহ এবাস্তে, তত্রানর্থকং বিশেষণমিতি উচ্যতে যস্ত অজ্ঞোদেহী দেহেন্দ্রিয়সংঘাতাত্মদর্শী, স সর্ব্বোহপি গেহে ভূমাবাসনে বা আসে ইতি মন্যতে। নহি দেহমাত্রাত্মদর্শিনো-গেহইব দেহ আসে ইতি প্রত্যয়ঃ সংভবতি। দেহাদিসংঘাতব্যতিরিক্তাত্মদর্শিনস্তু দেহ আসইতি প্রত্যয় উপপদ্যতে। পরকর্ম্মণাঞ্চ পরস্মিন্ আত্মনি অবিদ্যয়া অধ্যারোপিতানাং বিবেকজ্ঞানেন মনসা সংন্যাস উপপদ্যতে। উৎপন্নবিবেক-জ্ঞানস্য সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসিনোহপি গেহইব দেহ এব নবদ্বারে পুরে আসনং প্রারব্ধফলকর্ম্মসংস্কারশেষানুবৃত্ত্যা দেহএব বিশেষবিজ্ঞানোৎপত্তের্দেহএবাস্তে ইত্যস্ত্যেব বিশেষণফলং।

ভাষ্যানুবাদ।—বিশেষ করিয়া বলিবার কি প্রয়োজন? সংন্যাসী বা অসং-ন্যাসী সকল দেহীই দেহেতেই অবস্থান করিয়া থাকে, সুতরাং জিতেন্দ্রিয় তত্ত্ব-জ্ঞানী দেহেতে সুখে থাকেন, এই প্রকারে বিশেষ করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। এই প্রকার শঙ্কার সমাধান করিবার জন্য বলা যাইতেছে যে, যে ব্যক্তি অজ্ঞ (অর্থাৎ) দেহ ও ইন্দ্রিয়নিচয়ে যাহার আত্মাভিমান আছে, সাধারণতঃ সে বিবেচনা করিয়া থাকে যে, আমি ভূমিতে বা আসনে আছি। যাহার দেহেতে আত্মত্বজ্ঞান আছে, সে যেমন গৃহে আছি ইহা ভাবিয়া থাকে, সেইরূপ আমি দেহে আছি এই প্রকার ভাবিতে পারে না। যে ব্যক্তি কিন্তু দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি

হইতে আত্মাকে পৃথক্ বলিয়া জানিয়াছে, তাহারই "আমি দেহেতে আছি" এই প্রকার প্রতীতি হইতে পারে। আত্মা হইতে ভিন্ন দেহাদির কর্ম্ম, অবিদ্যা-প্রভাবেই আত্মাতে আরোপিত হইয়া থাকে, সেই সকল আরোপিত কর্ম্মের সংন্যাস বিদ্যার প্রভাবেই হইয়া থাকে। যাহার বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে এবং যে ব্যক্তি সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসী তাহার পক্ষেই এই নবদ্বারযুক্ত পুরস্বরূপ দেহে গৃহের ন্যায় স্থিতি প্রতিপন্ন হয়। যে কর্ম্ম ফল দিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহার অবশিষ্টাংশ ও তাহার সহকারী সংস্কারের অনুবৃত্তি অপরিহার্য্য, এই কারণ এই দেহ থাকিতে থাকিতেই, তাহার বিশেষ জ্ঞানের উৎপত্তি হইলেও সে দেহেতেই সুখে অবস্থিতি করে, এই প্রকার বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। বিদ্বান ও অবিদ্বানের জ্ঞানের পার্থক্যকে অপেক্ষা করিয়াই, এই প্রকার বিশেষ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ১৩॥

ভাষ্য —যদ্যপি কার্য্যকরণকর্ম্মাণি অবিদ্যয়া আত্মনি অধ্যারোপিতানি সংন্যস্যাস্তে ইত্যুক্তং তথাপি আত্মসমবায়িতু কর্তৃত্বং কারয়িতৃত্বঞ্চ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ নৈবকুর্ব্বন স্বয়ং ন কার্য্যকরণানি ক্রিয়াসু প্রবর্ত্তয়ন্। কিং যং তৎ কর্তৃত্বং কারয়িতৃত্বঞ্চ দেহিন স্বাত্মসমবায়ি সং সংন্যাসান্ন ভবতি যথা গচ্ছতোগতির্গমনব্যাপারপরিত্যাগে ন স্যাৎ তদ্বৎ কিংবা স্বত এবাত্মনোনাস্তি। অত্রোচ্যতে নাস্ত্যাত্মনঃ স্বতঃ কর্তৃত্বং কারয়িতৃত্বঞ্চ উক্তংহি "অবিকার্য্যোহয়মুচ্যতে" শরীরস্থোহপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ইতি "ধ্যায়তীব লেলায়তীব" ইতি চ শ্রুতেঃ ॥ ১৩॥

ভাষ্যানুবাদ।—যদি চ এই স্থলে সামান্যতঃ বলা হইয়াছে যে, "কার্য্য (দেহ) ও করণ (ইন্দ্রিয়) প্রভৃতির ধর্ম্ম অজ্ঞানের দ্বারা আত্মাতে আরোপিত হইয়া থাকে" তাহার সংন্যাস করিয়া দেহে অবস্থিত হয়। তথাপি আত্মার নিজকর্তৃত্ব ও কারয়িতৃত্বও হইতে পারে? এই প্রকার শঙ্কা করিয়া তাহার উত্তর স্বরূপে বলা হইতেছে যে, আত্মা নিজেও কোন প্রকার কার্য্য না করিয়া অথবা দেহ বা ইন্দ্রিয় নিচয়কে কোন কার্য্যে প্রবর্ত্তিত না করিয়া এই দেহে সুখে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। এইক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতেছে যে যেমন কোন ব্যক্তি স্বয়ং গমন করে এবং তাহার গমনানুকূলব্যাপারের নিবৃত্তি হইলে, সেই ব্যক্তির গমনের অভাব হয়, সেইরূপ আত্মার স্বভাবসিদ্ধ কর্তৃত্ব কিম্বা কারয়িতৃত্ব সংন্যাসের দ্বারা নিবৃত্ত হইয়া থাকে, ইহাই বুঝান হইতেছে? অথবা স্বতই আত্মাতে কর্তৃত্ব বা কারয়িতৃত্ব নাই, ইহাই বুঝান হইতেছে? ইহার উত্তর

স্বরূপে এই বলা হইতেছে যে,আত্মার স্বতঃ কর্ত্তৃত্ব বা কারয়িতৃত্ব নাই, কারণ এই গীতাশাস্ত্রেই বলা হইয়াছে যে,"অধিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে" (আত্মা অবিক বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে), "শরীরস্থোঽপি ন কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে" (হে কৌন্তেয় আত্মা শরীরস্থিত হইলেও কিছু করে না এবং কোন প্রকার পাপপুণ্যে লিপ্ত হয় না) এবং শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে যে "ধ্যায়তীব, লেলায়তীব" (আত্মা ধ্যাতা ও ক্রীড়াকর্ত্তার ন্যায় প্রতীত হয়)॥ ১৩॥

ন কর্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে ॥ ১৪॥

অন্বয়।—প্রভুঃ (আত্মা) লোকস্য কর্তৃত্বং কর্ম্মাণি বা ন সৃজতি (তথা) কর্ম্মফলসংযোগং ন সৃজতি, স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥ ১৩।

মূলানুবাদ।—প্রভু (আত্মা) লোকের কর্তৃত্ব কর্ম্মনিচয় কিংবা কর্ম্মফল-সংবন্ধের সৃষ্টি করেন না, কিন্তু স্বভাব (মায়া) স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া থাকে॥ ১৪॥

ভাষ্য।—ন কর্তৃত্বমিতি। ন কর্তৃত্বং স্বতঃ কুর্ব্বিতি নাপি কর্ম্মাণি রথঘট-প্রাসাদাদীনি ঈপ্সিততমানি লোকস্য সৃজতি উৎপাদয়তি প্রভুরাত্মা নাপি রথা-দিকৃতবতঃ তৎফলেন সংযোগং ন কর্ম্মফলসংযোগং। যদি কিঞ্চিদপি স্বতো ন করোতি ন কারয়তি চ দেহী কস্তর্হি কুর্ব্বন কারয়ংশ্চ প্রবর্ত্তত ইত্যু-চ্যতে স্বভাবস্তু স্বোভাবঃ স্বভাবঃ অবিদ্যালক্ষণা প্রকৃতির্মায়া প্রবর্ত্ততে দৈবী হীত্যাদিনা বক্ষ্যমাণা॥ ১৪॥

ভাষ্যানুবাদ।—ন কর্তৃত্বং ইত্যাদি (শ্লোকের অর্থ) "প্রভু" আত্মা স্বয়ং কোন প্রকারে কর্ত্তৃত্ব করেন না এবং "তুমি কর্ম্ম কর" ইত্যাদি প্রকারে প্রেরণা দ্বারা কাহাকেও রথ ঘট বা প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করেন না। কিংবা যে ব্যক্তি রথাদি কার্য্যের উৎপাদন করে, তাহার অভিলষিত ফলের সম্বন্ধরূপ যে কর্ম্মফল-যোগ তাহাও করেন না। আত্মা যদি স্বয়ং কিছুই না করেন এবং অপরের দ্বারাও না করান, তাহা হইলে কে তবে করে বা করাইয়া থাকে? এই প্রকার জিজ্ঞাসার উত্তর স্বরূপে বলা যাইতেছে যে, স্বভাব (অর্থাৎ) অবিদ্যারূপিণী প্রকৃতি মায়াই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; দৈবীহেষা ইত্যাদি শ্লোকে এই স্বভাবের পরিচয় দেওয়া যাইবে॥ ১৪॥

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং প্রভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়।—প্রভুঃ কস্যচিৎ পাপং ন আদত্তে, (তথা কস্যচিৎ) সুকৃতং ন চৈব (আদত্তে) অজ্ঞানেন জ্ঞানং আবৃতং তেন জন্তবঃ মুহ্যন্তি ॥ ১৫ ॥

মূলানুবাদ।—আত্মা কাহারও পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না; অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান আবৃত হইয়াছে, সেই জন্য প্রাণীসকল মুগ্ধ হয় ॥ ১৫ ॥

ভাষ্য।—পরমার্থস্তু নাদত্তে ন গৃহ্লাতি ভক্তস্যাপি কস্যচিৎ পাপং নচৈবাদত্তে সুকৃতং ভক্তৈঃ প্রযুক্তং বিভুঃ। কিমর্থং তর্হি ভক্তৈঃ পূজাদিলক্ষণং যাগদানহোমাদিকং চ সুকৃতং প্রযুজ্যত ইত্যাহ অজ্ঞানেন আবৃতং জ্ঞানং বিবেকবিজ্ঞানং, তেন মুহ্যন্তি করোমি কারয়ামি ভোক্ষ্যে ভোজয়ামি ইত্যেবং মোহং গচ্ছন্তি অবিবেকিনঃ সংসারিণো জন্তবঃ ॥ ১৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—পরমার্থতঃ কিন্তু প্রভু (আত্মা) কোন ভক্তেরও পাপ গ্রহণ করেন না অথবা ভক্তগণের প্রদত্ত পুণ্যও গ্রহণ করেন না। (তিনি যদি গ্রহণ না করেন) তবে ভক্তগণ কেন পূজা বা জপ হোমাদিরূপপুণ্য তাঁহাকে অর্পণ করে? (ইহার উত্তর এই যে) অজ্ঞানের দ্বারা (জীবগণের) বিবেকবিজ্ঞান আবৃত হইয়া থাকে, এই কারণ অবিবেকী সংসারী জীবগণ "আমি করিতেছি, আমি করাইতেছি, আমি ভোগ করি, আমি ভোগ করাইতেছি" ইত্যাদি প্রকার মোহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্‌জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরং ॥ ১৬ ॥

অন্বয়।—যেষাং তু তদজ্ঞানং আত্মনঃ জ্ঞানেন নাশিতং, তেষাং জ্ঞানং আদিত্যবৎ তৎপরং প্রকাশয়তি ॥ ১৬ ॥

মূলানুবাদ।—যাহাদের কিন্তু সেই অজ্ঞান, আত্মজ্ঞানের দ্বারা নাশিত হইয়াছে, তাহাদের আদিত্যের ন্যায় (নির্ম্মল) জ্ঞান পরব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

ভাষ্য।—জ্ঞানেনেতি। জ্ঞানেন তু যেন অজ্ঞানেনাবৃতা মুহ্যন্তি জন্তবঃ তদজ্ঞানং যেষাং জন্তূনাং বিবেকজ্ঞানেন তু আত্মবিষয়েণ নাশিতমাত্মনো ভবতি তেষামাদিত্যবদ্ যথাআদিত্যঃ সমস্তং রূপজাতং প্রকাশয়তি, তদ্বজ্ জ্ঞানং জ্ঞেয়ং বস্তুসর্ব্বং প্রকাশয়তি তৎপরং পরমার্থতত্ত্বম্ ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—জ্ঞানেন ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ। যে অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হইয়া প্রাণীসকল মোহ প্রাপ্ত হয় সেই অজ্ঞান, যাহাদের আত্মবিষয় বিবেকবিজ্ঞান দ্বারা নাশিত হয়, আদিত্য যে প্রকার সকলরূপকে অবভাসিত করে, সেইরূপ তাহাদের সেই জ্ঞান জ্ঞেয় বস্তু (অর্থাৎ) সেই পরমার্থতত্ত্ব ব্রহ্মকে সর্ব্বস্বরূপে প্রকাশ করিয়া থাকে॥ ১৬॥

তদ্‌বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ॥ ১৭॥

অন্বয়।—তদ্‌বুদ্ধয়ঃ তদাত্মানঃ তন্নিষ্ঠাঃ তৎপরায়ণাঃ জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ অপুনরাবৃত্তিং গচ্ছন্তি॥ ১৭॥

মূলানুবাদ।—যাহাদের বুদ্ধি পরমাত্মবিষয়িণী, যাহারা পরব্রহ্মকেই আত্মা বলিয়া বুঝিয়াছে, যাহাদের পরব্রহ্মেই নিষ্ঠা, যাহাদের পরব্রহ্মই পরায়ণ এবং যাহাদের জ্ঞানের উদয়ে সকল প্রকার পাপ দূর হইয়াছে, তাহারাই মোক্ষলাভ করিতে পারেন॥ ১৭॥

ভাষ্য।—যৎপরং জ্ঞানপ্রকাশিতং। তস্মিন গতা বুদ্ধির্যেষাং তদ্‌বুদ্ধয়ঃ তদাত্মানঃ তদেব পরং ব্রহ্ম আত্মা যেষাং তে তদাত্মানঃ তন্নিষ্ঠা নিষ্ঠা অভিনিবেশস্তাৎপর্য্যং সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্য ব্রহ্মণ্যেব অবস্থানং যেষাং তে তন্নিষ্ঠাঃ তৎপরায়ণাশ্চ তদেব পরময়নং গতির্যেষাং ভবতি তে তৎপরায়ণাঃ কেবলাত্মরতয় ইত্যর্থঃ। যেষাং জ্ঞানেন নাশিতমাত্মনোঽজ্ঞানং তে গচ্ছন্ত্যেবংবিধা অপুনরাবৃত্তিং অপুনর্দেহসম্বন্ধং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষা যথোক্তেনজ্ঞানেন নির্ধূতো নাশিতঃ কল্মষঃ পাপাদিসংসারকারণদোষো যেষাং তে জ্ঞাননির্ধূতকল্মষা যতয় হত্যর্থঃ॥ ১৭॥

ভাষ্যানুবাদ।—যে পরমতত্ত্ব জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত হয়, তাহাকেই যাহাদের বুদ্ধি অবলম্বন করে, তাহারাই "তদ্বুদ্ধি" (এই শব্দের দ্বারা প্রতিপাদিত হয়), সেই পরব্রহ্মই যাহাদের আত্মা, তাহারাই "তদাত্মা" (এই শব্দের দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে), সেই পরব্রহ্মেই যাহাদের অবস্থান তাহারাই "তন্নিষ্ঠ", সেই পরব্রহ্মই যাহাদের পরম গতি তাহারাই "তৎপরায়ণ" (অর্থাৎ) কেবল আত্মাতেই যাহাদের অনুরাগ, (তাহারাই এই সকল বিশেষণের দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে), যাহাদের সেই আত্মার অজ্ঞান জ্ঞানের দ্বারা নাশিত হইয়াছে, তাহারাই জ্ঞাননির্ধূতকল্মষ হইয়া

(অর্থাৎ) পাপ প্রভৃতি সংসারকারণ দোষ সকল, জ্ঞানের দ্বারা বিনাশিত করিয়া) "অপুনরাবৃত্তি" পুনর্ব্বার দেহের সহিত অসম্বন্ধ (অর্থাৎ) মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে, যতিগণই এই প্রকার লক্ষণসম্পন্ন ইহাই অর্থ ॥ ১৭ ॥

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনিচৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়।—পণ্ডিতাঃ বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি, হস্তিনি, শুনি শ্বপাকে চ সমদর্শিনঃ (ভবন্তি) ॥ ১৮ ॥

মূলানুবাদ।—যাঁহাদের আত্মতত্ত্বজ্ঞান হইয়াছে, তাঁহারা বিদ্যা ও বিনয়-যুক্ত ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুক্কুর ও শ্বপাক প্রভৃতি সকল জীবেই সমদৃষ্টিযুক্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥

ভাষ্য।—যেষাং জ্ঞানেন নাশিতমাত্মনোঽজ্ঞানং তে পণ্ডিতাঃ কথং তত্ত্বং পশ্যন্তীত্যুচ্যতে বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে বিদ্যা চ বিনয়শ্চ বিদ্যাবিনয়ৌ বিনয় উপশমঃ তাভ্যাং বিদ্যাবিনয়াভ্যাং সম্পন্নো বিদ্যাবিনয়সম্পন্নো বিদ্বান্ বিনীতশ্চ যো ব্রাহ্মণস্তস্মিন্ ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে উত্তমসংস্কারবতি ব্রাহ্মণে সাত্ত্বিকে মধ্যমায়াং চ রাজস্যাং চ গবি সংস্কারহীনায়াং অত্যন্তমেব কেবলতামসে হস্ত্যাদৌচ সত্ত্বাদিগুণৈঃ তজ্জৈশ্চ সংস্কারৈস্তথা রাজসৈস্তথা তামসৈশ্চ সংস্কারৈরত্যন্তমেবাস্পৃষ্টং সমমেকমবিক্রিয়ং ব্রহ্ম দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—যাঁহাদের আত্মবিষয়ক অজ্ঞান, জ্ঞানের দ্বারা নাশিত হয়, সেই সকল পণ্ডিতগণ কিরূপ তত্ত্ব দর্শন করিয়া থাকেন (তাহাই বলা যাইতেছে যে), "বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন" বিদ্যা ও বিনয় (এই প্রকার তাৎপর্য্যে) বিদ্যাবিনয় (শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে), সেই বিদ্যাবিনয় যাহার আছে, সে বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন। এই স্থলে বিনয় শব্দের অর্থ উপশম, (অর্থাৎ) বিদ্বান্ ও বিনীত ব্রাহ্মণে, গরুতে, হাতীতে, কুক্কুরে এবং চণ্ডালে (সর্ব্বত্রই) পণ্ডিতগণ সমদর্শী হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ উত্তমসংস্কারযুক্ত ও সত্ত্বপ্রকৃতিসম্পন্ন গাভী, রজঃপ্রকৃতিসম্পন্ন এবং একেবারে সংস্কারহীন এবং কেবল তমঃপ্রকৃতি-সম্পন্ন হস্তিপ্রভৃতি এই সকল প্রকার জীবের মধ্যে অবস্থিত হইয়াও যাহা, সত্ত্বাদিগুণ ও তজ্জনিত সংস্কার এবং রাজস ও তামস সংস্কার দ্বারা

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য।

স্বামী বিবেকানন্দ।] [৪র্থ সংখ্যার পর।

(চাল্‌চ...)

আমাদের দেশের চেয়ে ইউরোপে ও আমেরিকায় মলমূত্রাদি ত্যাগে বড়ই লজ্জা। আমরা হচ্ছি নিরামিষভোজী—এক বাঁড়ি ঘাস পাত আহার। আবার বেজায় গরম দেশ, এক দমে লোটাভর জল খাওয়া চাই। পশ্চিমী চাষা সেরভর্ ছাতু খেলে; তার পর, পাতকোকে পাতকোই খালি করে ফেল্‌লে, জল খাওয়ার চোটে। গরমী কালে আমরা বাঁশ বার করে দিই, লোককে জল খাওয়াতে। কাজেই সে সব যায় কোথা বল। দেশ বিষ্ঠা-মূত্রময় না হয়ে যায় কোথা? গরুর গোয়াল, ঘোঁড়ার আস্তাবল, আর বাঘ, সিঙ্গির পিঁজরার তুলনা কর দিকি।

কুকুর আর ছাগলের তুলনা কর দিকি? পাশ্চাত্য দেশের আহার মাংস-ময়, কাজেই অল্প; আর ঠাণ্ডা দেশ, জল ফল খাওয়া নাই বল্লেই হয়। ভদ্রলোকের খুদে খুদে গ্লাসে একটু মদ খাওয়া। ফরাসীরা জলকে বলে, ব্যাঙের রস; তা কি খাওয়া চলে? এক আমেরিকান জল খায় কিছু বেশী, কারণ ওদের দেশ গরমী কালে ভয়ঙ্কর গরম, নিউইয়র্ক কলকেতার চেয়েও গরম। আর জর্ম্মান্‌রা বড্ড "বিয়র" পান করে, কিন্তু সে খাবার সঙ্গে নয় বড়।

ঠাণ্ডা দেশে সর্দ্দি লাগ্‌বার সদাই সম্ভাবনা; গরম দেশে খেতে বসে ঢক্ ঢক্ জল। এরা কাজেই না হেঁচে যায় কোথা, আর আমরা ঢেঁকুর না তুলেই বা যাই কোথা। এখন দেখ নিয়ম—এ দেশে খেতে বসে যদি ঢেঁকুর তুলেছ, ত সে বেআদবীর আর পার নাই। কিন্তু রুমাল বার করে, তাতে ভড়্ ভড়্ করে সিক্‌নি ঝাড়, এদের তায় ঘেন্না হয় না। আমাদের ঢেঁকুর না তুল্‌লে নিমন্ত্রক খুসীই হন্ না; কিন্তু পাঁচজনের সঙ্গে খেতে খেতে ভড় ভড় করে সিক্‌নি ঝাড়াটা কেমন?

ইংলণ্ডে, আমেরিকায় মলমূত্রের নামটি আন্‌বার যো নাই, মেয়েদের সাম্‌নে। পাইখানায় যেতে হবে চুরি করে। পেট গরম হয়েছে, বা পেটের কোনও প্রকার অসুখের কথা মেয়েদের সাম্‌নে বলবার যো নাই। অবশ্য বুড়ী টুড়ী আলাদী আলাদা কথা। মেয়েরা মলমূত্র চেপে মরে যাবে, তবুও পুরুষের সাম্‌নে ও নামটিও আন্‌বে না।

ফরাসী দেশে অত নয়। মেয়েদের মলমূত্রের স্থান, তার আর একটা দোর পুরুষদের; অনেক স্থানে এক দোর, ঘর আলাদা। এরা এ দোর দিয়ে যাচ্ছে, ওরা এ দোর দিয়ে যাচ্ছে। রাস্তার দু ধারে মাঝে মাঝে প্রস্রাবের স্থান, তা খালি পিঠটা ঢাকা পড়ে মাত্র; মেয়েরা দেখছে, তার লজ্জা নাই, আমাদের মত। অবশ্য মেয়েরা অমন অনাবৃত স্থানে যায় না। জর্ম্মান্‌দের আরও কম।

ইংরেজ আর আমেরিকানরা কথা বার্ত্তায়ও বড় সাবধান, মেয়েদের সাম্‌নে। সে ঠ্যাঙ্‌ বল্‌বার পর্য্যন্ত যো নাই। ফরাসীরা আমাদের মত মুখ খোলা; জর্ম্মান, রুষ প্রভৃতি সকলের সাম্‌নে খিস্তি করে।

কিন্তু প্রেম প্রণয়ের কথা অবাধে মায় ছেলেয়, ভায়ে বোনে বাপে তা চলেছে। বাপ মেয়ের প্রণয়ীর (ভবিষ্যৎ বরের) কথা নানা রকম ঠাট্টা করে মেয়েকে জিজ্ঞাসা কর্‌ছে। ফরাসীর মেয়ে তায় অবনতমুখী, ইংরেজের মেয়ে ব্রীড়াশীলা, আর মার্কিনের মেয়ে চোট্‌পাট জবাব দিচ্ছে। চুম্বন, আলিঙ্গনটা পর্য্যন্ত দোষাবহ নয়, অশ্লীল নয়। সে সব কথা কওয়া চলে। আমাদের দেশে প্রেম প্রণয়ের নাম গন্ধটী পর্য্যন্ত গুরুজনের সাম্‌নে হবার যো নাই।

এদের অনেক টাকা। অতি পরিষ্কার এবং কেতা দোরস্ত কাপড় না পর্‌লে, সে ছোটলোক, তার সমাজে যাবার যো নাই। প্রত্যহ দোপদস্ত কামিজ কলার প্রভৃতি দুবার তিনবার বদ্‌লাতে হবে ভদ্রলোককে। গরীবরা অত সত পারে না। ওপরের কাপড়ে একটি দাগ, একটি কোঁচকা থাক্‌লেই মুস্কিল। নখের কোণে, হাতে, মুখে একটু ময়লা থাক্‌লেই মুস্কিল। গরমীতে পচেই মর, আর যাই হক্‌, দস্তানা পরে যেতেই হবে, নইলে রাস্তায় হাত ময়লা হয় এবং সে হাত কোন স্ত্রীলোকের হাতে দিয়ে সম্ভাষণ করাটা অতি অভদ্রতা। ভদ্রসমাজে থুথুফেলা বা কুলকুচো করা বা দাঁত খোঁটা ইত্যাদি কর্‌লে তৎক্ষণাৎ চণ্ডালত্ব প্রাপ্তি!!

ধর্ম্ম এদের শক্তিপূজা, আধা বামাচার রকমের; পঞ্চ মকারের শেষ অঙ্গগুলো বাদ্‌ দিয়ে। "বামে বামা··· দক্ষিণে পানপাত্রং—অগ্রে ন্যস্তং মরীচসহিতং শূকরস্যোষ্ণমাংসং...কৌলো ধর্ম্মঃ পরমগহনো যোগীনামপ্যগম্যঃ।" প্রকাশ্য, সর্ব্বসাধারণ, শক্তিপূজা বামাচার, মাতৃভাবও যথেষ্ট। প্রটেষ্টান্ট ত ইউরোপে নগন্য—ধর্ম্ম ত ক্যাথলিক। সে ধর্ম্মে জিহোবা, যীশু, ত্রিমূর্ত্তি,

সব অন্তর্দ্ধান, জেগে বসেছেন "মা"। শিশু-যীশু-কোলে "মা"। লক্ষ স্থানে, লক্ষ রকমে, লক্ষ রূপে, অট্টালিকায়, বিরাট মন্দিরে, পথ প্রান্তে, পর্ণ কুটীরে "মা" "মা" "মা"! বাদ্‌সা ডাক্‌ছে "মা", জঙ্গ বাহাদুর (Field-martial) সেনাপতি ডাক্‌ছে "মা", ধ্বজা হস্তে সৈনিক ডাক্‌ছে "মা", পোতবক্ষে নাবিক ডাক্‌ছে "মা", জীর্ণ বস্ত্র ধীবর ডাক্‌ছে "মা", রাস্তার কোণে ভিখারি ডাক্‌ছে "মা"। "ধন্য মেরি", "ধন্য মেরী" দিন্‌রাত এ ধ্বনি উঠেছে।

আর মেয়ের পূজা। এ শক্তি পূজা কেবল কাম নয়, কিন্তু যে শক্তি পূজা, কুমারী সধবা পূজো, আমাদের দেশে কাশী কালীঘাট প্রভৃতি তীর্থ-স্থানে হয়, বাস্তবিক, প্রত্যক্ষ, কল্পনা নয়—সেই শক্তি পূজা। তবে আমা-দের পূজা ঐ তীর্থস্থানেই, সেই ক্ষণমাত্র; এদের দিন, রাত, বারমাস। আগে স্ত্রীলোকের আসন, আগে শক্তির বসন, ভূষণ, ভোজন, উচ্চ স্থান, আদর, খাতির। এ যে সে স্ত্রীলোকের পূজো, চেনা অচেনার পূজো, ভদ্রকুলের ত কথাই নাই, রূপসী যুবতীর ত কথাই নাই। এ পূজো ইউরোপে আরম্ভ করে মূরেরা, মুষলমান আরবমিশ্র মূরেরা, যখন তারা স্পেন বিজয় করে, আট শতাব্দি রাজত্ব করে সেই সময়। তাদের থেকে ইউরোপে সভ্যতার উন্মেষ, শক্তিপূজার অভ্যুদয়। মূর ভুলে গেল, শক্তিহীন শ্রী-হীন হল। স্থানচ্যুত হয়ে আফ্রিকার কোণে অসভ্যপ্রায় হয়ে বাস কর্‌তে লাগ্‌লো, আর সে শক্তির সঞ্চার হলো ইউরোপে; "মা" মুষল-মান্‌কে ছেড়ে উঠলেন কৃশ্চানের ঘরে।

(ফ্রাঁস্——পারি।)

এ ইয়ুরোপ কি? কালো, আদ্‌কালো, হল্‌দে, লাল, এসিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকার সমস্ত মানুষ এদের পদানত কেন? এরা কেনই বা এ কলিযুগের একাধিপতি?

এ ইয়ুরোপ বুঝ্‌তে গেলে, পাশ্চাত্য ধর্ম্মের আকর ফ্রান্স থেকে বুঝ্‌তে হবে। পৃথিবীর আধিপত্য ইয়ুরোপে, ইয়ুরোপের মহাকেন্দ্র পারি। পাশ্চাত্য সভ্যতা, রীতি, নীতি, আলোক আঁধার, ভাল মন্দ, সকলের শেষ পরিপুষ্ট ভাব এই খানে, এই পারি নগরীতে।

এ পারি এক মহাসমুদ্র—মণি, মুক্ত, প্রবাল যথেষ্ট, আবার মকর কুম্ভীরও

অনেক। এই ফ্রান্স ইয়ুরোপের কর্ম্মক্ষেত্র। সুন্দর দেশ— চীনের কতক অংশ ছাড়া, এমন দেশ আর কোথাও নাই। নাতিশীতোষ্ণ, অতি উর্ব্বরা, অতি বৃষ্টি নাই, অনাবৃষ্টিও নাই, সে নির্ম্মল আকাশ, মিঠে রৌদ্র, ঘাসের শোভা, ছোট ছোট পাহাড়, চিনার, বাঁজ প্রভৃতি গাছ, ছোট ছোট নদী, ছোট ছোট প্রস্রবণ। সে জলে রূপ, স্থলে মোহ, বায়ুতে উন্মত্ততা, আকাশে আনন্দ। প্রকৃতি সুন্দর, মানুষও সৌন্দর্য্যপ্রিয়। আবালবৃদ্ধবনিতা, ধনী দরিদ্র, তাদের ঘর দোর, ক্ষেত ময়দান, ঘসে মেজে, সাজিয়ে গুজিয়ে ছবি খানি করে রাখ্‌ছে। এক জাপান ছাড়া, এ ভাব আর কোথাও নাই। সে ইন্দ্রভুবন অট্টালিকাপুঞ্জ, নন্দনকানন উদ্যান, উপবন, সায় চাষার ক্ষেত, সকলের মধ্যে একটু রূপ, একটু সুচ্ছবি দেখবার চেষ্টা, এবং সফলও হয়েছে।

এই ফ্রাঁস্ প্রাচীনকাল হতে গোলওয়া (Gaulois), রোমক, ফ্রাঁ (Franks) প্রভৃতি জাতির সংঘর্ষ ভূমি; এই ফ্রাঁ জাতি রোম সাম্রাজ্যের বিনাশের পর ইউরোপে একাধিপত্য লাভ করলে; এদের বাদ্‌সা শার্লমাঞ্যন ইয়ুরোপে কৃশ্চান্ ধর্ম্ম তলওয়ারের দাপটে চালিয়ে দিলেন, এই ফ্রাঁ জাতি হতেই আসিয়া খণ্ডে ইয়ুরোপের প্রচার,—তাই আজও ইউরোপী আমাদের কাছে ফ্রাঁকি, ফেরিঙ্গি, প্ল্যাঁকি, ফিলিঙ্গ, ইত্যাদি।

সভ্যতার আকর প্রাচীন গ্রীক ডুবে গেল, রাজচক্রবর্ত্তী রোম বর্ব্বর-আক্রমণ-তরঙ্গে তলিয়ে গেল, ইয়ুরোপের আলো নিবে গেল, এদিকে আর এক অতি বর্ব্বরজাতির আসিয়াখণ্ডে প্রাদুর্ভাব হলো—আরব জাতি। মহাবেগে সে আরব-তরঙ্গ পৃথিবী ছাইতে লাগ্‌লো। মহাবল পারস্য আরবের পদানত হলো, মুষলমান ধর্ম্ম গ্রহণ কর্ত্তে হল, কিন্তু তার ফলে মুষলমানধর্ম্ম আর এক রূপ ধারণ করলে। সে আরবি ধর্ম্ম আর পারসীক সভ্যতা সম্মিলিত হলো।

আরবের তল্‌ওয়ারের সঙ্গে সঙ্গে পারস্য সভ্যতা ছড়িয়ে পড়্‌তে লাগ্‌লো। সে পারস্য সভ্যতা প্রাচীন গ্রীস্ ও ভারতবর্ষ হতে নেওয়া। পূর্ব্ব, পশ্চিম, দুদিক্ হতে মহাবেগে মুষলমান তরঙ্গ ইউরোপের উপর আঘাত করলে, সঙ্গে সঙ্গে বর্ব্বর অন্ধ ইউরোপে জ্ঞানালোক ছড়িয়ে পড়তে লাগ্‌লো। প্রাচীন গ্রীকদের বিদ্যা, বুদ্ধি, শিল্প, বর্ব্বরাক্রান্ত ইতালীতে প্রবেশ করলে, ধরা-রাজধানী রোমের মৃতশরীরে প্রাণস্পন্দন হতে লাগলো—সে স্পন্দন ফ্লরেন্স নগরীতে প্রবল রূপ ধারণ করলে,

প্রাচীন ইতালী নব জীবনে বেঁচে উঠতে লাগলো,—এর নাম রনেসাঁস্, Renaissance, নব জন্ম। কিন্তু সে নব জন্ম হলো ইতালীর। ইউরোপের অন্যান্য অংশের তখন প্রথম জন্ম। সে কৃশ্চানী ষোড়শ শতাব্দিতে, যখন আকবর, জাহাঁগির, সাজাহাঁ প্রভৃতি মোগল সম্রাট্ ভারতে মহাবল সাম্রাজ্য তুলেছেন, সেই সময়, ইউরোপের জন্ম হল।

ইতালী বুড়ো জাত, একবার সাড়া শব্দ দিয়ে আবার পাশ ফিরে শুলো। সে সময় নানা কারণে ভারতবর্ষও জেগে উঠেছিল কিছু. আকবর হতে তিন পুরুষের রাজত্বে বিদ্যা বুদ্ধি শিল্পের আদর যথেষ্ট হয়েছিল, কিন্তু অতি বৃদ্ধ জাত, নানাকারণে আবার পাশ ফিরে শুলো।

ইয়ুরোপে, ইতালীর পুনর্জন্ম গিয়ে লাগলো বলবান, অভিনব, নূতন ফ্রাঁ জাতিতে। চারিদিক্ হতে সভ্যতার ধারা সব এসে ফ্লরেন্স নগরীতে একত্র হয়ে নূতন রূপ ধারণ করলে; কিন্তু ইতালী জাতিতে সে বীর্য্য ধারণের শক্তি ছিল না, ভারতের মত সে উন্মেষ ঐ খানেই শেষ হয়ে যেত, কিন্তু ইউরোপের সৌভাগ্য, এই নূতন ফ্রাঁ জাতি আদরে সে তেজ গ্রহণ করলে। নবীন-রক্ত, নবীন জাত সে তরঙ্গে মহাসাহসে নিজের তরণী ভাসিয়ে দিলে. সে স্রোতের বেগ ক্রমশই বাড়তে লাগলো, সে এক ধারা শত ধারা হয়ে বাড়তে লাগলো; ইউরোপের আর আর জাতি লোলুপ হয়ে খাল কেটে সে জল আপনার আপনার দেশে নিয়ে গেল এবং তাতে নিজেদের জীবনীশক্তি ঢেলে তার বেগ, তার বিস্তার বাড়াতে লাগ্লো, ভারতে এসে সে তরঙ্গ লাগ্লো, জাপান সে বন্যায় বেঁচে উঠলো, সে জল পান করে মত্ত হয়ে উঠ্লো; জাপান এসিয়ার নূতন জাত।

এই পারি নগরী সে ইউরোপী সভ্যতা-গঙ্গার গোমুখ। এ বিরাট্ রাজধানী মর্ত্তের অমরাবতী, সদানন্দনগরী। এ ভোগ, এ বিলাস, এ আনন্দ, না লণ্ডনে, না বর্লিনে, না আর কোথায়। লণ্ডনে, নিউইয়র্কে ধন আছে; বর্লিনে বিদ্যাবুদ্ধি যথেষ্ট, নেই সে ফরাসী মাটি, আর সর্ব্বাপেক্ষা নেই সে ফরাসী মানুষ। ধন থাক্, বিদ্যাবুদ্ধি থাক্, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যও থাক্—মানুষ কোথায়? এ অদ্ভুত ফরাসী চরিত্র প্রাচীন গ্রীক্ মরে জন্মেছে যেন—সদা আনন্দ, সদা উৎসাহ, অতি ছেবলা, আবার অতি গম্ভীর, সকল কাজে উত্তেজনা, আবার বাধা পেলেই নিরুৎসাহ। কিন্তু সে নৈরাশ্য ফরাসী মুখে বেশীক্ষণ থাকে না, আবার জেগে ওঠে।

এই পারি বিশ্ববিদ্যালয় ইয়ুরোপের আদর্শ। দুনিয়ার বিজ্ঞান সভা এদের আকাডেমির নকল; এই পারি ঔপনিবেশ সাম্রাজ্যের গুরু, সকল ভাষাতেই যুদ্ধ শিল্পের সংজ্ঞা এখনও অধিকাংশ ফরাসী; এদের রচনার নকল, সকল ইয়ুরোপী ভাষায়; দর্শন, বিজ্ঞান শিল্পের এই পারি খনি, সকল জায়গায় এদের নকল।

এরা হচ্ছে সহুরে আর সব জাত যেন পাড়াগেঁয়ে। এরা যা করে, তা ৫০ বৎসর, ২৫ বৎসর পরে জর্ম্মাণ ইংরেজ প্রভৃতি নকল করে, তা বিদ্যায় হক্, বা শিল্পে হক্, বা সমাজনীতিতেই হক্। এই ফরাসী সভ্যতা স্কটলাণ্ডে লাগ্‌লো, স্কট্ রাজা ইংলণ্ডের রাজা হলেন, ফরাসী সভ্যতা ইংলণ্ডকে জাগিয়ে তুল্‌লে;—স্কটরাজ ষ্টুয়ার্ট বংশের সময় ইংলণ্ডে রয়াল সোসাইটি প্রভৃতির সৃষ্টি।

আর এই ফ্রান্স স্বাধীনতার আবাস। প্রজাশক্তি মহাবেগে এই পারি-নগরী হতে ইয়ুরোপ তোলপাড়্ করে ফেলেছে, সেই দিন হতে ইয়ুরোপের নূতন মূর্ত্তি হয়েছে। সে এগালিতে, লিবার্তে ফ্রাতের্ণিতের, Egalité liberté fraternité ধ্বনি ফ্রান্স হতে চলে গেছে; ফ্রান্স অন্যভাব, অন্য উদ্দেশ্য অনুকরণ কর্চ্ছে, কিন্তু ইয়ুরোপের অন্যান্য জাত এখনও সেই ফরাসী বিপ্লব মক্স করছে।

একজন স্কট্‌লাণ্ড দেশের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত আমায় সেদিন বল্‌লেন, যে পারি হচ্চে পৃথিবীর কেন্দ্র; যে দেশ যে পরিমাণে এই পারি নগরীর সঙ্গে নিজেদের যোগ স্থাপন কর্ত্তে সক্ষম হবে, সে জাত তত পরিমাণে উন্নতি লাভ করবে। কথাটা কিছু অতিরঞ্জিত সত্য, কিন্তু এ কথাটাও সত্য, যে যদি কারু কোনও নূতন ভাব এ জগতকে দেবার থাকে, ত এই পারি হচ্ছে সে প্রচারের স্থান। এই পারিতে যদি ধ্বনি ওঠে, ত ইউরোপ অবশ্যই প্রতিধ্বনি করবে। ভাস্কর, চিত্রকর, গাইয়ে, নর্ত্তকী এই মহানগরীতে প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ কর্ত্তে পারলে, আর সবদেশে সহজেই প্রতিষ্ঠ হয়।

আমাদের দেশে এ পারি নগরীর বদ্ নামই শুনতে পাওয়া যায়,—এ পারি মহা কদর্য্য, বেশ্যাপূর্ণ, নরককুণ্ড। অবশ্য এ কথা ইংরেজরাই বলে থাকে, এবং অন্যদেশের যে সব লোকের পয়সা আছে এবং জিহ্বোপস্থ ছাড়া দ্বিতীয় ভোগ জীবনে অসম্ভব, তারা অবশ্য বিলাসময় জিহ্বোপস্থের উপকরণময় পারিই দেখে।

কিন্তু লণ্ডন, বর্লিন, ভিয়েনা, নিউইয়র্কও ঐ বারবনিতাপূর্ণ, ভোগের উদ্যোগ-পূর্ণ; তবে তফাৎ এই, সে অন্য দেশের ইন্দ্রিয় চর্চ্চা পশুবৎ; প্যারিসের, সভ্য প্যারির ময়লা সোণার পাত মোড়া। বুনো শোরের পাঁকে লোঠা, আর ময়ূরের পেখম-ধরা নাচে যে তফাৎ, অন্যান্য সহরের পৈশাচিক ভোগ আর এ প্যারির বিলাসের সেই তফাৎ।

ভোগ বিলাসের ইচ্ছা কোন্ জাতে নেই বল? নইলে দুনিয়ায় যার দু'পয়সা হয়, সে অমনি প্যারিনগরী অভিমুখে ছোটে কেন? রাজা বাদসারা চুপি সাড়ে নাম ভাঁড়িয়ে এ বিলাস-বিবর্ত্তে স্নান করে পবিত্র হতে আসেন কেন? ইচ্ছা সর্ব্বদেশে, উদ্যোগের ত্রুটি কোথাও কম দেখি না; তবে এরা সুসিদ্ধ হয়েছে, ভোগ করতে জানে, বিলাসের সপ্তমে পৌঁছেছে।

তাও অধিকাংশ কদর্য্য নাচ তামাসা বিদেশীর জন্য; ফরাসী বড় সাবধান, বাজে খরজ করে না। এই ঘোর বিলাস, এই সব হোটেল, কাফে, যাতে একবার খেলে সর্ব্বস্বান্ত হতে হয়, এ সব বিদেশী আহাম্মক্ ধনীদের জন্য। ফরাসীরা বড় সুসভ্য, আদব কায়দা বেজায়, খাতির খুব করে, পয়সা গুলি সব বার করে নেয়, আর মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসে।

তা ছাড়া, আর এক তামাসা এই যে, আমেরিকা, জর্ম্মাণ, ইংরেজ প্রভৃতির খোলা সমাজ, বিদেশী ঝাঁ করে সব দেখ্‌তে শুন্‌তে পায়। দু চার দিনের আলাপেই আমেরিক বাড়িতে দশদিন বাস কর্‌বার নিমন্ত্রণ করে; জর্ম্মাণ তদ্রূপ; ইংরেজ একটু বিলম্বে। ফরাসী এ বিষয়ে বড় তফাৎ, পরিবারের মধ্যে অত্যন্ত পরিচিত না হলে আর বাস কর্ত্তে নিমন্ত্রণ করে না। কিন্তু যখন বিদেশী ঐ প্রকার সুবিধা পায়, ফরাসী পরিবার দেখবার জান্‌বার অবকাশ পায়, তখন আর এক ধারণা হয়। বলি, মেছুয়াবাজার দেখে অনেক বিদেশী যে আমাদের জাতীয় চরিত্র সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করে—সেটা কেমন আহাম্মকি। তেমনি এ প্যারি। অবিবাহিতা মেয়ে এদেশে আমাদের দেশের মত সুরক্ষিতা, তারা সমাজে প্রায় মিশতে পায় না। বের পর তবে নিজের স্বামীর সঙ্গে সমাজে মেশে। বে থা মায়ে বাপে দেয়, আমাদের মত। আর এরা আমোদপ্রিয়, কোনও বড় সামাজিক ব্যাপার নর্ত্তকীর নাচ না হলে সম্পূর্ণ হয় না। যেমন আমাদের বে পূজো সর্ব্বত্রে নর্ত্তকীর আগমন। ইংরেজ ওলবাটা মুখ, অন্ধকার দেশে বাস করে, সদা নিরানন্দ, ওদের মতে এ বড় অশ্লীল, কিন্তু থিয়েটারে হলে আর দোষ নাই। এ কথাটাও

বলি যে এদের নাচটা আমাদের চখে অশ্লীল বটে, তবে এদের সয়ে গেছে! নেংটি নাচ সর্ব্বত্রে, ও গ্রাহ্যর মধ্যেই নয়। কিন্তু ইংরেজ আমেরিকা দেখতেও ছাড়বে না, আর ঘরে গিয়ে গাল্ দিতেও ছাড়বে না।

স্ত্রী সম্বন্ধী আবার পৃথিবীর সর্ব্বদেশেই একরূপ, অর্থাৎ পুরুষ মানুসের অন্য স্ত্রীসংসর্গে বড় দোষ হয় না, কিন্তু স্ত্রীলোকের বেলাটায় মুস্কিল। তবে ফরাসী পুরুষ একটু খোলা, অন্য দেশের ধনী লোকেরা যেমন। এ সম্বন্ধে বে পরোয়া তেম্‌নি। আর ইউরোপী পুরুষসাধারণ ও বিষয়টা অত দোষের ভাবে না। অবিবাহিতের ও বিষয়ে পাশ্চাত্য দেশে বড় দোষের নয়; বরং বিদ্যার্থী যুবক ও বিষয়ে একান্ত বিরত থাকলে, অনেক স্থলে তার মা বাপ দোষাবহ বিবেচনা করে। পাছে ছেলেটা "মেনি মুখো" হয়। পুরুষের এক গুণ পাশ্চাত্য দেশে চাই—সাহস; এদের "ভার্চ্চু" Virtue শব্দ আর আমাদের "বীরত্ব" একই শব্দ। ঐ শব্দের ইতিহাসেই দেখ, এরা কাকে পুরুষের সততা বলে। মেয়ে মানুসের পক্ষে সতীত্ব অত্যাবশ্যক বটে।

এ সকল কথা বল্‌বার উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক জাতির এক একটা নৈতিক জীবনোদ্দেশ্য আছে, সেইখানটা হতে সে জাতির রীতি নীতি বিচার কর্ত্তে হবে। তাদের চখে তাদের দেখতে হবে। আমাদের চোখে এদের দেখা, আর এদের চক্ষে আমাদের দেখা, এ দুই ভুল।

আমাদের উদ্দেশ্য এ বিষয়ে এদের ঠিক উল্টা, আমাদের ব্রহ্মচারী (বিদ্যার্থী) শব্দ আর কামজয়িত্ব এক। বিদ্যার্থী আর কামজিৎ একই কথা।

আমাদের উদ্দেশ্য মোক্ষ। ব্রহ্মচর্য্য বিনা তা কেমনে হয় বল? এদের উদ্দেশ্য ভোগ, ব্রহ্মচর্য্যের আবশ্যক তত নাই; তবে স্ত্রীলোকের সতীত্ব নাশ হলে ছেলে পিলে জন্মায় না এবং সমগ্র জাতির ধ্বংশ। পুরুষ মানুষে দশ গণ্ডা বে করলে তত ক্ষতি নাই, বরং বংশ বৃদ্ধি খুব হয়। স্ত্রীলোকের একটা ছাড়া আর একটা এক সঙ্গে চলে না—ফল বন্ধ্যাত্ব। কাজেই সকল দেশে স্ত্রীলোকের সতীত্বের উপর বিশেষ আগ্রহ, পুরুষের বাড়ার ভাগ। 'প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি।'

(ক্রমশঃ।)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত। *

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[নরেন্দ্র ও ভবনাথের মাষ্টারের সহিত মিলন।]

মাষ্টার তখন বরাহনগরে দিদির বাড়ীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দর্শন করা অবধি সর্ব্বক্ষণ তাঁহারই চিন্তা করেন। সর্ব্বদাই যেন সেই আনন্দময় মূর্ত্তি দেখিতেছেন ও তাঁহার সেই অমৃতময়ী কথা শুনিতেছেন। ভাবিতে লাগিলেন, এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ কিরূপে এই সব গভীর তত্ত্ব অনুসন্ধান করিলেন ও জানিলেন? আর এত সহজে এই সকল কথা বুঝাইতে মাষ্টার এ পর্য্যন্ত কাহাকেও কখনও দেখেন নাই। কখন্ তাঁহার কাছে যাইবেন ও আবার তাঁহাকে দর্শন করিবেন, এই কথা রাত্র দিন ভাবিতেছেন। দেখিতে দেখিতে রবিবার আসিয়া পড়িল। বরাহনগরের নেপাল বাবুর সঙ্গে বেলা ৩টা ৪টার সময় দক্ষিণেশ্বরের বাগানে আসিয়া পঁহুছিলেন। দেখিলেন, সেই পূর্ব্বপরিচিত ঘরের মধ্যে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ছোট তক্তপোষের উপর বসিয়া আছেন। ঘরে এক ঘর লোক। রবিবারে অবসর হইয়াছে, তাই ভক্তেরা দর্শন করিতে আসিয়াছেন। এখনও মাষ্টারের সঙ্গে কাহারও আলাপ হয় নাই। মাষ্টারও সভামধ্যে এক পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন। দেখিলেন, ভক্তদের সঙ্গে সহাস্যবদনে ঠাকুর কথা কহিতেছেন।

একটি ঊনবিংশতিবর্ষবয়স্ক ছোকরাকে উদ্দেশ করিয়া ও তাঁহার দিকে তাকাইয়া অনেক কথা যেন কত আনন্দিত হইয়া বলিতেছিলেন। ছেলেটির নাম নরেন্দ্র, কলেজে পড়েন ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করেন। কথাগুলি তেজঃপরিপূর্ণ; চক্ষু দুটি সাতিশয় উজ্জ্বল। ভক্তের চেহারা।

মাষ্টার অনুমানে বুঝিলেন যে, কথাটি বিষয়াসক্ত সংসারী ব্যক্তির সম্বন্ধে হইতেছিল। যারা কেবল ঈশ্বর ঈশ্বর করে, ও ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে, তাদের ঐ সকল ব্যক্তিরা নিন্দা করে। আর সংসারে কত দুষ্ট লোক আছে, তাদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, এই সব কথা হইতেছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (নরেন্দ্রের প্রতি) নরেন্দ্র! তুই কি বলিস? সংসারী

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (শ্রীম—কথিত) প্রথম ভাগ ছাপা হইতেছে।

লোকেরা কত কি বলে। কিন্তু দ্যাখো, হাতী যখন চলে যায়, পেছনে কত জানোয়ার কত রকম চীৎকার করে। কিন্তু হাতী ফিরেও চায় না। তোকে যদি কেউ নিন্দা করে, তুই কি মনে করবি ?

মাহুত নারায়ণ।

নরেন্দ্র। আমি মনে করব কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (সহাস্যে) নারে, অতো দূর নয়। ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন, তবে ভাল লোকের সঙ্গে মাখামাখি চলে, মন্দ লোকের কাছ থেকে তফাত্ থাকতে হয়। বাঘের ভিতরেও নারায়ণ আছেন ; তা বলে বাঘকে আলিঙ্গন করা চলে না। বাঘ নারায়ণকে দূর থেকে প্রণাম করবে।

"একটা গল্প শোন। কোন এক বনে একটি সাধু থাকেন। তাঁর অনেকগুলি শিষ্য। তিনি একদিন শিষ্যদের উপদেশ দিলেন যে, সর্ব্বভূতে নারায়ণ আছেন, এইটি জেনে সকলকে নমস্কার করবে। একদিন একটি শিষ্য হোমের জন্য কাট আনতে বনের মধ্যে গিছলো। এমন সময়ে একটা রব উঠলো 'কে কোথায় আছ পালাও,—একটা পাগলা হাতী যাচ্ছে।' সব্বাই পালিয়ে গেল, কিন্তু শিষ্যটি পালাল না। সে জানে যে, হাতীও নারায়ণ, তবে কেন পালাব ? এই বলে দাঁড়িয়ে রইল, আর নমস্কার করে স্তব স্তুতি করতে লাগলো। এ দিকে মাহুত চেঁচিয়ে বলচে, 'পালাও' 'পালাও'। শিষ্যটি তবুও নড়লো না। শেষে হাতীটা শুঁড়ে করে তুলে নিয়ে তাকে এক ধারে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেল। শিষ্য ক্ষতবিক্ষত হয়ে ও অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইল। এই সংবাদ পেয়ে গুরু ও অন্যান্য শিষ্যেরা তাকে আশ্রমে ধরাধরি করে নিয়ে গেল। আর ঔষধ দিতে লাগলো। খানিকক্ষণ পরে চেতনা হলে ওকে জিজ্ঞাসা করা গেল, তুমি কেন হাতী আসছে শুনেও চলে গেলে না ? সে বল্লে, গুরুদেব যে আমায় বলে দিছলেন যে, নারায়ণই মানুষ জীব জন্তু সব হয়েছেন। তাই আমি হাতী নারায়ণ আসছে দেখে সেখান থেকে সরে যাই নাই। গুরু তখন বল্লেন যে, হাতী নারায়ণ আসছিলেন বটে, তা সত্য ; কিন্তু বাবা, মাহুত নারায়ণ তো তোমায় বারণ করেছিলেন। যদি সবই নারায়ণ, তবে তার কথা বিশ্বাস করলে না কেন ? মাহুত নারায়ণের কথা শুনতে হয়।

"শাস্ত্রে আছে আপো নারায়ণঃ—জল নারায়ণ, কিন্তু কোনও জল ঠাকুর-সেবায় চলে, আবার কোন জলে আঁচান, বাসন মাজা, কাপড় কাচা, কেবল

চলে; কিন্তু খাওয়া বা ঠাকুর সেবা চলে না। তেমনি সাধু, অসাধু, ভক্ত, অভক্ত, সকলেরি হৃদয়ে নারায়ণ আছেন; কিন্তু অসাধু অভক্ত দুষ্ট লোকের সঙ্গে ব্যবহার চলে না। মাখামাখি চলে না। কাহারও সঙ্গে কেবল মুখের আলাপ পর্য্যন্ত চলে, আবার কাহারও সঙ্গে তাও চলে না। ঐরূপ লোকদের কাছ থেকে তফাতে থাকতে হয়।"

একজন ভক্ত। মহাশয়! যদি দুষ্ট লোক অনিষ্ট করতে আসে বা অনিষ্ট করে, তা হলে কি চুপ করে থাকা উচিত?

গৃহস্থ ও তমোগুণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। লোকের সঙ্গে বাস করতে গেলেই দুষ্ট লোকের হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করবার জন্য একটু তমোগুণ দেখান দরকার। কিন্তু সে অনিষ্ট করবে বলে, উল্টে তার অনিষ্ট করা উচিত নয়।

"এক মাঠে রাখালরা গরু চরাত। সেই মাঠে একটা ভয়ানক বিষাক্ত সাপ ছিল। সকলেই সেই সাপের ভয়ে অত্যন্ত সাবধানে থাকতো। এক দিন একটী ব্রহ্মচারী সেই মাঠের পথ দিয়ে আসছিল। রাখালেরা দৌড়ে এসে বল্লে, ঠাকুর মহাশয়! ও দিক দিয়ে যাবেন না। ও দিকে একটা ভয়ানক বিষাক্ত সাপ আছে। ব্রহ্মচারী বল্লেন, বাবা তা হউক, আমার তাতে ভয় নাই, আমি মন্ত্র জানি। এই কথা বলে ব্রহ্মচারী সেই দিকে চলে গেল। রাখালেরা ভয়ে কেউ সঙ্গে গেল না। এ দিকে সাপটা ফণা তুলে দৌড়ে আসছে। কিন্তু কাছে না আসতে আসতে ব্রহ্মচারী যেই একটি মন্ত্র পড়লেন, অমনি সাপটা কেঁচোর মতন পায়ের কাছে পড়ে রইল। ব্রহ্মচারী বল্লেন, ওরে! তুই কেন পরের হিংসা করে করে বেড়াস, আয় তোকে মন্ত্র দিব, এই মন্ত্র জপলে তোর ভগবানে ভক্তি হবে, আর হিংসা প্রবৃত্তি থাকবে না। এই বলে সাপকে মন্ত্র দিলেন। সাপটা মন্ত্র পেয়ে গুরুকে প্রণাম করলে, আর জিজ্ঞাসা করলে, ঠাকুর! কি করে সাধনা করব বলুন। গুরু বল্লেন, এই মন্ত্র জপ করো, আর কাহারও হিংসা করো না। ব্রহ্মচারী যাবার সময় বল্লেন, আমি আবার আসবো।

"এই রকমে কিছুদিন যায়। রাখালেরা দেখে যে, সাপটা আর কামড়াতে আসে না। ঢ্যালা মারে, তবুও রাগ হয় না, যেন কেঁচোর মতন হয়ে গেছে। একদিন এক জন রাখাল তার কাছে গিয়ে লেজ ধরে খুব ঘুরপাক দিয়ে সাপটাকে আছড়ে আছড়ে ফেলে দিল। সাপটার মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে

লাগল, আর সে অচেতন হয়ে পড়লো। নড়ে না চড়ে না। রাখালরা মনে করলে যে সাপটা মরে গেছে। এই মনে করে তারা সব চলে গেল।

"অনেক রাত্রে সাপের চেতনা হলো। তখন সে আস্তে আস্তে অতি-কষ্টে তার গর্ত্তের ভিতর চলে গেল। শরীর চূর্ণ হয়ে গিছল। নড়বার শক্তি নাই। অনেক দিনের পর যখন অস্থিচর্ম্মসার হয়ে গেছে, তখন বাহিরে আহারের চেষ্টায় রোজ রাত্রে এক একবার চরতে আসতো। রাখালদের ভয়ে দিনের বেলায় আসত না। মন্ত্র লওয়া অবধি আর জীবহিংসা করে না। মাটি, পাতা, গাছ থেকে পড়ে গেছে, এমন ফল খেয়ে প্রাণধারণ করতো।

"প্রায় এক বৎসরের পর ব্রহ্মচারী সেই পথে আবার এলেন। এসেই সাপের সন্ধান করলেন। রাখালেরা বল্লে, সে সাপটা মরে গেছে। ব্রহ্মচারীর কিন্তু ও কথা বিশ্বাস হলো না। তিনি জানেন, ও যে মন্ত্র নিয়েছে, তাহা সাধন না হলে দেহত্যাগ হবে না। খুঁজে খুঁজে সেই দিকে তাঁর দেওয়া নাম ধরে, ডাকতে লাগলেন। সে গুরুদেবের আওয়াজ শুনে গর্ত্ত থেকে বেরিয়ে এলো, ও খুব ভক্তিভাবে প্রণাম করলে। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করলেন, তুই কেমন আছিস? সে বল্লে, আজ্ঞে ভাল আছি। ব্রহ্মচারী বল্লেন, তবে তুই এত রোগা হয়ে গেছিস কেন? সাপ বল্লে, ঠাকুর! আপনি আদেশ করেছেন,—কাহারও হিংসা কোরো না। তাই পাতাটা ফলটা খাই বলে বোধ হয় রোগা হয়ে গেছি। ওর সত্বগুণ হয়েছে কি না, তাই কারু উপর ক্রোধ নাই, সে একেবারেই ভুলেই গিছলো যে রাখালেরা তাকে মেরে ফেলবার জোগাড় করেছিল। ব্রহ্মচারী বল্লেন, শুধু না খাওয়ার দরুন এরূপ অবস্থা হয় না, অবশ্য আরো কোন কারণ আছে; তুই ভেবে দেখ্। সাপটার তখন মনে পড়লো যে রাখালেরা তাকে আছাড় মেরেছিল। তখন সে বল্লে, ঠাকুর এখন মনে পড়েছে বটে, রাখালেরা আমায় একদিন আছাড় মেরেছিল। তা তারা অজ্ঞান, তারা তো জানে না যে আমার মনের কি অবস্থা। আমি যে কাহাকেও কামড়াব না বা কোনরূপ অনিষ্ট করবো না, তা তারা কেমন করে জানবে? ব্রহ্মচারী বল্লেন, ছি! তুই এতো বোকা, তুই আপনাকে রক্ষা করতে জানিস না; আমি তোকে কামড়াইতেই বারণ করেছি, তোকে তো ফোঁস করতে বারণ করি নাই; তুই ফোঁস করে তাদের ভয় দেখাস নাই কেন?

"তাই বলছি, দুষ্ট লোকের কাছে ফোঁস করতে হয়, তাদের ভয় দেখাতে

হয়, পাছে অনিষ্ট করে; কিন্তু তাদের গায়ে বিষ ঢালিতে নাই, তাদের উল্টে অনিষ্ট করতে নাই।

ভিন্ন প্রকৃতি।

"ঈশ্বরের সৃষ্টিতে নানা রকম জীব, জন্তু, গাছ পালা, এই সব আছে। জানোয়ারের মধ্যে ভালও আছে; মন্দও আছে। বাঘের মত হিংস্র জানোয়ারও আছে। গাছের মধ্যে অমৃতের ন্যায় ফল হয় এমন গাছও আছে, আবার বিষ ফল হয় এমন গাছও আছে। তেমনি মানুষের মধ্যে ভালও আছে, মন্দও আছে, সাধু আছে, আবার অসাধুও আছে, সংসারী জীবও আছে, আবার ভক্ত আছে।

Are all men equal ?

"জীব চারি প্রকার,—বদ্ধজীব, মুমুক্ষুজীব, মুক্তজীব ও নিত্যজীব। নিত্য-জীব—যেমন নারদাদি। এঁরা সংসারে থাকেন, জীবের মঙ্গলের জন্য—জীবদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য।

"বদ্ধজীব বিষয়ে আসক্ত হয়ে থাকে, আর ভগবানকে ভুলে থাকে—ভুলেও ভগবানের চিন্তা করে না।

"মুমুক্ষুজীব—যারা মুক্ত হবার ইচ্ছা করে। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ মুক্ত হতে পারে, কেউ পারে না।

"মুক্তজীব—যারা সংসারে কামিনী কাঞ্চনে বদ্ধ নন—যেমন সাধু মহা-আরা; যাঁদের মনে বিষয়বুদ্ধি নাই, আর যাঁরা সর্ব্বদা হরিপাদপদ্ম চিন্তা করেন।

"যেমন জাল ফেলা হয়েচে পুকুরে। দু'চারটা মাছ এমন সেয়ানা যে কখনও জালে পড়ে না—এরা নিত্যজীবের উপমাস্থল। কিন্তু অনেক মাছই জালে পড়ে। এদের মধ্যে কতকগুলি পালাবার চেষ্টা করে; এরা মুমুক্ষুজীবের উপমাস্থল। কিন্তু সব মাছেই পালাতে পারে না। দু'চারটা ধপাড় ধপাড় করে জাল থেকে পালিয়ে যায়—তখন জেলেরা বলে—ঐ একটা মস্ত মাছ পালিয়ে গেল। কিন্তু যারা জালে পড়েছে, অধিকাংশই পলাতেও পারে না। আর পালাবার চেষ্টাও করে না। বরং জাল মুখে করে পুকুরের পাঁকের ভিতর গিয়ে চুপ করে মুখ গুঁজড়ে শুয়ে থাকে—মনে করে, "আর কোন ভয় নাই আর আমরা বেশ আছি।" কিন্তু জানে না যে জেলে হড় হড় করে টেনে আড়ায় তুলবে। এরাই বদ্ধজীবের উপমাস্থল।

সংসারী লোক।

বদ্ধজীবেরা সংসারের কামিনী ও কাঞ্চনে বদ্ধ হয়েছে—হাত পা বাঁধা—আবার মনে করে যে ঐ সংসারের কামিনী ও কাঞ্চনেতেই সুখ হবে, আর নির্ভয়ে থাকবে; কিন্তু জানে না যে এতেই মৃত্যু হবে। বদ্ধজীব যখন মরে, তখন তার পরিবার বলে, 'তুমি তো চল্লে, আমার কি করে গেলে?' আবার এমনি মায়া যে, প্রদীপটাতে বেশী সল্‌তে জ্বললে বলে, 'তেল পুড়ে যাবে, সল্‌তে কমিয়ে দাও।' এ দিকে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে রয়েছে।

"বদ্ধজীবেরা ঈশ্বরচিন্তা করে না। যদি অবসর হয়, তা হলে হয় আবোল তাবোল ফালতো গল্প করে, নয় মিছে কাজ করে। জিজ্ঞাসা করলে বলে, আমি চুপ করে থাকতে পারি না, তাই বেড়া বাঁধছি। হয় তো সময় কাটে না দেখে তাস্ খেল্‌তে আরম্ভ করিল।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

একজন ভক্ত। মহাশয়, এরূপ সংসারী জীবের কি কোন উপায় নাই?

শ্রীরামকৃষ্ণ। অবশ্য উপায় আছে। মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গ করতে হয়, আর মাঝে মাঝে নির্জ্জনে থেকে ঈশ্বরচিন্তা করতে হয়। আর বিচার করতে হয়। তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয়, 'আমাকে ভক্তি বিশ্বাস দাও।'

বিশ্বাসের বল।

"বিশ্বাস হয়ে গেলেই হ'ল। বিশ্বাসের চেয়ে আর জিনিস নাই।

(কেদারের প্রতি) "বিশ্বাসের কত জোর তা তো শুনেছ? পুরাণে আছে রামচন্দ্র যিনি সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, তাঁর লঙ্কায় যেতে সেতু বাঁধতে হ'ল। কিন্তু হনুমান রামনামে বিশ্বাস করে লাফ দিয়ে সমুদ্রের পারে গিয়ে পড়ল! তার আর সেতুর দরকার হয় নাই।

"বিভীষণ একটী পাতায় রাম নাম লিখে, ঐ পাতাটী একটী লোকের কাপড়ের খোঁটে বেঁধে দিছল। সে লোকটি সমুদ্রের পারে যাবে। বিভীষণ তাকে বল্লেন, তোমার ভয় নাই, তুমি বিশ্বাস করে জলের ওপর দিয়ে চলে যাও; কিন্তু দেখো, যাই অবিশ্বাস করবে, অমনি জলে ডুবে যাবে। লোকটি বেশ সমুদ্রের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছিল। এমন সময়ে তার ভারি ইচ্ছা হ'ল যে কাপড়ের খোঁটে কি বাঁধা আছে একবার ত্যাখে। খুলে দেখ যে কেবল রাম নাম লেখা রয়েছে। তখন সে ভাবলে, এ কি! শুধু রাম নাম একটি লেখা রয়েছে! যাই অবিশ্বাস, অমনি ডুবে গেল।

"যার ঈশ্বরের বিশ্বাস আছে, সে যদি মহাপাতক করে—গো, ব্রাহ্মণ, স্ত্রী হত্যা করে, তবুও ভগবানে এই বিশ্বাসের বলে সে সব ভারি ভারি পাপ থেকে উদ্ধার হতে পারে। সে যদি বলে, আর আমি এমন কাজ করবো না, তার কিছুতেই ভয় হয় না।

মহাপাতক ও নামের মাহাত্ম্য।

"এই বলিয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণ গান গাইতে লাগিলেন,—

"আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।
আখেরে এ দিনে, না তার কেমনে, জানা যাবে গো শঙ্করী॥
নাশি গো ব্রাহ্মণ, হত্যা করি ভ্রূণ, সুরাপান আদি বিনাশি নারী।
এ সব পাতক, না ভাবি তিলেক, ব্রহ্মপদ নিতে পারি॥

(নরেন্দ্র।)

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রের কথা পড়িল। ভক্তদের সম্বোধন করে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বল্লেন—

"এই ছেলেটিকে দেখছ, এখানে এক রকম। দুরন্ত ছেলে বাবার কাছে যখন বসে যেন জুজুটি; আবার চাঁদনীতে যখন খেলে তখন আর এক মূর্ত্তি। এরা নিত্য সিদ্ধের থাক্। এরা সংসারে কখনও বদ্ধ হয় না। একটু বয়স হলেই চৈতন্য হয়, আর ভগবানের দিকে চলে যায়। এরা সংসারে আসে জীব শিক্ষার জন্য। এদের সংসারের বস্তু কিছু ভাল লাগে না—এরা কামিনী কাঞ্চনে কখনও আসক্ত হয় না।

"বেদে আছে হোমা পাখীর কথা। খুব উঁচু আকাশে সে পাখী থাকে। সেই আকাশেতেই ডিম পাড়ে। ডিম পাড়্লেই ডিমটা পড়তে থাকে—কিন্তু এত উচ্চ যে অনেকদিন থেকে ডিম পড়্তে থাকে। ডিম পড়্তে পড়্তে ফুটে যায়। তখন ছানাটা পড়তে থাকে। পড়্তে পড়্তে তার চোক ফোটে ও ডানা বেরোয়। চোখ ফুটলেই দেখ্তে পায় যে সে পড়ে যাচ্ছে, আর মাটিতে লাগলে একেবারে চুরমার হয়ে যাবে। তখন সে পাখী মার দিকে একেবারে চোঁচা দৌড় দেয়, আর উঁচুতে উঠে যায়।

নরেন্দ্র উঠিয়া গেলেন। সভামধ্যে কেদার, প্রাণকৃষ্ট, মাষ্টার ইত্যাদি অনেকে ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ভক্তদের প্রতি) দ্যাখো, নরেন্দ্র গাইতে বাজাতে পড়া

শুনার সব তাতেই ভাল। সেদিন কেদারের সঙ্গে তর্ক করছিল। কেদারের কথাগুলো কচ্ কচ্ করে কেটে দিতে লাগল। (মাষ্টারের প্রতি) ইংরাজিতে কি কোন তর্কের বই আছে?

মাষ্টার। হাঁ ইংরাজীতে Logic (ন্যায়শাস্ত্র) আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আচ্ছা, কি রকম একটু বল দেখি।

মাষ্টার এইবার মুস্কিলে পড়িলেন। বলিলেন—

"এক রকম আছে, সাধারণ সিদ্ধান্ত থেকে বিশেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছান। যেমন,—

সব মানুষ মরে যাবে।
পণ্ডিতেরা মানুষ।
অতএব পণ্ডিতেরা মরে যাবে।"

"আর এক রকম আছে, বিশেষ দৃষ্টান্ত বা ঘটনা দেখে সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছান; যেমন,—

এ কাকটা কালো;
ও কাকটা কালো;
(আবার) যত কাক দেখছি, সবই কালো;
অতএব সব কাকই কালো।

"কিন্তু এ রকমে সিদ্ধান্ত করলে ভুল হতে পারে; কেন না, হয় তো খুঁজতে খুঁজতে আর এক দেশে শাদা কাক দেখা গেল। আর এক দৃষ্টান্ত—যেখানে বৃষ্টি, সেইখানে মেঘ ছিল বা আছে; অতএব এই সাধারণ সিদ্ধান্ত হ'ল, যে মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়। আরো এক দৃষ্টান্ত,—

এ মানুষটীর বত্রিশ দাঁত আছে।
ও মানুষটীর বত্রিশ দাঁত।
(আবার) যে কোন মানুষ দেখছি তারই বত্রিশ দাঁত আছে।

"অতএব সব মানুষেরই বত্রিশ দাঁত আছে। এরূপ সাধারণ সিদ্ধান্তের কথা ইংরাজি ন্যায়শাস্ত্রে আছে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ কথাগুলি শুনিলেন মাত্র। শুনিতে শুনিতেই অন্যমনস্ক হইলেন। কাজে কাজেই আর এ বিষয়ে বেশী প্রসঙ্গ হইল না।

তিনি মানুষের হিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু দেবতার ধারণা তখনও অক্ষুণ্ণ রহিল। তাঁহারা তাঁহার নীতিপরায়ণতা এবং শক্তিও বর্দ্ধিত করিলেন মাত্র। জগতের মধ্যে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নীতিপরায়ণ পুরুষ এবং এরূপ সর্ব্বশক্তিমান্‌ও হইলেন।

কিন্তু জোড়া তাড়া দিয়া বেশী দিন চলে না। যেমন জগদ্রহস্যের সূক্ষ্মা তুসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা হইতে লাগিল, তেমনি ঐ রহস্য যেন আরও রহস্যময় হইতে লাগিল। দেবতা বা ঈশ্বরের গুণ যেমন সমযুক্তান্তর শ্রেঢ়ী নিয়মে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, সন্দেহও সেইরূপ সমগুণিতান্তর শ্রেঢ়ী নিয়মে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। যখন লোকের জিহোভা নামক নিষ্ঠুর ঈশ্বরের ধারণা ছিল, তখন সেই ঈশ্বরের সহিত জগতের সামঞ্জস্য বিধান করিতে যে কষ্ট পাইতে হইত, তাহা অপেক্ষা এখন যে ঈশ্বরের ধারণা উপস্থিত হইল, তাহার সহিত জগতের সামঞ্জস্যসাধন কঠিন হইয়া পড়িল। সর্ব্বশক্তিমান্ এবং প্রেমময় ঈশ্বরের রাজ্যে একপ পৈশাচিক ঘটনা কেন ঘটে? কেন সুখ অপেক্ষা দুঃখ এত বেশী? সাধুভাব যত আছে, তাহা অপেক্ষা অসাধুভাব এত বেশী কেন? আমরা কিছু খারাপ দেখিব না, বলিয়া চোক বুজিয়া থাকিতে পারি, কিন্তু তাহাতে এই জগৎ যে একটী বীভৎস জগৎ, তাহার কিছু পরিবর্ত্তন হয় না। খুব ভাল বলিলে বলিতে হয়, ট্যান্টালাসের * নরকস্বরূপ, তাহা হইতে উহা কোন অংশে উৎকৃষ্ট নহে। প্রবল প্রবৃত্তি সব রহিয়াছে, ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার প্রবল বাসনা, কিন্তু পূরণ করিবার উপায় নাই! আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদের হৃদয়ে এক তরঙ্গ উঠিল—তাহাতে আমাদিগকে কোন কার্য্যে অগ্রসর করিল, আর আমরা এক পদ যাই অগ্রসর হই, অমনি ধাক্কা আইসে। আমরা সকলেই যেন ট্যান্টালাসের মত এই জগতে জীবন ধারণ করিতে এবং মরিতে যেন নিদিনির্ব্বন্ধে অভিশপ্ত! ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সীমাবদ্ধ জগতের ভিতরে যতদূর উচ্চ আদর্শ হইতে পারে, সেই সকলের অতীত সব আদর্শ

* গ্রীকদিগের মধ্যে একটী পৌরাণিক গল্প আছে। তাহাতে বর্ণিত আছে যে, ট্যান্টালাস্ নামক এক রাজা পাতালে এক হ্রদে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ হ্রদের জল তাঁহার ওষ্ঠ পর্য্যন্ত আসিত এবং যখনই তিনি পিপাসা নিবারণ করিবার জন্য জল পান করিতে উদ্যত হইতেন, অমনিই জল সরিয়া যাইত। তাঁহার মাথার উপর নানাবিধ ফল ঝুলিত এবং যখনই তিনি ক্ষুধা নিবৃত্তি করিবার জন্য ঐ ফল হাত দিয়া লইতে যাইতেন, অমনি উহা সরিয়া যাইত।

আমাদের মস্তিষ্কে আসিতেছে, কিন্তু যদি আমরা সে গুলি কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করি, আমরা দেখিতে পাইব যে গুলিকে কখনই কার্য্যে পরিণত করিতে পারা যায় না। বরং আমরা চতুর্দ্দিকস্থ স্রোতে পেষিত হয়ে, চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পরমাণুতে পরিণত হই। আবার যদি আমি এই আদর্শের জন্যে চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া কেবল সাংসারিক ভাবে থাকিতে চাই, তাহা হইলেও আমাকে পশুজীবন যাপন করিতে হয়, আর আমি অবনত হইয়া যাই। কোন দিকেই সুখ নাই। যাহারা এই জগতেই যেমন জন্মাইয়াছে, সেই রূপই থাকিতে চায়, তাহাদেরও অদৃষ্টে দুঃখ। যাহারা আবার সত্যের জন্য— এই পাশব জীবন হইতে কিছু উন্নত জীবনের জন্য প্রাণ দিতে অগ্রসর হয়, তাহাদের আবার সহস্র গুণ অসুখ। ইহা বাস্তবিক ঘটনা; ইহার আর কিছু ব্যাখ্যা নাই। ইহার কোন ব্যাখ্যা হইতে পারে না, কিন্তু বেদান্ত বাহিরে যাইবার পথ দেখাইয়া দেন। এই সকল বক্তৃতার সময় আমাকে এমন অনেক কথা বলিতে হইবে, যাহাতে সময়ে সময়ে তোমরা ভয় পাইবে, কিন্তু আমি যাহা বলি, তাহা স্মরণ রাখিও, উহা বেশ করিয়া হজম করিও, দিবারাত্র ঐ সম্বন্ধে চিন্তা করিও। তাহা হইলে উহা তোমার অন্তরে প্রবেশ করিবে, উহা তোমাদিগকে উন্নত করিবে এবং তোমাদিগকে সত্য বুঝিতে এবং সত্যে বাস করিতে সমর্থ করিবে।

এই জগৎ যে ট্যাণ্টালাসের নরকস্বরূপ, ইহা কোন মত বিশেষ নহে, ইহা বাস্তবিক সত্য কথা—আমরা এই জগৎসম্বন্ধে কিছু জানিতে পারি না, আবার আমরা জানি না, তাহাও বলিতে পারি না। এই জগৎশৃঙ্খলের অস্তিত্ব আছে, তাহাও আমি বলিতে পারি না, আবার যখন আমরা উহার সম্বন্ধে চিন্তা করিতে যাই, তখন আমরা দেখিতে পাই, আমরা কিছুই জানি না। উহা আমার মস্তিষ্কের সম্পূর্ণ ভ্রম হইতে পারে। আমি হয়ত কেবল স্বপ্ন দেখিতেছি মাত্র। আমি স্বপ্ন দেখিতেছি, আমি তোমার সঙ্গে কথা কহিতেছি, আবার তুমি আমার কথা শুনিতেছ। কেহই ইহার বিপরীত প্রমাণ করিতে পারেন না। 'আমার মস্তিষ্ক' ইহাও একটা স্বপ্ন হইতে পারে, আর বাস্তবিকও ত কেহ নিজের মস্তিষ্ক কখন দেখে নাই। আমরা উহা কেবল মানিয়া লইতেছি মাত্র। সকল বিষয়েই এইরূপ। আমার নিজের শরীরও আমি মানিয়া লইতেছি মাত্র। আবার আমি জানি না, তাহাও বলিতে পারি না। জ্ঞান ও অজ্ঞানের মধ্যে এই অবস্থান, এই রহস্যময়

কুহেলিকা—এই সত্য মিথ্যার মিশ্রণ—কোথায় মিশিয়াছে, কে জানে? আমরা স্বপ্নের মধ্যে বিচরণ করিতেছি, অর্দ্ধনিদ্রিত, অর্দ্ধ জাগ্রত—সারা জীবন এক কুহেলিকায় আবদ্ধ—ইহাই আমাদের প্রত্যেকেরই দশা! সব ইন্দ্রিয়জ্ঞানের ঐ দশা। সকল দর্শনের, সকল গর্ব্বিত বিজ্ঞানের, সকল প্রকার গর্ব্বিত মানবজ্ঞানেরও এই দশা—এই পরিণাম। ইহাই ব্রহ্মাণ্ড।

ভূতই বল, আত্মাই বল, মনই বল, আর যাহাই বল না কেন, যে কোন নামই উহাকে দাও না কেন, ব্যাপার এই একই—আমরা বলিতে পারি না, উহাদের অস্তিত্ব আছে, বলিতে পারি না যে, উহাদের অস্তিত্ব নাই। আমরা উহাদিগকে একও বলিতে পারি না, আবার বহুও বলিতে পারি না। এই আলো আঁধারের খেলা—নানাবিধ দুর্ব্বলতা—দুর্বিজ্ঞেয়, দুর্বিভাজ্য, কিন্তু তথাপি রহিয়াছে—বাস্তবিক ব্যাপার অথচ বাস্তবিক নহে, জাগ্রত আবার যেন নিদ্রিত! ইহা প্রকৃত ঘটনা - ইহাকেই মায়া বলে। আমরা এই মায়াতে জন্মিয়াছি, আমরা ইহাতেই জীবিত রহিয়াছি, আমরা ইহাতেই চিন্তা করিতেছি, ইহাতেই স্বপ্ন দেখিতেছি। আমরা এই মায়াতেই দার্শনিক, আমরা ইহাতেই সাধু, শুধু তাহাই নহে, আমরা এই মায়াতেই কখন দানব কখন বা দেবতা হইতেছি। চিন্তারথে আরোহণ করিয়া যতদূর যাও, তোমার ধারণাকে উচ্চ হইতে উচ্চতর কর, উহাকে অনন্ত অথবা যে কোন নাম দিতে ইচ্ছা হয়, দাও, ঐ ধারণাও এই মায়ারই ভিতরে। ইহার বিপরীত হইতেই পারে না, আর মানুষের সমস্ত জ্ঞান কেবল এই মায়ার সাধারণ ভাব আবিষ্কার করা, উহার প্রকৃত স্বরূপ জানা। এই মায়া নামরূপেরই কার্য্য। যে কোন বস্তুরই আকৃতি আছে, যাহা কিছু তোমার মনের মধ্যে কোন প্রকার ভাবের উদ্দীপনা করিয়া দেয়, তাহাই মায়ার অন্তর্গত, কারণ, যেমন জর্ম্মান দার্শনিকগণ বলেন, যাহা কিছু দেশকাল-নিমিত্তের অধীন, তাহাই মায়ার অন্তর্গত।

এক্ষণে ফের সেই ঈশ্বর-ধারণা-সম্বন্ধে কি হইল, তাহার বিচার করা যাউক। পূর্ব্বে সংসারের যে অবস্থা চিত্রিত হইয়াছে, তাহাতে অনায়াসেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, পূর্ব্বোক্ত ঈশ্বরধারণা—একজন ঈশ্বর আমাদিগকে অনন্তকাল ধরিয়া ভালবাসিতেছেন—ভালবাসা অবশ্য আমাদের ধারণামত—একজন অনন্ত সর্ব্বশক্তিমান্ ও নিঃস্বার্থ পুরুষ এই জগৎ শাসন করিতেছেন, তাহা হইতেই পারে না। এই সগুণ ঈশ্বরধারণার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে কবির

সাহসের আবশ্যক। তোমার ন্যায়পর দয়াময় ঈশ্বর কি? কবি জিজ্ঞাসিতেছেন, তিনি কি মনুষ্যরূপ বা পশুরূপ তাঁহার লক্ষ লক্ষ সন্তানের বিনাশ দেখিতেছেন না? কারণ, এমন কে আছে, যে এক মুহূর্ত্তও অপরকে না মারিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে? তুমি কি সহস্র সহস্র জীবন সংহার না করিয়া একটী নিশ্বাসও আকর্ষণ করিতে পার? তুমি জীবিত রহিয়াছ, লক্ষ লক্ষ জীব মরিতেছে বলিয়া। তোমার জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত, প্রত্যেক নিঃশ্বাস যাহা তুমি গ্রহণ করিতেছ, তাহা সহস্র সহস্র ব্যক্তির মৃত্যুস্বরূপ, আর তোমার প্রত্যেক গতি লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির মৃত্যুস্বরূপ। কেন তাহারা মরিবে? এ সম্বন্ধে একটী অতি প্রাচীন অযৌক্তিক কথা প্রচলিত আছে,—"উহারা ত অতি নীচ জীব।" মনে কর যেন তাহাই হইল—কিন্তু ইহা একটী অমীমাংসিত বিষয়। কে বলিতে পারে, কীট মনুষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ, কি মনুষ্য কীট হইতে শ্রেষ্ঠ? কে প্রমাণ করিতে পারে, এটী ঠিক, কি ওটী ঠিক? মানুষ গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারে অথবা যন্ত্র আবিষ্কার করিতে পারে, অতএব মানুষই শ্রেষ্ঠতর। এ কথা বলিলে ইহাও বলা যাইতে পারে, কীট গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারে না বা যন্ত্র আবিষ্কার করিতে পারে না বলিয়াই শ্রেষ্ঠ। এ পক্ষেও যেমন যুক্তি নাই, ও পক্ষেও তদ্রূপ নাই।

যাক সে কথা, উহারা অতি হীন জীব ধরিয়া লইলেও, তাহারা মরিবে কেন? যদি তাহারা হীন জীব হয়, তাহাদেরই ত আরো বাঁচা বেশী দরকার। কেন তাহারা বাঁচিবে না? তাহাদের জীবন ইন্দ্রিয়েই বেশী আবদ্ধ, সুতরাং তাহারা তোমার আমার অপেক্ষা সহস্রগুণ সুখ দুঃখ বোধ করে। কুকুর ব্যাঘ্র যেরূপ স্ফূর্ত্তির সহিত ভোজন করে, কোন্ মানব সেরূপ স্ফূর্ত্তির সহিত ভোজন করিতে পারে? ইহার কারণ, আমাদের সমুদয় কার্য্যপ্রবৃত্তি ইন্দ্রিয়ে নহে,—বুদ্ধিতে—আত্মায়। কিন্তু কুকুরের ইন্দ্রিয়েতেই প্রাণ পড়িয়া রহিয়াছে, তাহারা ইন্দ্রিয় সুখের জন্য উন্মত্ত হয়, তাহারা এত আনন্দের সহিত ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করিবে, আমরা মনুষ্যেরা সেরূপ করিতে পারি না, আর এই সুখও যতখানি, দুঃখও তাহার সমপরিমাণ।

যতখানি সুখ, ততখানি দুঃখ। যদি মনুষ্যেতর প্রাণীরা এত তীব্রভাবে সুখ অনুভব করিয়া থাকে, তবে ইহাও সত্য, তাহাদের দুঃখবোধও তেমনি তীব্র—মানুষের অপেক্ষা সহস্রগুণে তীব্রতর—তাহাদিগকে মরিতে হইবে। তাহা হইলে হইল এই, মানুষ মরিতে যত কষ্ট অনুভব করিবে, অপর প্রাণী তাহার

শতগুণ ভোগ করিবে, তথাপি আমাদিগকে তাহাদের কষ্টের বিষয় না ভাবিয়া তাহাদিগকে মারিতে হয়। ইহাই মায়া; আর যদি আমরা মনে করি, একজন সগুণ ঈশ্বর আছেন, যিনি ঠিক মানুষেরই মত, যিনি সব সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইলে ঐ যে সকল ব্যাখ্যা মত প্রভৃতি, যাহাতে বলে, মন্দের মধ্য হইতে ভাল হইয়াছে, তাহা পর্য্যাপ্ত হয় না। হউক না শত শত সহস্র সহস্র উপকার— মন্দের মধ্য দিয়া উহা কেন আসিবে? এই সিদ্ধান্ত অনুসারে তবে আমিও নিজ পঞ্চেন্দ্রিয়ের সুখের জন্য অপরের গলা কাটিব। সুতরাং ইহা কোন যুক্তি হইল না। কেন মন্দের মধ্য দিয়া ভাল হইবে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে, কিন্তু এই প্রশ্নের ত উত্তর দেওয়া যায় না; ভারতীয় দর্শন ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

বেদান্ত সকল প্রকার ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকতর সাহসের সহিত সত্য অন্বেষণে অগ্রসর হইয়াছেন। বেদান্ত মাঝখানে এক জায়গায় গিয়া তাঁহার অনুসন্ধান স্থগিত রাখেন নাই, আর তাঁহার পক্ষে অগ্রসর হইবার এক সুবিধাও ছিল। বেদান্তধর্ম্মের বিকাশের সময় পুরোহিত সম্প্রদায় সত্যান্বেষিগণের মুখ বন্ধ করিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন নাই। ধর্ম্মে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। তাঁহাদের সঙ্কীর্ণতা ছিল—সামাজিক প্রণালীতে। এখানে (ইংলণ্ডে) সমাজ খুব স্বাধীন। ভারতে সামাজিক বিষয়ে স্বাধীনতা ছিল না, কিন্তু ধর্ম্মমত সম্বন্ধে ছিল। এখানে লোকে পোষাক যেরূপ পরুক না কেন, কিম্বা যাহা ইচ্ছা করুক না কেন, কেহ কিছু বলে না বা আপত্তি করে না, কিন্তু চর্চ্চে একদিন যাওয়া বন্ধ হইলেই, নানা কথা উঠে। সত্য চিন্তার সময় তাঁহাকে আগে হাজার বার ভাবিতে হয়, সমাজ কি বলে। অপর পক্ষে, ভারতবর্ষে যদি একজন অপর জাতির হাতে খায়, অমনি সমাজ তাহাকে জাতিচ্যুত করিতে অগ্রসর হইয়া থাকে। পূর্ব্ব পুরুষেরা যেরূপ পোষাক করিতেন, তাহা হইতে একটু পৃথক্‌রূপ পোষাক করিলেই, বাস, তাহার সর্ব্বনাশ। আমি শুনিয়াছি, প্রথম রেলগাড়ী দেখিতে গিয়াছিল বলিয়া একজন জাতিচ্যুত হইয়াছিল। মানিয়া লইলাম, ইহা সত্য নহে, কিন্তু আমাদের সমাজের এই গতি। কিন্তু আবার ধর্ম্ম বিষয়ে দেখিতে পাই, নাস্তিক, জড়বাদী, বৌদ্ধ, সকল রকমের ধর্ম্ম, সকল রকমের মত, অদ্ভুত রকমের, ভয়ানক ভয়ানক মত লোকে প্রচার করিতেছে, শিক্ষাও পাইতেছে,— এমন কি, দেবপূর্ণ মন্দিরের দ্বারদেশে ব্রাহ্মণেরা জড়বাদিগণকেও দাঁড়াইয়া

তাঁহাদেরই দেবতার নিন্দা করিতে দিতেছেন! ইহা তাঁহাদের—ধর্ম্মে উদারভাব ও মহত্ত্বের পরিচায়কই বটে।

বুদ্ধ খুব বৃদ্ধ বয়সে দেহরক্ষা করেন। আমার একজন আমেরিকান বৈজ্ঞানিক বন্ধু বুদ্ধদেবের জীবনী পড়িতে বড় ভাল বাসিতেন। তিনি বুদ্ধদেবের মৃত্যুটী ভালবাসিতেন না, কারণ বুদ্ধদেব ক্রুশে বিদ্ধ হন নাই। কি ভ্রমাত্মক ধারণা। বড় লোক হইতে গেলেই খুন হইতে হইবে! ভারতে এরূপ ধারণা প্রচলিত ছিল না। বুদ্ধদেব তাঁহাদের দেবতা, এমন কি, তাঁহাদের দেবদেব জগৎশাসনকর্ত্তা পর্য্যন্ত অস্বীকার করিয়া তাঁহাদেরই দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তিনিই আবার বৃদ্ধবয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি ৮৫ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন, আর তিনি অর্দ্ধেক দেশ তাঁহার ধর্ম্মে আনিয়াছিলেন।

চার্ব্বাকেরা ভয়ানক ভয়ানক মত প্রচার করিতেন—ঊনবিংশ শতাব্দিতেও লোকে এরূপ স্পষ্ট খোলা খাঁটি জড়বাদ প্রচারে সাহস করে না। এই চার্ব্বাকগণ মন্দিরে মন্দিরে নগরে নগরে প্রচার করিতেন—ধর্ম্ম মিথ্যা—উহা পুরোহিতগণের স্বার্থ চরিতার্থ করিবার উপায় মাত্র, বেদ ভণ্ড ধূর্ত্ত নিশাচরদিগের রচনা—ঈশ্বরও নাই, আত্মাও নাই। যদি আত্মা থাকেন, তবে স্ত্রী পুত্রের প্রণয়াকৃষ্ট হইয়া কেন তিনি ফিরিয়া আসেন না? তাহাদের এই ধারণা ছিল যে, যদি আত্মা থাকেন, তবে মৃত্যুর পরও তাঁহার ভালবাসা প্রণয় সব থাকে, তিনি ভাল খাইতে, ভাল পরিতে চান। এরূপ ধারণাসম্পন্ন হইলেও কেহই চার্ব্বাকদিগের উপর কোন অত্যাচার করে নাই।

আমরা ধর্ম্মবিষয়ে স্বাধীনতা দিয়াছিলাম, তাহার ফলস্বরূপ এখনও ধর্ম্মজগতে আমাদের মহাশক্তি বিরাজিত। তোমরা সামাজিক বিষয়ে সেই স্বাধীনতা দিয়াছ, তাহার ফল—তোমাদের অতি সুন্দর সামাজিক প্রণালী। আমরা সামাজিক উন্নতি বিষয়ে কিছু স্বাধীনতা দিই নাই, সুতরাং আমাদের সমাজ সঙ্কীর্ণ। তোমরা ধর্ম্মসম্বন্ধে স্বাধীনতা দাও নাই, ধর্ম্মবিষয়ে প্রচলিত মতের ব্যতিক্রম করিলেই অমনি বন্দুক তরবারি বাহির হইত; তাহার ফল, ইউরোপীয় ধর্ম্মভাব সঙ্কীর্ণ। ভারতে সমাজের শৃঙ্খল খুলিয়া দিতে হইবে, আর ইউরোপে ধর্ম্মের শৃঙ্খল খুলিয়া লইতে হইবে। তবেই উন্নতি হইবে। যদি আমরা এই আধ্যাত্মিক নৈতিক বা সামাজিক উন্নতির ভিতরে যে একত্ব রহিয়াছে, তাহা ধরিতে পারি, যদি জানিতে পারি, উহারা একই পদার্থের বিভিন্ন বিকাশমাত্র, তবে ধর্ম্ম আমাদের সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিবে, আমা-

দের জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তই ধর্ম্মভাবে পূর্ণ হইবে। ধর্ম্ম আমাদের জীবনের প্রতি কার্য্যে প্রবেশ করিবে—ধর্ম্ম বলিতে যাহা কিছু বুঝায়, সেই সমুদয় আমাদের জীবনে তাহার প্রভাব বিস্তার করিবে। বেদান্তের আলোকে তোমরা বুঝিবে, সব বিজ্ঞান কেবল ধর্ম্মেরই বিভিন্ন বিকাশমাত্র; জগতের আর সব জিনিষও ঐরূপ।

তবে আমরা দেখিলাম, স্বাধীনতা থাকাতেই ইউরোপে এই সকল বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, আর আমরা দেখিতে পাই, আশ্চর্য্যের বিষয়, সকল সমাজেই দুইটী দল দেখিতে পাওয়া যায়। এক দল সংহারক, আর এক দল সংগঠনকারী। মনে কর, সমাজে কোন দোষ আছে, অমনি একদল উঠিয়া অমনি গালাগালি করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহারা অনেক সময় গোঁড়ামাত্র হইয়া দাঁড়ায়। সকল সমাজেই ইহাদিগকে দেখিতে পাইবে, আর স্ত্রীলোকেরাই অধিকাংশ এই চীৎকারে যোগ দিয়া থাকে, কারণ তাহারা স্বভাবতই ভাবপ্রবণ। যে কোন ব্যক্তি দাঁড়াইয়া কোন বিষয়ের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করে, তাহারই দলবৃদ্ধি হইতে থাকে। ভাঙ্গা সহজ; একজন পাগল সহজে যাহা ইচ্ছা ভাঙ্গিতে পারে, কিন্তু তাহার পক্ষে কিছু গড়া কঠিন।

সকল দেশেই এইরূপ অসদ্বিষয়ের প্রতিবাদী কোন না কোন আকারে বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়, আর তাহারা মনে করে, কেবল গালাগালি দিয়া, কেবল দোষ প্রকাশ করিয়া দিয়াই তাহারা লোককে ভাল করিবে। তাহাদের দিক্ হইতে দেখিলে মনে হয় বটে, তাহারা কিছু উপকার করিতেছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহারা অধিক অনিষ্টই করিয়া থাকে। কোন জিনিষ ত আর এক দিনে হয় না। সমাজ একদিনে নির্ম্মিত হয় নাই, আর পরিবর্ত্তন অর্থে—কারণ দূর করা। মনে কর, এখানে অনেক দোষ আছে, কেবল গালাগালি দিলে কিছু হইবে না, কিন্তু মূলে গমন করিতে হইবে। প্রথমে ঐ দোষের হেতু কি নির্ণয় কর, তার পর উহা দূর কর, তাহা হইলে উহার ফলস্বরূপ দোষ আপনিই চলিয়া যাইবে। চীৎকারে কোন ফল হইবে না, তাহাতে বরং অনিষ্টই আনয়ন করিবে।

অপর দলের—যাঁহাদের কথা বলা হইয়াছে—তাঁহাদের হৃদয়ে সহানুভূতি ছিল। তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, দোষ নিবারণ করিতে হইলে উহার কারণ পর্য্যন্ত গমন করিতে হইবে। ইহাঁরাই বড় বড় সাধুগণ। একটী কথা তোমাদের স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, জগতের সকল শ্রেষ্ঠ আচার্য্যগণই বলিয়া গিয়াছেন, আমরা নাশ করিতে আসি নাই, পূর্ব্বে যাহা ছিল,

তাঁহাকে সম্পূর্ণ করিতে আসিয়াছি। অনেক সময় আচার্য্যগণের এইরূপ মহৎ উদ্দেশ্য না বুঝিয়া তাঁহারা সাধারণ লোকের মতে সায় দিয়া তাঁহাদের অনুপযুক্ত কার্য্য করিয়াছেন, বলিয়া থাকে। এখনও অনেকে এইরূপ বলিয়া থাকে যে, ইঁহারা যাহা সত্য বলিয়া ভাবিতেন, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে সাহস করিতেন না, ইঁহারা কতকটা কাপুরুষ ছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। এই সকল একদেশদর্শীরা এই সকল মহাপুরুষগণের হৃদয়স্থ প্রেমের অনন্ত শক্তি অতি অল্পই বুঝিতে পারে। তাঁহারা জগতস্থ জনগণকে তাঁহাদের সন্তানস্বরূপ দেখিতেন। তাঁহারাই যথার্থ পিতা, তাঁহারাই যথার্থ দেবতা, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই জন্য অনন্ত সহানুভূতি এবং ক্ষমা—তাঁহারা সর্ব্বদা সহ্য এবং ক্ষমা করিতে প্রস্তুত। তাঁহারা জানিতেন, কি করিয়া মানবসমাজ সংগঠিত হইবে; সুতরাং তাঁহারা অতি ধীরভাবে, অত্যন্ত সহগুণের সহিত তাঁহাদের সঞ্জীবনী ঔষধ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। লোককে তাঁহারা গালাগালি দেন নাই বা ভয় দেখান নাই, কিন্তু অতি ধীরভাবে তাঁহাদিগকে এক এক পদ করিয়া পথ দেখাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ইঁহারাই উপনিষদের লেখক। তাঁহারা সম্পূর্ণ জানিতেন, ঈশ্বরের প্রাচীন ধারণা সকল উন্নত-নীতি-সঙ্গত ধারণার সহিত মেলে না। তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে জানিতেন, ঐ সকল খণ্ডনকারীদের ভিতরই অধিক সত্য আছে; তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে জানিতেন, বৌদ্ধ ও নাস্তিকগণ যাহা প্রচার করিতেন, তাহার মধ্যে অনেক মহৎ মহৎ সত্য আছে, কিন্তু তাঁহারা ইহাও জানিতেন, যাহারা পূর্ব্বমতের সহিত কোন সম্বন্ধ রক্ষা না করিয়া নূতন মত স্থাপন করিতে চাহে, যাহারা যে সূত্রে মালা গ্রথিত, তাহাকে ছিন্ন করিতে চাহে, যাহারা শূন্যের উপর নূতন সমাজ গঠন করিতে চাহে, তাহারা সম্পূর্ণরূপে অকৃতকার্য্য হইবে।

আমরা কখনই নূতন কিছু নির্ম্মাণ করিতে পারি না, আমরা কেবল পুরাতন বস্তুর স্থান পরিবর্ত্তন করিতে পারি মাত্র। বীজই বৃক্ষরূপে পরিণত হয়, সুতরাং আমাদিগকে ধৈর্য্যের সহিত শান্তভাবে লোকের সত্যানুসন্ধানের জন্য নিযুক্ত শক্তিকে পরিচালন করিতে হইবে, যে সত্য পূর্ব্ব হইতেই জ্ঞাত, তাহারই সম্পূর্ণভাব জানিতে হইবে। সুতরাং ঐ প্রাচীন ঈশ্বরধারণা বর্ত্তমান কালের অনুপযুক্ত বলিয়া একেবারে উড়াইয়া না দিয়া, তাঁহারা উহার মধ্যে যাহা সত্য আছে, তাহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, তাহার ফল বেদান্তদর্শন। তাঁহারা প্রাচীন দেবতাসকল এবং জগতের শাস্তা এক ঈশ্বরের

হইয়াছে। কিরূপে ষষ্ঠী বিভক্তির দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইল? অর্থাৎ এই সূত্রে, বিভক্তি বিহীন নির্দ্দেশ করা যাইবে। যেমন কৃপ উঃ রঃ লঃ এইরূপ বিচ্ছেদ করিয়া "কৃপোরোলঃ" সূত্র নিষ্পাদিত হইয়াছে। এই স্থলে এইরূপ অর্থ হইবে যে কৃপ ধাতুর ঋকারের ষষ্ঠী বিভক্তিতে উঃ হইয়াছে। র্ ইহার ষষ্ঠী বিভক্তিতে রঃ হইয়াছে। ল্ ইহার ষষ্ঠী বিভক্তিতে লঃ হইয়াছে। সুতরাং কৃপ ধাতুর ঋকারের স্থানে ঌকার এবং র্ স্থানে ল্ হইবে; এইরূপই যখন অর্থ হইল, তখন এই স্থানে ঋকারও ষষ্ঠী বিভক্তি নির্দ্দিষ্ট হওয়াতে. একদেশ বিকৃত হইলেও রূপান্তর হইবে না। অতএব "কৢপ্তশিখ" এই স্থলেও 'ঌ' প্লুত হইবে।

ভাষ্যমূল।—অথবা পুনরস্তু অবিশেষেণ। নমু চোক্তং রাজ্ঞঃ ক চ রাজকীয়ম্ অল্লোপোন ইতি প্রাপ্নোতীতি। নৈব দোষঃ। বক্ষ্যত্যেতৎ শ্বাদীনাং সংপ্রসারণে নকারান্তগ্রহণমনকারান্তপ্রতিষেধার্থমিতি। তৎপ্রকৃতমুত্তরত্রানুবর্ত্তিষ্যতে। অল্লোপোনঃ নকারান্তস্যেতি।

বঙ্গানুবাদ।—অথবা পুনঃ ষষ্ঠী বিভক্তি বিশিষ্ট না হইয়া সাধারণরূপেই হউক। যদি বল যে, সাধারণরূপে (অবিশেষরূপে) প্রয়োগ করিলে, "রাজ্ঞঃ ক চ," এই সূত্র দ্বারা রাজকীয়ম্ শব্দ সিদ্ধ হইলে, অল্লোপোহনঃ।৬।৪।১৩৪। (কোনও শব্দের অঙ্গস্থিত অবয়ববিশিষ্ট কোনও "নকার" হইলে, সেই নকার যদি সর্ব্বনাম (১) বিশিষ্ট সংজ্ঞা না হয়, আর তৎপরে যদি অয়চ্ আদি বিশিষ্ট স্বাদি (২) পরে থাকে, পুনঃ সেই ন কার যদি অন্ভাগের অন্তস্থিত হয়, তাহা হইলে, সেই নকারের পূর্ব্ববর্ত্তী অকারের লোপ হয়) এই সূত্রানুসারে, রাজন্ শব্দের লুপ্ত নকার প্রযুক্তও, রাজকীয় শব্দের 'জ'কারস্থিত অকারের লোপ হইবে। সুতরাং 'রাজকীয়' এই শুদ্ধ প্রয়োগ না হইয়া রাজ্‌কীয় এই রূপ অশুদ্ধ প্রয়োগ হইবে।

এই স্থলে দোষ হইবে না। যে হেতু "শ্বযুবমঘোনামতদ্ধিতে" ।৬ ৪ ১৩৩। (তদ্ধিত ভিন্ন ভ (৩) সংজ্ঞা বিশিষ্ট, শ্বন্, যুবন্, এবং মঘবন্ শব্দের

(১) সু ও যস্ অম্ ও এই পঞ্চ বিভক্তির সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হয়, ক্লীবলিঙ্গ ভিন্ন অন্যত্র।

(২) সু হইয়াছে আদিতে যার (যে সকল বিভক্তির). তাহাকে স্বাদি বলে। যথা সু, ঔ, যস্, অম্, ঔট্, শস্ ইত্যাদি।

(৩) যকার আদিতে আছে এবং স্বরবর্ণ আদিতে আছে, এমন সর্ব্বনাম ভিন্ন স্বাদি বিভক্তি পরে থাকিলে তাহার পূর্ব্বস্থিত শব্দের ভ সংজ্ঞা হয়।

অন্ ভাগ পরে থাকিলে, সংপ্রসারণ (১) হইয়া থাকে।) এই সূত্রে শ্বন্ প্রভৃতি শব্দের সংপ্রসারণ প্রসঙ্গে যে, (নকারান্ত শব্দ হইলেও পুনঃ) নকারান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা অনকারান্ত শব্দের বারণের জন্যই হইয়াছে, এইরূপ বলিতে হইবে। প্রকৃতি গত সেই সূত্র উত্তরোত্তর অনুবৃত্তি করিতে হইবে। তাহা হইলে 'অল্লোপোঽনঃ' এই সূত্রেও নকারান্তের গ্রহণ হইবে। সুতরাং এই স্থলে এইরূপ অর্থ হইবে যে, প্রত্যক্ষদৃষ্ট নকারবিশিষ্ট অন্‌ভাগেরই, অকার লোপ হয়। তাহা হইলেই রাজকীয় শব্দের অন্তর্গত রাজন্‌শব্দের ন্‌কার প্রত্যক্ষদৃষ্ট নহে বলিয়া, এ স্থলে অকারের লোপ হইবে না। রাজ্ঞীয় এইরূপ অশুদ্ধ প্রয়োগও হইবে না।

ভাষ্যমূল।—ইহ তর্হি কৢপ্তশিখঃ। অনৃত ইতি প্রতিষেধঃ প্রাপ্নোতি। ঋৎপ্রতিষেধাচ্চ *। ঋবত প্রতিষেধাচ্চৈতৎসিধ্যতি। গুরোরৃবত ইতি বক্ষ্যামি যত্ররবত ইত্যুচ্যতে। হোতৃ ঋকারঃ হোতৃ ৯কারঃ। অত্র ন প্রাপ্নোতি। গুরোরৃবতঃ হ্রস্বস্যেতি বক্ষ্যামি। স এব সূত্রভেদেন ৯কারোপদেশঃ প্লুতাদ্যর্থ সংপ্রত্যাখ্যায়তে নৈষা মতভোরংশস্তস্মিন্নুট্টাঙ্ক্লৃপতে।

বঙ্গানুবাদ।—তবে 'কৢপ্তশিখঃ' এইস্থলে, গুরোরনৃতোঽনন্ত্যস্যাপ্যেকৈকস্য প্রাচাম্।৮।২।৮৬ (দূর হইতে সম্বোধন করিলে সেই অ হুত বাক্য, যদি ঋকার ভিন্ন অন্য কোন স্বর বর্ণ হয় এবং সেই স্বর বর্ণ যদি গুরু হয়, তবে সেই স্বর বিকল্পে প্লুত হয়) এই সূত্রানুসারে, ঋকার পরে থাকিলে প্লুতের নিষেধ হয় বলিয়া, ঋকার স্থানে ৯কার হওয়াতে, ৯কার পরে থাকিলেও প্লুতের নিষেধ প্রাপ্ত হইবে।

এই স্থানে দোষ ঘটিবে না। আমরা সূত্রের রূপান্তর করিব। প্রত্যক্ষ দৃষ্ট রকার বিশিষ্ট ঋকারের প্লুত নিষেধ হয়।*। র কার বিশিষ্ট ঋকারের প্লুত নিষেধ করিলেই ৯কারের প্লুত স্বর সিদ্ধ হইবে। এক্ষণে এইরূপ সূত্র হইবে যে, "গুরোরৃবতোঽনন্ত্যস্যাপ্যেকৈকস্য প্রাচাম্"। এইরূপ সূত্র করিলে, সমস্ত ঋকারের প্লুত নিষেধ না হইয়া যাহাতে রকার প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়, এইরূপ ঋকারেরই নিষেধ প্রাপ্ত হইবে। অতএব ঋকার স্থানে ৯কার হইলেও, ৯কারেতে রকার প্রত্যক্ষ দৃষ্ট নহে বলিয়া প্লুত নিষেধ হইবে না।

(১) 'য'কার স্থানে ইকার, 'ব'কার স্থানে উকার, রকার স্থানে ঋ, লকার স্থানে ৯ আদেশ হইলে, তাহাকে সংপ্রসারণ কহে।

যদি র কার বিশিষ্ট ঋ কারের প্লুত নিষেধ হয়, এই রূপই বলা যায় ; তবে "হোতৃ ঋকার" সন্ধি হইয়া হোতৄকার দীর্ঘ ৠকার হইলে, তাহারও ঋ কারেতে র কার, প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে বলিয়া প্লুত নিষেধ হইবে, অর্থাৎ হোতৄ৩ কার এই স্থানে ৠকার প্লুত হইবে না।

এই স্থলে নিষেধ প্রাপ্তি হইবে না। যেহেতু এস্থলে এইরূপ সূত্র করিব, যে গুরোরনৃতঃ হ্রস্বস্যানন্ত্যস্যাপ্যেকৈকস্য প্রচাম্। তাহা হইলে, কেবল হ্রস্ব ঋকারেই প্লুত নিষেধ প্রাপ্ত হইবে। 'হোতৄ৩কার' এই স্থলে প্লুতের নিষেধ প্রাপ্তি হইবে না। এইরূপ করিলে ঌ কার উপদেশ বিনাই কার্য্য সিদ্ধিও হইবে।

এই প্রকারে পাণিনিকৃত সূত্রের রূপান্তর করিয়া প্লুতি প্রভৃতিতে, ঌ কার উপদেশ ব্যতীতও প্রয়োগসিদ্ধি করিয়া, ঌ কারের প্রত্যাখ্যান (খণ্ডন) করা; যেমন অতি বৃহৎ বংশোপরিস্থিত লট্বা (পক্ষী বিশেষ বা ফল বিশেষ) কে অতি কষ্টে টানিয়া নামান হয়।

ভাষ্যমূল।—এওঙ্। ঐঔচ্ ইতি। ইদং বিচার্য্যতে। ইমানি সন্ধ্যক্ষরাণি তপরাণি বোপদিশ্যেরন্। এং ওং ঙ্। ঐং ঔং চ্ ইতি। অতপরাণি বা যথান্যাসমিতি। কশ্চাত্র বিশেষঃ।

সন্ধ্যক্ষরেষু তপরোপদেশশ্চেত্তপরোচ্চারণম্॥* । সন্ধ্যক্ষরেষু তপরোদেশশ্চেত্ত-পরোচ্চারণং কর্ত্তব্যম্।

বঙ্গানুবাদ।—এ ও ঙ্। ঐ ঔ চ্। এই স্থলে এই বিচার করা যাইতেছে যে, এ ঐ ও ঔ এই সন্ধি (১) অক্ষর সমূহ তকারান্ত বিশিষ্ট, "এং, ওং, ঙ। ঐং ঔং চ্"। এইরূপ উপদিষ্ট হওয়া উচিত, অথবা অতকারান্ত বিশিষ্ট গ্রন্থোক্ত বিধানবৎ উপদেশ করা কর্ত্তব্য? (যেমন গ্রন্থে এ ও ঙ্ ঐ ঔ চ্ আছে, সেই রূপই হইবে?)

ইহাতে বিশেষ কি? ভাবার্থঃ—যেরূপ গ্রন্থে লিখিত আছে সেইরূপ উল্লেখ করিলে কি দোষ হইবে এবং তকারান্ত বিশিষ্ট উচ্চারণ করিলে বিশেষ

---

(১) দুই বর্ণের পরস্পর মিলন হইলে, সেই মিলনকে সন্ধি কহে। একারে, অ এবং ই মিলিত হইয়া 'এ' হইয়াছে। ওকারে, অ এবং উ মিলিত হইয়া 'ও' হইয়াছে। ঐকারে, অ এবং ই মিলিত হইয়া 'ঐ হইয়াছে। ঔকারে অ এবং উ মিলিত হইয়া 'ঔ' হইয়াছে; (ঐকার এবং ঔকারে বিবৃততর প্রযত্ন হওয়াতে, বিবৃত প্রযত্ন বিশিষ্ট একার ওকার হইতে, তুল্য বর্ণ প্রযুক্ত হইয়া উৎপন্ন হইলেও, পৃথক্ হয়)। এই জন্যই এ ঐ ও ঔ ইহাদিগকে সন্ধি অক্ষর বলে।

কি লাভ হইবে? বরং ত কার উচ্চারণ করিলেই 'ত'কার রূপ একটী বর্ণ অতিরিক্ত উচ্চারণ জন্য গৌরব হওয়াতে দোষই হইবে। যদি সন্ধি অক্ষরেতে ত কারের উপদেশ করা যায়; তবে তকার উচ্চারণরূপ একটী অতিরিক্ত কার্য্য কর্ত্তব্য হইবে। * সন্ধি অক্ষরসমূহে, ত কারের যদি উচ্চারণ করা যায়; তবে ত কারের অতিরিক্ত উচ্চারণ জন্য গৌরব হওয়াতে, উচ্চারণকারীর পক্ষেই দোষ হইবে।

ভাষ্যমূল।—প্লুত্যাদিষ্বজ্বিধিঃ। প্লুতাদিষ্বজাশ্রয়ো বিধির্ন সিধ্যতি। গো৩ত্রাত নৌ৩ত্রাত ইত্যত্রানীচ চ অচ উত্তরস্য যবো দ্বে ভবত ইতি দ্বির্বচনং ন প্রাপ্নোতি। ইহ প্রত্যঙ্ঙ্ উ৩তিকাম্নন উদঙ্ঙ্ উ৩ পগব ইতি অচীতি ঙমুডাগমো ন প্রাপ্নোতি।

বঙ্গানুবাদ।—তাৎপর্য্যার্থঃ—শাস্ত্রকারদিগের মতে যদি, কোনও অর্দ্ধমাত্রা বিশিষ্ট বর্ণও উচ্চারণ না করিলে কার্য্য সিদ্ধি হয়, তাহা হইলে তাঁহারা কিছুতেই সেই বর্ণ উচ্চারণ করেন না। শাস্ত্রকারগণ কোনও সূত্র করিতে গিয়া যদি অর্দ্ধমাত্রাও লাঘব করিতে পারেন, তাহা হইলে, পুত্র উৎসবের ন্যায় আনন্দ অনুভব করেন। এরূপ অবস্থায় যদি ত কার উচ্চারণ ভিন্নও কার্য্য সিদ্ধি হয়, তাহা হইলে "এং ওং ঙ্" এইরূপ সূত্র করা একান্তই অসঙ্গত।

এতদ্ভিন্ন তকার উচ্চারণে দোষান্তরও প্রদর্শিত হইতেছে।

বার্ত্তিকার্থ।—সন্ধি অক্ষরে তকার উচ্চারণ করিলে, প্লুত প্রভৃতি কার্য্যে অচ্ (স্বর) বিধান করা কর্ত্তব্য। *।

যদি 'এওঙ্' 'ঐ ঔ চ্' ইহাদের মধ্যে, তকার উচ্চারণ করা যায়, (১) তবে প্লুত প্রভৃতি কার্য্য করিবার সময়, অচ্ (স্বর) নিমিত্ত বিধান সিদ্ধ হইবে না। যথা গো৩ত্রাত নৌ৩ত্রাত এই স্থলে অনচি। ৮।৪।৪৭। অচ্ প্রত্যাহারের পরস্থিত যর্ প্রত্যাহারান্ত বর্ণের দ্বিত্ব হয় এই বলিয়া, গো৩ এবং নৌ৩ এই প্লুত অচের (স্বরের) পরে যর্ প্রত্যাহারান্তর্গত তকারের দ্বিত্ব হইবে না। যেহেতু দীর্ঘ ওকারেরই তকারান্ত পাঠ করাতে অচ্ত্ব ধর্ম্ম প্রাপ্তি হইয়াছে।

(১) তপরস্তৎকালস্য ১।১।৭০। ত কার পরে আছে যার এমন যে বর্ণ অথবা ত কারের পরস্থিত যে বর্ণ, সেই বর্ণের সমকালেরই সংজ্ঞা হয়। যেমন 'অৎ ইৎ উৎ' এই সকল স্থলে ত কার পরে থাকাতে কেবল একমাত্রা উচ্চারণের কালের সমান হ্রস্ব অকার, হ্রস্ব ইকার এবং হ্রস্ব উকারেরই গ্রহণ হইবে। দীর্ঘ আকার ঈকার আদির গ্রহণ হইবে না। সেইরূপ এই স্থলেও যদি এং ওং ঙ্। ঐং ঔং চ এই স্থলে দীর্ঘ একার ওকার ঐকার ঔকার ভিন্ন প্লুত একারাদির গ্রহণ হইবে না। সুতরাং অচ্ সংজ্ঞা মধ্যে প্লুত একার ওকার ঐকার ঔকারেরও গ্রহণ হইবে না।

প্লুত ঔকার কি ঐকারের অচ্ত্ব প্রাপ্তি হয় নাই। আর প্রতা ঐতিকায়ন, উপগব এইস্থলে (ঙমোহ্রস্বাদচিঙমুন্নিত্যম্। ৮। ৩। ৩২। হ্রস্বের পরে যে ঙম্ প্রত্যাহার, সেই ঙম্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ পরে আছে যার, এমন যে পদ, সেই পদের পর অচ্ থাকিলে, ঙমুট্ আগম হয়)। এই সূত্রানুসারে অচ্ পরে থাকিলে, যে ঙমুট আগম প্রাপ্তি হইয়া থাকে, তাহা হইবে না। যে হেতু প্লুত ঐকার কি প্লুত ঔকার অচ্ প্রত্যাহার মধ্যে গৃহীত হয় নাই।

ভাষ্যমূল।—প্লুতসংজ্ঞা চ। *। প্লুত সংজ্ঞা চ ন সিধ্যতি। ঐ৩তিকায়ন। ঔ৩পগব। ঊকালোজ্ হ্রস্বদীর্ঘপ্লুতসংজ্ঞো ভবতীতি প্লুতসংজ্ঞা ন প্রাপ্নোতি।

বঙ্গানুবাদ।—এওঙ্। ঐঔচ্ এস্থলে এ ও প্রভৃতি তকারান্ত ভিন্ন পাঠ করিলে, একারাদির প্লুত সংজ্ঞাও হইবে না। *।

তকার রহিত এওঙ্ ঐঔচ্ পাঠ করিলে, তাহাদের প্লুত সংজ্ঞাও সিদ্ধ হইবে না। যেমন 'ঐ৩তিকায়েন', 'ঔ৩ পগব' এই স্থলে ঊকালোজ্ঝ্রস্ব-দীর্ঘপ্লুতঃ ১। ২। ২৭। (উ উ উ৩, ইহাদের উচ্চারণ কালের ন্যায় কাল যার, তাহাদের যথাক্রমে হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুত সংজ্ঞা হয়) এই সূত্রানুসারে ঐকারের এবং ঔকারের প্লুত সংজ্ঞা হইবে না।

ভাষ্যমূল।—সন্তু তর্হি তপরাণি। অতপর এ চ ইগ্ হ্রস্বাদেশে *। যদ্যতপরাণি এচ ইগ্ হ্রস্বাদেশইতি বক্তব্যম্। কিম্ প্রয়োজনম্। এচোহ্রস্বাদেশ-শাসনেষর্দ্ধ একারোঽর্দ্ধ ওকারে বা মা ভূদিতি।

বঙ্গানুবাদ।—যদি তকারান্ত বিশিষ্ট এওঙ্ ঐঔচ্ সূত্র করাতে, এত দোষই ঘটে; তবে তকারান্ত রহিতই সূত্র করা যাউক্।

যদি তকার রহিতই 'এওঙ্' 'ঐওচ্' সূত্র করা যায়, তবে 'এচইগ্ হ্রস্বাদেশে' এই সূত্রে 'ইক্' প্রত্যাহারের গ্রহণ করিতে হইবে। *।

যদি তকার রহিত সূত্র করা যায় তবে এচইগ্হ্রস্বাদেশে ১। ১। ৪৮। (এচ্ প্রত্যাহারের স্থানে, হ্রস্ব আদেশ কর্ত্তব্য হইলে, ইক্ প্রত্যাহারস্থ বর্ণই হইবে) এই সূত্রে ইক্ আদেশ করা কর্ত্তব্য হইবে।

কেন 'ইক্ আদেশ করা কর্ত্তব্য হইবে?

প্রযত্ন (১) সাম্যতা নিবন্ধন, হ্রস্ব আদেশ করিলে, ইকার উকারাদি না

(১) প্রযত্ন দুই প্রকার। আভ্যন্তর এবং বাহ্য। আভ্যন্তর প্রযত্ন চারি প্রকার যথা;—স্পৃষ্ট, ঈষৎ স্পৃষ্ট, বিবৃত ও সংবৃত। বাহ্য প্রযত্ন এগার প্রকার যথা;—বিবার,

হইয়া, অৰ্দ্ধমাত্রাবিশিষ্ট একার অৰ্দ্ধমাত্রাবিশিষ্ট ওকারান্ত হইতে পারে। সুতরাং এচ্ প্রত্যাহারস্থলে হ্রস্ব আদেশ বিধান করিলে, অর্দ্ধ একার বা অর্দ্ধ ওকার বিশিষ্ট বর্ণ না হউক্, এই জন্য তকারান্ত সূত্র বিধান করা কর্ত্তব্য।

ভাষ্যমূল।—ননু চ যান্যপি তপরাণি তেনাপ্যেতদ্বক্তব্যম্। ইমাবৈচৌ সমাহারবর্ণৌ মাত্রাবর্ণস্য মাত্রেবর্ণোবর্ণয়োঃ তয়োর্হ্রস্বাদেশশাসনেষু কদা-চিদবর্ণঃ স্যাৎ কদাচিদিবর্ণোবর্ণৌ। মা কদাচিদবর্ণং ভূদিতি।

বঙ্গানুবাদ।—কেবল মাত্র তকারান্ত সূত্র না করিলেই যে এই দোষ ঘটিবে তাহা নহে। কিন্তু যাহার মতে, তকারান্তবিশিষ্ট সূত্র করা হইবে, তাহার মতেও "হ্রস্ব আদেশ কর্ত্তব্য হইলে, এচ্ প্রত্যাহার স্থানে ইক্ প্রত্যাহারান্ত বর্ণই হইবে," এইরূপ বলিতে হইবে। যেহেতু এই যে ঐ ঔ ইহারা সমাহার বর্ণ (অকার ইকার সমাহৃত অর্থাৎ একত্রীকৃত হইয়া ঐ, অ, উ একত্রীকৃত হইয়া ঔ হওয়াতে, ইহারা সমাহার বর্ণ হওয়াতে, ইহাদের স্থানে হ্রস্ব আদেশ হইলে, কখনও অবর্ণ হইবে, কখনও ইবর্ণ অথবা উবর্ণ হইবে। কেন না ঐকার এবং ঔকারেতে যখন অকার এবং ইকার বা উকার আছে, তখন তাহাদের স্থানে হ্রস্ব আদেশ হইলে, কখনও বা হ্রস্ব অ, কখনও বা হ্রস্ব 'ই' বা 'উ' হ

সংবার, ঘোষ, অঘোষ, অল্প প্রাণ, মহাপ্রাণ, শ্বাস, নাদ, উদাত্ত, অনুদাত্ত, ও স্বরিত। কোনও প্রসঙ্গে, সদৃশতম আদেশ হইয়া থাকে। একার ঐকারের কণ্ঠ তালু স্থান বলিয়া, তাহার স্থানে হ্রস্ব আদেশ হইলে, ইকারেরও তালু স্থান হওয়াতে, ইকারই হইবে। ওকার ঔকারের কণ্ঠ ওষ্ঠ স্থান বলিয়া, তাহার স্থানে হ্রস্ব আদেশ হইলে, উকারের ওষ্ঠস্থান হওয়াতে, উকারই হইবে। কিন্তু যদি কণ্ঠতালু কিম্বা কণ্ঠ ওষ্ঠ বিশিষ্ট কোনও হ্রস্ববর্ণ পাওয়া যায়, তবে এ ঐ ও ঔ ইহাদের স্থলে সেইরূপ বর্ণই হইবে। সুতরাং অৰ্দ্ধমাত্রা বিশিষ্ট 'একার' এবং 'ওকার' হইবে। কেন না, 'ইকার এবং উকার ইহাদের সদৃশ স্থান হইলেও সদৃশতম স্থান নহে। হ্রস্ব একার এবং ওকারেরই কণ্ঠ তালু এবং কণ্ঠৌষ্ঠ স্থান বলিয়া একার এবং ওকারই হইবে। যে হেতু কাহারও স্থানে কোনও আদেশ হইলে, সেই আদেশ তাহার সদৃশতম বর্ণই হইয়া থাকে।

এও ঙ্. ঐ ঔচ্ এই সূত্রে যদি তকারান্ত বিশিষ্ট এৎ ওৎ ঐৎ ঔৎ পাঠ না করা যায়, তবে ইহাদের (একারাদির) হ্রস্ব বিধান কে বারণ করিবে যে, একারাদির স্থলে হ্রস্ব আদেশ প্রাপ্ত হইলে, হ্রস্ব একারাদি প্রাপ্ত হইবে না? এৎ, ওৎ, ইহারা তকারান্ত বিশিষ্ট পাঠ হইলেই, তকারান্ত বিশিষ্ট বর্ণ, সেই বর্ণের সমান কালিক বর্ণকে গ্রহণ করে বলিয়া, এৎ, ওৎ গ্রহণে দুই মাত্রা কাল বিশিষ্ট একার ওকারেরই গ্রহণ হইবে। হ্রস্ব একার বা ওকারের গ্রহণ হইবে না। এই জন্যই তকারান্ত বিশিষ্ট সূত্র করা কর্ত্তব্য।

হইবে। কখনও, কেবল ঐকার স্থানে ইকার, অথবা ঔকার স্থানে উকারই প্রাপ্ত হইবে না। কিন্তু ঐ ঔ স্থানে অ হওয়া কখনও কর্ত্তব্য নহে। অতএব ঐ ঔ স্থানে হ্রস্ব আদেশ করিলে, কখনও হ্রস্ব 'অ' না হয়, এই জন্যও 'ইক্' প্রত্যাহারই (ই উ), হ্রস্ব আদেশ বলে, গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

ভাষ্যমূল।—প্রত্যাখ্যায়তে এতৎ। ঐচোশ্চোত্তরভূয়স্ত্বাদিতি। যদি প্রত্যাখ্যানপক্ষঃ ইদমপি প্রত্যাখ্যায়তে। সিদ্ধমেঙঃ সস্থানত্বাদিতি। নম্বচৈঙঃ সস্থানতরাবর্দ্ধ একারোঽর্দ্ধ ওকারঃ। ন তৌ স্তঃ। যদি হি তৌ স্যাতাং তাবেবায়মুপদিশেৎ। ননু চ ভোঃ ছন্দোগানাং সাত্যমুগ্রিরাণায়নীয়া অর্দ্ধমেকারমর্দ্ধমোকারং চাধীয়তে। সুজাতে এ অশ্বসূনৃতে। অধ্বর্যো ও অদ্রিভিঃ সুতম্। শুক্রং তে এ অন্যদ্যজতং তে এ অন্যদিতি। পার্ষদকৃতিরেষা তত্র ভবতাম্। নৈব হি লোকে নান্যস্মিন্ বেদেঽর্দ্ধ একারোঽর্দ্ধ ওকারো বাস্তি।

বঙ্গানুবাদ।—'ঐ' 'ঔ' স্থানে হ্রস্ব আদেশ করিলে, 'অ'কার স্বভাবতঃই প্রতিনিবৃত্ত হইবে। যেহেতু ঐ ঔ উচ্চারণে, উত্তরাংশই (ই এবং উ) বিশেষ রূপে উচ্চারিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বাংশ 'অ' কারের সেই রূপ বিশেষ উচ্চারণ হয় না। এই জন্যই ঐ ঔ স্থানে হ্রস্ব হইয়া অকার প্রাপ্তি হওয়া অসম্ভব বলিয়া, ইহা প্রত্যাখ্যান করা যাইতেছে। হে তকারান্ত সূত্রকারী ব্যক্তি, যদি প্রত্যাখ্যান পক্ষই অবলম্বন করিলে, তবে তকারান্তরহিত সূত্রকারী আমরাও, তোমার উপায়েতেই 'ইক্' আদেশ প্রত্যাখ্যান করিব। যদি বল যে, ঐ ঔ স্থানে হ্রস্ব আদেশ কর্ত্তব্য হইলে, ইক্ আদেশ অনাবশ্যক হইলেও, এ ও স্থানে কি হইবে?

এতদুত্তরে আমরা ইহাই বলিব যে, একার এবং ওকার স্থানে, যখন কেবল মাত্র তালু এবং ওষ্ঠ স্থানই সিদ্ধ আছে, তখন একার স্থানে হ্রস্ব আদেশ হইলে ইকার, এবং ওকার স্থানে হ্রস্ব আদেশ হইলে উকারই হইবে। যেহেতু একার এবং ইকারের তালু স্থান; ওকার এবং উকারের ওষ্ঠস্থান। (১)

(১) ঐ কার এবং ঔ কারের যথাক্রমে কণ্ঠ তালু এবং কণ্ঠ ওষ্ঠ স্থান মানিলেও ভাষ্যকার পতঞ্জলি একার এবং ওকারের কণ্ঠ তালু এবং কণ্ঠ ওষ্ঠ স্থান স্বীকার করেন না। বরং একারের তালু এবং ওকারের কেবলমাত্র ওষ্ঠ স্থানই স্বীকার করেন। সুতরাং একার ওকার স্থানে হ্রস্ব আদেশ হইলে ইকার উকারই হইবে। যেহেতু তালু বা ওষ্ঠস্থান বিশিষ্ট একার বা ওকার স্থানে, তাহার সমস্থান বিশিষ্ট ইকার বা উকার না হইয়া অকার হওয়া কোনও-রূপে সম্ভবপর হইতে পারে না।

যদি কোনও প্রসঙ্গ ক্রমে তাহার সদৃশতম বর্ণই আদেশ হয়,তবে অপেক্ষাকৃত সদৃশতর স্থান প্রযুক্ত অর্দ্ধমাত্রাবিশিষ্ট একার অর্দ্ধমাত্রাবিশিষ্ট ওকারই আদেশ হওয়া উচিত।

তাহা হইবে না; যেহেতু অর্দ্ধ মাত্রা বিশিষ্ট একার বা ওকার বলিয়া কোনও বর্ণই নাই।

যদি এইরূপ কোনও বর্ণ থাকা সম্ভব হয়, তাহা হইলে সেই বর্ণও পুনরায় উপদেশ করা কর্ত্তব্য।

যদি বল ওহে! অর্দ্ধ একার বা ও কার উপদেশের কোনও প্রয়োজন নাই; যেহেতু "সাত্যমুগ্রিরাণায়ণীয়" (১) গণ অর্দ্ধ মাত্রা বিশিষ্ট একার ও 'ওকার পাঠ করিয়া থাকেন; যেমনঃ—'সুজাতে এ অশ্বসূনৃতে। অধ্বর্যো ও অদ্রিভিঃ সুতম্। শুক্রং তে এ অন্যদ্‌যজতং তে এ অন্যদিতি," সামবেদের এই সমস্ত প্রয়োগ স্থলে, অর্দ্ধ একার এবং ওকার পাঠ করা হেতুই জানা যাইবে যে, অর্দ্ধ একার এবং অর্দ্ধ ওকার শব্দ শাস্ত্রে প্রসিদ্ধই রহিয়াছে। সুতরাং অর্দ্ধ এ বা ও উপদেশের কোনও প্রয়োজন নাই।

সামবেদের শাখা বিশেষে এইরূপ পাঠ হেতু, বলা যাইতে পারে না যে, অর্দ্ধ এ কার বা ও কারের পাঠ আবশ্যকই হইবে। অথবা শব্দ শাস্ত্রে প্রসিদ্ধই আছে; কেননা ইহা কেবল মাত্র সেই শাখা অধ্যয়ন শীল ব্যক্তিগণের, সভাতে পাঠ করিবার জন্যই, অর্দ্ধ 'এ' বা 'ও' পাঠ করা হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা কোনও রূপ লৌকিক ব্যবহারে বা শাস্ত্রে অথবা অন্য কোনও বেদে ঐরূপ অর্দ্ধ একার বা ওকার বিশিষ্ট কোনও বর্ণ নাই। সুতরাং বেদ বিশেষের শাখা বিশেষ পাঠকারীগণের কেবল মাত্র সভাতেই পাঠ করিবার জন্য যে, অর্দ্ধ একার বা ওকার পাঠ হইয়া থাকে, তাহা কখনও শাস্ত্রে প্রবর্ত্তিত করা যাইতে পারে না।

ভাষ্যমূল —একাদেশে দীর্ঘগ্রহণম্। *

একাদেশে দীর্ঘগ্রহণং কর্ত্তব্যম্। আদ্‌গুণোদীর্ঘোবৃদ্ধিরেচিদীর্ঘ ইতি। কিং প্রয়োজনম্। আন্তর্য্যতস্ত্রিমাত্র চতুর্মাত্রাণাং স্থানিনাং ত্রিমাত্রাচতুর্মাত্রা আদেশামাভূবন্নিতি। খট্বা ইন্দ্রঃ খট্বেন্দ্রঃ। খট্বা উদকম্ খট্বোদকম্। খট্বা ঈষা খট্বেষা। খট্বা ঊঢ়া খট্বোঢ়া। খট্বা এলকা খট্বৈলকা। খট্বা ওদনঃ খট্বৌদনঃ। খট্বা ঐতিকায়নঃ খট্বৈতিকায়নঃ। খট্বা ঔপগবঃ খট্বৌপগব ইতি।

(১) সাম বেদের শাখা বিশেষ।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য।

স্বামী বিবেকানন্দ।]

[১০৪ পৃষ্ঠার পর।

যাক্, মোদ্দা এমন সহর আর এ ভূমণ্ডলে নাই। পূর্ব্বকালে এ সহর ছিল আর একরূপ, ঠিক আমাদের কাশীর বাঙ্গালীটোলার মত। আঁকা বাঁকা গলি রাস্তা, মাঝে মাঝে দুটো বাড়ি এক করা খিলান, দেলের গায়ে পাতকো, ইত্যাদি। এবারকার একৃঝিবিষনে একটা ছোট পুরাণ পারি তৈরি করে দেখিয়েছে। সে পারি কোথায় গেছে, ক্রমিক বদ্‌লেছে, এক একবার লড়াই বিদ্রোহ হয়েছে, কতক অংশ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে, আবার পরিকার নূতন ফর্‌দা পারি সেই স্থানে উঠেছে।

বর্ত্তমান পারি অধিকাংশই তৃতীয় ন্যাপোলেঅঁর তৈরি। তৃ-ন্যাপোলেঅঁ মেরে কেটে জুলুম করে বাদ্‌সা হলেন। ফরাসী সেই প্রথম বিপ্লব হওয়া অবধি সতত টলমল্; কাজেই বাদ্‌সা, প্রজাদের খুসী রাখবার জন্য, আর পারি-নগরীর সতত চঞ্চল গরীব লোকদের কাজ দিয়ে খুসী করবার জন্য, ক্রমাগত রাস্তা ঘাট তোরণ থিয়েটার প্রভৃতি গড়তে লাগলেন। অবশ্য পারির সমস্ত পুরাতন মন্দির তোরণ স্তম্ভ প্রভৃতি রৈল। রাস্তা ঘাট সব নূতন হয়ে গেল। পুরাণ সহর পনার পাঁচিল সব ভেঙ্গে বুলভারের অভ্যুদয় হতে লাগ্‌ল এবং তাঁ হতেই এ সহরের সর্ব্বোত্তম রাস্তা, পৃথিবীতে অদ্বিতীয় শাঁজেলিজে রাস্তা তৈরি হল। এ রাস্তা এত বড় চওড়া, যে মধ্যখানে, এবং দুপাশ দিয়ে বাগান চলেছে এবং এক স্থানে অতি বৃহৎ গোলাকার হয়ে দাঁড়িয়েছে—তার নাম প্লাস্ দ লা কন্‌কর্দ, Place de la concorde. এই প্লাস্ দ লা কনকর্দের চারিদিকে প্রায় সমান্তরালে ফ্রাঁসের প্রত্যেক জেলার এক এক যান্ত্রিক নারীমূর্ত্তি। তার মধ্যে একটি মূর্ত্তি হচ্ছে স্ট্রাস্-বুর্গ-নামক জেলার। ঐ জেলা এখন ডইচ্ (জর্ম্মান্) রা ১৮৭২ সালের লড়াইয়ের পর হতে কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু সে দুঃখ ফ্রাঁসের আজও যায় না, সে মূর্ত্তি দিন্ রাত প্রেতোদ্দিষ্ট ফুল মালায় ঢাকা। যে রকমের মালা লোকে আত্মীয় স্বজনের গোরের উপর দিয়ে আসে, সেই রকম বৃহৎ বৃহৎ মালা দিন রাত সে মূর্ত্তির উপর কেউ না কেউ দিয়ে যাচ্ছে।

দিল্লির চাঁদনিচৌক কতক অংশে এই প্লাস্ দ লা কন্‌কর্দের মত এককালে ছিল বলে বোধ হয়। স্থানে স্থানে জয়স্তম্ভ, বিজয় তোরণ, আর বিরাট নর-

নারী সিংহাদি ভাস্কর্য্য মূর্ত্তি। মহাবীর প্রথম ন্যাপোলেঅঁর স্মারক এক সুবৃহৎ ধাতুনির্ম্মিত বিজয়স্তম্ভ। তার গায়ে ন্যাপোলেঅঁর সময়ের যুদ্ধ বিজয় অঙ্কিত। উপরে তাঁর মূর্ত্তি। আর একস্থানে প্রাচীন দুর্গ বাস্তিল (Bastille) ধ্বংসের স্মারক চিহ্ন। তখন রাজাদের একাধিপত্য ছিল, যাকে তাকে যখন তখন জেলে পুরে দিত। বিচার না, কিছু না, রাজা এক হুকুম লিখে দিতেন; তার নাম লেটর্ দ ক্যাশে– মানে রাজমুদ্রাঙ্কিত লিপি। তার পর, সে ব্যক্তির আর কি করেছে কি না, দোষী কি নির্দ্দোষী, তার আর জিজ্ঞাসাপড়া নেই, একবারে নিয়ে পুরলে সেই বাস্তিলে;—সেখান থেকে বড় কেউ আর বেরুত না। রাজাদের প্রণয়িনীরা কারুর উপর চট্‌লে, রাজার কাছ থেকে ঐ শীলটা করিয়ে নিয়ে সে ব্যক্তিকে বাস্তিলে ঠেলে দিত। পরে যখন দেশ শুদ্ধ লোক এ সব অত্যাচারে ক্ষেপে উঠলো, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, সব সমান, ছোট বড় কিছুই নয়, --এ ধ্বনি উঠল, পারির লোক উন্মত্ত হয়ে রাজারাণীকে আক্রমণ করলে, সে সময় প্রথমেই এ মানুষের উপর মানুষের অত্যাচারের ঘোর নিদর্শন এ বাস্তিল ভূমিসাৎ করলে, সে স্থানটায় এক রাত ধরে নাচ গান আমোদ করলে। তার পর, রাজা পালিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁকে ধরে ফেল্‌লে, রাজার শ্বশুর অষ্ট্রিয়ার বাদ্‌শা জামায়ের সাহায্যে সৈন্য পাঠাচ্ছেন শুনে প্রজারা ক্রোধে অন্ধ হয়ে রাজারাণীকে মেরে ফেল্‌লে, দেশশুদ্ধ লোক স্বাধীনতা সাম্যের নামে মেতে উঠ্‌লো, ফ্রাঁস প্রজাতন্ত্র হল, অভিজাত ব্যক্তির মধ্যে যাকে ধরতে পারলে তাকেই মেরে ফেল্‌লে, কেউ কেউ উপাধি টুপাধি ছেড়ে প্রজার দলে মিসে গেল। শুধু তাই নয়, বল্‌লে, "দুনিয়া শুদ্ধ লোক তোমরা ওঠ, রাজা ফাজা অত্যাচারী সব মেরে ফেল, সব প্রজা স্বাধীন হক্, সকলে সমান হক্।" তখন ইউরোপ শুদ্ধ রাজারা ভয়ে অস্থির হয়ে উঠ্‌লো—এ আগুন পাছে নিজেদের দেশে লাগে, পাছে নিজেদের সিংহাসন গড়িয়ে পড়ে যায়; তাই তাকে নেবাবার জন্য বদ্ধ পরিকর করে চারিদিক থেকে ফ্রাঁস আক্রমণ করলে। এদিকে প্রজাতন্ত্রের কর্ত্তৃপক্ষেরা "লা পাত্রি আ দাঁজে" "জন্মভূমি বিপদে", এই ঘোষণা করে দিলে; সে ঘোষণা আগুনের মত দেশময় ছড়িয়ে পড়ল। ছেলে বুড়ো, মেয়ে মদ্দে "মার্সাইএ" মহা গীত গাইতে গাইতে, উৎসাহপূর্ণ ফ্রাঁসের মহাগীত গাইতে গাইতে, দলে দলে জীর্ণবসন, সে শীতে নগ্নপদ, অত্যল্পাহার ফরাসী প্রজাফৌজ বিরাট্ সমগ্র ইউরোপী চমূর সম্মুখীন হল, বড় ছোট ধনী দরিদ্র সব বন্দুক ঘাড়ে বেরুল—পরিত্রাণায়……বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং বেরুল। সমগ্র ইউরোপ

সে বেগ সহ্য করতে পারলে না। ফরাসী জাতির অগ্রে সৈন্যদের স্কন্ধে দাঁড়িয়ে এক বীর,—তাঁর অঙ্গুলি হেলনে ধরা কাঁপতে লাগল, তিনিই ন্যাপোলেঅঁ।

স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, বন্দুকের নলামুখে, তলওয়ারের ধারে, ইউরোপের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়ে দিলে, তিন রঙ্গা ককার্ডের জয় হল। তার পর, ন্যাপোলেঅঁ ফ্রাঁস মহারাজ্যকে দৃঢ়বদ্ধ সাবয়ব করবার জন্য বাদ্‌সা হলেন। তার পর তাঁর কার্য্য শেষ হল, ছেলে হলনা বলে সুখ দুঃখের সঙ্গিনী ভাগ্য-লক্ষ্মী রাজ্ঞী জোসেফিনকে ত্যাগ করলেন, অষ্ট্রিয়ার বাদ্‌সার মেয়ে বে করলেন। জোসেফিনের সঙ্গে সঙ্গে সে ভাগ্য ফিরলো, রুষ জয় কর্ত্তে গিয়ে বরফে তাঁর ফৌজ মারা গেল। ইউরোপ বাগ্ পেয়ে, তাঁকে জোর করে সিংহাসন ত্যাগ করিয়ে একটা দ্বীপে পাঠিয়ে দিলে, পুরাণ রাজাবংশের এক-জনকে তক্তে বসালে।

মরা সিঙ্গি সে দ্বীপ থেকে পালিয়ে আবার ফ্রাঁসে হাজির হল, ফ্রাঁস শুদ্ধ লোক আবার তাঁকে মাথায় করে নিলে, রাজা পালাল; কিন্তু অদৃষ্ট ভেঙ্গেছে, আর যুড়্‌লো না—আবার ইউরোপ শুদ্ধ পড়ে, তাঁকে হারিয়ে দিলে। ন্যাপো-লেঅঁ ইংরেজদের এক জাহাজে উঠে শরণাগত হলেন। ইংরেজরা তাঁকে সেণ্ট হেলেনা নামক দূর একটা দ্বীপে বন্দী রাখ্‌লে আমরণ। আবার পুরাণ রাজা এল, তাঁর ভাইপো রাজা হল। আবার ফ্রাঁসের লোক ক্ষেপে উঠ্‌লো, রাজা কাজা তাড়িয়ে দিলে, আবার প্রজাতন্ত্র হল। মহাবীর ন্যাপোলেঅঁর এক ভাইপো এ সময় ক্রমে ফ্রাঁসের প্রীতিপাত্র হলেন, ক্রমে একদিন ষড়যন্ত্র করে নিজেকে বাদ্‌সা ঘোষণা করলেন। তিনি ছিলেন তৃতীয় ন্যাপোলেঅঁ; দিন কতক তাঁর খুব প্রতাপ হল। কিন্তু জর্ম্মাণ যুদ্ধে হেরে, তাঁর সিংহাসন গেল, আবার ফ্রাঁস প্রজাতন্ত্র হল। সেই অবধি প্রজাতন্ত্র চলেছে।

যে পরিণাম-বাদ ভারতের প্রায় সকল সম্প্রদায়ের মূলভিত্তি, এখন সে পরিণাম-বাদ ইউরোপী বহির্বিজ্ঞানে প্রবেশ করেছে। ভারত ছাড়া অন্যত্র সকল দেশের ধর্ম্মে ছিল এই যে, দুনিয়াটা সব টুকরা টুকরা, আলাদা আলাদা। ঈশ্বর একজন আলাদা, প্রকৃতি একটা আলাদা, মানুষ একটা আলাদা, ঐ রকম পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, গাছ, পালা, মাটি, পাথর, ধাতু প্রভৃতি সব আলাদা আলাদা। ভগবান্ ঐ রকম আলাদা আলাদা করে সৃষ্টি করেছেন।

জ্ঞান মানে কি না বহুর মধ্যে এক দেখা। যে গুলো আলাদা, তফাৎ বলে আপাততঃ বোধ হচ্ছে, তাদের মধ্যে ঐক্য দেখা।—যে সম্বন্ধে এই

ঐক্য মানুষ দেখ্‌তে পায়, সেই সম্বন্ধটাকে "নিয়ম" বলে ; এরি নাম প্রাকৃতিক নিয়ম।

পূর্ব্বে বলেছি যে, আমাদের বিদ্যা বুদ্ধি চিন্তা সমস্ত আধ্যাত্মিক, সমস্ত বিকাশ ধর্ম্মে। আর পাশ্চাত্যে ঐ সমস্ত বিকাশ বাইরে, শরীরে, সমাজে। ভারতবর্ষে চিন্তাশীল মনীষীরা ক্রমে বুঝতে পারলেন যে, ও আলাদা ভাবটা ভুল ও সব আলাদার মধ্যে সম্বন্ধ রয়েছে, মাটি, পাথর, গাছ, পালা, জন্তু, মানুষ, দেবতা, এমন কি ঈশ্বর স্বয়ং, এর মধ্যে ঐক্য রয়েছে, অদ্বৈতবাদী এর চরম সীমায় পৌঁছুলেন, ব'ল্লে যে, সমস্তই সেই একের বিকাশ। বাস্তবিক এই অধ্যাত্ম অধিভূত জগৎ এক, তার নাম "ব্রহ্ম" ; আর ঐ যে আলাদা আলাদা বোধ হচ্ছে ওটা ভুল, ওর নাম দিলেন "মায়া", "অবিদ্যা" অর্থাৎ অজ্ঞান। এই হলো জ্ঞানের চরম সীমা।

ভারতবর্ষের কথা ছেড়ে দাও, বিদেশে যদি একথাটা এখন কেউ বুঝতে না পারে, ত তাকে আর পণ্ডিত কি করে বলি। মোদ্দা এদের অধিকাংশ পণ্ডিতই এটা এখন বুঝেছে, এদের রকম দিয়ে, জড় বিজ্ঞানের ভেতর দিয়ে। তা সে এক কেমন করে বহু হল, এ কথা আমরাও বুঝি না, এরাও বোঝে না। আমরাও সিদ্ধান্ত করে দিয়েছি যে, ওখানটা বুদ্ধির অতীত। এরাও তাই করেছে। তবে সেই এক কি কি রকম হয়েছে, কি কি রকম জাতিত্ব ব্যক্তিত্ব পাচ্ছে, এটা বোঝা যায় এবং এইটার খোঁজের নাম বিজ্ঞান Science।

কাজেই এখন এদেশে প্রায় সকলেই পরিণামবাদী, Evolutionist যেমন ছোট জানোয়ার বদ্‌লে বদ্‌লে বড় জানোয়ার হচ্ছে, বড় জানোয়ার কখন কখন ছোট হচ্ছে, লোপ পাচ্ছে। তেমনি মানুষ যে একটা সুসভ্য অবস্থায় দুম্ করে জন্ম পেলে, এ কথা আর কেউ বড় বিশ্বাস কর্চ্ছে না। বিশেষ এদের বাপ্ দাদা, কাল্ না পরশু, বর্ব্বর ছিল, তা থেকে অল্প দিনে এই কাণ্ড। কাজেই এরা বলছে যে, সমস্ত মানুষ ক্রমে ক্রমে অসভ্য অবস্থা থেকে উঠেছে এবং উঠ্‌ছে। আদিম মানুষ কাঠ পাথরের যন্ত্র তন্ত্র দিয়ে কাজ চালাত, চামড়া বা পাতা পরে দিন কাটাত, পাহাড়ের গুহায় বা পাখির বাসার মত কুঁড়ে ঘরে গুজ্‌রান্ করত। এর নিদর্শন সর্ব্বদেশের মাটির নীচে পাওয়া যাচ্ছে এবং কোনও কোনও স্থলে সে অবস্থার মানুষ স্বয়ং বর্ত্তমান। ক্রমে মানুষ ধাতু ব্যবহার কর্ত্তে শিখ্‌লে, সে নরম ধাতু টিন আর তামা। তাকে মিশিয়ে যন্ত্রতন্ত্র অস্ত্রশস্ত্র করতে শিখ্‌লে। প্রাচীন, গ্রীক, বাবিল, মিশরীরাও অনেক দিন

পর্য্যন্ত লোহার ব্যবহার জানত না, যখন তারা অপেক্ষাকৃত সভ্য হয়েছিল, বই পত্র পর্য্যন্ত লিখ্‌তো, সোণা রুপো ব্যবহার করত, তখন পর্য্যন্ত। আমেরিকা মহাদ্বীপের আদিম নিবাসিদের মধ্যে মেক্সিকো পেরু মায়া প্রভৃতি জাতি অপেক্ষাকৃত সুসভ্য ছিল, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মন্দির নির্ম্মাণ কর্‌ত, সোণা রূপোর খুব ব্যবহার ছিল (এমন কি ঐ সোণা রুপোর লোভেই স্পানি লোকেরা তাদের ধ্বংস সাধন কর্লে)। কিন্তু সে সমস্ত কাজ চকমকি পাথরের অস্ত্র দ্বারা অনেক পরিশ্রমে কর্‌তো, লোহার নাম গন্ধও জান্‌তো না।

আদিম অবস্থায় মানুষ তীর ধনুক বা জালাদি উপায়ে জন্তু জানোয়ার মাছ মেরে খেত, ক্রমে চাষ বাস শিখ্‌লে, পশু পালন কর্‌তে শিখ্‌লে। বনের জানোয়ারকে বশে এনে নিজের কাজ করাতে লাগ্‌লো। অথবা সময়মত আহারের জন্য জানোয়ার পাল্‌তে লাগলো। গরু, ঘোড়া, শূকর, হাতি, উট, ভেড়া, ছাগল, মুরগি প্রভৃতি পক্ষী মানুষের গৃহপালিত হতে লাগ্‌লো। এর মধ্যে কুকুর হচ্ছেন মানুষের আদিম বন্ধু।

আবার চাষ বাস আরম্ভ হলো। যে ফল মূল শাক সব্‌জি ধান চাল মানুষে খায়, তার বুনো অবস্থা আর এক রকম। এ মানুষের যত্নে বুনো ফল, বুনো ঘাস নানাপ্রকার সুখাদ্য বৃহৎ ও উপাদেয় চালে পরিণত হলো। প্রকৃতিতে আপনা আপনি দিন রাত অদল বদল ত হচ্ছেই। নানাজাতের বৃক্ষ লতা পশু পক্ষী শরীরসংসর্গে দেশ-কাল-পরিবর্ত্তনে নবীন নবীন জাতির সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু মানুষ সৃষ্টির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রভৃতি ধীরে ধীরে তরু লতা জীব জন্তু বদ্‌লাচ্ছিলেন; মানুষ জন্মে অবধি সে হুড় মুড় করে বদ্‌লে দিতে লাগ্‌লো। সাঁ সাঁ করে একদেশের গাছ পালা জীব জন্তু অন্য দেশে মানুষ নিয়ে যেতে লাগ্‌লো, তাদের পরস্পর মিশ্রণে নানাপ্রকার অভিনব জীব জন্তুর, গাছ পালার জাত মানুষের দ্বারা সৃষ্ট হতে লাগলো।

আদিম অবস্থায় বিবাহ থাকে না, ক্রমে ক্রমে যৌন সম্বন্ধ উপস্থিত হলো। প্রথম বৈবাহিক সম্বন্ধ সর্ব্বসমাজে "মা"য়ের উপর ছিল। বাপের বড় ঠিকানা থাক্‌তো না। মায়ের নামে ছেলে পুলের নাম হত। মেয়েদের হাতে সমস্ত ধন থাক্‌তো, ছেলে মানুষ করবার জন্য। ক্রমে ধন পত্র পুরুষের হাতে গেল, মেয়েরাও পুরুষের হাতে গেল। পুরুষ বল্লে, "যেমন এ ধন ধান্য আমার, আমি চাষ বাস করে বা লুঠ তরাজ করে উপার্জ্জন করেছি, এতে যদি কেউ ভাগ বসায়, ত আমি বিরোধ কর্‌বো।" তেম্‌নি বল্লে, "এ মেয়েগুলো আমার," এতে

যদি কেউ হস্তার্পণ করে, ত বিরোধ হবে।” বর্ত্তমান বিবাহের সূত্রপাত হলো। মেয়ে মানুষ, পুরুষের চাটি বাটি গোলাম প্রভৃতি অধিকারের ন্যায় হলো। প্রাচীন রীতি—এক দলের পুরুষ অন্য দলে বে করত। সে বিবাহও জবরদস্তি মেয়ে ছিনিয়ে এনে। ক্রমে সে কাড়াকাড়ি বদ্‌লে গেল, স্বেচ্ছায় বিবাহ চল্‌লো; কিন্তু সকল বিষয়ের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আভাস থাকে। এখনও প্রায় সর্ব্বদেশে বরকে একটা নকল আক্রমণ করে। বাঙ্গালাদেশে, ইউরোপে, চাল দিয়ে বরকে আঘাত করে,পশ্চিমাঞ্চলে কনের আত্মীয় মেয়েরা বরযাত্রীদের গালি গালাজ করে ইত্যাদি।

সমাজ সৃষ্ট হতে লাগ্‌ল। দেশভেদে সমাজের সৃষ্টি। সমুদ্রের ধারে যারা বাস কর্‌তো, তারা অধিকাংশই মাছ ধরে জীবিকা কর্‌তো; যারা সমতল জমীতে, তাদের চাস্‌বাস্; যারা পার্ব্বত্য দেশে, তারা ভেড়া চরাত; যারা মরুময়দেশে, তারা ছাগল, উঠ, চরাতে লাগ্‌ল। কতকদল জঙ্গলের মধ্যে বাস করে, শীকার করে খেতে লাগ্‌লো। যারা সমতল দেশ পেলে, চাস্‌বাস্ শিখ্‌লে, তারা পেটের দায়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে, চিন্তা করবার অবকাশ পেলে, তারা অধিকতর সভ্য হতে লাগ্‌ল। কিন্তু সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে শরীর দুর্ব্বল হতে লাগ্‌ল। যাদের শরীর দিন রাত খোলা হাওয়ায় বাস করে, মাংস প্রধান আহার, তাদের, আর যারা ঘরের মধ্যে বাস করে, শস্যপ্রধান আহার করে, অনেক পার্থক্য হতে লাগ্‌লো। শীকারী বা পশুপাল বা মৎস্যজীবী, আহারের অনাটন হলেই, ডাকাৎ বা বোম্বেটে হয়ে সমতলবাসীদের লুট্‌তে আরম্ভ কর্‌লে। সমতলবাসীরা আত্মরক্ষার জন্য, ঘনদলে সন্নিবিষ্ট হতে লাগ্‌লো, ছোট ছোট রাজ্যের সৃষ্ট হতে লাগলো।

দেবতারা ধান চাল খায়, সুসভ্য অবস্থা, গ্রাম, নগর, উদ্যানে বাস, পরিধান বোনা কাপড়; আর অসুরদের পাহাড়, পর্ব্বত, মরুভূমি বা সমুদ্র তটে বাস, আহার বন্য জানোয়ার, বন্য ফল মূল, পরিধান ছাল; আর বুনো জিনিস্ বা ভেড়া ছাগল গরু দেবতাদের কাছে থেকে বিনিময়ে যা ধান চাল। দেবতার শরীর শ্রম সহিতে পারে না, দুর্ব্বল। অসুরের শরীর উপবাস কৃচ্ছ্র কষ্ট সহনে বিলক্ষণ পটু।

অসুরের আহারাভাব হলেই, দল বেঁধে পাহাড় হতে, সমুদ্র কূল হতে, গ্রাম নগর লুঠতে এলো। কখনও বা ধন ধানের লোভে দেবতাদের আক্রমণ করতে লাগ্‌লো। দেবতারা বহুজন একত্র না হতে পার্‌লেই অসুরের হাতে মৃত্যু।

আর দেবতার বুদ্ধি প্রবল হয়ে, নানা প্রকার যন্ত্র তন্ত্র নির্ম্মাণ করতে লাগলো। ব্রহ্মাস্ত্র, গরুড়াস্ত্র, বৈষ্ণবাস্ত্র, শৈবাস্ত্র সব দেবতাদের; অসুরের সাধারণ অস্ত্র, কিন্তু গায়ে বিষম বল। বারম্বার অসুর দেবতাদের হারিয়ে দেয়, কিন্তু অসুর সভ্য হতে জানে না, চাসবাস করতে পারে না, বুদ্ধি চালাতে জানে না। বিজয়ী অসুর যদি বিজিত দেবতাদের স্বর্গে রাজ্য করতে চায়, ত সে কিছু দিনের মধ্যে দেবতাদের বুদ্ধি কৌশলে দেবতাদের দাস হয়ে পড়ে থাকে। নতুবা অসুর লুট করে সরে আপনার স্থানে যায়। দেবতারা যখন একত্রিত হয়ে, অসুরদের তাড়ায়, তখন, হয় তাদের সমুদ্র মধ্যে তাড়ায়, না হয় পাহাড়ে, না হয় জঙ্গলে তাড়িয়ে দেয়। ক্রমে দু দিকেই দল বাড়তে লাগলো, লক্ষ লক্ষ দেবতা একত্র হতে লাগলো, লক্ষ লক্ষ অসুর একত্র হতে লাগলো। মহা সংঘর্ষ, মেশা মিশি, জেতা জিতি, চলতে লাগলো। এ সব রকমের মানুষ মিলে মিশে বর্ত্তমান সমাজ, বর্ত্তমান প্রথা সকলের সৃষ্টি হতে লাগলো। নানা রকম নূতন ভাবের সৃষ্টি হতে লাগলো, নানা বিদ্যার আলোচনা চললো। এক দল লোক ভোগোপযোগী বস্তু তৈয়ার করতে লাগল—হাত দিয়ে বা বুদ্ধি করে। একদল সেই সব ভোগ্য দ্রব্য রক্ষা করতে লাগলো। সকলে মিলে সেই সব দ্রব্য বিনিময় করতে লাগলো। আর মাঝখান্ থেকে এক দল ওস্তাদ্, এ জায়গার জিনিষটা ও জায়গায় নিয়ে যাবার বেতন স্বরূপ, সমস্ত জিনিষের অধিকাংশ আত্মসাৎ করতে শিখ্‌লে। এক জন চাস করলে, এক জন পাহারা দিলে, এক জন বয়ে নিয়ে গেল, আর এক জন কিন্‌লে। যে চাস কর্লে, সে পেলে শুন্য; যে পাহারা দিলে, সে জুলুম্ করে কতকটা আগ ভাগ নিলে; অধিকাংশ নিলে ব্যবসাদার, যে বয়ে নিয়ে গেল। যে কিন্‌লে, সে এ সকলের দাম দিয়ে মলো!! পাহারাওয়ালার নাম হলো রাজা, মুটের নাম হলো সওদাগর। এ দু দল কাজ করলে না—ফাঁকি দিয়ে মুড়ো মারতে লাগলো। যে জিনিষ তৈরি কর্ত্তে লাগল, সে পেটে হাত দিয়ে হা ভগবান্ ডাকতে লাগলো।

ক্রমে এই সকল ভাব প্যাঁচাপেচি, মহা গেরোর উপর গেরো, তস্য গেরো হয়ে, বর্ত্তমান মহা জটিল সমাজ উপস্থিত হলেন। কিন্তু ছিট্ মরে না। যে গুলো পূর্ব্ব জন্মে ভেড়া চরাত, মাছ ধরে খেত, সে গুলো সভ্য জন্মে বম্বেটে, ডাকাত্ প্রভৃতি হতে লাগলো। বন্ নাই, যে সে শীকার করে; কাছে পাহাড় পর্ব্বতও নাই, যে ভেড়া চরায়; জন্মের দরুণ শীকার বা ভেড়া চরাণ বা মাছ ধরা কোনটারই সুবিধা পায় না—সে কাজেই ডাকাতি করে, চুরি করে, সে

যায় কোথা ? সে প্রাতঃস্মরণীয়াদের কালের মেয়ে, এ জন্মে ত আর এক সঙ্গে অনেক বর বে করতে পায় না, কাজেই হয় বেশ্যা। ইত্যাদি রকমে নানা ঢঙ্গের, নানা ভাবের, নানা সভ্য অসভ্য দেবতা অসুর জন্মের মানুষ একত্র হয়ে হয়েছে সমাজ। কাজেই সকল সমাজে এই নানারূপে ভগবান্ বিরাজ কর্চ্চেন। সাধু নারায়ণ, ডাকাত্ নারায়ণ, ইত্যাদি। আবার যে সমাজে যে দলে সংখ্যায় অধিক, সে সমাজের চরিত্র সেই পরিমাণে দৈবী বা আসুরী হতে লাগ্‌লো।

জম্বুদ্বীপের তামাম্ সভ্যতা—সমতল ক্ষেত্রে, বড় বড় নদীর উপর, অতি উর্ব্বর ভূমিতে উৎপন্ন—ইয়ংচিকিয়ং, গঙ্গা, সিন্ধু, ইউফ্রেটিস্ তীর। এ সকল সভ্যতারই আদ্ ভিত্তি চাস্ বাস্। এ সকল সভ্যতাই দেবতা-প্রধান। আর ইউরোপের সকল সভ্যতাই প্রায় পাহাড়ে, না হয় সমুদ্রময় দেশে জন্মেছে -ডাকাৎ আর বম্বেটে এ সভ্যতার ভিত্তি, এতে অসুর ভাব অধিক। (ক্রমশঃ)

মুক্তি।

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

এ জীবন সমস্যার কিবা হল সমাধান্,
জন্মাবধি এ চিন্তায় তীব্রতৃষ্ণাশুষ্ক প্রাণ।
সসীম মানব মতি, অসীম অনন্তে গতি,
সান্তে কেন অনন্তের প্রতিচ্ছায়া বিদ্যমান্,
সুখে কেন দুঃখাভাস, অজ্ঞানে কেন বা জ্ঞান্ ?

জন্ম সনে মৃত্যু কেন, হাসিতে কান্নার স্বর,
আলোতে আঁধার কেন, স্বরগে নরক ডর ?
উত্থানে পতন কেন, যৌবনে বার্দ্ধক্য পুন,
এ দ্বন্দ্ব তরঙ্গাঘাতে ত্রিভুবন বিচলিত ;
দেশকালনিমিত্ততা-চক্রে সবি নিষ্পেষিত।

এ দারুণ চিন্তাভারে হতাশ্বাস জীবকুল,
হৃদয় ভেদিয়ে তাই উঠিছে বিলাপ রোল।
শান্তি কি নাহিক তবে, আসিতে যাইতে হবে,—

এ ভাবে কি বার বার, কলের পুতুল প্রায় ?
তবে কি সে মুক্তিবাদ নিশার স্বপন হায় ?

না—না—শুন, আর্য্যঋষি মন্দ্রস্বরে আশ্বান ;
"শুই ভেবে জীব ! তুমি কেন ক্লেশে ম্রিয়মাণ ?
একি তত্ত্ব সুমহান, অদ্বিতীয় প্রাণদান,
দ্বিরূপী অলীক লীলা দেখাইছে চমৎকার,
কিছুমাত্র ভেদ নাই সে তত্ত্বে তোমাতে আর।"

এ সত্যে একান্ত নিষ্ঠ যেই জন ধন্য মাঝে,
জনম মরণ দুঃখ সুখ তার ঘুচিয়াছে।
চিন্তাশূন্য নিরভয়, সাক্ষীরূপে সদা রয়,
দ্বৈতদৃশ্য তার কাছে মরু-মরিচীকা-সম ;
অগ্নিদগ্ধ সূত্র সম জগৎ প্রতীত হয়।

না লভিল এ সত্য যে মানব শরীর ধরি,
বৃথা তার ধর্ম্ম কর্ম্ম,—জীবন্ত সে আছে মরি।
হউক বেদান্তবাদী, ভজুক বা দেবতাদি,
অথবা করুক কর্ম্ম যত ইচ্ছা মনে লয় ;
সোঽহমিতি জ্ঞান বিনে কদাচ না মুক্তি হয়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত।*

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(নরেন্দ্র ও ভবনাথের মাষ্টারের সহিত মিলন)

[সমাধিমন্দিরে।]

শ্রীম——।] [১১২ পৃষ্ঠার পর।

সভাভঙ্গ হইল। ভক্তেরা এদিক্ ওদিক পাইচারি করিতে লাগিলেন। মাষ্টারও পঞ্চবটী ইত্যাদি স্থানে বেড়াইতে লাগিলেন। তখন বেলা আন্দাজ ৫টা। কিয়ৎক্ষণ পরে মাষ্টার ঠাকুর রামকৃষ্ণের ঘরের দিকে আসিয়া দেখিলেন, ঘরের

* প্রথম ভাগ ছাপা হইতেছে।

উত্তরদিকের ছোট বারাণ্ডার মধ্যে অদ্ভুত ব্যাপার হইতেছে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। নরেন্দ্র গান করিতেছেন; দুই চারি জন ভক্ত দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। মাষ্টার আসিয়া গান শুনিতে লাগিলেন। গান শুনিয়া আকৃষ্ট হইয়া রহিলেন। ঠাকুরের গান ছাড়া এমন মধুর গান তিনি কখনও শুনেন নাই। হঠাৎ ঠাকুরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। দেখিলেন, ঠাকুর দাঁড়াইয়া নিস্পন্দ, চক্ষের পাতা পড়িতেছে না। নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিছে কি না বহিছে। জিজ্ঞাসা করাতে এক জন ভক্ত বলিলেন, এর নাম সমাধি। মাষ্টার এরূপ কখনও দেখেন নাই, শুনেন নাই। অবাক্ হইয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'ভগবানকে চিন্তা করিয়া মানুষ কি এত বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়? না জানি কত দূর বিশ্বাস ভক্তি থাকিলে এরূপ হয়!' গানটি এই—

'চিন্তয় মম মানস হরি চিদ্ঘন নিরঞ্জন।
(কিবা) অনুপম ভাতি, মোহন মূরতি, ভকত-হৃদয়-রঞ্জন॥
নবরাগে রঞ্জিত, কোটী শশী বিনিন্দিত; (কিবা) বিজলী চমকে,
সে রূপ-আলোকে, পুলকে শিহরে জীবন।"

গানের এই চরণটি গাহিবার সময় ঠাকুর রামকৃষ্ণ শিহরিতে লাগিলেন। দেহ রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে যেন কি দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন। না জানি 'কোটী শশী বিনিন্দিত' কি অনুপম রূপ দর্শন করিতেছিলেন। এরই নাম কি ভগবানের চিন্ময়রূপ-দর্শন? কত সাধন করিলে, কত তপস্থার ফলে, কতখানি ভক্তি বিশ্বাসের বলে এরূপ ঈশ্বরদর্শন হয়?

আবার গান চলিতে লাগিল,—

"হৃদি কমলাসনে ভজ তাঁর চরণ,
দেখ শান্ত মনে, প্রেম নয়নে, অপরূপ প্রিয়দর্শন।"

আবার সেই ভুবনমোহন হাস্য—শরীর সেইরূপ নিঃস্পন্দ ও স্তিমিত লোচন, কিন্তু কি যেন অপরূপ রূপ দর্শন করিতেছিলেন; আর সেই অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া যেন মহানন্দে ভাসিতেছিলেন।

এইবারে গানের শেষ হইল। নরেন্দ্র গাইলেন—

"চিদানন্দরসে, ভক্তিযোগাবেশে, হও রে চিরমগন।
(চিদানন্দ রসে, হায়রে)

(প্রেমানন্দরসে)

সমাধির ও প্রেমানন্দের এই অদ্ভুত ছবি হৃদয়মধ্যে গ্রহণ করিয়া মাষ্টার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে হৃদয়মধ্যে সেই হৃদয়োন্মত্তকারী মধুর সঙ্গীতের ফুট উঠিতে লাগিল,—

প্রেমানন্দ রসে হও রে চিরমগন।

(হরিপ্রেমে মত্ত হয়ে)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নরেন্দ্র-ভবনাথাদি ভক্তদের সঙ্গে আনন্দ।

তাহার পরদিনও ছুটি ছিল। বেলা ৩ টার সময় মাষ্টার আবার আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুর রামকৃষ্ণ সেই পূর্ব্বপরিচিত ঘরে বসিয়া আছেন। মেজেয় মাদুর পাতা। সেখানে নরেন্দ্র, ভবনাথ, আরও দুই এক জন বসিয়া আছেন। কয়টিই ছোকরা; ১৯, ২০ বৎসর বয়স। ঠাকুর সহাস্যবদন, ছোট তক্তপোষের উপর বসিয়া আছেন, আর ছোকরাদের সহিত আনন্দের কথাবার্ত্তা কহিতেছেন।

মাষ্টার ঘরে প্রবেশ করিতেছেন দেখিয়াই ঠাকুর উচ্চহাস্য করিয়া ছোকরাদের বলিয়া উঠিলেন, 'ঐ রে আবার এসেছে!'—বলিয়াই হাস্য। মাষ্টার আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বসিলেন। আগে হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইয়া প্রণাম করিতেন—ইংরাজিপড়া লোকেরা যেমন করে। কিন্তু আজ তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে শিখিয়াছেন। তিনি আসন গ্রহণ করিলে, ঠাকুর রামকৃষ্ণ কেন হাসিতেছিলেন, তাহাই নরেন্দ্রাদি ভক্তদের বুঝাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন,—

"দ্যাখ্, একটা ময়ূরকে বেলা চারটার সময় আফিম খাইয়ে দিছিল। তার পর দিন ঠিক চারটার সময় সেই ময়ূরটা এসে উপস্থিত—আফিমের নেশা লেগেছিল—মৌতাত ধরেছিল—তাই আবার ঠিক সময়ে আফিম খেতে এসেছে।" (হাস্য)

মাষ্টার মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ইনি ত ঠিকই কথা বলিতেছেন। বাড়ীতে যাই, কিন্তু দিবানিশি ইঁহার দিকে মন পড়িয়া থাকে—কখন দেখিব, কখন দেখিব। এখানে কে যেন টেনে আন্‌লে। মনে করলে অন্য জায়গায় যাবার যো নাই, এখানে আস্‌তেই হবে। এইরূপ ভাবিতেছেন, ঠাকুর এ দিকে ছোকরাগুলির সহিত অনেক ফষ্টিনাষ্টি করিতে লাগলেন, যেন তারা সম

বয়স্ক। হাসির লহরী উঠিতে লাগিল, যেন আনন্দের হাট বসিয়াছে। মাষ্টার অবাক্ হইয়া এই অদ্ভুত চরিত্র দেখিতে লাগিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, ইহাঁরই কি পূর্ব্বদিনে সমাধি ও অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রেমানন্দ দেখিয়াছিলাম? সেই ব্যক্তিই কি আজ প্রাকৃত লোকের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন? ইনিই কি আমার প্রথমদিনে উপদেশ দিবার সময় তিরস্কার করেছিলেন? ইনিই কি আমায় 'তুমি কি জ্ঞানী' বলেছিলেন? ইনিই কি সাকার নিরাকার দুইই সত্য বলেছিলেন? ইনিই কি আমায় বলিয়াছিলেন যে, ঈশ্বরই সত্য, আর সংসারের সমস্তই অনিত্য? ইনিই কি আমায় সংসারে দাসীর মত থাকিতে বলিয়াছিলেন?

ঠাকুর রামকৃষ্ণ আনন্দ করিতেছেন ও মাষ্টারকে এক একবার দেখিতেছেন। দেখিলেন, তিনি অবাক্ হইয়া বসিয়া আছেন। তখন রামলালকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দ্যাখ্, এর একটু উমের বেশী কি না, তাই একটু গম্ভীর। এরা এতো হাসি খুসী করছে, কিন্তু এ চুপ করে বসে আছে।" মাষ্টারের বয়স তখন ২৫।২৬ হইবে।

'ব্রহ্মকল্পতরু'।

কথা কহিতে কহিতে পরম ভক্ত হনুমানের কথা উঠিল। হনুমানের পট একখানি ঘরের দেয়ালে ছিল। ঠাকুর বলিলেন, 'দেখ, হনুমানের কি ভাব! ধন, মান, দেহসুখ, কিছুই চায় না, কেবল ভগবানকে চায়! যখন স্ফটিক-স্তম্ভ থেকে ব্রহ্মাস্ত্র নিয়ে পালাচ্চে, তখন মন্দোদরী অনেক রকম ফল নিয়ে লোভ দেখাতে লাগল। ভাবলে, ফলের লোভে নেমে এসে অস্ত্রটা যদি ফেলে দেয়; কিন্তু হনুমান ভুলবার ছেলে নয়। সে বল্লে,—

> আমার কি ফলের অভাব,
> পেয়েছি যে ফল জনম সফল,
> মোক্ষ-ফলের বৃক্ষ রাম হৃদয়ে।
> শ্রীরাম-কল্পতরু-মূলে বসে রই—
> যখন যে ফল বাঞ্ছা সেই ফল প্রাপ্ত হই,
> ফলের কথা কই (ধনী গো) ও ফল গ্রাহক নই,
> যাব তোমাদের প্রতিফল যে দিয়ে।

পুনঃ সমাধি।

গান গাইতে গাইতেই আবার সেই সমাধি। অবস্থা আবার নিঃস্পন্দ দেহ,

স্তিমিত লোচন, দেহ স্থির, বসিয়া আছেন—ফটোগ্রাফে যেরূপ ছবি দেখা যায়। ভক্তেরা, যাহারা এইমাত্র এত হাসি খুসি করিতেছিল, সকলেই একদৃষ্টি হইয়া সেই অদ্ভুত অবস্থা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সমাধি-অবস্থা মাষ্টার এই দ্বিতীয়বার দর্শন করিলেন।

অনেক ক্ষণ পরে ঐ অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। দেহ শিথিল হইল, মুখ সহাস্য হইল, ইন্দ্রিয়গণ আবার নিজের নিজের কার্য্য করিতে ফিরিতে লাগিল। ঠাকুর চক্ষের কোণ দিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে 'রাম' 'রাম' এই নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

মাষ্টার ভাবিতে লাগিলেন, এই মহাপুরুষই কি ছেলেদের সঙ্গে ফচকমি করিতেছিলেন। তখন ঠিক যেন পাঁচ বছরের বালক।

ঠাকুর পূর্ব্বপ্রকৃতিস্থ হইয়া আবার প্রাকৃত লোকের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। মাষ্টারকে ও নরেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বল্লেন,—"তোমরা দু'জনে ইংরাজীতে কথা কও ও তর্ক বিচার করো, আমি শুনবো।" মাষ্টার ও নরেন্দ্র উভয়ে এই কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন। দু' জনে কিছু কিছু আলাপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু বাঙ্গালাতে। ঠাকুরের সামনে মাষ্টারের তর্ক বিচার আর সম্ভব নয়—তাঁর তর্কের ঘর ঠাকুরের কৃপায় এক রকম বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অতএব তিনি আর কিরূপে তর্ক বিচার করিবেন? ঠাকুর আর একবার জিদ করিলেন, কিন্তু ইংরাজীতে তর্ক করা আর হইল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

(অন্তরঙ্গ সঙ্গে)

পাঁচটা বাজিয়াছে। ভক্ত কয়টি যে যার বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। কেবল মাষ্টার ও নরেন্দ্র রহিলেন। নরেন্দ্র গাড়ু লইয়া হাঁসপুকুরে ও ঝাউতলার দিকে মুখ ধুইতে গেলেন। মাষ্টারও ঠাকুর বাড়ীর এ দিক ও দিক পায়চারি করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কুঠীর কাছে দিয়া হাঁসপুকুরের দিকে আসিতে লাগিলেন। দেখিলেন, পুকুরের দক্ষিণ দিকের সিঁড়ির চাতালের উপর ঠাকুর রামকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, আর নরেন্দ্র গাড়ু হাতে করিয়া মুখ ধুইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, "দেখ্ আর একটু বেশী বেশী আসবি। সবে নূতন আসছিস্ কি না। প্রথম আলাপের পর নূতন সকলেই ঘন ঘন আসে, যেমন নূতন—পতি। কেমন আসবি তো?" নরেন্দ্র বলিলেন, "হাঁ চেষ্টা করবো।" আবার সকলেই কুঠীর পথ দিয়া ঠাকুরের

ঘরে আসিতে লাগিলেন। কুঠীর কাছে মাষ্টারকে ঠাকুর বলিলেন, "দেখ চাষারা হাটে গরু কিনতে যায়। তারা ভাল গরু মন্দ গরু বেশ চেনে। ল্যাজের নীচে হাত দিয়ে দেখে। কোনও গরু ল্যাজে হাত দিলে শুয়ে পড়ে; সে গরু কেনে না। কিন্তু যে গরু ল্যাজে হাত দিলে তিড়িং মিড়িং করে লাফিয়ে উঠে, সেই গরুকেই পছন্দ করে। এই যে নরেন্দ্রকে দেখছো, এ সেই গরুর জাত। ভিতরে খুব তেজ আছে।" এই বলিয়া ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন। "আবার কেউ কেউ লোক আছে যেন চিঁড়ের ফলার, আঁট নাই, জোর নাই, ভ্যাৎ ভ্যাৎ করছে।"

সন্ধ্যা হইল। ঠাকুর ঘরে বসিয়া ঈশ্বরচিন্তা করিতে লাগিলেন ও মাষ্টারকে বলিলেন, "তুমি নরেন্দ্রের সঙ্গে আলাপ করগে যাও। আমায় বলবে কি রকম ছেলে।"

মাষ্টার, অনেক ক্ষণ পরে যখন আরতি হইয়া গেল, চাঁদনির কাছে বেড়াইতে বেড়াইতে নরেন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন। পরস্পর আলাপ হইতে লাগিল। নরেন্দ্র বলিলেন, আমি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের। কলেজে পড়িতেছি, ইত্যাদি।

রাত হইয়াছে—মাষ্টার এইবার বিদায় গ্রহণ করিবেন, কিন্তু যাইতে আর পারিতেছেন না। তাই নরেন্দ্রের নিকট হইতে চলিয়া আসিয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণকে খুঁজিতে লাগিলেন। তাঁহার গান শুনিয়া হৃদয় মন মুগ্ধ হইয়াছে। আবার বড় সাধ যে, তাঁর মুখের গান শুনিতে পান। খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিলেন, মা কালীর মন্দিরের সম্মুখে নাটমন্দিরমধ্যে একাকী ঠাকুর পাদচারণ করিতেছেন। মার মন্দিরের মার দুই পার্শ্বে আলো জ্বলিতেছিল। বৃহৎ নাটমন্দিরে একটি আলো জ্বলিতেছিল। আলো ও অন্ধকার মিশ্রিত হইলে যেরূপ হয়, সেইরূপ দেখাইতেছিল।

মাষ্টার সঙ্কুচিতভাবে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ আর কি গান হবে?" ঠাকুর বলিলেন, "না, আজ আর গান হবে না।" এই বলিয়া কি যেন মনে পড়িল, অমনই বলিলেন, "তবে এক কর্ম্ম করো। আমি বলরামের বাড়ী কলিকাতায় যাব, তুমি যেও, সেখানে গান হবে।" মাষ্টার বলিলেন, "যে আজ্ঞে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারের সঙ্গে (নাট মন্দিরে বেড়াইতে বেড়াইতে)। "আচ্ছা, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমাকে তোমার কি বোধ হয়?"

মাষ্টার চুপ করিয়া রহিলেন। তখন ঠাকুর বলিলেন, "তোমার কি বোধ হয়? আমার কয় আনা জ্ঞান হয়েছে?"

মাষ্টার। আনা এ কথা বুঝিতে পারিতেছি না। তবে এরূপ জ্ঞান বা ভক্তি বা বিশ্বাস কখন কোথাও দেখি নাই।

এরূপ কথাবার্ত্তার পর মাষ্টার প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। সদর ফটক পর্য্যন্ত আসিয়া আবার কি মনে পড়িল, অমনই ফিরিলেন। আবার নাটমন্দিরে ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে আসিয়া উপস্থিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। আবার যে ফিরে এলে?

মাষ্টার। আজ্ঞে বড়মানুষের বাড়ী—যেতে দেবে কি না; তাই সেখানে যাব না ভাবছি। এইখানে এসেই আপনার সঙ্গে দেখা করব।

শ্রীরামকৃষ্ণ। না গো, তা কেন? তুমি আমার নাম করবে। বলবে তাঁর কাছে যাব, তা হলেই—কেউ আমার কাছে নিয়ে আসবে।

মাষ্টার যে আজ্ঞা বলিয়া আবার প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণমহোৎসব।

প্রেরিত পত্র।

মাদ্রাজ।

মাদ্রাজ মহোৎসব অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তিথিপূজার দিন, সমস্ত দিন ধরিয়া পূজা হয়; পরে রাত্রি বারটার সময় হোম সমাপন করিয়া কর্ম্ম সাঙ্গ করা হয়। সে দিবস প্রায় তিন শত ভদ্রলোক প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। রবিবার মহোৎসবের দিন পঞ্চাশ মনেরও অধিক চাল রন্ধন করা হয় এবং ছয় সহস্রেরও অধিক কাঙ্গালি প্রসাদ পায়। অপরাহ্নের সময় এত অধিক ভিড় হইয়াছিল যে আর বসাইয়া খাওয়ানো সুবিধা হইল না। তখন ভাত, ডাল, কড়ম্বু প্রভৃতি একসঙ্গে মাখিয়া ভাল ভাল করিয়া দেওয়া হইতে লাগিল। মাদ্রাজের অনেক ভদ্রলোক সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পরিবেশন করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এদিকে ভদ্রলোকদের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। প্রায় ৫০০ ভদ্রলোক প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। জলখাবারের মধ্যে ফলই সমস্ত, আর মিছরি। শ্রীশ্রীপরমহংস মহারাজের শ্রীবিগ্রহ একটি বিমানের মধ্যে বিরাজ করিতেছিলেন। নানাবিধ কুসুমমালায় ও কদলী বৃক্ষে সুসজ্জিত হইয়া বিমানটি পরম রমণীয় হইয়াছিল। তাহারই সম্মুখে সঙ্কীর্ত্তন হইতে লাগিল। সঙ্কীর্ত্তনের পর প্রসাদ গ্রহণ, পরে অপরাহ্ন চারিটার পর, মহাত্মা আত্মারাম স্বামী,

(জনৈক পরমত্যাগী,) তামিল ভাষায় ভক্তি সম্বন্ধে প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করিয়া সকলকে সাতিশয় প্রীতি দিয়াছিলেন। পরে শ্রীশ্রীপরমহংস মহারাজ কিসের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই সম্বন্ধে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ কিছু বলিয়াছিলেন। তাহার পর Mr. Drew রামকৃষ্ণ মিসনের উপর বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া কিছুক্ষণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। পরে এখানকার হাই-কোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত সুন্দররাম আয়ার কিছুক্ষণ বক্তৃতা করিলেন। তিনি বলিলেন যে যদিও ভারতবর্ষ অন্য সকল বিষয়ে পশ্চাৎপদ হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্ম সম্বন্ধে ইহা যে জগতের শিক্ষক, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। হিন্দুধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক এবং সনাতন। তাঁহার পরে গৃহস্বামী মহাত্মা বিলিগিরি আয়েঙ্গার সকলকে ধন্যবাদ দিয়া সভার কার্য্য শেষ করিলেন।

চেঙ্গটীয়া।

বিগত ২১শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার, ১৩০৭, যশোহরের অন্তর্গত চেঙ্গটীয়া ধর্ম্মাশ্রমে মহোৎসবিক রামকৃষ্ণোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। ঐ উপলক্ষে তথায় কীর্ত্তন বক্তৃতা ও প্রসাদ বিতরণ হইয়াছিল। প্রায় ৪০০ লোক সমাগত হইয়াছিলেন।

পাঁচকথা।

"চোর" "চোর"—আমি, আমার কয়েকটী বন্ধু ও একজন হিন্দুস্থানী চাকর উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে বেড়াবার কালে এক রাত অম্বালায় কোনও ভদ্রলোকের বাড়িতে অতিথি হয়েছিলাম। গরম কাল; রাত প্রায় ১টা; আমি এক ঘরে শুয়ে আছি ও পাশের ঘরে আমার বন্ধু কয়জন এবং বারাণ্ডায় হিন্দুস্থানী চাকরটা শুইয়া আছে। গরমে আমার ঘুম হ'চ্ছে না; আর সকলেই নিদ্রিত। এক বুড়ো কুলী, আমার ঘরে এক খানা টানা পাখা ছিল, সে খানা আস্তে আস্তে টান্‌ছে। বুড়ো মানুষ, পাখা টান্‌তে টান্‌তে, ঘুমের ঘোরে একবারে ভুম্ করে বারাণ্ডার উপর পড়ে গেছে। যেই ভুম্ করে পড়ে গেল, আর বাড়ির মধ্যে এক মহা কোলাহল উঠ্‌লো। যাঁহারা ঘুমুচ্ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন, "চোর, চোর" বলে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন। অমনি আর একজন আরও উচ্চৈঃস্বরে "চোর, চোর" বলে চীৎকারে যোগ দিলেন। হিন্দুস্থানী চাকরটা একেবারে বিছানা থেকে লাফ দিয়ে উঠে, লাঠী ঘোরাতে ঘোরাতে বাড়ির চার্ দিকে "চোর, চোর" বলে চক্কর দিতে লাগ্‌লো। আমি তাড়াতাড়ি উঠে বোঝাতে গেলাম, "ওরে, ভয় নেই, পাঙ্খাওয়ালা পড়ে গেছে।" পাঙ্খাওয়ালা বল্‌তে লাগ্‌লো, "বাবু, ভয় নেই, ভয় নেই, আমি, আমি?" কে কার কথা শোনে? "চোর, চোর"—মহা হলুস্থূল উঠ্‌লো। শেষে, আলো জ্বেলে, হিন্দুস্থানী চাকরটাকে কাণ ধরে বসাই, তবে সব ঠাণ্ডা হয়। ভগবান্ সম্বন্ধে যত তর্ক বিচার বাক্ বিতণ্ডা দলাদলি হয়, সে সবও কি অন্ধকারে এই রকম "চোর চোর" ব'লে চেঁচান না কি?

ভাব হইতেও উচ্চতর ভাবসকল আবিষ্কার করিতে লাগিলেন—উহাকেই নির্গুণ পূর্ণব্রহ্ম বলে—এই নির্গুণব্রহ্মের ধারণায়, তাঁহারা জগতের মধ্যে এক অখণ্ড সত্তা দেখিতে পাইয়াছিলেন।

যিনি এই বহুত্বপূর্ণ জগতে সেই এক অখণ্ডস্বরূপকে দেখিতে পান, যিনি এই মরজগতে সেই এক অনন্ত জীবন দেখিতে পান, যিনি এই জড়তা ও অজ্ঞানপূর্ণ জগতে সেই একস্বরূপকে দেখিতে পান, তাঁহারই শাশ্বতী শান্তি, আর কাহারও নহে, আর কাহারও নহে।

মায়া ও মুক্তি।

কবি বলেন, "আমরা জগতে প্রবেশ করিবার সময় আমাদের পশ্চাদ্দেশে যেন হিরণ্ময় জলদজাল লইয়া প্রবেশ করি।" কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে, আমরা সকলেই এরূপ মহিমা-মণ্ডিত হইয়া সংসারে প্রবেশ করি না; আমাদের অনেকেই কুজ্ঝটিকার কালিমা পশ্চাতে টানিয়া জগতে প্রবেশ করি; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমরা, আমাদের মধ্যে সকলেই, যেন যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধের জন্য প্রেরিত হইয়াছি। কাঁদিয়া আমাদিগকে এই জগতে প্রবেশ করিতে হইবে—যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া আপনার পথ করিয়া লইতে হইবে—এই অনন্ত জীবন সমুদ্রের মধ্যে পশ্চাতে কোন চিহ্ন পর্য্যন্ত না রাখিয়া পথ করিয়া লইতে হইবে—সম্মুখে আমরা অগ্রসর, পশ্চাতে অনন্ত যুগ পড়িয়া রহিয়াছে, সম্মুখেও অনন্ত। এইরূপে আমরা চলিতে থাকি, অবশেষে মৃত্যু আসিয়া আমাদিগকে এই ক্ষেত্র হইতে অপসারিত করিয়া দেয়—জয়ী বা পরাজিত কিছু নিশ্চয় নাই—ইহাই মায়া।

বালকের হৃদয়ে আশা বলবতী। বালকের বিস্ফারিত নয়নসমক্ষে সমুদয়ই যেন একটী সোনার ছবি বলিয়া প্রতিভাত হয়; সে ভাবে, আমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই হইবে। কিন্তু যাই সে অগ্রসর হয়, অমনি প্রতি পদবিক্ষেপে প্রকৃতি বজ্রদৃঢ় প্রাচীর স্বরূপে তাহার গতিরোধ করিয়া দণ্ডায়মান হয়। বার বার এই প্রাচীর ভঙ্গ করিবার উদ্দেশে সে বেগে তদুপরি উৎপতিত হইতে পারে। সারা জীবন যেমন সে অগ্রসর হয়, অমনিই তাহার আদর্শ যেন তাহার সম্মুখ হইতে সরিয়া সরিয়া যায়—শেষে মৃত্যু আসিয়া হয়ত নিস্তার; ইহাই মায়া।

বৈজ্ঞানিক উঠিলেন—মহা জ্ঞানপিপাসু। তাঁহার পক্ষে এমন কিছুই নাই, যাহা তিনি না ত্যাগ করিতে পারেন, কোন চেষ্টাতেই তাঁহাকে নিরুৎসাহ করিতে পারে না। তিনি ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া, প্রকৃতির একটার পর একটী গুপ্ততত্ত্ব আবিষ্কার করিতেছেন—প্রকৃতি অন্তস্তল হইতে পর্য্যন্ত রহস্য উদ্ঘাটন করিতেছেন—কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য কি? এ সব করিবার উদ্দেশ্য কি? আমরা এই বৈজ্ঞানিকের গৌরব করিব কেন? কেন তিনি যশোলাভ করিবেন? প্রকৃতি কি, মানুষ যতদূর জানিতে পারে, তদপেক্ষা অনন্তগুণে অধিক জানিতে পারেন না? তাহা হইলেও তিনি কি জড় নহেন? জড়ের অনুকরণে গৌরব কি? প্রকৃতি, যে কোন পরিমাণের হউক না কেন, বজ্র, যত দূর ইচ্ছা দূরে নিক্ষেপ করিতে পারেন। যদি কোন মানুষ তাহার শতাংশের একাংশ করিতে পারে, তবে আমরা তাহাকে একেবারে আকাশে তুলিয়া দিই। কিন্তু ইহার কারণ কি? প্রকৃতির অনুকরণ—মৃত্যুর অনুকরণ—জাড্যের অনুকরণ—অচেতনের অনুকরণের জন্য কেন তাঁহার প্রশংসা করিব?

মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অতি বৃহত্তম পদার্থকে পর্য্যন্ত খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিতে পারে, তথাপি উহা জড়শক্তি। জড়ের অনুকরণে কি ফল? তথাপি আমরা সারা জীবন কেবল উহার জন্যই চেষ্টা করিতেছি; ইহাই মায়া।

ইন্দ্রিয়গণ মনুষ্যকে টানিয়া বাহিরে লইয়া যায়। যেখানে কোন ক্রমে সুখ পাওয়া যায় না, মানুষে সেখানে সুখের অন্বেষণ করিতেছে। অনন্ত যুগ ধরিয়া আমরা সকলেই এই উপদেশ পাইতেছি—এ সব বৃথা; কিন্তু আমরা শিখিতে পারি না। নিজে না ঠেকিলে শিখাও অসম্ভব। ঠেকিতে হইবে—হয়ত তীব্র আঘাত পাইব। তাহাতেই কি আমরা শিখিব? না, তখনও নহে। পতঙ্গ যেমন পুনঃ পুনঃ অগ্নি অভিমুখে ধাবমান হয়, আমরাও তেমনি পুনঃ পুনঃ বিষয় সমূহের দিকে বেগে যাইতেছি—যদি কিছু সুখ পাই। ফিরিয়া ফিরিয়া আবার নূতন উৎসাহে যাইতেছি। এইরূপেই আমরা অগ্রসর হই। শেষে প্রতারিত ও ভগ্নহস্তপদ হইয়া অবশেষে মরিয়া যাই—ইহাই মায়া।

আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধেও তদ্রূপ। আমরা জগতের রহস্যমীমাংসার চেষ্টা করিতেছি—আমরা এই জিজ্ঞাসা, এই অনুসন্ধান প্রবৃত্তিকে বন্ধ করিয়া রাখিতে পারি না; কিন্তু আমাদিগের ইহা জানিয়া রাখা উচিত, জ্ঞান লব্ধব্য বস্তু নহে—কয়েক পদ অগ্রসর হইলেই, অনাদি অনন্ত কালের প্রাচীর আসিয়া মধ্যে ব্যবধানস্বরূপে দণ্ডায়মান হয়, আমরা উহা

লঙ্ঘন করিতে পারি না। কয়েক পদ অগ্রসর হইলেই, অসীম দেশের ব্যবধান আসিয়া উপস্থিত হয়—উহাকে অতিক্রম করা যায় না; সমুদয়ই অনতিক্রমণীয় ভাবে কার্য্যকারণরূপ প্রাচীরে সীমাবদ্ধ। আমরা উহাদিগকে ছাড়াইয়া যাইতে পারি না। তথাপি আমরা চেষ্টা করিয়া থাকি। চেষ্টা আমাদিগকে করিতেই হয়—ইহাই মায়া।

প্রতি নিশ্বাসে, হৃদয়ের প্রতি আঘাতে, আমাদের প্রত্যেক গতিতে আমরা বিবেচনা করি, আমরা স্বাধীন, আবার সেই মুহূর্ত্তেই আমরা দেখিতে পাই, আমরা স্বাধীন নই। ক্রীতদাস—প্রকৃতির ক্রীতদাস আমরা—শরীর, মন, সর্ব্ব চিন্তা এবং সকল ভাবেই প্রকৃতির ক্রীতদাস আমরা। ইহাই মায়া।

এমন জননীই নাই, যিনি তাঁহার সন্তানকে অদ্ভুত শিশু—মহাপুরুষ বলিয়া বিশ্বাস না করেন। তিনি সেই ছেলেটীকে লইয়াই মাতিয়া থাকেন—সেই ছেলেটির উপর তাঁহার সমুদয় প্রাণটী পড়িয়া থাকে। ছেলেটী বড় হইল—হয়ত মহা মাতাল, পশুতুল্য হইয়া উঠিল—জননীর প্রতি অসদ্ব্যবহার করিতে লাগিল। যতই এই অসদ্ব্যবহার বাড়িতে থাকে, মায়ের ভালবাসাও তত বাড়িতে থাকে। জগৎ উহাকে মায়ের নিঃস্বার্থ ভালবাসা বলিয়া খুব প্রশংসা করে—তাহাদের স্বপ্নেও মনে উদয় হয় না যে, সেই জননী জন্মাবধি একটী ক্রীতদাসীতুল্যমাত্র—তিনি না ভালবাসিয়া থাকিতে পারেন না। সহস্রবার তাঁহার ইচ্ছা হয়, তিনি উহা ত্যাগ করিবেন, কিন্তু তিনি পারেন না। তিনি কতকগুলি পুষ্পরাশি উহার উপর চড়াইয়া, উহাকেই আশ্চর্য্য ভালবাসা বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। ইহাই মায়া।

জগতে আমরা সকলেই এইরূপ। নারদও একদিন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, 'প্রভু, তোমার মায়া কিরূপ, তাহা দেখাও।' কয়েক দিন গত হইলে কৃষ্ণ নারদকে সঙ্গে লইয়া একটী অরণ্যে লইয়া গেলেন—অনেক দূর গিয়া, কৃষ্ণ বলিলেন, 'নারদ, আমি বড় তৃষ্ণার্ত্ত, একটু জল আনিয়া দিতে পার?' নারদ বলিলেন, 'প্রভু, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, আমি জল লইয়া আসিতেছি।' এই বলিয়া নারদ চলিয়া গেলেন। ঐ স্থান হইতে কিয়দ্দূরে একটী গ্রাম ছিল; নারদ সেই গ্রামে জলের অনুসন্ধানে প্রবেশ করিলেন। তিনি একটী দ্বারে গিয়া ঘা মারিলেন, দ্বার উন্মুক্ত হইল, একটী পরমা সুন্দরী কন্যা তাঁহার সম্মুখে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই নারদ সমুদয় ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার প্রভু যে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, তিনি যে তৃষ্ণার্ত্ত, হয়ত তৃষ্ণায় তাঁহার

প্রাণবিয়োগ হইবার উপক্রম হইয়াছে, নারদ এ সমুদয় ভুলিয়া গেলেন। তিনি সব ভুলিয়া সেই কন্যাটীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন—ক্রমে পরস্পরের প্রতি পরস্পারের প্রণয়ের সঞ্চার হইল। তখন নারদ সেই কন্যার পিতার নিকট ঐ কন্যার জন্য প্রার্থনা করিলেন—বিবাহ হইয়া গেল—তাঁহারা সেই গ্রামে বাস করিতে লাগিলেন—ক্রমে তাঁহাদের সন্তানসন্ততি হইল। এইরূপে দ্বাদশবর্ষ অতিবাহিত হইল। তাঁহার শ্বশুরের মৃত্যু হইল—তিনি শ্বশুরের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন এবং পুত্রকলত্র ভূমি পশু সম্পত্তি গৃহ প্রভৃতি লইয়া বেশ সুখে সচ্ছন্দে কাটাইতে লাগিলেন। অন্ততঃ তাঁহার বোধ হইতে লাগিল, তিনি বেশ সুখে সচ্ছন্দে আছেন। এই সময় সেই দেশে বন্যা আসিল। একদিন রাত্রিকালে নদী বেলা অতিক্রম করিয়া উভয় কূল প্লাবিত করিল, আর সমুদয় গ্রামটীই জলমগ্ন হইল। অনেক বাড়ী পড়িতে লাগিল—মানুষ পশু সব ভাসিয়া গিয়া ডুবিয়া যাইতে লাগিল—স্রোতের বেগে সবই ভাসিয়া যাইতে লাগিল। নারদকে পলায়ন করিতে হইল। এক হাতে তিনি স্ত্রীকে ধরিলেন, অপর হস্তদ্বারা দুইটী ছেলেকে ধরিলেন, আর একটী ছেলেকে কাঁধে লইয়া এই ভয়ঙ্কর নদী হাঁটিয়া পার হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই তরঙ্গের বেগ অত্যন্ত অধিক বোধ হইল। নারদ স্কন্ধস্থ শিশুটীকে কোন ক্রমে রাখিতে পারিলেন না; সে পড়িয়া গিয়া তরঙ্গে ভাসিয়া গেল। নিরাশায় দুঃখে নারদ চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাহাকে রক্ষা করিতে গিয়া আর একজন—যাহার হাত ধরিয়াছিলেন, সে হাত ফসকাইয়া ডুবিয়া গেল। অবশেষে তাঁহার পত্নী, যাহাকে তিনি তাঁহার যত শক্তি ছিল, সমুদয় প্রয়োগ করিয়া ধরিয়াছিলেন, তরঙ্গের বেগে তাহাকেও হাত ছিনাইয়া লইল, আর তিনি কূলে নিক্ষিপ্ত হইয়া মৃত্তিকায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন ও অতি কাতর স্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে কে যেন তাঁহার পৃষ্ঠদেশে মৃদু আঘাত করিল; কে যেন বলিল, 'বৎস, কই, জল কই? তুমি জল আনিতে গিয়াছিলে, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছি। তুমি আধ ঘণ্টা হইল গিয়াছ।' আধ ঘণ্টা! নারদের মনে দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রান্ত হইয়াছিল, আর আধ ঘণ্টার মধ্যে এই সমস্ত দৃশ্য তাঁহার মনের ভিতর দিয়া চলিয়াছিল—ইহাই মায়া। কোন না কোনরূপে আমরা এই মায়ার ভিতর রহিয়াছি। এ ব্যাপার বুঝা বড় কঠিন—বিষয়টীও বড় জটিল। ইহার

তাৎপর্য্য কি? তাৎপর্য্য এই—ব্যাপার বড় ভয়ানক—সকল দেশেই মহাপুরুষগণ এই তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন, সকল দেশের লোকেই এই তত্ত্ব শিক্ষা পাইয়াছে, কিন্তু খুব অল্প লোকেই ইহা বিশ্বাস করিয়াছে; তাহার কারণ এই, নিজে না ভুগিলে, নিজে না ঠেকিলে আমরা ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না। বাস্তবিক বলিতে গেলে—সমুদয়ই বৃথা—সমুদয়ই মিথ্যা।

সর্ব্বসংহারক কাল আসিয়া সকলকেই গ্রাস করেন, কিছু আর অবশিষ্ট রাখেন না। তিনি পাপকে গ্রাস করেন, পাপীকে গ্রাস করেন, রাজাকে প্রজাকে, সুন্দর কুৎসিৎ সকলকেই গ্রাস করেন, কাহাকেও ছাড়েন না। সবই সেই এক চরম গতি বিনাশের দিকে অগ্রসর হইতেছে। আমাদের জ্ঞান, শিল্প, বিজ্ঞান, সবই এই এক অনিবার্য্য গতি মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে। কেহই ঐ তরঙ্গের গতিরোধে সমর্থ নহে, কেহই ঐ বিনাশাভিমুখী গতিকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও রোধ করিয়া রাখিতে পারে না। আমরা উহাকে ভুলিয়া থাকিবার চেষ্টা করিতে পারি, যেমন কোন দেশে মহামারী উপস্থিত হইলে মদ্যপান নৃত্য এবং অন্যান্য বৃথা চেষ্টা করিয়া লোকে সমুদয় ভুলিতে চেষ্টা করিয়া পক্ষাঘাতগ্রস্তের ন্যায় গতিশক্তিরহিত হইয়া থাকে। আমরাও এই রূপে এই মৃত্যুচিন্তাকে ভুলিবার জন্য অতি কঠোর চেষ্টা করিতেছি—সর্ব্ব প্রকার ইন্দ্রিয় সুখের দ্বারা ভুলিয়া থাকিতে চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু তাহাতে উহার নিবৃত্তি হয় না।

লোকের সম্মুখে দুটী পথ আছে। তন্মধ্যে একটী পথ সকলেই জানেন—তাহা এই:—"জগতে দুঃখ আছে, কষ্ট আছে, সব সত্য, কিন্তু ও সম্বন্ধে মোটেই ভাবিও না। 'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।' দুঃখ আছে বটে, ওদিকে নজর দিও না। যা একটু আধটু সুখ পাও, তাহা ভোগ করিয়া লও, এই সংসারচিত্রের ছায়াময় অংশের দিকে লক্ষ্য করিও না—কেবল আলোকময় অংশের দিকেই লক্ষ্য করিও।" এই মতে কিছু সত্য আছে বটে, কিন্তু ইহাতে ভয়ানক বিপদাশঙ্কাও আছে। ইহার মধ্যে সত্য এইটুকু যে, ইহাতে আমাদিগকে কার্য্যে প্রবৃত্ত রাখে, আশা এবং এইরূপ একটা প্রত্যক্ষ আদর্শ আমাদের কার্য্যে প্রবৃত্ত ও উৎসাহিত করে বটে, কিন্তু উহাতে এই এক বিপদ্ আছে যে, শেষে হতাশ হইয়া সব চেষ্টা ছাড়িয়া দিতে হয়। যাহারা বলেন, "সংসারকে যেমন দেখিতেছ, তেমনই গ্রহণ কর; যত দূর স্বচ্ছন্দে থাকিতে পার থাক, দুঃখকষ্ট সমুদয় আসিলেও তাহাতে সন্তুষ্ট

থাক, অঘাত পাইলে বল—উহারা আঘাত নহে, পুষ্পবৃষ্টি, দাসবৎ পরিচালিত হইলেও বল আমি মুক্ত, আমি স্বাধীন, অপরের নিকট এবং নিজের নিকট ক্রমাগত মিথ্যা কথা বল, কারণ সংসারে থাকিবার—জীবনধারণ করিবার ইহাই একমাত্র উপায়," তাহাদিগের বাধ্য হইয়া অবশেষে ইহা করিতে হয়। ইহাকেই পাকা সাংসারিক জ্ঞান বলে, আর এই উনবিংশ শতাব্দীতে এই জ্ঞান যত সাধারণ, কোন কালে উহা এত সাধারণ ছিল না; তাহার কারণ এই, লোক এখন যেমন তীব্র আঘাত পাইয়া থাকে, কোন কালে এত তীব্র আঘাত পাইত না, প্রতিদ্বন্দ্বিতাও কখন এত অধিক ও তীব্র ছিল না, মানুষ এক্ষণে তাহার অপর ভ্রাতার প্রতি যত নিষ্ঠুর, তত কখন ছিল না, আর এই জন্যই এক্ষণে এই সান্ত্বনা প্রদত্ত হইয়া থাকে। বর্তমানকালে এই উপদেশই অধিক পরিমাণে প্রদত্ত হইয়া থাকে, কিন্তু এই উপদেশে কোন ফল হয় না, কোন কালেই হয় না। গলিত শবকে আর কতকগুলি ফুল চাপা দিয়া রাখা যায় না—অসম্ভব বেশী দিন চলে না; এক দিন ফুলগুলি উঠিয়া যাইবে, তখন সেই সব পূর্ব্বাপেক্ষা বীভৎস রূপে প্রতিভাত হইবে। আমাদের সমুদয় জীবনও এই প্রকার। আমরা আমাদের পুরাতন পচা ঘা সোণার কাপড়ে মুড়িয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে পারি, কিন্তু এক দিন আসিবে, যখন সেই সোণার কাপড় সরিয়া পড়িবে, আর সেই ক্ষত অতি বীভৎসভাবে নয়ন সমক্ষে প্রকাশিত হইবে। তবে কি কিছু আশা নাই? এ কথা সত্য যে, আমরা সকলেই মায়ার দাস, আমরা সকলেই মায়ায় জন্মগ্রহণ করিয়াছি, মায়াতেই আমরা জীবিত।

তবে কি কোন উপায় নাই, কোন আশা নাই? আমরা যে সকলেই অতি দুর্দ্দশাপন্ন, এই জগৎ যে বাস্তবিক একটী কারাগার, আমাদের পূর্ব্ব হইতে প্রাপ্ত মহিমার ছটাও যে একটী কারাগৃহমাত্র, আমাদের বুদ্ধি এবং মনও যে কারাস্বরূপ, তাহা শত শত যুগ ধরিয়া লোকে জ্ঞাত আছে। মানুষ যাহাই বলুক না কেন, এমন লোকই নাই, যিনি কোন না কোন সময়ে ইহা প্রাণে প্রাণে অনুভব না করিয়াছেন। বৃদ্ধেরা এটী আরো তীব্রভাবে অনুভব করিয়া থাকে, কারণ, তাহাদের সারা জীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা রহিয়াছে; প্রকৃতির মিথ্যা ভাষা তাহাদিগকে বড় অধিক ঠকাইতে পারে না। এই বন্ধন অতিক্রমের উপায় কি? এই বন্ধনগুলিকে অতিক্রম করিবার কি কোন উপায় নাই? আমরা দেখিতেছি, এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার—এই বন্ধন

আমাদের সম্মুখে পশ্চাতে সর্ব্বত্র থাকিলেও, এই দুঃখ কষ্টের মধ্যেই, এই জগতেই, যেখানে জীবন ও মৃত্যু একার্থক, এখানেও এক মহাবাণী সকল যুগে, সকল দেশে, সকল ব্যক্তির হৃদয়াভ্যন্তরে দিয়া যেন উত্থিত হইতেছে, "দৈবী হেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।" "আমার এই দৈবগুণময়ী মায়া অতি কষ্টে অতিক্রম করা যায়। যাহারা আমার শরণাপন্ন হন, তাঁহারা এই মায়া অতিক্রম করেন।" "হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোকগণ, আইস, আমি তোমাদিগকে আশ্রয় দিব।" এই বাণীই আমাদিগকে ক্রমাগত সম্মুখে অগ্রসর করিতেছে। মানুষ ইহা শুনিয়াছে, এবং অনন্ত যুগ ইহা শুনিতেছে। যখন মানুষের সবই যায় যায় হইয়াছে বোধ হয়, যখন আশা ভঙ্গ হইতে থাকে, যখন মানুষের নিজ বলের প্রতি বিশ্বাস নষ্ট হইয়া যায়, যখন সমুদয়ই যেন তাঁহার আঙ্গুল গলিয়া পলাইতে থাকে এবং জীবন একটী ভগ্নস্তূপে পরিণত হয় মাত্র, তখনই সে এই বাণী শুনিতে পায়—আর ইহাই ধর্ম্ম।

তাহা হইলেই হইল, একদিকে এই অভয়বাণী, এই আশাপ্রদ বাক্য যে, এই সমুদয়ই কিছুই নয়, সমুদয়ই মায়া, ইহা উপলব্ধি কর, কিন্তু মায়ার বাহিরে যাইবার পথ আছে। অপর দিকে, আমাদের সাংসারিক ব্যক্তিগণ বলেন, "ধর্ম্ম দর্শন এ সব বাজে জিনিষ লইয়া মাথা বকাইও না। জগতে বাস কর; এই জগৎ ঘোর অশুভপূর্ণ বটে, কিন্তু যতদূর পার, ইহার সদ্ব্যবহার করিয়া লও।" সাদা কথায় ইহার অর্থ এই, ভণ্ডভাবে দিবা রাত্র প্রতারণাপূর্ণ জীবন যাপন কর—তোমার ক্ষতগুলি যতদূর পার ঢাকিয়া রাখ। তালির উপর তালি দাও, শেষে আসল জিনিষটাই যেন নষ্ট হইয়া যায়, আর তুমি কেবল একটী তালির উপর তালি হইয়া যাও। ইহাকেই বলে—সাংসারিক জীবন। যাহারা এইরূপ জোড়াতাড়া তালি লইয়া সন্তুষ্ট, তাহারা কখন ধর্ম্মলাভ করিতে পারিবে না। যখন জীবনের বর্ত্তমান অবস্থায় ভয়ানক অশান্তি উপস্থিত হয়, যখন নিজের জীবনের উপরও আর মমতা থাকে না, যখন এইরূপ তালি দেওয়ার উপর ভয়ানক ঘৃণা উপস্থিত হয়, যখন মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার উপর ভয়ানক বিতৃষ্ণা জন্মায়, তখনই ধর্ম্মের আরম্ভ হয়। সেই কেবল প্রকৃত ধার্ম্মিক হইবার যোগ্য হইতে পারে, যে বুদ্ধদেব বোধিবৃক্ষের নিম্নে দাঁড়াইয়া দৃঢ়স্বরে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারে, যখন এই সাংসারিকতার ভাব তাঁহার নিকটও আবির্ভাব হইয়াছিল, তিনি বুঝিতে পারিতেছেন, এ সমুদায়ই

ভূল, অথচ কোন পথ বাহির পারিতেছেন না। একবার তাঁহার প্রলোভন আসিল,—সত্যের জন্য অনুসন্ধান পরিত্যাগ কর,সংসারে ফিরিয়া গিয়া প্রাচীন প্রতারণাপূর্ণ জীবন যাপন কর, সকল জিনিষকে তাহার ভুল নাম দিয়া ডাক, নিজের নিকট এবং সকলের নিকট দিনরাত মিথ্যা বলিতে থাক,—এইরূপ প্রলোভন তাঁহার নিকট একবার আসিয়াছিল, কিন্তু সেই মহাবীর অতুল বিক্রমে তৎক্ষণাৎ উহা জয় করিয়া ফেলিলেন, তিনি বলিলেন, "অজ্ঞানভাবে কেবল খাইয়া পরিয়া জীবনযাপনাপেক্ষা মৃত্যুও শ্রেয়ঃ, পরাজিত হইয়া জীবনযাপনাপেক্ষা যুদ্ধক্ষেত্রে মরা শ্রেয়ঃ।" ইহাই ধর্ম্মের ভিত্তি। যখন মানুষ এই ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হয়, তখন সে সত্যলাভ করিবার পথে চলিয়াছে, সে ঈশ্বর লাভ করিবার পথে চলিয়াছে, বুঝিতে হইবে। ধার্ম্মিক হইবার জন্য প্রথমেই এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আবশ্যক। আমি নিজের পথ নিজে করিয়া লইব। সত্য জানিব, অথবা এই চেষ্টায় জীবন সমর্পণ করিব। কারণ, এ দিকে ত কিছুই নাই, শূন্য, দিবারাত্রি অন্তর্হিত হইতেছে। অদ্যকার সুন্দর আশাপূর্ণ তরুণ পুরুষ কল্যকার বৃদ্ধ। আশা আনন্দ সুখ এ সকল মুকুলসমূহের ন্যায় কল্যকার শিশিরপাতেই নষ্ট হইবে। এত এই দিকের কথা; অপর দিকে, জয়ের প্রলোভন রহিয়াছে—জীবনের সমুদয় অশুভ জয় করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এমন কি, জীবন এবং জগতের উপর পর্যন্ত জয়ী হইবার আশা রহিয়াছে। এই উপায়েই মানুষ নিজ পদের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারে। অতএব যাহারা এই জয়লাভের জন্য, সত্যের জন্য, ধর্ম্মের জন্য চেষ্টা করিতেছে, তাহারাই সত্য পথে রহিয়াছে, আর বেদসকল ইহাই প্রচার করেন। "নিরাশ হইও না; পথ বড় কঠিন—যেন ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম; তাহা হইলেও নিরাশ হইও না; উঠ, জাগ এবং তোমার চরম আদর্শে উপনীত হও।"

বিভিন্ন ধর্ম্মসমূহ, তাহারা যে আকারেই মানুষের নিকট আসুক না কেন, সকলেরই এই এক মূল ভিত্তি। সকল ধর্ম্মই জগৎ হইতে বাহিরে যাইবার—মুক্তির—উপদেশ দিতেছে। এই ধর্ম্মসকল সংসার ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য সাধন করিতে আইসে না, বরং ধর্ম্মকে নিজ আদর্শে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিতে আইসে, সংসারের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া ঐ আদর্শকে ছোট করিয়া ফেলে না। প্রত্যেক ধর্ম্মই ইহা প্রচার করিতেছেন, আর বেদান্তের কর্ত্তব্য—বিভিন্ন ধর্ম্মভাব সকলের সামঞ্জস্যসাধন, যেমন এই মাত্র আমরা দেখিলাম, এই মুক্তিতত্ত্বে জগতের উচ্চতম ও নিম্নতম সকল ধর্ম্মের মধ্যে সামঞ্জস্য রহিয়াছে। আমরা

একেবারে স্পৃষ্ট নহে, সেই সম এক অবিক্রিয় ব্রহ্মকেই দর্শন করাই যাহাদের স্বভাব, তাহারাই সমদর্শী পণ্ডিত ॥ ১৮ ॥

ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্‌ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়।—যেষাং মনঃ সাম্যে স্থিতং তৈরিহৈব সর্গোজিতঃ হি (যস্মাৎ) ব্রহ্ম সমং নির্দ্দোষং তস্মাৎ তে ব্রহ্মণি স্থিতাঃ ॥ ১৯ ॥

মূলানুবাদ।—যাহাদের মনঃ সাম্যে অবস্থিত, তাহারা এই লোকেই জন্ম জয় করিতে সমর্থ হইয়াছে, যে কারণ নির্দ্দোষ ব্রহ্মই সম, এই কারণ তাহারা ব্রহ্মতেই অবস্থিত ॥ ১৯ ॥

ভাষ্য।—নন্বভোজ্যান্নাস্তে দোষবন্তঃ "সমাসমাভ্যাং বিষমসমে পূজাতঃ" ইতি স্মৃতেঃ, নতে দোষবন্তঃ কথং ইহৈব জীবদ্ভিরেব তৈঃ সমদর্শিভিঃ পণ্ডিতৈর্জিতোবশীকৃতঃ সর্গঃ জন্ম যেষাং সাম্যে সর্ব্বভূতেষু ব্রহ্মণি সমভাবে স্থিতং নিশ্চলীভূতং মনোঽন্তঃকরণং। নির্দ্দোষং যদ্যপি দোষবৎসু শ্বপাকাদিষু মূঢ়ৈস্তদ্দোষৈর্দোষবদিব বিভাব্যতে, তথাপি তদ্দোষৈরস্পৃষ্টমিতি নির্দ্দোষং দোষবর্জ্জিতং হি যস্মাৎ নাপি স্বগুণভেদভিন্নং নির্গুণত্বাচ্চৈতন্যস্য বক্ষ্যতি চ ভগবান্ ইচ্ছাদীনাং ক্ষেত্রধর্ম্মত্বং অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাচ্চ। নাপ্যন্ত্যাবিশেষা আত্মনো ভেদকাঃ সন্তি প্রতিশরীরং তেষং প্রমাণানুপপত্তেরতঃ সমং ব্রহ্ম একঞ্চ তস্মাদ্‌ব্রহ্মণ্যেব তে স্থিতাস্তস্মান্ন দোষগন্ধমাত্রমপি তান্ স্পৃশতি দেহাদিসংঘাতাত্মদর্শনাভিমানাভাবাৎ দেহাদিসংঘাতাত্মদর্শনাভিমানবদ্ বিষয়ন্তু তৎ সূত্রম্ সমাসমাভ্যাং বিষমসমে পূজাত ইতি পূজাবিষয়ত্ব-বিশেষণাৎ দৃশ্যতে চ ব্রহ্মবিৎ ষড়ঙ্গবিচ্চতুর্ব্বেদবিদিতি পূজাদানাদৌ গুণবিশেষসম্বন্ধঃ কারণং ব্রহ্ম তু সর্ব্বগুণদোষবর্জ্জিতমিতি ব্রহ্মণি তে স্থিতা ইতি যুক্তম্ কর্ম্মিবিষয়ঞ্চ সমাসমাভ্যাং ইত্যাদি ইদং তু সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসিবিষয়ং প্রস্তুতং সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা ইত্যারভ্য আ অধ্যায়পরিসমাপ্তেঃ ॥ ১৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—এক্ষণে এই প্রকার শঙ্কা হইতেছে যে চণ্ডাল প্রভৃতির অন্নভোজন করিতে নাই, সুতরাং তাহারা সদোষ। উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট ব্যক্তিকে যথাক্রমে অপকৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট পূজা করিলে (পাপ হয়), এই প্রকার স্মৃতি (প্রমাণ দ্বারা ইহা জানা যায় যে ঐ সকল অপকৃষ্ট ব্যক্তিকে ও উৎকৃষ্ট ব্যক্তিকে একরূপ জ্ঞান করা উচিত নহে) ইহার উপর, এই বলা

যাইতেছে যে, তাহারা (ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির নিকট) দোষযুক্ত নহে কেন? (তাহাই শ্লোকের দ্বারা বলা হইতেছে) সেই সকল সমদর্শী পণ্ডিতগণ বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতেই সর্গ (অর্থাৎ) জন্মকে বশীকৃত করিয়া থাকেন, যাঁহাদের মন (অর্থাৎ) অন্তঃকরণ সাম্যে (অর্থাৎ) সকল প্রাণীতেই সমভাবে অবস্থিত ব্রহ্মতেই স্থিত (অর্থাৎ) নিশ্চল হইয়া থাকে; যে কারণ ব্রহ্ম নির্দ্দোষ ও সম, যদ্যপি দোষযুক্ত শ্বপাকাদিতে (স্থিত বলিয়া) মূঢ়গণ সেই শ্বপাকাদির দোষে ব্রহ্মকেও দোষযুক্তের ন্যায় বোধ করিয়া থাকে, তাহা হইলেও প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্ম নির্দ্দোষ, অর্থাৎ সকল প্রকার দোষ-বর্জ্জিত, যে কারণ চৈতন্য নির্গুণ এবং নির্গুণত্বনিবন্ধনই উহা স্বগত গুণবিশেষবশতঃ বিভিন্ন হইতে পারে না। ভগবানও বলিবেন যে, ইচ্ছা-প্রভৃতি গুণ ক্ষেত্রের ধর্ম্ম, আত্মার অনাদিত্ব ও নির্গুণত্ব নিবন্ধন (পরমাত্মা বিকারী নহেন) ইত্যাদি। এবং প্রত্যেক নিত্য দ্রব্যে বিদ্যমান বৈশেষিক মত সিদ্ধ বিশেষনামক বস্তুর দ্বারাও আত্মার ভেদ সাধিত হইতে পারে না, কারণ প্রতিশরীরভেদে আত্মগত তাদৃশ বিশেষ বস্তুর স্বীকারে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এইজন্য ব্রহ্ম সম এবং এক, এই জন্য তাহারা ব্রহ্মেতেই স্থিত, সুতরাং (পরমার্থ দৃষ্টিতে) তাহাদের অণুমাত্রও দোষের স্পর্শ হইতে পারে না। কারণ তাহাদের দেহাদিসঙ্ঘাতে আত্মদর্শনজনিত অভিমান নিবৃত্ত হইয়াছে। "সম এবং অসম ব্যক্তির বিষম ও সমভাবে পূজা করিলে প্রত্যবায় হয়", এই প্রকার ধর্ম্মশাস্ত্রের বিষয় দেহাদিসঙ্ঘাতে আত্মাভিমান-শালী জীব। সেই প্রকার জীবের পক্ষেই ব্রহ্মবিদ্, ষড়ঙ্গবিদ্, চতুর্ব্বেদবিদ্ ইত্যাদি পাত্রগত গুণ ভেদে পূজা ও দানাদিতে বিশেষ বিধানও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সর্ব্বজগতের কারণ ব্রহ্ম সর্ব্বপ্রকার গুণ ও দোষ হইতে বিনির্ম্মুক্ত, এই কারণে তাহারা ব্রহ্মেতেই অবস্থিত, এইরূপ যাহা বলা হই-য়াছে, তাহা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। "সমাসমাভ্যাং" ইত্যাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের বিষয়-কর্ম্মী জীব। সর্ব্বকর্ম্মাণি সংন্যস্য ইত্যাদি শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া এই অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত যাহা কিছু বলা হইয়াছে, তাহা সর্ব্বকর্ম্মসংন্যা-সীর বিষয়েই প্রকৃত আছে ॥ ১৯ ॥

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়।—স্থিরবুদ্ধিঃ অসম্মূঢ়ঃ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ব্রহ্মবিদ্ প্রিয়ং প্রাপ্য ন প্রহৃষ্যেৎ (তথা) অপ্রিয়ং প্রাপ্য ন উদ্বিজেৎ চ॥ ২০॥

মূলানুবাদ।—ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি, স্থিরবুদ্ধি সম্মোহশূন্য এবং সর্ব্বদা ব্রহ্মদর্শন তৎপর (হইবে), সে প্রিয়বস্তু লাভ করিলে হৃষ্ট হইবে না এবং অপ্রিয় প্রাপ্তিতে উদ্বিগ্ন হইবে না॥ ২০॥

ভাষ্য।—যস্মাৎ নির্দ্দোষং সমং ব্রহ্ম আত্মা তস্মাৎ ন প্রহৃষ্যেৎ ন প্রহর্ষং কুর্য্যাৎ প্রিয়মিষ্টং প্রাপ্য লব্ধ্বা নোদ্বিজেৎ প্রাপ্যেব চাপ্রিয়ং অনিষ্টং লব্ধ্বা দেহমাত্রাত্মদর্শিনাং হি প্রিয়াপ্রিয়প্রাপ্তী হর্ষবিষাদস্থানে। ন কেবলাত্মদর্শিনস্তস্য প্রিয়াপ্রিয়প্রাপ্ত্যসম্ভবাৎ। কিঞ্চ সর্ব্বভূতেষু একঃ সমো নির্দ্দোষ আত্মা ইতি স্থিরা নির্ব্বিচিকিৎসা বুদ্ধির্যস্য সঃ স্থিরবুদ্ধিঃ অসম্মূঢ়ঃ সম্মোহবর্জ্জিতশ্চ স্যাৎ যথোক্ত ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতোঽকর্ম্মকৃৎ সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসীত্যর্থঃ॥২০॥

ভাষ্যানুবাদ।—যে কারণ ব্রহ্ম নির্দ্দোষ সম এবং আত্মা, সেই কারণে প্রিয় (অর্থাৎ) ইষ্ট লাভ করিয়া প্রহৃষ্ট হইবে না এবং অপ্রিয় (অর্থাৎ) অনিষ্ট লাভ করিয়া উদ্বিগ্ন হইবে না। যাহারা শরীরেতেই আত্মাভিমানী, তাহাদেরই প্রিয় বা অপ্রিয় বস্তুর প্রাপ্তি হর্ষ বা বিষাদের কারণ হয়। ব্রহ্মই আত্মা, এই প্রকার জ্ঞান যাহার হইয়াছে, তাহার প্রিয় বা অপ্রিয় প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। আরও সকল প্রাণিতেই এক ও সম আত্মা কোন প্রকার দোষসংস্পৃষ্ট নহে, এই প্রকার স্থির (অর্থাৎ) সংশয়হীন বুদ্ধি যাহার হইয়াছে, তাহাকেই স্থিরবুদ্ধি বলা যায়। স্থিরবুদ্ধি ও সম্মোহবর্জ্জিত হইবে। (এবং) যথোক্ত ব্রহ্মস্বরূপকে জানিয়া ব্রহ্মস্থিত (অর্থাৎ) "অকর্ম্মকৃৎ" সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসী (হইবে), ইহাই অর্থ॥ ২০॥

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে॥ ২১॥

অন্বয়।—আত্মনি যৎ সুখং (বর্ত্ততে, তৎ) অক্ষয়ং সুখং বাহ্যস্পর্শেষু অসক্তাত্মা ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা স (যোগী) অশ্নুতে॥ ২১॥

মূলানুবাদ।—আত্মাতেই যে সুখ বিদ্যমান রহিয়াছে সেই অক্ষয় সুখ তাহারই হইয়া থাকে, যে ব্যক্তির অন্তঃকরণ বাহ্য বিষয়সমূহে আসক্ত নহে এবং ব্রহ্মবিষয়ক সমাধিতে যাহার অন্তঃকরণ সর্ব্বদা যুক্ত থাকে॥ ২১॥

ভাষ্য।—কিঞ্চ ব্রহ্মণি স্থিতঃ বাহ্যস্পর্শেষু বাহ্যাশ্চতে স্পর্শাশ্চ বাহ্যস্পর্শাঃ,

স্পৃশ্যন্তে ইতি স্পর্শাঃ শব্দাদয়ো বিষয়াস্তেষু বাহ্যস্পর্শেষু আসক্ত আত্মা অন্তঃকরণং যস্য সোঽয়ং অসক্তাত্মা বিষয়েষু প্রীতিবর্জ্জিতঃ সন্ বিন্দতি লভতে আত্মনি যৎ সুখং তদ্বিন্দতীত্যেতৎ। স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা ব্রহ্মণি যোগঃ সমাধিঃ ব্রহ্মযোগস্তেন ব্রহ্মযোগেন যুক্তঃ সমাহিতস্তস্মিন্ ব্যাপৃত আত্মান্তঃকরণং যস্য স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ব্যাপ্নোতি। তস্মাদ্বাহ্যবিষয়প্রীতেঃ ক্ষণিকায়া ইন্দ্রিয়াণি নিবর্ত্তয়েদাত্মন্যক্ষয়সুখার্থীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—আরও ব্রহ্মেতে অবস্থিত (হইতে হইলে কি হইতে হইবে তাহা বলিতেছেন), বাহ্যস্পর্শসমূহে (অর্থাৎ) বাহিরের শব্দাদিভোগ্য বিষয়নিচয়ে অসক্তাত্মা, যাহার আত্মা (অর্থাৎ) অন্তঃকরণ অনাসক্ত সেই অসক্তাত্মা অর্থাৎ বিষয়ে প্রীতিবর্জ্জিত হইলে, আত্মাতে যে সুখ (আছে), তাহাই লাভ করিয়া থাকে। সেই ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা অক্ষয় সুখ লাভ করিয়া থাকে, ব্রহ্মে যোগ (অর্থাৎ) সমাধি (এই অর্থে) ব্রহ্ম যোগ (এই শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে), যাহার আত্মা (অর্থাৎ) অন্তঃকরণ সেই ব্রহ্মযোগেতে যুক্ত (অর্থাৎ) ব্যাপৃত আছে, সেই ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা। সেই কারণে আত্মার অক্ষয় সুখ যে কামনা করে, সে ক্ষণিক বাহ্যবিষয়প্রীতি হইতে ইন্দ্রিয় সকলকে নিবৃত্ত করিবে ইহাই অর্থ ॥ ২১ ॥

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়।—হে কৌন্তেয়! যে ভোগাঃ সংস্পর্শজাঃ তে দুঃখযোনয় এব (তথা) আদ্যন্তবন্তঃ, তেষু বুধঃ ন রমতে ॥ ২২ ॥

মূলানুবাদ।—(এই কারণেও বাহ্যবিষয়প্রীতি হইতে মনকে নিবৃত্ত করিবে কারণ) বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শজনিত যে সুখভোগ সকল হয়, তাহা দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। হে কৌন্তেয়, ঐ সকল ভোগ আদি ও অন্তযুক্ত, পণ্ডিত ব্যক্তি ঐ সকল বাহ্যবিষয়ভোগে প্রীতিলাভ করে না ॥ ২২ ॥

ভাষ্য।—ইতশ্চ নিবর্ত্তয়েৎ যে হি যস্মাৎ সংস্পর্শজা বিষয়েন্দ্রিয়সংস্পর্শেভ্যো জাতা ভোগাভুক্তয়ঃ দুঃখযোনয় এব অবিদ্যাকৃতত্বাৎ। দৃশ্যন্তে হি আধ্যাত্মিকাদীনি দুঃখানি তন্নিমিত্তান্যেব। যথেহ লোকে তথা পরলোকেঽপি গম্যত এব শব্দাৎ। ন সংসারে সুখস্যগন্ধমাত্রমপ্যস্তীতি বুদ্ধ্বা বিষয়মৃগতৃষ্ণিকায়া ইন্দ্রিয়াণি নিবর্ত্তয়েৎ। ন কেবলং দুঃখযোনয় আদ্যন্তবন্তশ্চ আদি-

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগো ভোগানামন্তশ্চ তদ্বিয়োগ এবাত আদ্যন্তবন্তোঽনিত্যা-মধ্যক্ষণভাবিত্বাদিত্যর্থঃ। কৌন্তেয়, ন তেষু রমতে বুধঃ ভোগেষু বিবেকী অবগত-পরমার্থতত্ত্বোঽত্যন্তমূঢ়ানামেব বিষয়েষু রতির্দৃশ্যতে যথা পশুপ্রভৃতীনাম্॥ ২২॥

ভাষ্যানুবাদ।—এই কারণেও নিবৃত্ত করিবে, কারণ বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের পরস্পর সংযোগ হইতে উৎপন্ন যে সকল ভোগ (অর্থাৎ) ভুক্তি, তাহারা দুঃখকারণ, কারণ ঐ সকলই অজ্ঞানের কার্য্য। দেখিতেও পাওয়া যায়, আধ্যাত্মিক প্রভৃতি দুঃখ তাহার নিমিত্ত হইয়া থাকে। যেমন এই লোকে, সেই প্রকারে শাস্ত্রপ্রমাণ বলে পরলোকেও হইয়া থাকে, ইহা বুঝিতে পারা যায়। এই সংসারে সুখের লেশমাত্রও নাই, ইহা বুঝিয়া বিষয়মৃগতৃষ্ণা হইতে ইন্দ্রিয় সকলকে নিবৃত্ত করিবে, তাহারা কেবল যে দুঃখযোনি তাহাই নহে, তাহাদের আদি ও অন্ত আছে; বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগই ভোগের আদি এবং তাহার বিয়োগই ভোগের অন্ত; সুতরাং সকল ভোগই অনিত্য, কারণ ভোগ আদিতেও নাই, পরেও থাকে না, কেবল মধ্যেই থাকে। হে কৌন্তেয়, বুধ (অর্থাৎ) বিবেকী সেই ভোগসমূহে প্রীতি লাভ করে না, কারণ সে ভোগের অসারতা বুঝিয়াছে এবং নিত্য ব্রহ্মেরও স্বরূপ জানিতে পারিয়াছে। পশুপক্ষী প্রভৃতির ন্যায় যাহারা অত্যন্ত মূঢ়, তাহাদেরই বিষয়সমূহে প্রীতি দেখিতে পাওয়া যায়॥ ২২॥

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্‌শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥ ২৩॥

অন্বয়।—ইহৈব শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাক্ কামক্রোধোদ্ভবং বেগং সোঢ়ুং যঃ শক্নোতি স নরঃ যুক্তঃ সুখী (চ)॥ ২৩॥

মূলানুবাদ।—এই লোকেই মরণের পূর্ব্বে কাম ও ক্রোধের বেগ ধারণ করিতে যে সমর্থ হয়, সেই মনুষ্যই যুক্ত এবং সেই সুখী॥ ২৩॥

ভাষ্য।—অয়ং চ শ্রেয়োমার্গপ্রতিপক্ষী কষ্টতমোদোষঃ সর্ব্বানর্থপ্রাপ্তি-হেতুর্দুর্নিবার্য্যশ্চেতি তৎপরিহারে যত্নাধিক্যং কর্ত্তব্যমিত্যাহ ভগবান্। শক্নোতি উৎসহতে ইহৈব জীবন্নেব যঃ সোঢ়ুং প্রসহিতুং প্রাক্ পূর্ব্বং শরীরবিমোক্ষণা-দামরণাৎ। মরণসীমাকরণং জীবতোঽবশ্যম্ভাবী হি কামক্রোধোদ্ভবো বেগো-ঽনন্তনিমিত্তবান্ হি সইতি যাবন্মরণং তাবন্ন বিশ্রম্ভণীয় ইত্যর্থঃ। কাম ইন্দ্রিয়-গোচরপ্রাপ্তে ইষ্টে বিষয়ে শ্রূয়মাণে স্মর্য্যমাণে বানুভূতে সুখহেতৌ যা গর্দ্ধি-

তৃষ্ণা সকামঃ। ক্রোধশ্চ আত্মনঃ প্রতিকূলেষু দুঃখহেতুষু দৃশ্যমানেষু শ্রূয়মাণেষু বা যোদ্বেষঃ সক্রোধঃ তৌ কামক্রোধৌ উদ্ভবো যস্য কাম-ক্রোধোদ্ভবো বেগঃ রোমাঞ্চনহৃষ্টনেত্রবদনাদিলিঙ্গোঽন্তঃকরণপ্রক্ষোভরূপঃ কামোদ্ভবো বেগঃ। গাত্রপ্রকম্পপ্রস্বেদসংদষ্টোষ্ঠপুটরক্তনেত্রাদিলিঙ্গঃ ক্রোধোদ্ভবো বেগঃ তং কামক্রোধোদ্ভবং বেগং য উৎসহতে প্রসহতে সোঢ়ুং প্রসহিতুং স যুক্তো যোগী সুখী চেহ লোকে নরঃ॥ ২৩॥

ভাষ্যানুবাদ।—এইটীই মোক্ষমার্গের প্রতিপক্ষ এবং অত্যন্তক্লেশসাধ্য দোষ এবং ইহাই সকল অনর্থপ্রাপ্তির হেতু, এই জন্য ইহার নিবারণ করা উচিত এবং ইহার পরিহার করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতে হইবে, ইহাই বলিতেছেন ভগবান।

এই লোকেই (অর্থাৎ) জীবিত অবস্থায় যে ব্যক্তি মরণের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত কামক্রোধোদ্ভববেগ সহন করিতে সমর্থ হয়; মরণ পর্য্যন্ত সীমা করিবার তাৎপর্য্য এই যে কাম ও ক্রোধ হইতে উৎপন্ন বেগ, জীবিতব্যক্তির পক্ষে অবশ্যম্ভাবী, কারণ তাহার নিমিত্ত অনন্ত। সুতরাং আমরণ উহাকে বিশ্বাস করিবে না। অভিলষিত সুখকরবস্তু ইন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইলে অথবা শ্রুত হইলে কিংবা পূর্ব্বে অনুভূত ছিল বলিয়া কোন কারণ বশতঃ স্মরণ-পথে উপস্থিত হইলে, তাহার উপর যে গর্দ্ধি অর্থাৎ তৃষ্ণা হয়, তাহারই নাম কাম। যে সকল বস্তু দুঃখহেতু, সুতরাং আত্মার প্রতি-কূল, সেই সকল বস্তুর দর্শন শ্রবণ বা স্মরণ হইলে যে দ্বেষ উৎপন্ন হয়, তাহাকেই ক্রোধ বলা যায়। সেই কাম ও ক্রোধ হইতে যে বেগ উৎপন্ন হয়, তাহাকে কামক্রোধোদ্ভব বেগ বলা যায়। শরীরে রোমাঞ্চ হৃষ্টনেত্র ও হৃষ্টবদন প্রভৃতি চিহ্নের দ্বারা অন্তঃকরণের যে চাঞ্চল্যকে বাহিরের লোকে অনুমান করিয়া থাকে, তাহারই নাম কামোদ্ভব বেগ। শরীরে কম্প, প্রস্বেদ, অধরোষ্ঠের দংশন, আরক্ত নেত্র প্রভৃতি চিহ্নের দ্বারা অন্তঃকরণের যে চাঞ্চল্য অনুমিত হয়, তাহাকে ক্রোধোদ্ভব বেগ কহা যায়। যে ব্যক্তি সেই কাম এবং ক্রোধ হইতে উৎপন্ন বেগকে সহন করিতে সমর্থ হয়, সেই যুক্ত (অর্থাৎ) যোগী এবং ইহলোকে সেই মনুষ্যই সুখী॥ ২৩॥

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি॥ ২৪॥

অন্বয়।—যঃ অন্তঃসুখঃ অন্তরারামঃ তথা যঃ অন্তর্জ্যোতিঃ এব স যোগী ব্রহ্মভূতঃ (সন্) ব্রহ্মনির্ব্বাণং অধিগচ্ছতি॥ ২৪॥

মূলানুবাদ।—যে অন্তঃসুখ, যাহার অন্তরাত্মাতেই ক্রীড়া এবং অন্তরাত্মাই যাহার নিকট জ্যোতিঃ স্বরূপে প্রকাশমান, সেই যোগী ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া (এই জীবনেই) ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করিয়া থাকে॥ ২৪॥

ভাষ্য।—কথং ভূতশ্চ ব্রহ্মণিস্থিতো ব্রহ্ম প্রাপ্নোতীত্যাহ। যোহন্তঃসুখঃ অন্তরাত্মনি সুখং যস্য সোহন্তঃসুখঃ তথা অন্তরেবাত্মনি আরাম আক্রীড়া যস্য সোহন্তরারামস্তথৈবান্তরাত্মৈব জ্যোতিঃ প্রকাশোযস্য সোহন্তর্জ্যোতিরেব যঈদৃশঃ স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মণি নিবৃতিং মোক্ষমিহ জীবন্নেব ব্রহ্মভূতঃ সন্নধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি॥ ২৪॥

ভাষ্যানুবাদ।—কি প্রকার হইলে ব্রহ্মেতে স্থিত হইয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইতে পারে ? (তাহাই বলা যাইতেছে) যে "অন্তঃসুখ" (অন্তঃশব্দের অর্থ আত্মা) আত্মাতেই যাহার সুখ, তাহাকেই অন্তঃসুখ বলা যায়, যে ব্যক্তি "অন্তরারাম" আত্মাতেই যাহার আরাম (অর্থাৎ) আক্রীড়া সেই অন্তরারাম, এইরূপ যে অন্তর্জ্যোতিঃ, আত্মাই যাহার জ্যোতিঃ (অর্থাৎ সর্ব্বদা) প্রকাশ,সেই অন্তর্জ্যোতিঃ। এই প্রকার লক্ষণসম্পন্ন যে যোগী সে ব্রহ্মনির্ব্বাণ (অর্থাৎ) ব্রহ্মেতেই 'নিবৃত্তি' মোক্ষ, এই লোকেহ বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে ব্রহ্মের স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ২০॥

লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধাযতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥ ২৫॥

অন্বয়।—ক্ষীণকল্মষাঃ ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতা ঋষয়ঃ ব্রহ্ম নির্ব্বাণং লভন্তে॥ ২৫॥

মূলানুবাদ।—বিগতপাপ সংশয়শূন্য সমাহিতচেতা এবং সর্ব্বভূতহিতনিরত ঋষিগণ ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করিয়া থাকেন॥ ২৫॥

ভাষ্য।—কিঞ্চ ব্রহ্মনির্ব্বাণং মোক্ষমৃষয়ঃ সম্যগ্‌দর্শিনঃ সংন্যাসিনঃ ক্ষীণ-কল্মষাঃ ক্ষীণপাপাদিদোষাশ্ছিন্নদ্বৈধাশ্ছিন্নসংশয়া যতাত্মানঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ সর্ব্ব-ভূতহিতে রতাঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং হিতে আনুকূল্যে রতাঃ অহিংসকা ইত্যর্থঃ॥২৫॥

ভাষ্যানুবাদ।—আরও "ঋষি" সম্যগ্‌দর্শনশীল সংন্যাসী, "ক্ষীণকল্মষ" পাপাদিদোষহীন, "ছিন্নদ্বৈধ" সংশয়শূন্য, "যতাত্মা" সংযতেন্দ্রিয় ও সর্ব্বভূতের

মঙ্গল পরায়ণ (অর্থাৎ) অহিংসক ব্যক্তিগণ "ব্রহ্মনির্ব্বাণ" মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়।—বিদিতাত্মনাং কামক্রোধবিযুক্তানাং যতচেতসাং যতীনাং অভিতঃ ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে ॥ ২৬ ॥

মূলানুবাদ।—যাহারা সম্যগ্দর্শী, যাহাদের কাম ও ক্রোধ নাই এবং যাহারা সংযতচেতা সেই যতিগণের উভয়ত (অর্থাৎ দেহপাতের পূর্ব্বে ও পরে) মোক্ষ হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

ভাষ্য।—কিঞ্চকামবিযুক্তানাং কামশ্চ ক্রোধশ্চ কামক্রোধৌ তাভ্যাং বিযুক্তানাং যতীনাং সংন্যাসিনাং যতচেতসাং সংযতান্তঃকরণানাং অভিত উভয়তো জীবতাং মৃতানাঞ্চ ব্রহ্মনির্ব্বাণং মোক্ষোবর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্ বিদিতোজ্ঞাত আত্মা যেষাং তে বিদিতাত্মানস্তেষাম্ বিদিতাত্মনাং সম্যগ্দর্শিনামিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—আরও, যাহারা কাম ও ক্রোধ এই উভয় বর্জ্জিত, যাহারা যতি (অর্থাৎ) সংন্যাসী, যাহারা যতচেতা (অর্থাৎ) সংযতান্তঃকরণ এবং যাহারা "আত্মতত্ত্বজ্ঞ" সম্যগ্দর্শনশীল, তাহাদের জীবিতাবস্থায় এবং মৃত্যুর পরে উভয়তঃ ব্রহ্মনির্ব্বাণ (অর্থাৎ) মোক্ষ আছেই ॥ ২৬ ॥

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥ ২৭ ॥
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়।—যঃ মুনিঃ মোক্ষপরায়ণঃ (সন্) বাহ্যান্ স্পর্শান্ বহিঃ কৃত্বা (তথা) ভ্রুবোঃ অন্তরে চক্ষুঃ (কৃত্বা) চ নাসাভ্যন্তরচারিণৌ প্রাণোপাণৌ চ সমৌ কৃত্বা সদা যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ (স্যাৎ) স মুক্ত এব ॥ ২৭—২৮ ॥

মূলানুবাদ। যে মুনি মোক্ষপরায়ণ হইয়া বাহ্যবিষয়নিচয়কে মনের মধ্যে প্রবেশ করিতে দিবে না এবং ভ্রুদ্বয়ের মধ্যে চক্ষুঃ সন্নিবিষ্ট করিয়া নাসাভ্যন্তর চারি প্রাণ ও অপান বায়ুকে, সমভাবাপন্ন করিবে এবং ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধিকে

শুকদেব-চরিত।

(ডাক্তার শশীভূষণ ঘোষ, এম, বি,।)

শাস্ত্রালোচনা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটী সুন্দর উপদেশ আছে। তিনি বলিতেন, "তৃষ্ণা পাইয়া থাকে, পুষ্করিণীর নীচের পাঁক ঘোলাইও না, উপর উপর জল পান কর, তৃষ্ণা নিবারণ হইবে। শাস্ত্রের মর্ম্ম গ্রহণ কর, তোমার ধর্ম্ম-পিপাসা নিবৃত্তি হইবে, কিন্তু শাস্ত্রের বাক্যার্থ লইয়া বিচার করিতে গেলে বুদ্ধি কলুষিত হইয়া যাইবে, তৃষ্ণা মিটিবে না'। তিনি আরও বলিতেন, 'খোসা পরিত্যাগ করিয়া শুধু চাল পুঁতিলে গাছ হয় না, ধান পোঁতা আবশ্যক। বিচার করিলে অনেক জিনিষ আমাদের নিকট অসার বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু সেই অসার কল্পনা পরিত্যাগ করিলে, সত্যমাত্র বাছিয়া লইতে চেষ্টা কর, সত্যের জীবনীশক্তি বিলুপ্ত হইবে'। যমরাজের সহিত অরণ্য মধ্যে সাবিত্রীর কথোপকথন কবিকল্পনা বোধ হইতে পারে, কিন্তু সাবিত্রীজীবনের সেই ঘটনা অবিশ্বাস্য ও অসত্য বিবেচনা কর, সতীত্বধর্ম্মের অপ্রতিহতশক্তি, সতীপ্রতিমার অপূর্ব্ব জলন্ত চিত্র আর দেখিতে পাইবে না। মেদিনী বিদীর্ণ করিয়া ধরিত্রীর আবির্ভাব ও সীতাদেবীর পাতালে প্রবেশ যদি [illegible] পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে পতিভক্তির অদ্বিতীয় আদর্শ, আর্য্যধর্ম্মের চিরারাধ্য পবিত্র দেবীমূর্ত্তি অর্দ্ধশ্রীহীন হইয়া পড়িবে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেই উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহার পবিত্র চরণে প্রণামপূর্ব্বক আমরা অদ্য সংসারবৈরাগ্যের প্রতিমূর্ত্তি ব্রহ্মচর্য্যের তেজোময়রূপ পরমযোগী ভগবান্ শুকদেবের পবিত্র চরিত্র আলোচনা করিব।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার অমৃতময়ী সরলবাক্যসংযোজনায় শুকদেবকে 'নিদাগি খই,' বা 'প্রাতে তোলা মাখমে'র সহিত তুলনা করিতেন। যখন খই ফুটিতে থাকে, তখন যে গুলি ছিটকাইয়া বাহিরে পড়ে, তাহাদের গায়ে দাগ লাগে না। যাঁহারা বাল্যকাল হইতে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া সাধনভজন করেন, তাঁহাদের মন স্বভাবতঃই নির্ম্মল থাকে, সংসারের ময়লা স্পর্শ করিতে পারে না। বেলাতে মাখম তুলিলে ভাল মাখম উঠে না, অধিক বয়সের সাধনে সুমধুর পবিত্র জীবন হয় না। আমরা শুকদেবের জীবন অনেক পুরাণাদিতে দেখিতে পাই, কিন্তু 'নিদাগি খই' বা 'প্রাতে তোলা মাখমে'র তুল্য সেই জীবন মহাভারতে যেরূপ প্রতিফলিত হইয়াছে, সেরূপ আর কোথাও পাই না। মহা:

ভারতের রচনা পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ ও সরল ; অন্যান্য পুরাণে মহাভারতের অনেক শ্লোক গৃহীত হইয়া ও দুই একটী অসম্বন্ধ ঘটনা গ্রথিত করিয়া শুকচরিত বর্ণিত হইয়াছে। এ কারণ আমরা মহাভারতের মৌলিক বর্ণনা অনুসরণ করিয়া পবিত্র শুক-চরিত অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইব।

কোন সময়ে মহর্ষি বেদব্যাস দিব্যদর্শনীয় কর্ণিকারবন বেষ্টিত সুমেরু পর্ব্বতে পুত্রলাভেচ্ছায় কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। যাহাতে তিনি পৃথ্বী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ সদৃশ ধৈর্য্যশালী পুত্র লাভ করিতে পারেন, এই অভিলাষে মরুদাহারী হইয়া একশত বৎসর দেবসিদ্ধগন্ধর্ব্বাপ্সরালোকপালগণ-সেবিত দেবদেব উমাপতি মহাদেবের আরাধনা করেন। সেই আমরণ-চেষ্ট যোগযুক্ত তেজস্বান্ দ্বৈপায়নের তেজোদ্বারা জটামণ্ডল বহ্নিশিখাসদৃশ প্রজ্বলিত দৃষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার ভক্তি ও তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া কুসুমময়ী মনোহারিণী মালায় ভূষিতাঙ্গ মহেশ্বর আবির্ভূত হইয়া কহিলেন—"হে দ্বৈপায়ন, অগ্নি, বায়ু, আকাশ যেমন স্বতঃশুদ্ধ, তোমার সুমহান্ পুত্র সেইরূপ শুদ্ধ হইবে। তোমার পুত্র ব্রহ্মভাবভাবী, ব্রহ্মনিশ্চয়বুদ্ধি, ব্রহ্মার্পিতচিত্ত হইবে, ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে এবং নিজ তেজোদ্বারা ত্রিলোক আবরণ করিবে।"

সত্যবতীনন্দন দেবদেবের সেই বর পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। একদিন হোমার্থ অগ্ন্যুৎপাদনের অভিলাষী হইয়া অরণীযুগল গ্রহণ পূর্ব্বক মন্থন করিতেছেন এমন সময়ে ঘৃতাচীনাম্নী জনৈকা অপ্সরী তাঁহার নয়ন পথে পতিতা হইল। মহামুনি বেদব্যাস ধৈর্য্যসহকারে স্বীয় মনকে নিয়মিত করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। অগ্ন্যুৎপাদনার্থ মনোনিবেশপূর্ব্বক হৃদয়স্থবেগ সংবরণ করিতে উদ্যত হইলে, অরণীমধ্যে তাঁহার তেজের অংশ প্রবিষ্ট হইল। অপ্সরী ঘৃতাচী বেদব্যাসকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া ভীতচিত্তে শুকপক্ষিণী রূপ ধারণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ব্রহ্মর্ষি ব্যাস অবিশঙ্কিত চিত্তে পূর্ব্ববৎ অরণীমন্থন করিতে লাগিলেন। যজ্ঞকাষ্টসমুৎপন্নপ্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় সেই অরণীমধ্য হইতে শুকদেব স্বকীয় তেজে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার জন্মসময়ে অন্তরীক্ষ হইতে দণ্ড ও কৃষ্ণাজিন পতিত হইয়াছিল, স্বয়ং গঙ্গাদেবী আবির্ভূতা হইয়া জাত বালকের শরীরাভ্যন্তর ধৌত ও পরিষ্কৃত করিয়াছিলেন। পুত্রের জন্ম সময়ে ব্যাস শুকরূপ অপ্সরী দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া পুত্রের নাম শুক রাখিলেন। মহাদেব সেই মুনিপুত্রের উপনয়নসংস্কার নির্ব্বাহ করেন, এবং দেবরাজ ইন্দ্র কমণ্ডলু ও দেবাসন প্রদান করেন। অযোনি-

সম্ভব নির্ম্মলদেহ দৈবশক্তিপরিচালিত শুকদেব সেই স্থানেই ব্রতচারী ও সমাহিত হইয়া বসতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেবগুরু বৃহস্পতিকে উপাধ্যায় রূপে বরণ করিয়া নিখিল বেদ ও ইতিহাসাদি অধ্যয়নপূর্ব্বক গুরুদক্ষিণাপ্রদানান্তর গুরুকুল হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। ব্রহ্মদর্শী শুকদেবের মতি কোনরূপেই গার্হস্থ্যমূলক আশ্রমত্রয়ে অনুরক্ত হয় নাই। মোক্ষই তাঁহার একমাত্র আরাধনীয় বস্তু ছিল। এখন ব্রহ্মচর্য্য আশ্রয় করিয়া মোক্ষপথের পথিক হইবেন, কি গার্হস্থ্য জীবন অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মণোচিত নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিবেন, এই চিন্তা তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইল। শান্তি-অভিলাষী শুকদেব পিতার নিকট মোক্ষধর্ম্ম অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়া যোগ ও কপিলপ্রোক্ত শাস্ত্রশিক্ষায় অনুরক্ত হইলেন। ব্রহ্মর্ষি বেদব্যাস তাঁহাকে ব্রহ্মশ্রীযুক্ত জ্ঞান করিয়া কহিলেন—"তুমি মিথিলাধিপতি আমার যজমান রাজর্ষি জনকের নিকট গমন কর, তিনিই তোমাকে নিখিল মোক্ষশাস্ত্রার্থ কহিবেন।" [এই মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনক কে? ভারতের পৌরাণিক ইতিহাসে আমরা জনক নামে অনেক রাজর্ষি দেখিতে পাই। ত্রেতাযুগে যে জনক ধনুর্ভঙ্গ পণ করিয়া সীতাদেবী শ্রীরামচন্দ্রকে প্রদান করেন এবং দ্বাপরের শেষভাগে গুরুরূপে ভগবান্ শুকদেবকে ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করেন, এ উভয় জনকই এক ব্যক্তি নহেন। এই মিথিলা রাজবংশে অনেকানেক নরপতি রাজর্ষি জনক নামে অভিহিত হইয়াছেন, ইহা পুরাণ পাঠে অবগত হওয়া যায়। ইঁহারা সকলেই জীবন্মুক্ত ও বিদেহ জনক বলিয়া কথিত হইয়াছেন। জ্ঞান ও বিজ্ঞানসম্পন্ন ও জীবন্মুক্তের দৃষ্টান্তস্থল রূপে "জনকাদয়ঃ" ভারতীয় নানা দর্শনে উল্লিখিত হইয়াছেন। এখন বেদব্যাস নিখিলশাস্ত্রজ্ঞ হইয়া এই ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশের নিমিত্ত একজন ক্ষত্রিয়ের নিকট নিজপুত্রকে প্রেরণ করিলেন কেন? ব্রাহ্মণগণই শাস্ত্রবেত্তা, আচার্য্য ও উপদেষ্টা। ব্রাহ্মণ উপদেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া শুকদেব কঠিন ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশের নিমিত্ত ক্ষত্রিয়ের আশ্রয় কেন গ্রহণ করিলেন? এ স্থলে স্বামী বিবেকানন্দ শাস্ত্রাদি পর্য্যালোচনা করিয়া এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে বৈদিক সময় হইতেই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মার্গাবলম্বী দুই বিরোধী দল কলহে প্রবৃত্ত দেখিতে পাওয়া যায়। যাগযজ্ঞাদিবৈদিককর্ম্মপর ব্রাহ্মণগণ কতিপয় ক্ষত্রিয় রাজন্যগণ সাহায্যে আপনাদিগের প্রভুত্ব ও স্বার্থরক্ষণে দৃঢ়ব্রত; অপরদিকে জ্ঞানমার্গাবলম্বী ও উপনিষদ্-নিষ্ঠ অধিকাংশ রাজন্যবর্গ কর্ম্মকাণ্ডের অসারতা ও জ্ঞানের মোক্ষদাতৃত্ব প্রতিপাদনার্থ বদ্ধপরিকর। উপনিষৎ পাঠে

অবগত হওয়া যায় যে, ঋষিতনয় ক্ষত্রিয়ের নিকট ব্রহ্মজ্ঞানাভিলাষী হইয়া দণ্ডায়মান এবং পুরাণে একবাক্যে বর্ণিত হইতেছে, ব্রহ্মজ্ঞানের নিমিত্ত ব্রহ্মর্ষি বেদব্যাসপুত্র ভগবান্ শুকদেব রাজর্ষি জনকের দ্বারস্থ।]

"এই কয়েকটী কথা স্মরণ রাখিও—১। গমনকালে নিজ দেবপ্রভাব প্রদর্শন করিও না এবং সুখান্বেষী হইও না, কিন্তু সরলভাবে গমন করিও, কারণ শক্তি-প্রদর্শনাভিলাষ ও সুখান্বেষণ মোক্ষপথের কণ্টক। ২। বিষয়ে অনুরক্ত হইও না, তাহা হইলে বিষয়ে আসক্ত হইবে"। [সকল যোগশাস্ত্রে অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন মোক্ষপথের কণ্টক বলিয়া লিখিত আছে। যিনি এই শক্তি-লাভেই সন্তুষ্ট থাকেন, তিনি মোক্ষপথ হইতে ভ্রষ্ট হন। পরমহংসদেব শক্তি-প্রদর্শন অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন; অনন্ত শক্তি তাঁহার ভিতর, কিন্তু তিনি ইহা চির-গোপন করিয়া গিয়াছেন। ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি নিকটস্থ কোন কোন ভাগ্যবান্‌কে চকিতের ন্যায় নিজ স্বরূপ জানাইয়াছেন, কিন্তু পরক্ষণেই আবার মোহাচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিতেন, হাতি মরিল আর হাতি বাঁচিল, তোর কি? সাধারণ মনুষ্য এই অলৌকিক শক্তি দর্শনেই আকৃষ্ট হয়। একজন কোন অলৌকিক শক্তি নিজ আয়ত্ত করিয়া লোক মুগ্ধ করিতে পারেন, কিন্তু আধ্যাত্মিক বিষয়ে তিনি শক্তিহীন সামান্য মনুষ্য অপেক্ষাও কৃপাধীন।] ৩। "রাজর্ষির নিকট নিজ মহত্ত্বের নিমিত্ত অহঙ্কার করিও না। তাঁহার বশীভূত হইবে; তাহা হইলে সেই মোক্ষশাস্ত্রবিশারদ তোমার সকল সংশয় অপনোদন করিবেন।"

শুকদেব অন্তরীক্ষ পথে গমন করিতে সমর্থ হইলেও পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন। সমৃদ্ধিশালী নগর, রমণীয় উদ্যান, বিচিত্ররত্নরাজি তুচ্ছ করিয়া দেখিয়াও দেখিলেন না। ইন্দ্রিয়বিজয়ী শুকদেব মিথিলা রাজ্যের সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্য্য জনপদের সহিত দর্শন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে সেই প্রশান্তচিত্ত আত্মারাম মোক্ষচিন্তাপরায়ণ ব্যাসপুত্র মিথিলার রাজ-ধানীতে উপনীত হইলেন। রাজধানীর দ্বারদেশে দ্বারপাল কর্ত্তৃক বিদিত হইয়া রাজপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক ক্রমে রাজনিকেতনে উপস্থিত হইলেন। রাজপ্রাসাদ প্রবেশোন্মুখ শুকদেবকে দ্বারপালগণ উগ্রবাক্যে তথায় প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল। আতপসন্তপ্ত, পথশ্রান্ত, ক্ষুধা ও পিপাসাক্লিষ্ট ব্যাসপুত্র নিষ্ক্রোধ হইয়া আতপতাপে দণ্ডায়মান রহিলেন। কিছুক্ষণ অতীত হইলে কৃপাবিষ্ট জনৈক দ্বারপাল তাঁহাকে রাজভবনের প্রথম প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করাইয়া দিল। ছায়াতপে সমজ্ঞান শুকদেব মোক্ষচিন্তাপরায়ণ হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে তথায় উপবিষ্ট

রহিলেন। মুহূর্ত্ত পরে রাজমন্ত্রী কৃতাঞ্জলিপুটে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে রাজভবনের দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে লইয়া গেলেন। তথায় রমণীয়জলাশয়সমন্বিত, পুষ্পিত-পাদপশোভিত সুবিস্তীর্ণ প্রমোদবনে প্রবেশ করাইয়া আসনপ্রদানার্থ রমণীগণের প্রতি আদেশপূর্ব্বক তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সেই রমণীগণ সকলেই সুচারুবেশা, প্রিয়দর্শনা, সূক্ষ্মরক্তাম্বরধারিণী, কাঞ্চনভূষণা, আলাপ-কুশলা, নৃত্যগীতনিপুণা, স্মিতপূর্ব্বভাষিণী, অপ্সরাসদৃশরূপশালিনী ও ভাবজ্ঞা। পঞ্চাশৎসংখ্যক তরুণী বারনারী শুকদেবকে পাদ্যার্ঘ প্রদানপূর্ব্বক পূজা করিয়া সুস্বাদু অন্নদান দ্বারা তাঁহার তৃপ্তি সাধন করিয়া পরে সেই রমণীয় প্রমোদবন হাস্যক্রীড়া ও গান করতঃ দর্শন করাইতে লাগিল। শুদ্ধবুদ্ধি সন্দেহশূন্য যতেন্দ্রিয় শুকদেব তাহাতে হৃষ্ট বা কুপিত হইলেন না। রাত্রি উপস্থিত হইলে সেই বার-যোষিতাগণ তাঁহাকে দেবযোগ্য রত্নভূষিত দিব্যশয্যা ও আসন প্রদান করিল। তিনি মোক্ষবিষয় চিন্তা করিতে করিতে ধ্যানমগ্ন হইলেন। ধৈর্য্য হইতে অবিচ্যুত শুকদেব এইরূপে দিনযামিনী যাপন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর নৃপতি জনক, পুরোহিত মন্ত্রী ও অন্তঃপুরবাসীজনগণপুরঃসর গুরুপুত্রের নিকট উপনীত হইয়া তাঁহাকে যথাবিহিত পূজা করিলেন। শুকদেব কহিলেন,"মহারাজ,আপনার মঙ্গল হউক; পিতা আমাকে কহিয়াছেন, 'জনক নামে বিখ্যাত বিদেহরাজ আমার যজমান; তিনি মোক্ষধর্ম্মবিষয়ে অভিজ্ঞ। যদি তোমার অন্তঃকরণে মোক্ষধর্ম্মবিষয়ে কোন সংশয় থাকে, তাঁহার নিকট গমন কর। তিনি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বিষয়ে তোমার সকল সংশয় ছেদন করিবেন।' আমি আপনার নিকট এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি—ইহলোকে ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কি এবং কি প্রকারে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়।" জনক বলিলেন "ব্রাহ্মণ উপনয়নের পর বেদপরায়ণ হইবেন, তপস্যা গুরু-শুশ্রূষা ও ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা অসূয়াশূন্য হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক গার্হস্থ্যধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক স্বদারনিরত হইয়া বাস করিবেন। পরে পুত্র পৌত্র উৎ-পাদনান্তর পূর্ব্বহুত অগ্নির অর্চ্চনা করিয়া অতিথিপ্রিয় হইয়া বনমধ্যে আশ্রমে বসতি করিবেন। পরে অরণ্যমধ্যে আত্মাকে অগ্নিস্বরূপ করিয়া সুখদুঃখ-বিরহিত এবং বিরক্তচিত্ত হইয়া সন্ন্যাসাশ্রমে অবস্থিতি করিবেন।" শুকদেব কহিলেন, "সুখদুঃখবিহীন অন্তঃকরণে যদি জ্ঞান ও বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তবে কি গার্হস্থ্যপ্রভৃতি আশ্রমত্রয়ে অবশ্যই বাস করিতে হইবে?" জনক বলিলেন "জ্ঞান ও বিজ্ঞান ব্যতিরেকে মোক্ষলাভ হয় না; গুরু উপদেশ ব্যতিরেকে জ্ঞান-

লাভ হয় না। সংসারে বহুবার জন্মপরিগ্রহপূর্ব্বক শোধিত বুদ্ধি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করিলে, প্রথম আশ্রমেই মোক্ষলাভ হইতে পারে। ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমেই যাঁহার চিত্তশুদ্ধি হয়, তাঁহার অপর আশ্রমত্রয়ে প্রয়োজন কি? রাজস ও তামস দোষ সকলকে নিয়তই পরিত্যাগ করিবে। সাত্ত্বিকপথ আশ্রয়পূর্ব্বক আপনি আপনাকে অবলোকন করিবে। সর্ব্বভূতে আত্মাকে এবং আত্মাতে সর্ব্বভূত দর্শন করতঃ জল মধ্যে হংসাদির ন্যায় নির্লিপ্ত থাকিবে। অন্য ব্যক্তি যাঁহা হইতে ভীত নহেন এবং যিনি অন্য হইতে ভীত নহেন, যাঁহার ইচ্ছা দ্বেষ নাই, তিনিই ব্রহ্মভাব লাভ করেন। যিনি কর্ম্ম বাক্য ও মনের দ্বারা জীবের প্রতি পাপ অভিপ্রায় না করেন, তিনিই ব্রহ্মভাব লাভ করেন। হে মহাত্মন্, তোমাতে এই সমুদয় ভাব অবলোকন করিতেছি। তুমি বিষয়াভিলাষ পরিত্যাগ করিয়াছ। আমার অপেক্ষা তোমার সমধিক বিজ্ঞান, উৎকৃষ্ট গতি ও পরম ঐশ্বর্য্য হইয়াছে। তোমার বিজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও বাল্যভাব, সংশয় ও অবিমোক্ষ জন্য ভয়বশতঃ সে গতি অবগত হইতে সমর্থ হও নাই। মাদৃশ ব্যক্তি কর্ত্তৃক সংশয়চ্ছেদ হইলে, তুমি বিশুদ্ধ ব্যবহার দ্বারা হৃদয়গ্রন্থি মোচনপূর্ব্বক পরমগতি প্রাপ্ত হইবে। ব্রাহ্মণ, তোমার বিজ্ঞান জন্মিয়াছে, বুদ্ধি স্থির হইয়াছে, বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করিয়াছ। কিন্তু ব্যবসায় ব্যতিরেকে সেই পরমপদ প্রাপ্ত হইবে না। সুখ দুঃখে তোমার বিশেষ নাই, বুদ্ধি বিষয়লোলুপ নহে, নৃত্যগীতাদি দর্শন শ্রবণে ঔৎসুক্য ও অনুরাগ নাই। বন্ধুগণের প্রতি অনুবন্ধ নাই। ভয়জনক বিষয়ে ভয় নাই। পাষাণ কাঞ্চনে সমদর্শী হইয়াছ। ইহলোকে ব্রাহ্মণের যাহা প্রয়োজন এবং মোক্ষস্বরূপ, তাহাতেই তুমি বিদ্যমান রহিয়াছ।" বিশুদ্ধবুদ্ধি শুকদেব জনকের এই কথা শ্রবণপূর্ব্বক আত্মনিশ্চয় করিয়া শান্ত ও মৌনাবলম্বী হইয়া হিমশৈলের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। পিতার রমণীয় আশ্রমে উপনীত হইয়া প্রীতচিত্তে জনকরাজের সহিত কথোপকথন পিতৃসমীপে নিবেদন করিলেন। সেই স্থানে অন্যান্য শিষ্যবেষ্টিত পিতা দ্বৈপায়নের নিকট বেদ, ইতিহাস ও পুরাণাদি শাস্ত্রানুশীলনে ব্যাপৃত হইয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। অনন্তর বেদব্যাস অপরাপর শিষ্য সকলকে বেদপ্রচারার্থ আজ্ঞা দিয়া আকাশগঙ্গায় অবগাহনার্থ প্রস্থান করিলেন।

ইত্যবসরে দেবর্ষি নারদ সিদ্ধচারণসেবিত হিমালয়ে উপনীত হইয়া সেই পবিত্র ব্যাসাশ্রমে গমনপূর্ব্বক শুকদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। শুকদেব দেবর্ষি নারদকে যথোপযুক্ত পূজা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহলোকে হিতকর কি"?

নারদ বলিলেন, "বিদ্যার সমান চক্ষু নাই। সত্যের তুল্য ত তপস্যা নাই। রাগের সদৃশ দুঃখ নাই, ত্যাগের তুল্য সুখ নাই। পাপকর্ম্ম হইতে সতত নিবৃত্তিই পুণ্যশীলতা। যে মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া বিষয়াসক্ত হয়, সে মুগ্ধ; যে মুগ্ধ, সে ইহলোকে ও পরলোকে দুঃখভাগী হয়। বিষয়সঙ্গ দুঃখমোচনে সমর্থ নহে, তাহা দুঃখেরই লক্ষণ। যিনি কল্যাণ কামনা করেন, তিনি সর্ব্বপ্রযত্নে কাম ও ক্রোধের নিগ্রহ করিবেন। অনৃশংসভাবই পরমধর্ম্ম, ক্ষমা পরমবল, আত্মজ্ঞান পরমজ্ঞান। সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। যাহা ভূতগণের অত্যন্ত হিতকর, তাহাই সত্য। যিনি নিজ বশীভূত ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা ইন্দ্রিয় বিষয় ভোগ করেন, যিনি সর্ব্ববিষয়ে অসঙ্গ, শান্তচিত্ত, নির্ব্বিকার, ও সমাহিত হন, দেহাদির সহিত তদাত্ম্যরহিত ভাবে বর্ত্তমান থাকেন, তিনি অচিরকাল মধ্যে পরম শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হন। এই সংসারে মৃত্যু, জরা ও দুঃখ দ্বারা জীব সতত পীড়িত হইতেছে, অহিত বিষয়ে হিতজ্ঞ, অনিশ্চিত বস্তুতে ধ্রুবজ্ঞান, অনর্থ বিষয়ে অর্থজ্ঞ হইয়াছে। কোষকার কীটের ন্যায় মানব আত্মজ তন্তু দ্বারা বেষ্টিত আপনাকে জানিতে পারে না। এই সংসার-পরিগ্রহে কি প্রয়োজন? সরোবরের পঙ্কার্ণবে নিমগ্ন বন্য গজ যেমন বিশীর্ণ হয়, তদ্বৎ স্ত্রী পুত্র কুটুম্বগণে আসক্ত জীব অবসন্ন হইয়া থাকে। বিশাল জাল দ্বারা আকৃষ্ট মৎস্য সকল স্থলে উদ্ধৃত হইলে যেরূপ দুঃখিত হয়, স্নেহ জালে সমাকৃষ্ট জীবগণ তদ্রূপ দুঃখিত বিলোকন কর। কুটুম্ব, পুত্র, পত্নী, শরীর, সঞ্চিত ধন, পরলোকে গমন করিলে কিছুই থাকিবে না। স্বকীয় সুকৃত ও দুষ্কৃত কর্ম্মমাত্র স্থায়ী হইবে। সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া অবশ হইয়া যখন তোমাকে গমন করিতে হইবে, তখন তুমি কেন অনর্থে আসক্ত হইয়া নিজ প্রয়োজন অনুষ্ঠানে বিরত রহিয়াছ। বিশ্রান্তিবিহীন, আলম্বনশূন্য, পাথেয়বর্জ্জিত অদৈশিক অন্ধকারাচ্ছন্ন দুর্গম মার্গে তুমি একাকী কি প্রকারে গমন করিবে? ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম পরিত্যাগ কর, সত্য ও অনৃত পরিহার কর, সত্যানৃত উভয় পরিহার করিয়া যদ্দ্বারা ত্যাগ করিতেছ, তাহাকেও ত্যাগ কর। সঙ্কল্পশূন্যতা হেতু ধর্ম্ম পরিহার কর এবং অলিপ্সানিবন্ধন অধর্ম্ম বর্জ্জন কর, বুদ্ধির দ্বারা সত্য ও অনৃত পরিত্যাগ কর, এবং পরমার্থ-নিশ্চয়-নিবন্ধন বুদ্ধিকে পরিত্যাগ কর। অস্থিমাংসশোণিত-চর্ম্ম ও দুর্গন্ধমূত্রপুরীষপূর্ণ জরাশোকসমাবিষ্ট রোগায়তন এই অনিত্য ভূতাবাস শরীরের মমতা ত্যাগ কর।

"বিষয় সমুদয় অতীত হইলে তাহাদের যে সমস্ত গুণ ছিল, তাহা চিন্তা

করিবে না। যে ব্যক্তি তাহাতে সমাদর করে, সে স্নেহবন্ধ হইতে বিমুক্ত হয় না। যে বিষয়ে অনুরাগ জন্মিবে, তাহাতে দোষদর্শী হইবে। দুঃখের বিষয় চিন্তা না করাই দুঃখ বিনাশের মহৌষধ ; দুঃখ চিন্তা করিলে দুঃখ দূর হয় না, বরঞ্চ অতিশয় বর্দ্ধিত হয়। প্রজ্ঞাদ্বারা মানস দুঃখ ও ঔষধদ্বারা দৈহিক দুঃখ দূর করিবে ; বিজ্ঞানের ইহাই সামর্থ্য। রূপ, যৌবন, জীবন, ধনসঞ্চয়, আরোগ্য, প্রিয়সহবাস, এই সমুদয় অনিত্য, অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি তাহাতে আকাঙ্ক্ষা করিবেন না। ইন্দ্রিয়ের বিষয় সমূহে মোহবশতঃ স্নেহ প্রকাশই মরণ তুল্য অপ্রিয়।

"যে মানব সুখ দুঃখ উভয়ই পরিত্যাগ করেন, তিনি নিরতিশয় সুখস্বরূপ ব্রহ্মভাব লাভ করিতে সমর্থ হন। পিপাসার অন্ত নাই ; তুষ্টিই পরম সুখ ; অতএব পণ্ডিতেরা ইহলোকে সন্তোষকেই পরম ধন বলিয়া বিবেচনা করেন। গমনশীল বয়স নিমেষ মাত্র অবস্থান করে না ; স্বকীয় শরীরই অনিত্য। অতএব নিত্য বিষয়ের অনুশীলন কর। মনুষ্য কামভোগে তৃপ্ত হইয়া বিষয় সঞ্চয় করিতে থাকিলে, ব্যাঘ্র যেমন মৃগাদিকে লইয়া যায়, তদ্রূপ মৃত্যু তাঁহাকে গ্রহণ পূর্ব্বক গমন করে। যাহাতে দুঃখ বিমোচন হয়, তাহার উপায় অবলোকন কর। অশোক হইয়া কার্য্যারম্ভ কর। মনুষ্য মুক্ত হইলেই দুঃখহীন হয়। যিনি আত্মাতে অনুরক্ত হইয়া নিরপেক্ষ ও নির্লোভ ভাবে আসীন রহেন এবং আত্মাকে সহায় করিয়া বিচরণ করেন, তিনিই সুখী হন।"

শুকদেব নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে তাহার অনুশীলন করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, পুত্রদারাদি প্রতিপালনে মহান্ ক্লেশ, অতএব ক্লেশ নাই, অথচ মহোন্নতি হয়, এমন নিত্য স্থান কি আছে? অনন্তর ধর্ম্মের পরম্পরজ্ঞ শুকদেব মুহূর্ত্তকাল আপনি আপনার উপায় নিশ্চয়ে প্রবৃত্ত হইয়া নিঃশ্রেয় সম্বর্দ্ধনী পরমগতি নির্ণয় করিলেন, "আমি যে প্রকারে যোনিসঙ্কুল সাগরে প্রত্যাবৃত্ত না হই, সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া কিরূপে সেই পরম ধামে গমন করিব, যে স্থানে গমন করিলে পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে না হয়। সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া আমি সেই পরমভাব আকাঙ্ক্ষা করিতেছি, যে স্থানে আমার আত্মা শান্তি লাভ করিবে এবং আমি অক্ষয় অব্যয় শাশ্বত ভাবে অবস্থান করিতে সমর্থ হইব। যোগ ব্যতিরেকে কেহ সেই চরম গতি প্রাপ্ত হইতে পারে না। অতএব যোগাবলম্বনকরতঃ এই কলেবর পরিহার পূর্ব্বক বায়ুস্বরূপে তেজোময় দিবাকর মণ্ডলে প্রবেশ করিয়া নিঃশঙ্ক চিত্তে সূর্য্যসদনে

বাস করিব। আমি সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করিব, সংশয় নাই। ঋষিগণের সহিত সুরগণ আমার যোগবল অবলম্বন করুন।”

অনন্তর শুকদেব দেবর্ষি নারদের অনুজ্ঞা লাভ করিয়া মহানুভব কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নকে অভিবাদন পূর্ব্বক আপনার অভিলষিত বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্যাসদেব শুকের সেই কথা শুনিয়া প্রীত হইয়া বলিলেন, “হে পুত্র, তুমি এক্ষণে তাবৎকাল অবস্থান কর, যাবৎ তোমাকে দেখিয়া আমার নয়নদ্বয় প্রীত হয়। শুকদেব নিরপেক্ষ নিঃস্নেহ ও মুক্তসংশয় হইয়া মোক্ষের বিষয় নিয়ত চিন্তা করিতে মনঃ সমাধান করিলেন। তিনি পিতাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিদ্ধসঙ্ঘনিসেবিত বিপুল কৈলাস শৈলের উপরিভাগে গমন করিতে লাগিলেন। শৈলশিখরে আরোহণ পূর্ব্বক নির্জ্জন তৃণবিবর্জ্জিত সমতল প্রদেশে উপবেশন করিলেন। তথায় পক্ষীসজ্ঞাত শব্দ বা উৎকটদর্শনযোগ্য বিষয় কিছুই ছিল না। তিনি তখন সর্ব্ব সঙ্গ হইতে বিনিঃসৃত আত্মাকে দর্শন করিয়া সর্ব্বসংশয়-বিমুক্ত হইলেন। মোক্ষপদ প্রাপ্তির নিমিত্ত যোগাবলম্বন করিয়া নারদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “হে তপোধন! আমি পথ নিরীক্ষণ করিলাম; আপনার স্বস্তি হউক। আপনার প্রসাদে আমি অভিলষিত স্থানে গমন করিব।” সংসারে নিরপেক্ষ বালকবৎ দিগ্‌দেশধারী ভগবান্ ব্যাসতনয় শুকদেব ইহা কহিয়া ইতস্ততঃ আকাশমার্গে বিচরণ করিতে লাগিলেন। রমণীয়-কুসুমিত-তরুকাননসমন্বিতমন্দাকিনীসলিলাবগাহিনী বিবসনা ক্রীড়ারতা উর্ব্বশী ও অন্যান্য অপ্সরীগণ নিতান্ত উৎফুল্লনয়ন ও সম্ভ্রান্তচিত্ত হইয়া সহসা তাঁহাকে আকাশ পথে গমন করিতে দেখিয়া নিরতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইল। তাহারা বলিতে লাগিল, “এ কোন্ দেবতা উৎকৃষ্টগতি অবলম্বনপূর্ব্বক নিস্পৃহ ও নিশ্চিত বিমুক্তের ন্যায় এ স্থানে আগমন করিতেছেন। কি আশ্চর্য্য! বেদাভ্যাসরত ব্রাহ্মণের কি জ্ঞানসমাধান হইয়াছে? ইনি পিতৃভক্ত দৃঢ়তপস্বী ও পিতার প্রিয়তম পুত্র। অতএব সেই অনন্যচিত্ত পিতাকর্ত্তৃক কি প্রকারে বিসর্জ্জিত হইয়াছেন।” পরম ধর্ম্মজ্ঞ শুকদেব অপ্সরীদিগের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক সকল দিক্, অন্তরীক্ষমণ্ডল, শৈলবন, মহারণ্যসহ মেদিনীতল, সরোবর ও সরিৎ সকল অবলোকন করিলেন। চতুর্দ্দিক্ হইতে দেবতারা সবহুমান কৃতাঞ্জলিপুটে দ্বৈপায়ন-তনয়কে দর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি তৎকালে সেই দেবতা সকলকে এই কথা বলিলেন যে, ‘পিতা যদি শুক বলিয়া আহ্বান করতঃ আমার অনুগমন করেন, তবে আপনারা সকলেই সমাহিত থাকিয়া তাঁহাকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিবেন।’

শুকদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া দিক্সরিৎ শৈলনিচয় চতুর্দ্দিক্ হইতে এই প্রত্যুত্তর প্রদান করিল, 'হে বিপ্রবর! আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন, আমরা তাহা স্বীকার করিলাম। মহর্ষি আপনার কথা জিজ্ঞাসা করিলে আমরা সকলেই তাঁহাকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিব।'

ব্রহ্মর্ষি শুক সত্ত্বগুণ দ্বারা লিঙ্গদেহাত্মক তম ও বাসনাময় রজোগুণ পরিত্যাগ করতঃ সত্ত্বগুণকেও পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর প্রজ্জ্বলিত বিধূম পাবকের ন্যায় নিত্য নির্গুণ লিঙ্গবর্জ্জিত পরব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। সেই মহাপুরুষের উপরম সময়ে জগতের দুর্ভাগ্যসূচক উল্কাপাত দিগ্দাহ ও ভূমিকম্প প্রভৃতি হইতে লাগিল। সহস্রাংশু প্রকাশিত হইলেন না। পাবক প্রজ্জ্বলিত রহিলেন না। হ্রদ, নদী ও সাগর সকল ক্ষুব্ধ হইল।

পুত্রস্নেহসমন্বিত ব্যাসদেব শুকদেবকে প্রক্রান্ত জানিয়া পুত্রের পশ্চাৎ অনুসরণ করতঃ উচ্চৈঃস্বরে হা পুত্র হা পুত্র বলিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। তখন সর্ব্বগত, সর্ব্বতোমুখ ও সর্ব্বাত্মা শুকদেব স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত বস্তু হইতে হা পুত্র এই শব্দ উচ্চারণ করতঃ প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। অনন্তর মন্দাকিনী তীরে যে সমুদয় অপ্সরীগণ ক্রীড়া করিতেছিল, তাহারা সেই মুনিসত্তমকে অবলোকন করিয়া অতিশয় ভীত ও লজ্জিত হইল। কেহ কেহ জলমধ্যে বিলীন রহিল, কেহ বা গুল্মলতাদির অন্তরালে লুক্কায়িত হইল, কেহ বা সত্বর হইয়া পরিধেয় বস্ত্র গ্রহণ করিল। তদ্দর্শনে মহর্ষি নিজপুত্রের মুক্ততা ও আপনার সক্ততা জানিয়া প্রীত ও লজ্জিত হইলেন। ইত্যবসরে দেবগন্ধর্ব্বপরিবৃত ভগবান শঙ্কর তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া পুত্রশোকসন্তপ্ত দ্বৈপায়নকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক বলিলেন, "তুমি পূর্ব্বে আমার নিকট আকাশাদি সদৃশ শুদ্ধসত্ত্ব বীর্য্যবান্ পুত্র প্রার্থনা করিয়াছিলে। তোমার তাদৃশ লক্ষণসম্পন্ন পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া তপস্যা দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিল এবং আমার প্রসাদে ব্রহ্মতেজোময় ও শুচী হইয়া দেবগণেরও দুষ্প্রাপ্য পরমগতি প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব তুমি তাহার নিমিত্ত কেন অনুশোচন করিতেছ? যাবৎকাল পর্য্যন্ত পর্ব্বত সকল বর্ত্তমান থাকিবে, যে পর্য্যন্ত সাগর সমুদয় বিদ্যমান থাকিবে, তাবৎকাল পুত্রের সহিত তোমার কীর্ত্তি প্রতিধ্বনিরূপে অক্ষয় হইবে। হে মহামুনে! তুমি আমার প্রসাদে ইহলোকে সর্ব্বতোভাবে অনপায়িনী স্বপুত্রের সদৃশী ছায়া দেখিতে পাইবে।" মহামুনি দ্বৈপায়ন ভগবান্ রুদ্রকর্তৃক অনুনীত হইয়া পুত্রের ছায়া দর্শন করতঃ পরমহর্ষে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

যিনি ভক্তিপরায়ণ হইয়া এই মোক্ষ ধর্ম্ম সমন্বিত পবিত্র ইতিহাস ধারণা করেন, তিনি পরম পদ লাভে সমর্থ হন।

মৃত্যু।

(শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি এ।)

কোথা যাও দ্রুতপদে পথিক প্রবীণ,
ছিন্নকন্থা, জঠর জ্বালায় তনু ক্ষীণ?
বুঝি অর্থ অন্বেষণে, চলিয়াছ ক্ষুণ্ণ মনে,
যাও,—যাও,—সম্মুখেতে গভীর গহন;
মৃত্যু অই সম্মুখে ভীষণ!

কুবেরের প্রতিনিধি কে তুমি রাজন্,
আসমুদ্র ক্ষিতিতল করিছ শাসন?
ধনবল, জনবল, মরকত হর্ম্ম্যস্থল,
পেয়ে সুখে আছ বুঝি? কর কি স্মরণ—
মৃত্যু অই সম্মুখে ভীষণ?

হুঙ্কারি চলিছ রণে কেও বীরবর,
পদভরে ধরাতল কাঁপে থর থর।
ভীম অসি প্রহরণে, বধিছ অরাতিগণে,
দিগ্বিজয়ী বলি তোমা বাখানে ভুবন;
মৃত্যু অই সম্মুখে ভীষণ!

নব-জাত শিশু তুমি প্রভাতের তারা,
অনন্ত সুখের উৎস,—মুখে হাসিভরা,
নাহি কপটতা ভান্, পুণ্যালোকে জ্যোতিষ্মান্,
নিবিবে আঁধারে ওই সুবর্ণ বরণ,—
মৃত্যু অই সম্মুখে ভীষণ!

কত আশা যুবা তুমি সম্মুখে তোমার,
বহু শ্রম বিদ্যালাভে, ফুল্ল পরিবার,
কত অর্থ কত মান, লভিতে তোমার প্রাণ,
উধাও উতলা; ভ্রমে কর কি স্মরণ—
মৃত্যু অই সম্মুখে ভীষণ?

রূপ-গৌরবিণী তুমি সুকোমল-কায়া,
কটাক্ষে জগৎ মুগ্ধ—মূর্ত্তিমতী মায়া;
ভালবিম্ব অলকায়, চন্দ্রিমা স্তিমিত প্রায়,
ভ্রূভঙ্গে বিলোল তব আব্রহ্ম ভুবন;—
মৃত্যু অই সম্মুখে ভীষণ!

স্থিরবুদ্ধি বৈজ্ঞানিক তুমি অভিমানী.
পঞ্চভূত ক্রীড়নক,—হেন অনুমানি ;
বায়ু বহ্নি ব্যোম জলে, সসাগরা ভূমণ্ডলে,
প্রকৃতি নিয়ম লঙ্ঘি গড়িছ নূতন।
মৃত্যু অই সম্মুখে ভীষণ !

মহামেধা দার্শনিক তর্কচূড়ামণি,
বাগ্মিতায়, প্রতিভায় স্তম্ভিতা ধরণী।
প্রখর গভীর দৃষ্টি, তন্ন তন্ন করি সৃষ্টি,
উদ্ভাবিলে কত তত্ত্ব জগদান্দোলন।
মৃত্যু অই সম্মুখে ভীষণ !

প্রেমিক সুকবি কেহে উধাও পরাণ,
প্রকৃতির উরে বসি তুলিছ সুতান,
সুরসিক নবরসে, প্রকৃতির ভাবাবেশে,
নানা রঙ্গ ভঙ্গে কর বিশ্ব বিলোড়ন,—
মৃত্যু অই সম্মুখে ভীষণ !

কে এ কঠোর-কর্ম্মিন্, মানি ত্যাগীশ্বর,
তুচ্ছ মুক্তি, লক্ষ জন্ম, কারুণ্য-কাতর,
দুষিতে নরের দুখ, কর্ম্মত্যাগ-পরাঙ্মুখ ?
মৃত্যুঞ্জয় তুমি ? সম্মুখেতে, হে কপট,*—
মৃত্যু অই সম্মুখে ভীষণ !

হে কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, স্থাবর, জঙ্গম,
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা—কোথায় গমন ?
ব্রহ্মা আদি দেবগণ, করিতেছ কি চিন্তন ?—
নেহার কালের আছে বিকট ব্যাদন।
মৃত্যু অই সম্মুখে ভীষণ !

কে অই বসিয়ে শুভ্র হিমাচল শিরে,
"জন্ম মৃত্যু হীন আমি"—কহে দম্ভভরে,
মুখে শান্তি সরলতা, পরিপূর্ণ অমিয়তা,
ত্যেয়াগের প্রতিমূর্ত্তি, নির্ভীক হৃদয়,
শান্তিরসে আত্মতন্ময়।

---

* অনেকে মুক্তি স্বারত না করিয়া, জন্মমৃত্যু জয় না করিয়া, মনে করেন ও বলেন, "আমরা মহাত্যাগী, আমরা জগতের মঙ্গলের জন্য লক্ষ লক্ষ জন্মগ্রহণ করিব ; আমরা মুক্তি তুচ্ছ করি।" যে মহাপুরুষ মুক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ও ইচ্ছা করিলে মুক্ত হইতে পারেন, কেবল তাঁহারই এরূপ বলা সাজে। অন্যের পক্ষে এরূপ বলা হাঁসির কথা।

আর—না!

(১)

"বাবা জীবন" অনেক পড়িয়াছেন, অনেক শুনিয়াছেন, অনেক তর্কবিতর্কও করিয়াছেন, অনেক সাধন-ভজনও করিয়াছেন; কিন্তু কিছু সিদ্ধান্ত করিতে পারিতেছেন না। ঘোর অশান্তি; কিছুতেই বিশ্বাস হয় না, কিছুই তাঁর ভাল লাগে না। কাহারও সঙ্গে কথা কন না, সর্ব্বদাই গভীর চিন্তাশীল। নিদ্রা পর্য্যন্ত যান না; এমন কি খাওয়া দাওয়া পর্য্যন্তও, নাই বলিলেই হয়। অবশ্য, তিনি যে অত্যন্ত সত্যপ্রিয়, তাহার সন্দেহ নাই। এমন তাঁর অবস্থা হইয়াছে যে, আর তিনি কোনও শোনা-কথায় বিশ্বাস করিতে, কোনও মতেই পারেন না। সত্যের জন্য জীবন যথার্থই উৎসর্গ করিয়াছেন। সত্য বিনা তাঁর জীবন যায়-যায়। বলেন—একটা গ্রন্থিও যদি কেহ খুলিয়া দেয় ত, আমার সব গ্রন্থি আপনা হইতেই খুলিয়া যায়! আহা, দেখিলে খুবই দুঃখ হইত বটে, কিন্তু কি করিব বলুন, বাবাজীবন কাহারও কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছিলেন না—এমন তাঁর অবস্থা (বা আবস্থা!) হইয়াছিল। পাঁচ জন সাধু-শাস্ত্রের কথা, শাস্ত্রের কথা, দর্শনের কথা, এমন কি—সিদ্ধগুরুর কথাতে পর্য্যন্তও তাঁর মন প্রবোধ মানছিল না। তাঁহার অশান্তির প্রধান কারণ—তিনি পুনর্জন্মে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না; দেহত্যাগের পর মন বা আত্মার অস্তিত্ব যে থাকে, তা বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। সর্ব্বদাই বলিতেন—জীবের পরকাল (পুনর্জন্ম-প্রভৃতি) যদি না থাকিল, আর ধর্ম্ম কর্ম্ম, সংসার বা সন্ন্যাসের, আবশ্যক কি? বৃথা জীবনের ভার বহন করার, বা অনিত্য দেহের সুখ দুঃখাদি ভোগ করায়, আর কোনও প্রয়োজন নাই; আত্মহত্যাই শ্রেয়ঃ।

নিষ্ফল এবং চেষ্টার অতীত বিবেচনায়, আমরা আর কেহ তাঁহাকে বড় একটা কিছু বলিতাম না। জানি—তিনি যখন যথার্থ সত্য-পিপাসু, ঈশ্বর তাঁহাকে রক্ষা করিবেনই; জ্ঞান-চক্ষু তিনি ফুটাইয়া দিবেনই। আলোক দেখাইবার তিনিই একমাত্র মালিক। বাবাজীবন, জীবন একেবারে উৎসর্গ করিয়া, নিজেই যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিতেছিলেন কিসে তাঁর বিশ্বাস হয়।

একদা তিনি শুনিলেন—কোথায় রাম-রাজার দেশ (—না, কি বলে, তাই) আছে, সেথায় নাকি বাঁদরে বড় অতিথি-সেবা করে; পথে থেকে অতিথি-

গণকে ডাকিয়া লইয়া যাইয়া, নাকি নানা প্রকার ফল মূল দ্বারা অতিথি-সৎকার করে; পথ হারাইয়া গেলে, পথ দেখাইয়া দেয়; ইত্যাদি ইত্যাদি। বাবাজীবন অমনি সেই দেশে ছুটিলেন—"যদি নিদেন এটাও সত্যি হয়, তাহা হ'লেও অনেকটা শাস্ত্রাদির কথা মান্‌তে পারি"।

সমস্ত ঘুরে ফিরে দেখলেন—সর্ব্বৈব মিথ্যে।

শুনিলেন—চন্দ্রনাথে এক "সহস্রধারা" আছে, সেখানে নাকি "বোম্‌ বোম্‌" করিলেই জল পড়ে। সেখানে অমনি ছুটিলেন। সেখানেও দেখিলেন—"তথৈবচ"। শুনিলেন কোথায় কিনি মেস্‌মেরিজ্‌ম্‌'এর দ্বারা ক্লেয়ারভয়েন্সে ভূত নামান প্রভৃতি নানাপ্রকার আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ব্যাপার করাইতে পারেন। বাবাজীবন সেখানেও ছুটিলেন। নিজেই মেসমেরাইজ্‌ড্‌ হইতে চাহিলেন। ডাক্তার বাবু অনেক চেষ্টা করিলেন, তাঁহাকে কোন মতেই করিতে পারিলেন না; শুধু তাঁকে নয়, তিন দিন ধরিয়া আর কাহাকেও ভালরূপ মেসমেরাইজড্‌ করিতে পারিলেন না।—এই ত সব ব্যাপার!

তার পর, ভৈরবী চক্র, পিশাচচক্র, প্ল্যাঞ্চেট-চক্র, প্রভৃতি নানাপ্রকার রঙ্‌-বেরঙের চক্রাচক্রে ঘুরিলেন; কিছুতেই কিছু হইল না।

অবশেষে, ঘটনাবশতঃ হঠাৎ, তারকেশ্বরে এসে উপস্থিত। সেখানে যাঁহারা "হত্যে" দিয়ে পড়ে আছেন, তাঁহাদিগকে বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। একজন ভীষণ অম্লশূলের রোগী স্বপ্ন পাইলেন—"অমুক স্থানে অমুকের বাটীতে অমুক—তোমার গত জন্মের বাপ; তুমি তাঁর নিকট বিশেষ অপরাধী; যাও, তাঁর প্রসাদ খাওগে; তিনি তোমার উপর সন্তুষ্ট হইলেই, তুমি রোগমুক্ত হইবে"। বাবাজীবন এই সমস্ত শুনিয়াই ত আর কোথায় আছেন!—অমনি তাঁর সঙ্গ লইলেন। সঙ্গে সঙ্গে যাইয়া নিজে চাক্ষুষ দেখিলেন—তাঁর প্রসাদ খাইয়া তিনি বেশ সারিয়া যাইলেন। বাবাজীবন ঠাণ্ডা হইলেন। বিশ্বাস করিলেন—হাঁ। পুনর্জ্জন্ম আছে; হাঁ। ঠাকুর-দেবতাও আছে বটে।

ব'লব কি মশাই! দু'দিন যেতে না যেতে, বাবাজীবন আবার সেই রকম গম্ভীরত্ব প্রাপ্ত হ'লেন। বলেন, "ও—কিসে কি হ'ল—ভাল বোঝা গেল না। নিজের হ'ত ত বরং কিছু বুঝ্‌তে পারতুম"। (এত যে, তারকেশ্বরে তাঁর বিশ্বাস হয়েছিল, সব যেন বানের জলে ভেসে গেল!)

যাক; তার পর মাস কতক যায়, এমন সময়, বাবাজীবনের, হস্তে ও পায়ু-দেশে, দু জায়গায় দুই ভয়ানক বিস্ফোটক হয়। কোনও ঔষধেই কিছু বাগ মানিতেছে না; অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছেন। বাবাজীবন না পারেন খেতে, না পারেন শুতে, না পারেন চলিতে; দুর্দ্দশার সীমা নাই! (বাবাজীবন এ ধারে লোক বড় ভাল ছিলেন; বড়ই সাত্ত্বিক প্রকৃতি; ঠিক সাধুর মতনই

ছিলেন)। তিনি এক দিন বড় ভাব্‌তে ভাব্‌তে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ে'ছেন, এমন সময় স্বপ্ন পান—অমুক জেলার অমুক গ্রামে সিংহবাহিনীর "মাড়োর" (মন্দিরের) একটু মাটী আনিয়া দাও ত সেরে যায়। বাবাজীবন বল্লেন, উঁ তা হচ্ছে না; ঢের ঠকে'ছি, আর ঠক্‌ছি না; এখানে যদি, ঠাকুর, এনে দাও ত হ'তে পারে। ঠাকুর বল্লেন—আচ্ছা, তা'ই হবে; কাল সকাল বেলা উঠে তোর কাছেই পাবি। সকালে উঠে বাবাজীবন সত্যিই দেখেন পাশে কাগজে মোড়া একটু মাটী রহিয়াছে। কি করিবেন, যন্ত্রণার চোটে সেই মাটী, একটু একটু, দু'জায়গায় লাগাইয়া দিলেন। বিকাল বেলা দেখেন—আদ্ধেক কমিয়া গেছে। তার পরদিন প্রাতে, ফের আর একটু মাটি দিলেন। তৃতীয় দিবসে যন্ত্রণা আর কিছুই রহিল না। এইরূপ, ৫।৭ দিনে একেবারে শুকাইয়া গেল। বাবাজীবনের হৃদয়ে আবার, বিশ্বাসের সঞ্চার হইল। সিংহবাহিনীর পূজাও কিছু পাঠাইয়া দিলেন।

ফের, মাস দুই যেতে না যেতে, মশাই! আবার—যে বাবাজীবন সে'ই বাবাজীবন! যে অশান্তি, সে'ই অশান্তি!! বলেন যে, ও—চাক্ষুষ কিছু না দেখ্‌লে বিশ্বাস রীতিমত হয় না।

"কি দেখতে চাও"?—"আমি আর কিছু বিশেষ দেখতে চাই না; কেবল যদি একটা ভূত দেখতে পাই ত, পুনর্জ্জন্মের উপরে ধ্রুব বিশ্বাস হ'য়ে যায়"।—"তা ঘোরো; আরও দিন কতক ঘুরে ফিরে দেখ"।

যেখানে শোনেন বড় বড় ভৈরব, বড় বড় ব্রহ্মদৈত্য, বড় বড় ভূত-প্রেতের জায়গা, সেইখানেই, শনি-মঙ্গলবার, আমাবস্যা, প্রভৃতি যোগ দেখে, সমস্ত রাত্রি একা জেগে ব'সে থাকেন—কখন্ ভূত-প্রেত আসবে, দেখবেন। (আশ্চর্য্য মশাই! অনেকে অনেক দেখতে চায় বটে, কিন্তু আমাদের বাবাজীবনের মত দেখ্‌তে চা'বার জিনিষ আর কখন কেউ শুনেছেন কি? তাই, না হয়, দেবতাটা আসটা দেখতে চাও বাপু; তা নয়; কিনা—ভূত! বাবাঃ—যা দেখলে দাঁত-কপাটী যায়, যা দেখলে লোকে পালায়, যা দেখতে লোকে ঘৃণা করে!)।

যাক; এইরূপ, তিন চার মাস ভীষণ ভীষণ স্থানে "হত্যে" দিয়ে বেড়াবার পর, একদিন বাসায় এসে বাবাজীবন একা এক ঘরে শুইয়ে আছেন। চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছেন। এমন সময় স্বপ্ন দেখছেন:—এক প্রকাণ্ড ভাঙ্গা বাড়িতে গেছেন। অত বড় বাড়িতে জন-প্রাণিও নাই; কেবল ধুলো আর জঞ্জাল। বেলা তখন ১২টা। তিনি একা এ-ঘর সে ঘর ঘুরে ফিরে দেখছেন: কোথাও কিছুই পাচ্ছেন না। এমন সময়, এক ভাঙ্গা সিঁড়ির চাতালের নীচে, বুঝলেন, একটা যেন অন্ধকার ঘর আছে। কোনও রকম ক'রে সেই ঘরটায় যাবার পথ আবিষ্কার করিলেন। তারপর, মশাই! যেয়ে দেখেন সেখানে—ভয়ানক ব্যাপার!! ঘরের ভিতরে দেয়ালের কোলে মস্ত একটা বেদী। ঘরটা খুব বড়। বেদীর সুমুখে অনেক জায়গা ঘরের ভিতর প'ড়ে আছে। বেদীর উপর পা ঝুলাইয়া একটী স্ত্রীলোক ব'সে আছেন;

রঙ—শ্যামবর্ণ ; মানুষের মতনই ভাল চেহারা ; মাথায় কাপড় নাই ; আলুলায়িত ঘন কেশজালে পৃষ্ঠদেশ পূর্ণ ; পরিধানে এক খানি কল্কা পেড়ে সাড়ি ; মস্তক, মুখমণ্ডল, হস্তদ্বয়, ও চরণ যুগল ভিন্ন, সমুদয় অঙ্গই বস্ত্রে উত্তম আচ্ছাদিত, (মাথায় সিন্দূর, বা হস্তে গহনা প্রভৃতি ছিল কিনা—বাবাজীবন ভাল করিয়া দেখেন নাই) ; নয়নে বা ভ্রূ যুগলে অথবা ওষ্ঠ প্রদেশে কিছু মাত্রও ভয়ের কারণ ছিল না—মূর্ত্তির সর্ব্বত্রই ("অতিসুন্দর" না হউক) সুন্দর বলিতে হইবে বৈ কি। পাঠক মহাশয়, মূর্ত্তিতে ত কিছুমাত্র ভয়ানক দেখিলেন না, কিন্তু (বলিতে গা শিহরিয়া উঠিতেছে) কীর্ত্তিতে—অতীব ভয়ানক ! নৃসিংহ মূর্ত্তির ন্যায় উরুদেশে একটী মানুষকে শোয়াইয়া দুই হাত দিয়া তাহাকে খাইতেছিলেন। মানুষটী ঈষৎ জীবন্ত, কিন্তু মন্ত্রমুগ্ধপ্রায় ; নড়িবার ক্ষমতা নাই। খাইতেছিলেনও যে কিছুমাত্র ভয়ানক রকমে (নৃসিংহের মত), তা নয়। মানুষটী স্ত্রী কি পুরুষ, তা তত বাবাজীবন বুঝতে পারেন নাই। পার্শ্বেই আর একটী, নিচু কিন্তু বৃহৎ ঘর ; সেই ঘরের ভিতর একটু উঁকি মেরে দেখেন যে, কেবল মৃতদেহ আর কঙ্কাল। মৃতদেহগুলির মধ্যে কেহ কেহ অর্দ্ধভক্ষিত। ফিরিয়াই দেখেন—বেদীর উপর "মা" আর নাই। কোথায় যে মা গেলেন, কেমন করিয়া গেলেন, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

যা হ'ক, এধারে, বাবাজীবন আমার, নিতান্ত বালকের ন্যায় ডরিয়া উঠিলেন। নিজের কান্নার চোটে নিজেরই নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। জাগরিত হইয়া নিজেকে দেখিলেন—ক্ষিপ্তপ্রায়। কোন মতেই নিজের মনকে প্রবোধ দিতে পারিতেছেন না। আলো জ্বালিলেন ; হাত মুখ ধুইলেন ; মাথায়, বুকে ও পায়ে জল দিলেন ; কিছুতেই কিছু "বাগ" মানিতেছে না। পাইখানায় যাইলেন ; এ জিনিষ দেখ্, সে-জিনিষ দেখ্ ক'রে, নানাপ্রকারে মনকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিলেন, কিছুতেই শান্তি হইল না। মনে করিলেন—যাঃ, বুঝি সবই গেল ; এ'র চে'ও যে, কিছু সত্য না পেয়েছিলুম, সে ছিল ভাল ; শেষকালে ক্ষেপে গেলুম গা ! সত্য অনুসন্ধান করিতে এসে কপালে শেষকালে, এই ঘটিল !! বুকের ভিতর মাথার ভিতর যেন সর্ব্বদাই কি করতে লাগ্‌ল, অত্যন্ত যন্ত্রণা ও ভয় ভিতরে যেন অনবরত হইতে লাগ্‌ল, কিন্তু কি যন্ত্রণা বা কিসের ভয়—কিছুই বু'ঝতে পারিতেন না ; কেবলই খুব চীৎকার ক'রে উঠতে ইচ্ছা হইত। এইরূপ ক্ষিপ্ত ও ভীত অবস্থায় তাঁর তিন চারি দিন অতিবাহিত হইল। পরে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া, বাবাজীবন বেশ বুঝিলেন—ভাগ্যেস্, ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ভূত দেখা দেন নি। এই একটা শান্ত মেয়ে-ভূতের চেহারা, এক ক্ষণমাত্রসময়ের জন্য, দেখিয়াই এই, না জানি তাঁদের নিজ মূর্ত্তি দেখিলে আমার কি হইত! খুব গুরুবল, তাই রক্ষে। খুব বুঝেছি, হাড়ে হাড়ে বুঝেছি—গুরু যা ব'লে গেছেন—সব সত্যি ; শাস্ত্র যা বল্‌ছেন—সব সত্যি ; সাধুমহাত্মাগণ যা বলেন—সব সত্য ; যে যা বলে, প্রায় সমস্তই সত্য। বাবাঃ—"আর না" ! ঢের হ'য়েছে ; ঠাকুর যখন বুঝাবেন, বুঝবো। আমার ক্ষুদ্র মস্তিকে "আর না !"

যাহাকে অত্যন্ত ঘৃণিত কুসংস্কার বলি, আবার যাহা সর্ব্বোচ্চ দর্শন, সকলগুলিরই এই এক সাধারণ ভিত্তি যে, তাহারা সকলেই ঐ এক প্রকার সঙ্কট হইতে নিস্তারের পথ দেখাইয়া দেয়, এবং এই সকল ধর্ম্মের অধিকাংশগুলিতেই জগতের বহিঃস্থ কোন পুরুষের, যিনি নিজে প্রকৃতির নিয়মদ্বারা বদ্ধ নন, এক কথায় যিনি স্বয়ং মুক্ত, তাঁহার সাহায্যে এই মুক্তিলাভ করিতে হয়। এই মুক্ত পুরুষের স্বরূপ-সম্বন্ধে নানা গোলযোগ ও মতভেদ সত্ত্বেও, তিনি ব্রহ্ম, সগুণ বা নির্গুণ, মানুষের ন্যায় তিনি জ্ঞানসম্পন্ন কি না, তিনি পুরুষ স্ত্রী বা ক্লীব, এইরূপ অনন্ত বিচার সত্ত্বেও, বিভিন্ন মতের অতি প্রবল বিরোধসত্ত্বেও, আমরা উহাদের সকলগুলির মধ্যেই একত্বের সুবর্ণ সূত্র গিয়াছে দেখিতে পাই ; সুতরাং ঐ সকল বিভিন্নতা বা বিরোধ আমাদের ভীতি উৎপাদন করে না। আর এই বেদান্ত দর্শনে এই স্বর্ণ সূত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, আমাদের দর্শনসমক্ষে একটু একটু করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, আর ইহার প্রথম সোপান এই যে, আমরা সকলেই বিভিন্ন পথ দ্বারা এই এক মুক্তির দিকে অগ্রসর হইতেছি ; সকল ধর্ম্মের এই সাধারণ ভাব।

আমাদের সুখদুঃখ, বিপদ্, কষ্ট সকল অবস্থার মধ্যেই আমরা এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতে পাই যে, আমরা ধীরে ধীরে সকলেই সেই মুক্তির দিকে অগ্রসর হইতেছি। প্রশ্ন হইল, এই জগৎ বাস্তবিক কি ? কোথা হইতে ইহার উৎপত্তি, কোথায়ই বা ইহা যায় ? আর ইহার উত্তর প্রদত্ত হইল, মুক্তিতে ইহার উৎপত্তি, মুক্তিতে বিশ্রাম, এবং অবশেষে মুক্তিতে ইহার লয়। এই যে মুক্তির ভাব, আমরা যে বাস্তবিক মুক্ত, এই আশ্চর্য্য ভাব ছাড়িয়া আমরা এক মুহূর্ত্ত চলিতে পারি না, এই ভাব ব্যতীত তোমার সকল কার্য্য, এমন কি, তোমার জীবন পর্য্যন্ত বৃথা। প্রতি মুহূর্ত্তে প্রকৃতি আমাদিগকে দাস বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছেন, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গেই এই অপর ভাবও আমাদের মনে উদয় হইতেছে যে, তথাপি আমি মুক্ত। প্রতি মুহূর্ত্তে যেন আমরা মায়া দ্বারা আহত হইয়া বদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছি, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই, সেই আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই, আমরা বদ্ধ এই ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই আর এক ভাব আসিতেছে যে, আমরা মুক্ত। ভিতরে কিছু যেন আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে যে, আমরা মুক্ত। কিন্তু এই মুক্তিকে প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতে, আমাদের মুক্ত স্বভাবকে প্রকাশ করিতে যে সকল বাধা উপস্থিত হয়, তাহাও একরূপ অনতিক্রমণীয়। তথাপি ভিতরে, আমাদের অন্তরের অন্তস্তলে উহা যেন

সর্ব্বদা বলিতেছে, আমি মুক্ত, আমি মুক্ত। আর যদি তুমি জগতের বিভিন্ন ধর্ম্ম সকল আলোচনা করিয়া দেখ, তবে তুমি বুঝিবে, তাহাদের সকল গুলিতেই কোন না কোনরূপে এই ভাব প্রকাশিত হইয়াছে। শুধু ধর্ম্ম নয়—ধর্ম্ম শব্দটীকে আপনারা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করিবেন না, সমাজের সমুদয় জীবনটী কেবল এই এক মুক্ত ভাবের অভিব্যক্তিমাত্র। সকল সামাজিক গতিই সেই এক মুক্তভাবের অভিব্যক্তিমাত্র। যেন সকলেই, জানুক বা না জানুক, সেই স্বর শুনিয়াছে—যে স্বর বলিতেছে, "পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত সকলে আমার নিকট আইস।" একরূপ ভাষায় বা একরূপ ভঙ্গীতে উহা প্রকাশিত না হইতে পারে, কিন্তু মুক্তির জন্য আহ্বানকারী সেই বাণী কোন না কোনরূপে আমাদের সহিত বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমরা এখানে যে জন্মিয়াছি, তাহাও ঐ বাণীর কারণে, আমাদের প্রত্যেক গতিই উহার জন্য। আমরা জানি বা না জানি, আমরা সকলেই মুক্তির দিকে চলিয়াছি, আমরা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সেই বাণীর অনুসরণ করিতেছি। যেমন সেই মোহন বংশীবাদক বংশীধ্বনি দ্বারা গ্রামের বালকগণকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, আমরাও তেমনি না জানিয়াই সেই মোহন বংশীর অনুসরণ করিতেছি।

আমরা নীতিপরায়ণ কেন ? না, আমাদিগকে অবশ্যই সেই বাণীর অনুসরণ করিতে হয়। কেবল জীবাত্মা নহেন, কিন্তু সেই নিম্নতম জড়পরমাণু হইতে উচ্চতম মানব পর্য্যন্ত সকলেই সেই স্বর শুনিয়াছেন, আর ঐ স্বরে গা ঢালিয়া দিবার জন্য চলিয়াছেন। আর এই চেষ্টায় পরস্পরে মিশ্রিত হইতেছে, এ উহাকে ঠেলিয়া দিতেছে—প্রতিদ্বন্দ্বিতা, আনন্দ, চেষ্টা, সুখ, জীবন মৃত্যু সব আসিতেছে; আর এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঐ বাণীতে উপস্থিত হইবার জন্য উন্মত্ত চেষ্টার ফল বই আর কিছুই নয়। আমরা ইহাই করিয়া চলিয়াছি। ইহাই ব্যক্ত প্রকৃতি।

এই বাণী শুনিতে পাইলে কি হয় ? তখন আমাদের সম্মুখস্থ দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। যখনই তুমি ঐ স্বর জানিতে পার, বুঝিতে পার উহা কি, তখন তোমার সম্মুখস্থ সমুদয় দৃশ্যই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এই জগৎ, যাহা পূর্ব্বে মায়ার বীভৎস যুদ্ধক্ষেত্র ছিল, তাহা আর কিছুতে, অপেক্ষাকৃত সৌন্দর্য্যপূর্ণ সুন্দরতর কিছুতে পরিণত হইয়া যায়। প্রকৃতিকে অভিসম্পাত করিবার তখন আর আমাদের কিছু প্রয়োজন থাকে না, জগৎ অতি বীভৎস অথবা এ সমুদয়ই বৃথা, ইহা বলিবারও আমাদের প্রয়োজন থাকে না, আমাদের কাঁদিবার অথবা বিলাপ করিবারও কোন প্রয়োজন থাকে না। যখনই তুমি

ঐ স্বর জানিতে পার, তখনই তুমি বুঝিতে পার, এই সকল চেষ্টা, এই সকল যুদ্ধ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এই গোলমাল, এই নিষ্ঠুরতা এই সকল ক্ষুদ্র সুখাদির প্রয়োজন কি। তখন বুঝিতে পারা যায় যে, উহারা প্রকৃতির স্বভাববশতই ঘটিয়া থাকে—আমরা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সেই স্বরের দিকে অগ্রসর হইতেছি বলিয়াই এই গুলি ঘটিয়া থাকে। অতএব সমুদয় মানবজীবন, সমুদয় প্রকৃতি কেবল সেই মুক্তভাব অভিব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে মাত্র, সূর্য্যও সেই দিকে চলিয়াছে, পৃথিবীও তজ্জন্য সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে, চন্দ্রও তাই পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সেই স্থানে উপস্থিত হইবার জন্য সকল গ্রহ ভ্রমণ করিতেছে এবং পবনও বহিতেছে। সেই মুক্তির জন্য বজ্র তীব্র নিনাদ করিতেছে, মৃত্যুও তাহারই জন্য চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সকলেই সেই দিকে যাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। সাধুও সেই দিকে চলিয়াছেন, তিনি না গিয়া থাকিতে পারেন না, তাঁহার পক্ষে উহা কিছু প্রশংসার কথা নহে। পাপীও তদ্রূপ। খুব দানশীল ব্যক্তি সেই স্বর লক্ষ্য করিয়া সরলভাবে চলিয়াছেন, তিনি না গিয়া থাকিতে পারেন না; আবার ভয়ানক কৃপণ ব্যক্তিও সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছেন। যিনি মহা সৎকর্ম্মশীল, তিনিও সেই বাণী শুনিয়াছেন, তিনি সেই সৎকর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারেন না। আবার ভয়ানক অলস ব্যক্তিও তদ্রূপ। এক জনের অপর ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক পদস্খলন হইতে পারে, আর যে ব্যক্তির খুব বেশী পদস্খলন হয়, তাহাকে আমরা দুর্ব্বল বলি, আর যাঁহার পদস্খলন অল্প হয়, তাঁহাকে আমরা সৎ বলি। ভাল মন্দ এই দুইটী দুইটী বিভিন্ন বস্তু নহে, উহারা একই জিনিষ; উহাদের মধ্যে ভেদ প্রকারগত নহে, পরিমাণ গত।

এক্ষণে দেখুন,যদি এই মুক্তভাবরূপ শক্তি বাস্তবিক সমুদয় জগতে কার্য্য করিতে থাকে, তবে আমাদের বিশেষ আলোচ্য বিষয় ধর্ম্মে প্রয়োগ করিলে দেখিতে পাই, সমুদয় ধর্ম্মই ঐ একভাব দ্বারাই নিয়মিত হইয়াছে। খুব নিম্নতম ধর্ম্মগুলির কথা ধরুন; সেই সকল ধর্ম্মে হয়ত কোন মৃত পূর্ব্বপুরুষ অথবা ভয়ানক নিষ্ঠুর দেবগণ উপাসিত হন; এই দেবতা বা মৃত পূর্ব্বপুরুষের মোটামুটি ভাবটা কি? ভাবটা এই যে, ইহাঁরা প্রকৃতি হইতে উন্নত, এই মায়া দ্বারা বদ্ধ নন। অবশ্য তাহাদের প্রকৃতির ধারণা খুব সামান্য। তাহারা কেবল আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ শক্তি দ্বয়ের সহিত পরিচিত। উপাসক—একজন অজ্ঞ ব্যক্তি, খুব স্থূল ধারণা, তিনি গৃহের দেওয়াল অতিক্রম করিয়া যাইতে পারেন না,

অথবা শূন্যে উড়িতে পারেন না, সুতরাং তাঁহার সমস্ত ক্ষমতার ধারণা। এই টুকু যে, এই সকল বাধা অতিক্রম করা বা না করা, সুতরাং তিনি যে দেবগণের উপাসনা করেন, তাঁহারা দেয়াল ভেদ করিয়া অথবা আকাশের মধ্যে দিয়া চলিয়া যাইতে পারেন, অথবা নিজরূপ পরিবর্তন করিতে পারেন। দার্শনিক ভাবে ইহার অর্থ কি? অর্থ এই যে, এখানেও সেই মুক্তির ভাব রহিয়াছে, তাঁহার দেবতার ধারণা পরিজ্ঞাত প্রকৃতির ধারণা হইতে উন্নত। আবার যাঁহারা তদপেক্ষা উন্নত দেবতার উপাসক, তাঁহাদের সম্বন্ধেও সেই একই মুক্তির অপরবিধ ধারণা। যেমন প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা উন্নত হইতে থাকে, তেমনি প্রকৃতির প্রভু আত্মার ধারণাও উন্নত হইতে থাকে; অবশেষে আমরা একেশ্বরবাদে উপনীত হই। এই মায়া—এই প্রকৃতি রহিয়াছেন, আর এই মায়ার প্রভু একজন রহিয়াছেন—ইহাই আমাদের আশার স্থল।

যেখানে প্রথম এই একেশ্বরবাদসূচক ভাবের আরম্ভ, সেইখানে বেদান্তেরও আরম্ভ। বেদান্ত ইহা হইতেও গভীরতর তত্ত্বানুসন্ধান করিতে চান। বেদান্ত বলেন, এই মায়াপ্রপঞ্চের পশ্চাতে যে এক আত্মা রহিয়াছেন, যিনি মায়ার প্রভু, অথচ যিনি মায়ার অধীন নন, তিনি যে আমাদিগকে তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন এবং আমরাও যে সকলে তাঁহারই দিকে ক্রমাগত চলিতেছি, এই ধারণা সত্য বটে, কিন্তু এখনও যেন ধারণা স্পষ্ট হয় নাই, এখনও যেন এই দর্শন অস্পষ্ট ও অস্ফুট—যদিও উহা স্পষ্টতর যুক্তির বিরোধী নহে। যেমন আপনাদের স্তবগীতিতে আছে, 'আমার ঈশ্বর তোমার অতি নিকটে', বেদান্তীর পক্ষেও এই স্তুতি খাটিবে, তিনি কেবল একটী শব্দ পরিবর্তন করিয়া বলিবেন, 'আমার ঈশ্বর আমার অতি নিকটে।' আমাদের চরম পথ যে আমাদের অনেক দূরে, প্রকৃতির অতীত প্রদেশে, আমরা যে তাহার নিকট ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছি, এই তফাত তফাত ভাবকে ক্রমশঃ আমাদের নিকটবর্তী করিতে হইবে, অবশ্য আদর্শের পবিত্রতা ও উচ্চতা বজায় রাখিয়া ইহা করিতে হইবে। যেন ঐ আদর্শ ক্রমশঃ আমাদের নিকট হইতে নিকটতর হইতে থাকে—অবশেষে সেই স্বর্গস্থ ঈশ্বর যেন প্রকৃতিস্থ ঈশ্বররূপে উপলব্ধ হন, শেষে যেন প্রকৃতিতে এবং সেই ঈশ্বরে কোন প্রভেদ থাকে না, তিনিই যেন এই দেহমন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে, অবশেষে এই দেহমন্দির রূপেই পরিজ্ঞাত হন, তাঁহাকেই যেন শেষে জীবাত্মা ও মানুষ বলিয়া পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। এই খানেই বেদান্তের শেষ কথা। যাঁহাকে ঋষিগণ

বিভিন্ন স্থানে অন্বেষণ করিতেছিলেন, তাঁহাকে এতক্ষণে জানা গেল। বেদান্ত বলেন, তুমি যে বাণী শুনিয়াছিলে, তাহা সত্য, তবে তুমি উহা শুনিয়া ঠিক পথে পরিচালিত হও নাই। যে মুক্তির মহা আদর্শ তুমি অনুভব করিয়াছিলে, তাহা সত্য বটে, কিন্তু তুমি উহা বাহিরে অন্বেষণ করিতে গিয়া ভুল করিয়াছ। ঐ ভাবকে তোমার খুব নিকটে নিকটে লইয়া আইস, যত দিন না তুমি জানিতে পার যে, ঐ মুক্তি, ঐ স্বাধীনতা তোমারই ভিতরে, উহা তোমার আত্মার অন্তরাত্মাস্বরূপ। এই মুক্তি বরাবরই তোমার স্বরূপই ছিল, এবং মায়া তোমাকে কখনই আক্রমণ করে নাই। এই প্রকৃতি কখনই তোমার উপর শক্তি বিস্তার করিতে সমর্থ ছিল না। বালককে ভয় দেখাইলে যেরূপ হয়, সেইরূপ তুমিও স্বপ্ন দেখিতেছিলে যে, প্রকৃতি তোমাকে নাচাইতেছেন, আর উহা হইতে মুক্ত হওয়াই তোমার লক্ষ্য। শুধু ইহা বুদ্ধিপূর্ব্বক জানা নহে, প্রত্যক্ষ করা, অপরোক্ষ করা—আমরা এই জগৎকে যতদূর স্পষ্টভাবে দেখিতেছি, তদপেক্ষা স্পষ্ট ভাবে উহা উপলব্ধি করা। তখনই আমরা মুক্ত হইব, তখনই সকল গোলমাল চুকিয়া যাইবে, তখনই হৃদয়ের চঞ্চলতা সকল স্থির হইয়া যাইবে, তখনই সমুদয় বক্রতা সরল হইয়া যাইবে, তখনই এই বহুত্বভ্রান্তি চলিয়া যাইবে, তখনই এই প্রকৃতি, এই মায়া, এখনকার মত ভয়ানক, অবসাদকর স্বপ্ন না হইয়া অতি সুন্দররূপে প্রতিভাত হইবে, আর এই জগৎ এখন যেমন কারাগার প্রতীয়মান হইতেছে, তাহা না হইয়া ক্রীড়াক্ষেত্র স্বরূপ প্রতিভাত হইবে, তখন বিপদ্ বিশৃঙ্খলা, এমন কি, আমরা যে সকল যন্ত্রণা ভোগ করি, তাহারাও ব্রহ্মভাবে পরিণত হইবে—তাহারা তখন তাহাদের প্রকৃত স্বরূপে প্রতিভাত হইবে—সকল বস্তুর পশ্চাতে, সকল বস্তুর সারসত্তা স্বরূপ তিনিই দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন দেখা যাইবে, আর বুঝিতে পারা যাইবে যে, তিনিই আমার প্রকৃত অন্তরাত্মাস্বরূপ।

ব্রহ্ম ও জগৎ।

অদ্বৈত বেদান্তের এই বিষয়টী ধারণা করা অতি কঠিন যে, অনন্ত ব্রহ্ম যিনি, তিনি সসীম হইলেন কিরূপে। এই প্রশ্ন মানুষ চিরকালই জিজ্ঞাসা করিবে, কিন্তু সারাজীবন এই প্রশ্নের অনুধ্যান করিয়াও মানুষের অন্তর হইতে এই প্রশ্ন বিদূরিত হইবে না—অনন্ত অসীম যিনি, তিনি সসীম হইলেন কিরূপে?

আমি এক্ষণে এই প্রশ্নটী লইয়া আলোচনা করিব। ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য আমি নিম্নলিখিত চিত্রের সাহায্য গ্রহণ করিব।

এই চিত্রে (ক) ব্রহ্ম, (খ) জগৎ। ব্রহ্ম জগৎ হইয়াছেন। এখানে

(ক) ব্রহ্ম
(গ) দেশ কাল নিমিত্ত
(খ) জগৎ

জগৎ অর্থে শুধু জড়জগৎ নহে, সূক্ষ্ম জগৎ আধ্যাত্মিক জগতও তাহার সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে হইবে—স্বর্গ, নরক, এক কথায়, যাহা কিছু আছে, জগৎ অর্থে তৎসমুদয় বুঝিতে হইবে। মন এক প্রকার পরিণামের নাম, শরীর আর এক প্রকার পরিণামের নাম—ইত্যাদি, ইত্যাদি; এই সব লইয়া জগৎ। এই ব্রহ্ম (ক) জগৎ (খ) হইয়াছেন—দেশকালনিমিত্তের (গ) মধ্য দিয়া আসিয়া, অদ্বৈতবাদের এই মূল কথা। দেশকালনিমিত্তরূপ আদর্শের মধ্য দিয়া ব্রহ্মকে আমরা দেখিতেছি, আর নীচের দিক হইতে দেখিলে এই ব্রহ্ম জগদ্রূপে দৃষ্ট হন। ইহা হইতে বেশ বোধ হইতেছে, যেখানে ব্রহ্ম, সেখানে দেশকালনিমিত্ত নাই। কাল তথায় থাকিতে পারে না, কারণ, তথায় মনও নাই, চিন্তাও নাই। দেশ তথায় থাকিতে পারে না, কারণ তথায় কোন পরিণাম নাই। গতি এবং নিমিত্ত বা কার্য্যকারণভাবও তথায় থাকিতে পারে না, যথায় একমাত্র সত্তা বিরাজমান। এইটী বুঝা এবং বিশেষরূপ ধারণা করা আমাদের আবশ্যক যে, যাহাকে আমরা কার্য্যকারণভাব বলি, তাহা ব্রহ্ম প্রপঞ্চরূপে অবনতভাবাপন্ন হইবার পর (যদি আমরা এইরূপ ভাষা প্রয়োগ করিতে পারি) আরম্ভ হয়। তাহার পূর্ব্বে নহে; আর আমাদের ইচ্ছা বাসনা প্রভৃতি যাহা কিছু, সব তারপর হইতে আরম্ভ হয়। আমার বরাবর এই ধারণা যে, শোপেনহাওয়ার (Schopenhauer) বেদান্ত বুঝিতে এই জায়গায় ভ্রমে পড়িয়াছেন—তিনি এই 'ইচ্ছা'কেই সর্ব্বস্ব করিয়াছেন। তিনি ব্রহ্মের স্থানে এই 'ইচ্ছা'কে বসাইতে চান। কিন্তু পূর্ণব্রহ্মকে কখন 'ইচ্ছা' বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে না, কারণ, ইচ্ছা জগৎপ্রপঞ্চের অন্তর্গত ও পরিণামশীল, কিন্তু ব্রহ্মে ('গ' এর অর্থাৎ দেশকালনিমিত্তের উপরে) কোনরূপ গতি নাই, কোনরূপ পরিণাম নাই। ঐ (গ) এর নিম্নেই গতি—বাহ্য বা আন্তর সর্ব্বপ্রকার গতির আরম্ভ; এই আন্তরিক গতিকেই চিন্তা বলে। অতএব, (গ) এর উপরে কোনরূপ ইচ্ছা থাকিতে পারে না, সুতরাং 'ইচ্ছা' জগতের কারণ

হইতে পারে না। আরো নিকটে আসিয়া পর্য্যবেক্ষণ কর; আমাদের শরীরের সকল গতি ইচ্ছাপ্রযুক্ত নহে। আমি এই চেয়ারখানি নাড়িলাম। ইচ্ছা অবশ্য উহা নাড়াইবার কারণ, ঐ ইচ্ছাই পৈশিক শক্তিরূপে পরিণত হইয়াছে। এ কথা ঠিক বটে। কিন্তু যে শক্তি চেয়ারখানি নাড়াইবার কারণ, তাহাই আবার হৃদয় ফুস্ফুসকেও সঞ্চালিত করিতেছে, কিন্তু 'ইচ্ছা' রূপে নহে। এই দুই শক্তিই এক ধরিয়া লইলেও যখন উহা জ্ঞানের ভূমিতে আরোহণ করে, তখনই উহাকে 'ইচ্ছা'বলা যায়,কিন্তু ঐ ভূমি আরোহণ করিবার পূর্ব্বে উহাকে ইচ্ছা বলিলে উহাকে ভুল নাম দেওয়া হইল, বলিতে হইবে। ইহাতেই শোপেনহাওয়ারের দর্শনে বিশেষ গোলযোগ হইয়াছে। বরং এখানে 'প্রজ্ঞা ও সম্বিৎ' শব্দদ্বয় ব্যবহার করিলে ভাল হয়। এই শব্দ দুইটী মনের সর্ব্বপ্রকার অবস্থার সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইতে পারে। প্রজ্ঞা ও সম্বিৎ ঠিক জ্ঞানের অবস্থা বা জ্ঞানের পূর্ব্বাবস্থা নহে, বরং উহারা এক প্রকার পরিণামমাত্র বলা যাইতে পারে। যাহা হউক, আমরা কোন বিষয়ের কারণ কেন জিজ্ঞাসা করি, তাহা এইবার বুঝা যাইবে। একটী প্রস্তর পড়িল, আমরা অমনি প্রশ্ন করিলাম, উহার পতনের কারণ কি? এই প্রশ্নের ন্যায্যতা বা সম্ভবনীয়তা এই অনুমান বা ধারণার উপর নির্ভর করিতেছে যে, যাহা কিছু ঘটে তাহারই পূর্ব্বে—প্রত্যেক গতিরই পূর্ব্বে আর কিছু ঘটিয়াছে। এই বিষয়টী সম্বন্ধে আপনাদিগকে খুব স্পষ্ট ধারণা করিতে অনুরোধ করিতেছি, কারণ, যখনই আমরা জিজ্ঞাসা করি, এই ঘটনা কেন ঘটিল, তখনই আমরা মানিয়া লইতেছি যে, সব জিনিষরই, সব ঘটনারই, একটী 'কেন' থাকিবে, অর্থাৎ উহা ঘটিবার পূর্ব্বে আর কিছু উহার পূর্ব্ববর্ত্তী থাকিবে। এই পূর্ব্ববর্ত্তিতা ও পরিবর্ত্তিতাকেই 'নিমিত্ত বা 'কার্য্যকারণভাব' বলে, আর যাহা কিছু আমরা দেখি, শুনি, অনুভব করি, সংক্ষেপে জগতের সমুদয়ই, একবার কারণ, আবার কার্য্য হইতেছে। একটী জিনিষ তাহার পরবর্ত্তীর কারণ হইতেছে, কিন্তু আবার উহাই তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কিছুর কার্য্য। ইহাকেই কার্য্যকারণের নিয়ম বলে, ইহাই আমাদের স্থির বিশ্বাস। আমাদের বিশ্বাস, জগতের প্রত্যেক পরমাণুই অপর সমুদয় বস্তুর সহিত, তাহা যাহাই হউক না কেন, তাহার সহিত সম্বন্ধ আছে। আমাদের এই ধারণা কিরূপে আসিল, এই লইয়া ভয়ানক বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। ইউরোপে অনেক অন্তর্দ্দর্শী (Intuitive) দার্শনিক আছেন, তাঁহাদের বিশ্বাস, ইহা মানবজাতির স্বভাবগত ধারণা, আবার

অনেকের ধারণা, ইহা ভূয়োদর্শনলব্ধ, কিন্তু এই প্রশ্নের এখনও মীমাংসা হয় নাই। বেদান্ত ইহার কি মীমাংসা করেন, আমরা পরে দেখিব। অতএব আমাদের প্রথম ইহা বুঝা উচিত যে, 'কেন' এই প্রশ্নটী এই ধারণার উপর নির্ভর করিতেছে যে, উহার পূর্ব্ববর্ত্তী কিছু আছে, এবং উহার পরে আরো কিছু ঘটিবে। এই প্রশ্নে আর এক বিশ্বাস অন্তর্নিহিত রহিয়াছে যে, জগতের কোন পদার্থই স্বতন্ত্র নহে, সকল পদার্থেরই উপর উহার বহিঃস্থ অপর কোন পদার্থ কার্য্য করিতে পারে। জগতের সকল বস্তুই এইরূপ পরস্পর সাপেক্ষ—একটী অপরটীর অধীন—কেহই স্বতন্ত্র নহে। যখন আমরা বলি, 'ব্রহ্মের উপর কোন্ শক্তি কার্য্য করিল?' তখন আমরা এই ভুল করিতেছি—ব্রহ্মকে জগতের সামিল কোন বস্তুর ন্যায় বোধ করিতেছি। এই প্রশ্ন করিতে গেলেই আমাদিগকে অনুমান করিতে হইবে যে, সেই ব্রহ্মও অপর কিছুর অধীন—সেই নিরপেক্ষ ব্রহ্মসত্তাও অপর কিছুর দ্বারা বদ্ধ। অর্থাৎ 'ব্রহ্ম' বা 'নিরপেক্ষ সত্তা' শব্দটীকে আমরা জগতের ন্যায় মনে করিতেছি। পূর্ব্বোক্ত রেখার উপরে ত আর দেশকালনিমিত্ত নাই, কারণ উহা একমেবাদ্বিতীয়ং, মনের অতীত। যাহা কেবল নিজের অস্তিত্বে নিজে প্রকাশিত, যাহা একমাত্র একমেবাদ্বিতীয়ং, তাহার কোন কারণ থাকিতে পারে না। যাহা মুক্তস্বভাব—স্বতন্ত্র, তাহার কোন কারণ থাকিতে পারে না, কারণ, তাহা হইলে তিনি মুক্ত হইলেন না, বদ্ধ হইয়া গেলেন। যাহার ভিতর আপেক্ষিকতা আছে, তাহা কখন মুক্তস্বভাব হইতে পারে না। অতএব তোমরা দেখিতেছ, অনন্ত সান্ত কেন হইল, এই প্রশ্নই ভ্রমাত্মক—উহা স্ববিরোধী। এই সব সূক্ষ্ম বিচার ছাড়িয়া দিয়া সাদাসিদে ভাবেও আমরা এ বিষয় বুঝাইতে পারি। মনে কর, আমরা বুঝিলাম, ব্রহ্ম কিরূপে জগৎ হইলেন, অনন্ত কিরূপে সান্ত হইলেন, তাহা হইলে ব্রহ্ম কি ব্রহ্মই থাকিবেন—অনন্ত কি অনন্তই থাকিবেন? তাহা হইলে ত অনন্ত সান্তই হইয়া গেলেন। মোটামুটি আমরা জ্ঞান বলিতে কি বুঝি? যে কোন বিষয় আমাদের মনের বিষয়ীভূত হয়, অর্থাৎ মনের দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়, তাহাই আমরা জানিতে পারি, আর যখন উহা আমাদের মনের বাহিরে থাকে অর্থাৎ মনের বিষয়ীভূত না হয়, তখন আমরা উহা জানিতে পারি না। এক্ষণে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, যদি সেই অনন্ত ব্রহ্ম মনের দ্বারা সীমাবদ্ধ হইলেন, তাহা হইলে তিনি আর অনন্ত রহিলেন না; তিনি সসীম হইয়া গেলেন। মনের দ্বারা যাহা কিছু সীমাবদ্ধ, সবই সসীম। অতএব, সেই 'ব্রহ্মকে জানা' এ কথা আবার

তত্তর্হি দীর্ঘগ্রহণং কর্ত্তব্যম্। ন কর্ত্তব্যম্। উপরিষ্টাদ্যোগবিভাগঃ করিষ্যতে। অকঃ সবর্ণে একোভবতি। ততো দীর্ঘঃ। দীর্ঘশ্চ সভবতি। যঃ একঃ পূর্ব্বোপরয়োরিত্যেবং নির্দ্দিষ্ট ইতি।

বঙ্গানুবাদ।—একটী মাত্র বর্ণ আদেশে, দীর্ঘ গ্রহণ কর্ত্তব্য। *। যদি তকারান্তরহিত এওঙ্‌ ঐঔচ্‌ সূত্র করা যায়, তবে, "কোনও বর্ণস্থলে একটী মাত্র বর্ণ আদেশ করিতে হইলে, সেটী দার্ঘ বর্ণ হয়, এইরূপ আদেশ করিতে হইবে"। আদ্‌গুণঃ ৬।১।৮৭। (অবর্ণের পরে অচ্‌ প্রত্যাহার স্থিতবর্ণ অর্থাৎ স্বরবর্ণ থাকিলে, উভয়ে মিলিয়া গুণরূপ একটী আদেশ হয়। যেমনঃ—উপেন্দ্র) বৃদ্ধি রেচি ৬।১।৮৮ (অবর্ণের পরে এচ্‌ প্রত্যাহারস্থিত বর্ণ অর্থাৎ এ ঐ ও ঔ থাকিলে, উভয়বর্ণ মিলিয়া বৃদ্ধি রূপ এক আদেশ হয়। যেমনঃ—গঙ্গৌঘঃ) এই সূত্রদ্বয়ে উভয়ে মিলিয়া যে এক বর্ণ আদেশ করা হইয়াছে, সে স্থানে দীর্ঘরূপ একাদেশ করা অবশ্যই কর্ত্তব্য হইবে।

কি প্রয়োজনে দীর্ঘ গ্রহণ করিতে হইবে?

অন্তরতমতা (১) প্রযুক্ত তিন মাত্রা বা চারি মাত্রা মিলিত বর্ণের স্থানে, যেন তিন মাত্রা চারি মাত্রা বিশিষ্ট কোনও বর্ণ আদেশ না হয়, এই জন্যই উভয় বর্ণ মিলিয়া একাদেশ বিধান করিতে হইলে, সেই একাদেশ দীর্ঘরূপ একাদেশই হইয়া থাকে, এইরূপ বলিতে হইবে; নতুবা খট্বা শব্দের আকারে দুই মাত্রা থাকাতে এবং ইন্দ্রশব্দের ইকারে একমাত্রা থাকাতে, যেখানে আকার এবং ইকার মিলিয়া একার আদেশ হওয়াতে, খট্বেন্দ্র আদেশ হইয়াছে; সেই একারে তিনি মাত্রাবিশিষ্ট একার শ্রবণ হইবে। এইরূপ খট্বা উদকম্‌ খট্বোদকম্। খট্বা ঈশা এই উভয় শব্দের আকার এবং ঈকার প্রত্যেকেই দুই মাত্রা বিশিষ্ট হওয়াতে, উভয়ে মিলিয়া চারি মাত্রাবিশিষ্ট খট্বেশা, এইরূপ একারবিশিষ্ট শব্দ শ্রবণ হইবে। এবং খট্বা শব্দের দুই মাত্রা বিশিষ্ট আকারের সহিত, ঊঢ়া শব্দের দুই মাত্রা বিশিষ্ট ঊকার মিলিত হইয়া চারি মাত্রা বিশিষ্ট খটোঢ়া শব্দ হইবে। খটা শব্দের দুই মাত্রা বিশিষ্ট আকারের সহিত, এলকা শব্দের দুই মাত্রা বিশিষ্ট একার মিলিত হইয়া, চারি মাত্রা বিশিষ্ট ঐকার যুক্ত খটৈলকা' এইরূপ শব্দ হইবে। এইরূপ খট্বা শব্দের দুই মাত্রা বিশিষ্ট আকারের সহিত, যথাক্রমে দুই মাত্রা বিশিষ্ট ওদন শব্দ মিলিত হইয়া, চারি মাত্রা বিশিষ্ট খট্বৌদন, ঐতিকায়ন শব্দের দুই মাত্রা বিশিষ্ট ঐকার মিলিত হইয়া, চারি মাত্রা সম্পন্ন ঐকার বিশিষ্ট খট্বৈতিকায়ন, ঔপগব শব্দের দুই মাত্রা বিশিষ্ট

উকার মিলিত হইয়া, চারি মাত্রা সম্পন্ন ঔকার বিশিষ্ট, খট্বৌপগব পদ সম্পন্ন হইবে। এই সকল স্থলে, আকারের সহিত ই, উ, এ, ঐ, ও, ঔ প্রভৃতি বর্ণ মিলিত হইয়া এ, ঐ, ও, ঔ প্রভৃতি একাদেশ হওয়াতে, সেই আদিষ্ট একারাদি বর্ণ চারি মাত্রা বিশিষ্ট হয় বলিয়া, চারি মাত্রা বিশিষ্ট বর্ণ শাস্ত্রে ব্যবহার না থাকাতে, "এক আদেশ করিতে হইলে, দুই মাত্রা বিশিষ্ট বর্ণই হইয়া থাকে", এইরূপ বলা কর্ত্তব্য।

যদি এইরূপই করিতে হয়, তাহা হইলে পাণিনি-কর্ত্তৃক প্রণীত সূত্রে অথবা কাত্যায়ন কৃত বার্ত্তিকে, দীর্ঘ' শব্দ বিধান করা কর্ত্তব্য ?

তাহা কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু ইহা, উপরোক্ত সূত্রে যোগ বিভাগ করিলেই প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে। যেমন, "অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ" ৬।১।১০১। এই সূত্রকে দুই ভাগ করিয়া এক ভাগে 'অকঃ সবর্ণে', অপর ভাগে 'দীর্ঘ', এইরূপ করিতে হইবে। তাহা হইলে, এইরূপ অর্থ হইবে যে, 'অকঃ সবর্ণে' অর্থাৎ অক্ প্রত্যাহার বিশিষ্ট বর্ণের (অ, ই, উ, ঋ, ৯র) পরে, সবর্ণ (১) অচ্ প্রত্যাহারা-ন্তর্গত বর্ণ থাকিলে কোনও একটী মাত্র আদেশ হয়। অপরাংশে দীর্ঘ এই শব্দ রাখিলে, ইহাই অর্থ হইবে যে, পূর্ব্ব শব্দ এবং পরশব্দের উভয় বর্ণ মিলিয়া একটী মাত্র আদেশ, যেখানেই হইবে, সেখানে সেই আদেশ দীর্ঘই হইবে।

"অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ" এই সূত্রে যোগ বিভাগ করিয়া, যখন এইরূপ অর্থই হইল যে, পূর্ব্ব ও পরের স্থানে একটী মাত্র বর্ণ আদেশ হইলে, সেই আদিষ্ট বর্ণটী দীর্ঘই হইবে, তখন খট্বা শব্দের আকারের সহিত ইন্দ্র শব্দের ইকার, যখন আকার এবং ইকার মিলিত হইয়া, একার রূপ এক আদেশই হইয়াছে, তখন সেই একার কখনও দীর্ঘ অর্থাৎ দুই মাত্রা বিশিষ্ট না হইয়া, আকারের দুই মাত্রা ও ইকারের এক মাত্রা মিলিত হইয়াছে বলিয়া, তিন মাত্রাবিশিষ্ট একার হইতে পারিবে না। এইরূপ খট্বৈলকা, খট্বৌপগব এই সকল শব্দেও ঐকার এবং ঔকারও, কিছুতেই দুই মাত্রাবিশিষ্ট দীর্ঘ না হইয়া, চারি মাত্রা হইতে পারিবে না।

(১) যে সকল বর্ণের সমান সমান স্থান এবং সমান সমান প্রযত্ন তাহাদের সবর্ণ সংজ্ঞা হয়। সমান স্থান যেমন :—ককারের সহিত গ কারের বা হকারের, চকারের সহিত জকারের, অ কারের সহিত আকারের পরস্পর সমান স্থান বলিয়া ইহাদের সবর্ণ সংজ্ঞা। সমান প্রযত্ন যথা :—খকারের আভ্যন্তর স্পৃষ্ট প্রযত্ন (এবং বাহ্য মহাপ্রাণ। এজন্য ইহারা পরস্পর সবর্ণ।

ভাষ্যমূল।—ইহাপি তর্হি প্রাপ্নোতি। পশুং বিদ্ধং পচন্তীতি। নৈষ দোষঃ। ইহ তাবৎপশুমিতি অমোক ইতীয়তা সিদ্ধং সৌগমেবং সিদ্ধে সতি যৎ পর্ব্বগ্রহণং করোতি তস্যৈতৎপ্রয়োজনং যথাজাতীয়কঃ পূর্বস্তথাজাতীয়ক উভয়োর্যথাস্যাদিতি।

বঙ্গানুবাদ।—যদি পূর্ব্বপদের স্থানে একটী মাত্র আদেশ হইলে, সেই আদেশটী দীর্ঘই হয়; তবে পশূং, বিদ্ধং, পচন্তি, এই সকল স্থলেও পূর্ব্বপদের স্থানে এক আদেশ হওয়াতে, সেই আদেশটী 'দীর্ঘ' হইবে। যেমন পশূং (১) ইত্যাদি। এখানে পশু শব্দের দ্বিতীয়ার এক বচনে পশূম্ এইরূপ হওয়া অসংগত।

এই স্থলে দোষ হইতে পারে না। কেননা পশু শব্দের স্থলে 'অমি' এইরূপ সূত্র করিলেই, পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রান্তর হইতে, 'পূর্ব' এই শব্দের অনুবৃত্তি আসিয়া, এইরূপ অর্থ হইবে যে, 'অম্' বিভক্তি পরে থাকিলে, পূর্ব্বরূপ এক আদেশ হয়; সুতরাং এইরূপেই যখন 'পশুম্' এই পদ সিদ্ধ হয়, তখন যে 'অমি পূর্ব্বঃ' এই সূত্রে পুনরায় 'পূর্ব্ব' গ্রহণ করা হইয়াছে, তাঁহার ইহাই উদ্দেশ্য যে, পূর্ব্ববর্ত্তী শব্দ হ্রস্ব বা দীর্ঘ যেই জাতীয়ই হউক না কেন, উভয় শব্দ মিলিয়া সেই জাতীয়ই পূর্ব্বরূপ এক আদেশ হইবে। এই উদ্দেশ্যেই যখন 'অমি পূর্ব্ব' এই সূত্রে পূর্ব্বগ্রহণ করা হইয়াছে, তখন এই স্থলে পূর্ব্বশব্দের বিশেষ বিধান হেতু, একাদেশ কালে কেবল মাত্র দীর্ঘই আদেশ হইবে না। সুতরাং পশুম্ শব্দে উকার হইয়া যায় যে, পশূম্ এইরূপ অশুদ্ধ প্রয়োগ হইবে বলিয়া ভয় ছিল, তাহাও থাকিবে না এবং কোনও দোষও ঘটিবে না।

ভাষ্যমূল।—বিদ্ধমিতি। পূর্ব ইত্যেবানুবর্ত্ততে। অথবা আচার্য্য প্রবৃত্তিজ্ঞাপয়তি নানেন সংপ্রসারণস্য দীর্ঘত্বং শাস্তি।

বঙ্গানুবাদ।—বিদ্ধম্ এই সূত্রে পূর্ব্বশব্দের অনুবৃত্তি করিতে হইবে।

তাৎপর্য্যার্থ :—গ্রহিজ্যাবয়িব্যধিবষ্টি বিচতি বৃশ্চতি পৃচ্ছতি ভৃজ্জতীনাং ক্ঙিতি চ ৬।১।১৬। (এই সকল ধাতুর পরে ককার ইৎ এবং নকার ইৎ প্রত্যয় হইলে সংপ্রসারণ হয়), সুতরাং 'ব্যধ্' ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় করিলে,

(১) অমি পূর্ব্বঃ। ৬। ১।১১১ অক্ প্রত্যাহারস্থ বর্ণের পরে, অম্ সম্বন্ধি অচ্ অর্থাৎ স্বরবর্ণ থাকিলে, পূর্ব্বরূপ এক আদেশ হয়। যেমন:—'রাম' শব্দের দ্বিতীয়া বিভক্তিতে অম্ প্রত্যয় যোগ করিলে, রামশব্দের অকার এবং অম্ প্রত্যয়ের অকার উভয়ে মিলিত হইয়া পূর্ব্বরূপ এক আদেশ হইলে, রামম্ হইয়া থাকে।

'ব্য'এর যকারের স্থানে সংপ্রসারণ হইয়া, হ্রস্ব ইকার আদেশ হইল। অতএব বিদ্ধম্ এই পদও সিদ্ধ হইবে। কিন্তু এস্থলে ইহাও বলা কর্ত্তব্য যে, ব্যধ্ ধাতুর যকারের স্থানে সংপ্রসারণ হইয়া ইকার হইলে, সেই ইকার যাহাতে পূর্ব্ব বর্ণই হয়; এই জন্য 'পূর্ব্ব' এই শব্দের অনুবৃত্তি করিতে হইবে। নতুবা বিদ্ধঃ এই শব্দেতে হ্রস্ব ইকার হইবে না। যেহেতু উভয় বর্ণ মিলিত হইয়া একাদেশ হইলে, সেই এক আদেশ দীর্ঘই হইয়া থাকে, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

অথবা ইহাতে আচার্য্য পাণিনিরই অভিপ্রায় জানা যাইতেছে যে, এই স্থলে "সংপ্রসারণস্য" ৬। ৩। ১৩৯। (সংপ্রসারণের দীর্ঘ হয়, শেষ পদ হইলে); এই সূত্রাভিপ্রায়ানুসারে দীর্ঘ হইবে না। যদি সংপ্রসারণের সর্ব্বত্রই দীর্ঘ প্রাপ্তি হইত; তবে আর 'হলঃ' ৬। ৪। ২। (হলের পর যে সংপ্রসারণ, তাহার দীর্ঘ হয়) এই সূত্রদ্বারা দীর্ঘ বিধান করিবার প্রয়োজন ছিল না। পাণিনিও আচার্য্য 'সংপ্রসারণস্য' সূত্রের দ্বারায় সংপ্রসারণের দীর্ঘ বিধান করিয়াও পুনরায় 'হলঃ' সূত্রের দ্বারায়, হলের অর্থাৎ ব্যঞ্জনের পরবর্ত্তী সংপ্রসারণের দীর্ঘবিধান করিয়াছেন; তখন এতদ্দ্বারা ইহাই জানা যাইতেছে পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্র সর্ব্বত্র গ্রহণীয় নহে।

ভাষ্যমূল।—পচন্তীত্যতোগুণে পররূপত্বেনৈবাসিদ্ধং সোয়মেবং সিদ্ধে সতি যদ্রূপ গ্রহণং করোতি তস্যৈতৎ প্রয়োজনম্ যথা জাতীয়কং পরস্য রূপং তথা জাতীয়কমুভয়োর্যথাস্যাদিতি।

বঙ্গানুবাদ।—পচন্তি এইস্থলে, 'পচ্' ধাতুর পরে, 'ঝি' স্থানে আদেশ করিয়া 'অতোগুণে' ৬। ১। ৯৭। (পদান্ত ভিন্ন অকারের পরে গুণ বিশিষ্ট বর্ণ অর্থাৎ একার ওকারাদি থাকিলে, পর বর্ণের স্বরূপ একাদেশ হয়), এই সূত্রানুসারে পচন্তি এই পদ সিদ্ধ হইল। এই স্থলে, "গুণ পরে থাকিলে একাদেশ হয়", এই রূপ বলিলেই যখন প্রয়োগ সিদ্ধ হয়, তখন যে আবার পর রূপ একাদেশ হয়, এইরূপ বলা হইয়াছে, তাহার ইহাই প্রয়োজন যে, পরস্থিতবর্ণ যে জাতীয় রূপ বিশিষ্ট হইয়াছে, পূর্ব্বাপর উভয় বর্ণই সেই জাতীয় রূপ বিশিষ্ট যাহাতে হইতে পারে।

ভাষ্যমূল।—ইহ তর্হি খট্বর্শ্যো মালর্শ্য ইতি দীর্ঘবচনাদকারো ন। অনান্তর্য্যাদেবারোকারো ন। তত্র কো দোষঃ। বিগৃহীতস্য শ্রবণং প্রসজ্যেত। ন ব্রূমো বরং যত্র ক্রিয়মাণে দোষঃ তত্র কর্ত্তব্যমিতি কিং তর্হি। যত্র ক্রিয়মাণে ন দোষঃ তত্র কর্ত্তব্যমিতি।

বঙ্গানুবাদ।—যদি পূর্ব্বাপর স্থানে একাদেশ হইলে, তাহা দীর্ঘই হয়; তবে খট্বা+ঋশ, মালা+ঋশ্য এ স্থলে ঋকারের গুণ অর্ হইলে, খট্বা শব্দের দীর্ঘ আকারের পরে, অর্শ্য শব্দের হ্রস্ব অকার থাকাতে,পূর্ব্বাপর স্থানে 'অ'কার রূপ একাদেশ হইবে না। সুতরাং খট্বর্শ্য মালর্শ্য প্রভৃতি পদও সিদ্ধ হইবে না। যদি বল যে, অকার না হইয়া একার অথবা ওকার হইবে, তাহাও হইবে না। যেহেতু আকারের সহিত একার বা ওকারের স্থান বা প্রযত্নের কোনও রূপ আন্তর্য্যত্ব (সাম্যত্ব) নাই। খট্বা বা মালা শব্দের আকারের পরে, অর্শ্য শব্দের অকার থাকিলে কোনও রূপ সন্ধি নাই বা হইল, তাহাতে কি দোষ হইবে?

যাহা শাস্ত্রে কখনও গ্রহণ করা হয় না, তাহাই শুনা যাইবে। অর্থাৎ খট্বর্শ্য প্রভৃতি অশাস্ত্রীয় শব্দ ব্যবহৃত হইবে।

তাহা হইবে না। যে হেতু আমরা ইহা বলিতেছি না যে, যেখানে পূর্ব্বাপর স্থানে দীর্ঘরূপ একাদেশ করিলে, অসঙ্গত হইবে, সে খানেও দীর্ঘাদেশ করিতেই হইবে। তবে কি না, আমরা ইহাই মাত্র বলিতেছি যে, যেখানে পূর্ব্বাপর স্থানে দীর্ঘ গ্রহণ করিলে দোষ হইবে না, সে খানেই দীর্ঘগ্রহণ করিতে হইবে।

ভাষ্যমূল।—ক্ব চ ক্রিয়মাণে ন দোষঃ। সংজ্ঞাবিধৌ। বৃদ্ধিরাদৈজ্ দীর্ঘঃ, অদেঙ্ গুণো দীর্ঘইতি। তত্তর্হি দীর্ঘগ্রহণং কর্ত্তব্যম্। ন কর্ত্তব্যম্। কস্মাদেবান্তর্যতস্ত্রিমাত্রচতুর্মাত্রাণাং স্থানিনাং ত্রিমাত্রাচতুর্মাত্রা আদেশা ন ভবন্তি। তপরে গুণবৃদ্ধী। নন্ু চ তঃ পরো যস্মাৎ সোয়ংতপরঃ। হ্লাদোরবিতীহৈব স্যাৎ। খবঃ স্তবঃ। কস্তর্হি দকারঃ। কিং দকারে প্রয়োজনম্। অথ কিং ত কারে। যদ্যসন্দেহার্থস্তকারঃ দকারোপি। অথ মুখসুখার্থস্তকারঃ দকারোপীতি।

বঙ্গানুবাদ।—পূর্ব্বাপর স্থানে একাদেশ করিলে, কোথায় দোষ হইবে না? সংজ্ঞা বিধানে দোষ হইবে না। যেমন, 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' ১।১।১। এই সূত্রে দীর্ঘ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে আকার ঐকার এবং ঔকার এই সকল বৃদ্ধি সংজ্ঞক বর্ণ সমূহ দুই মাত্রাবিশিষ্ট দীর্ঘ বর্ণই হইবে। তিন মাত্রা অথবা চারি মাত্রা হইবে না। এইরূপ গুণসংজ্ঞা বিধানেও দীর্ঘ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যেমনঃ—'অদেঙ্গুণঃ' ১।১।২। এই সূত্রে দীর্ঘগ্রহণ করিতে হইবে। তাহা হইলে যেখানেই গুণ সংজ্ঞা প্রাপ্তি হইবে, সেখানেই পূর্ব্বাপরের স্থানে দীর্ঘরূপ একাদেশ হইবে। তাহা হইলেই একার এবং ওকারে দুই মাত্রা বিশিষ্ট দীর্ঘ বর্ণ ভিন্ন তিন মাত্রা কি চারি মাত্রা বিশিষ্ট বর্ণ হইবে না।

যদি এইরূপই হয় ; তবে বৃদ্ধিরাদৈচ্ প্রভৃতি সংজ্ঞাবিধায়ক সূত্রে দীর্ঘ শব্দ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য ? তাহা হইলেও 'দীর্ঘ' নামক এত বৃহৎ একটী শব্দ, সূত্রে প্রবেশ করাইতে হইবে বলিয়া, সূত্র বৃহৎ হওয়াতে দোষও ত হইবে ?

সংজ্ঞা বিধানে দীর্ঘশব্দ প্রয়োগের প্রয়োজন নাই। যদি দীর্ঘ শব্দ প্রয়োগই করা না হয়, তাহা হইলে কেনই বা 'খট্বা উদক' প্রভৃতি শব্দের দুই মাত্রা বিশিষ্ট আকার ও এক মাত্রা বিশিষ্ট ইকার প্রভৃতি মিলিত হইয়া, তিন মাত্রা চারি মাত্রা বিশিষ্ট বর্ণের স্থানে তিন মাত্রা চারি মাত্রা বিশিষ্ট একার ওকার প্রভৃতি আদেশ হইবে না ?

তাহা হইবে না। কেন না, 'তপরস্তৎকালস্য' (১) এই সূত্রে যে কেবল ত কার পরে আছে যাহার তাহার সমকাল বিশিষ্ট বর্ণেরই সংজ্ঞা হইবে, এরূপ নহে। বরং ত কার পরে আছে যাহার, তাহারও সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইবে। তাহা হইলেই 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' সূত্রে, দুই মাত্রা বিশিষ্ট আকারের পরে যে ত কার, তাহার পরে ঐচ্ গ্রহণ হওয়াতে, ঐকার ঔকারেরও দুই মাত্রাই হইবে। কেন না আত্ ঐচ্ এই স্থলে ত কারের পরে যখন ঐচ্ গ্রহণ হইয়াছে এবং ত কারের পূর্ব্বে যখন দুই মাত্রাবিশিষ্ট আকার রহিয়াছে, তখন ত কারের পরে ঐকার ঔকার থাকাতে, তাহাদেরও আকারের সম কাল বিশিষ্ট দুই মাত্রা সম্পন্ন বর্ণই হইবে। সুতরাং সংজ্ঞা বিধানে দীর্ঘশব্দ উল্লেখ না করিলেও স্বতঃসিদ্ধই দীর্ঘ হইবে।

যদি তকারের পরস্থিত বর্ণেরও ত কার প্রযুক্ত কার্য্যই হয়, তবে 'ঋদোরপ্' ৩।৩।৫৭। (ঋ বর্ণ অন্তে আছে এবং উবর্ণ অন্তে আছে যে ধাতুর, তাহার উত্তর অপ্ প্রত্যয় হয়) এই সূত্রেও ঋৎ, উ (২) এই স্থলে 'উ' ত কারের পরে আছে বলিয়া হ্রস্ব উকারেরই মাত্র গ্রহণ হইবে। তাহা হইলে যু ধাতু এবং স্তু ধাতু এই হ্রস্বান্ত ধাতুর উত্তর অপ্ প্রত্যয় করিয়া যদিও যবঃ স্তবঃ প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে বটে ; কিন্তু লূ ধাতু এবং পূ ধাতু, এই দীর্ঘান্ত ধাতুর উত্তর, 'অপ্' প্রত্যয় করিয়া লবঃ পবঃ পদ সিদ্ধ হইবে না।

এইরূপ প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে। যেহেতু 'ঋদোরপ্', এই সূত্রে ঋৎ উ অপ্

(১) এই সূত্রের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

(২) ঋৎ+উ ঋদু। ষষ্ঠীর দ্বি বচনে ওস্ প্রত্যয় করিয়া ঋদোঃ পদ সিদ্ধ হইয়াছে। ঋদোঃ অপ্ ঋদোরপ্।

এইরূপ ত কার বিশিষ্ট ঋকার নহে। এই স্থানে ঋদ্ উঃ অপ্ এইরূপ সন্ধি বিচ্ছেদ করিতে হইবে। সুতরাং ত কারের পরে উ কার না হওয়াতে, উকারের সমকাল বিশিষ্ট কেবল মাত্র হ্রস্ব উকারেরই গ্রহণ হইবে না। বরং উকারের সবর্ণ হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুত প্রভৃতি সকল প্রকার উকারেরই গ্রহণ হইবে। তাহা হইলেই, দীর্ঘ উকার বিশিষ্ট লূ ধাতু এবং পূ ধাতুর উত্তর অপ্ প্রত্যয় করিয়া, 'লবঃ' 'পবঃ' প্রয়োগ সিদ্ধ হইবে। এইরূপ প্রয়োগ সিদ্ধ করিবার জন্য, ইহাই বলিতে হইবে যে, 'ঋদোরপ্' সূত্রে 'ত'কার নাই।

তবে কি? 'দ'কার।

দ কারের প্রয়োজন কি?

দকারের প্রয়োজন না থাকিলে, তোমার 'ত'কার করিবারই বা প্রয়োজন কি?

যদি 'ঋদোরপ্' সূত্রে ঋকারের পরে তকার না করা যায়, তাহা হইলে ঋকারে উকারে মিলিত ষষ্ঠী বিভক্তিতে ওঃ হইলে 'রোরপ্' এইরূপ সূত্র হইবে। তখন সন্দেহ হইবে যে ঋকারের সহিত উকার মিলিত না হইয়া, র্ কারের সহিতও উকার মিলিত হইতে পারে। এই সন্দেহ নিবারণের জন্যই ঋকারের অন্তে ত কার পাঠ করা হইয়াছে।

যদি সন্দেহ নিবারণের জন্যই তকার পাঠ হইয়া থাকে, তবে আমার দ কারও সন্দেহ নিবারণের জন্যই পাঠ হইয়াছে।

যদি বল, যে তোমার মুখের সুখের জন্য, ত কার পাঠ করিয়াছ; তবে আমিও বলিব যে, আমার মুখের সুখের জন্য আমি দকার পাঠ করিয়াছি।

ভাষ্যমূল।—ইদং বিচার্য্যতে। য এতেষু বর্ণেষু বর্ণৈকদেশা বর্ণান্তর-সমানাকৃতয় এতেষামবয়বগ্রহণেন গ্রহণং স্যাদ্বা ন বেতি। কুতঃ পুনরিয়ং বিচারণা। ইহ হি সমুদায়া অপ্যুপদিশ্যন্তে অবয়বা অপি। অভ্যন্তরশ্চ সমুদায়ে অবয়বঃ। তদ্ যথা। বৃক্ষপ্রচলন্ সহাবয়বৈঃ প্রচলতি। তত্র সমুদায়-স্থস্যাবয়বস্যাবয়বগ্রহণেন গ্রহণং স্যাদ্বা ন বেতি জায়তে বিচারণা।

বঙ্গানুবাদ।—এক্ষণে এই বিচার করা যাইতেছে যে, (আ ঋ ৯ এ ঐ ও ঔ) বর্ণসকলের একদেশে যে বর্ণান্তরের তুল্য আকৃতি সমূহ আছে, তাহা বর্ণগ্রহণে গৃহীত হইবে কি না? যেমন;—ঐকার, এই বর্ণে অকার এবং ইকার মিলিত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং এক্ষণে ইহাই বিচার্য্য যে, কেবল মাত্র 'ঐ' এই বর্ণটী গ্রহণ করিলে, তাহার একাদেশ (একাংশ) অকার এবং ইকার গ্রহণ হইবে কি না? কেনই বা এইরূপ বিচার করা যাইতেছে?

এরূপ বিচারের প্রয়োজন এই যে, এই স্থলে কি (আ ঋ ঐ ইত্যাদি) বর্ণের সর্ব্বাংশই একত্রে উপদেশ করা হইয়াছে; না অবয়ব সমূহ ভিন্ন ভিন্ন উপদেশ করা হইয়াছে?

সমুদায় বর্ণেরই অভ্যন্তরে অবয়বও অবস্থান করিতেছে, যথা :—আকারে অ+অ এই দুইটী অকার। ঋ কারে এক অংশ স্বর বর্ণ, অপরাংশ র্ বং ব্যঞ্জন বর্ণ। ৯ কারে একাংশ স্বরবর্ণ, অপরাংশ 'ল্'বং ব্যঞ্জন বর্ণ। একারে অ+ই, ওকারে অ+উ, ঐকারে অ+ই, ঔকারে অ+উ প্রভৃতি প্রযত্ন ভেদে অবস্থান করিতেছে। এই সকল বর্ণে, অন্য বর্ণের তুল্য বর্ণাংশ সমূহ বর্ত্তমান থাকিলেও সেই অংশ সমূহ, যখন মূল বর্ণ সমূহেরই অবয়ব বিশেষ; তখন মূল আকারাদিরূপ বর্ণ গ্রহণ করিলে তদংশ রূপে বর্ত্তমান হ্রস্ব অকারাদিও গ্রহণ হইবে। যেমন, বৃক্ষ কম্পিত হইলে তাহার শাখা প্রশাখাদি অবয়ব সমূহের সহিতই কম্পিত হইয়া থাকে, সেইরূপ এই স্থানেও বর্ণের সমুদায় অঙ্গ স্থিত যে পৃথক্ পৃথক্ অবয়ব, তাহাদেরও বর্ণের সর্ব্বাবয়ব গ্রহণে গৃহীত হইবে কি না, অথবা গ্রহণ করা হইবে না, এই স্থলে ইহাই বিচার করা যাইতেছে।

ভাষ্যমূল।—কশ্চাত্র বিশেষঃ। বর্ণৈকদেশা বর্ণগ্রহণেন চেৎসন্ধ্যক্ষরে সমানাক্ষরাবধিপ্রতিষেধঃ*। বর্ণৈকদেশা বর্ণগ্রহণেন চেৎসন্ধ্যক্ষরে সমানাক্ষরাশ্রয়ো বিধিঃ প্রাপ্নোতি সপ্রতিষেধঃ। অগ্নে ইন্দ্র। বায়ো উদকম্। "অকঃ সবর্ণে দীর্ঘ" ইতি দীর্ঘত্বং প্রাপ্নোতি।

বঙ্গানুবাদ।—এইরূপ বিচারের দ্বারা এমন বিশেষ কি ফল লাভ হইবে?

বর্ণের একদেশও যদি বর্ণ গ্রহণেই গৃহীত হয়, তবে মিলিতাক্ষরে তুল্যাক্ষর নিমিত্ত যে বিধি, তাহার নিষেধ প্রাপ্ত হইবে। *।

বর্ণের একাংশও যদি বর্ণগ্রহণেই গ্রহণীয় হয়, তাহা হইলে (এ ও ঐ ঔ প্রভৃতি) সংযুক্তাক্ষরে, তুল্যাক্ষর নিমিত্ত যে বিধি প্রাপ্ত হওয়া উচিত, তাহার নিষেধ করা কর্ত্তব্য হইবে।

তাৎপর্য্যার্থঃ—অ কারের পরে অ কার, ইকারের পরে ইকার প্রভৃতি সমান সমান বর্ণ পরে থাকিলে উভয়ে মিলিয়া দীর্ঘ হয়, যেমনঃ—লক্ষ্মী+ঈশ= লক্ষ্মীশ, হরি+ইন্দ্র=হরীন্দ্র ইত্যাদি। এইরূপ সন্ধি অক্ষরে একার বা ওকারের পরে, ই কার বা উ কার থাকিলেও উভয়ে মিলিয়া দীর্ঘ একাদেশ হইবে। যেহেতু একারের শেষাংশে ই কার রহিয়াছে এবং ওকারের শেষাংশে উ কার রহিয়াছে। সুতরাং উভয় ই কার এবং উভয় উকার একত্র মিলিত হইয়া

১লা বৈশাখ, ১৩০৮ সাল ; ৭ম সংখ্যা।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য।

স্বামী বিবেকানন্দ।] [১৩৬ পৃষ্ঠার পর।

বর্ত্তমান কালে যতদূর বোঝা যায়, জম্বুদ্বীপের মধ্যভাগ ও আরবের মরুভূমি অসুরদের প্রধান আড্ডা। ঐ স্থান হতে একত্র হয়ে, পশুপাল, মৃগয়াজীবী, অসুরকুল, সভ্য দেবতাদের তাড়া দিয়ে, দুনিয়াময় ছড়িয়ে দিয়েছে।

ইয়ুরোপ খণ্ডের আদিম নিবাসী এক জাত অবশ্য ছিল। তারা পর্ব্বত-গহ্বরে বাস করতো; যারা ওর মধ্যে একটু বুদ্ধিমান, তারা অল্প গভীর তলাওয়ের জলে খোঁটা পুতে, মাচান বেঁধে, সেই মাচানের উপর ঘর দোর নির্ম্মাণ করে বাস করতো। চকমকি পাথরের তীর, বর্শার ফলা, চকমকির ছুরি ও পরশু দিয়ে সমস্ত কাজ চালাত।

ক্রমে জম্বুদ্বীপের নরস্রোত ইউরোপের উপর পড়তে লাগলো। কোথাও কোথাও অপেক্ষাকৃত সভ্য জাতের অভ্যুদয় হলো; রুষ-দেশান্তর্গত কোনও জাতির ভাষা, ভারতের দক্ষিণি ভাষা অনুরূপ।

কিন্তু এ সকল জাত বর্ব্বর, অতি বর্ব্বর অবস্থায় রইল। এসিয়া মিনর হতে একদল সুসভ্য মানুষ সন্নিকট দ্বীপপুঞ্জে উদয় হল, ইউরোপের সন্নিকট স্থান অধিকার করলে, নিজেদের বুদ্ধি আর প্রাচীন মিসরের সাহায্যে এক অপূর্ব্ব সভ্যতা সৃষ্টি করলে; তাদের আমরা বলি যবন, ইয়ুরোপীরা বলে গ্রীক্।

পরে ইতালিতে রোমক নামক অন্য এক বর্ব্বর জাতি, ইট্রস্কান্ নামক এক সভ্য জাতিকে পরাভূত করে, তাদের বুদ্ধি বিদ্যা সংগ্রহ করে নিজেরা সভ্য হলো। ক্রমে রোমকেরা চারিদিক্ অধিকার করলে; ইয়ুরোপ খণ্ডের দক্ষিণ পশ্চিম ভাগের যাবতীয় অসভ্য মানুষ তাদের প্রজা হলো। কেবল উত্তর-ভাগে বন জঙ্গলে বর্ব্বর জাতিরা স্বাধীন রইল। কাল বশে রোম ঐশ্বর্য্য-বিলাস-পরতায় দুর্ব্বল হতে লাগ্‌লো; সেই সময় আবার জম্বুদ্বীপ অসুরবাহিনী ইউ-রোপের উপর নিক্ষেপ করলে। অসুর তাড়নায় উত্তর-ইউরোপী বর্ব্বর রোম-সাম্রাজ্যের উপর পড়লো। রোম উৎসন্ন হয়ে গেল। জম্বুদ্বীপের তাড়ায়, ইউরোপের বর্ব্বর আর ইউরোপের ধ্বংসাবশিষ্ট রোমক, গ্রীক মিলে এক অভিনব জাতির সৃষ্টি হলো; এ সময় য়াহুদীজাতি রোমের দ্বারা বিজিত ও বিতাড়িত হয়ে, ইয়ুরোপময় ছড়িয়ে পড়লো, সঙ্গে সঙ্গে তাদের নূতন ধর্ম্ম ক্রিশ্চানীও ছড়িয়ে পড়লো। এই সব বিভিন্ন জাত, মত, পথ, নানাপ্রকারের

অসুর কুল, মহামারীর মুচিতে, দিবারাত্র যুদ্ধ, মারকাটের আগুনে, গলে মিশতে লাগ্‌লো ; তা হতেই এই ইয়ুরোপী জাতের সৃষ্টি।

হিঁদুর কাল রঙ থেকে, উত্তরে দুধের মত সাদা রঙ, কাল কটা লাল বা সাদা চুল, কাল চোখ, কটা চোখ্, নীল চোখ, দিব্যি হিঁদুর মত নাক মুখ চোখ্, বা থ্যাঁতা মুখ চীনে রাম, এই সকল আকৃতি বিশিষ্ট এক বর্ব্বর, অতি বর্ব্বর ইউরোপী জাতির সৃষ্টি হয়ে গেল। কিছু কাল তারা আপনা আপনি মার কাট করতে লাগ্‌লো ; উত্তরের গুলো বেঘেটে রূপে বাগে পেলেই অপেক্ষাকৃত সভ্যগুলোর উৎসাদন করতে লাগ্‌লো। মাঝখান থেকে, কৃশ্চান ধর্ম্মের দুই গুরু, ইতালীর পোপ্ (ফরাসী, ইতালী ভাষায় বলে পাপ,) আর পশ্চিমে কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলসের পাটিয়ার্ক, এরা এই জন্তু প্রায় বর্ব্বরবাহিনীর উপর, তাদের রাজা রাণী সকলের উপর কর্ত্তাত্তি চালাতে লাগ্‌লো।

এদিকে আরব মরুভূমে মুষলমানি ধর্ম্মের উদয় হলো, বন্যপশুপ্রায় আরব এক মহাপুরুষের প্রেরণাবলে অদম্য তেজে, অনাহত বলে, পৃথিবীর উপর আঘাত করলে। পশ্চিম পূর্ব্ব দু প্রান্ত হতে সে তরঙ্গ ইউরোপে প্রবেশ করলে। সে স্রোত-মুখে ভারত ও প্রাচীন গ্রীসের বিদ্যাবুদ্ধি ইয়ুরোপে প্রবেশ করতে লাগ্‌লো।

জম্বুদ্বীপের মাঝখান হতে সেল্‌যুক্ তাতার নামক অসুর জাতি মুষলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে, আসিয়া মাইনর প্রভৃতি স্থান দখল করে ফেল্লে। আরাবরা ভারতবর্ষ জয়ের অনেক চেষ্টা করেও সফল হয় নাই। মুষলমান অভ্যুদয় সমস্ত পৃথিবী বিজয় করেও ভারতবর্ষের কাছে কুণ্ঠিত হয়ে গেল। সিন্ধুদেশ একবার আক্রমণ করেছিল মাত্র, কিন্তু রাখ্‌তে পারেনি ; তার পর থেকে আর উদ্যম করে নাই।

কয়েক শতাব্দির পর যখন তুর্ক প্রভৃতি তাতার জাতি বৌদ্ধধর্ম্ম ছেড়ে মুষলমান হলো, তখন এই তুর্কিরা সমভাবে হিন্দু, পার্শী, আরাব, সকলকে দাস করে ফেল্লে। ভারতবর্ষের সমস্ত মুষলমান বিজেতার মধ্যে একদলও আরবি বা পার্শী নয়, সব তুর্কাদি তাতার। রাজপুতানায় সমস্ত আগন্তুক মুষলমানের নাম তুর্ক—তাই সত্য, ঐতিহাসিক্। রাজপুতানার চারণ যে গাইলেন, "তুরুগন্‌কো বহি জোর", তাই ঠিক্। কুতুব্ উদ্দীন হতে মোগল বাদ্‌সাই পর্য্যন্ত, ও সব তাতার ; যে জাত তিব্বতী, সেই জাত ; কেবল হয়েছেন মুষলমান, আর হিঁদু পারসী বে করে বদ্‌লেছেন, চাকামুখ। ও সেই প্রাচীন অসুর বংশ। আজও

কাবুল, পারস্য, আরব্য, কনষ্টাণ্টিনোপলে সিংহাসনে বসে রাজত্ব কর্চ্ছেন, সেই অসুর তাতার; গান্ধারি, ফারসী, আরাব সেই তুরুস্কের গোলামী কর্চ্ছেন। বিরাট্ চীন সাম্রাজ্যও সেই তাতার মাঞ্চুর পদতলে, তবে সে মাঞ্চু নিজের ধর্ম্ম ছাড়ে নি, মুষলমান হয়নি, মহালামার চেলা। এ অসুর জাত কস্মিন্ কালে বিদ্যাবুদ্ধির চর্চ্চা করে না, জানে মাত্র লড়াই। ও রক্ত না মিস্‌লে, যুদ্ধবীর্য্য বড় হয় না। উত্তর ইয়ুরোপ, বিশেষ রুষের প্রবল যুদ্ধবীর্য্য সেই তাতার। রুষ তিন হিস্সে তাতার রক্ত। দেবাসুরের লড়াই এখনও চল্‌বে অনেক কাল। দেবতা অসুর কন্যা বে করে, অসুর দেবকন্যা ছিনিয়ে নেয়,—এই রকম করে প্রবল খিচুড়ী জাতের স্থষ্টি হয়।

তাতাররা আরবি খলিফার সিংহাসন কেড়ে নিলে, কৃশ্চানদের মহাতীর্থ জিরুশালম্ প্রভৃতি স্থান দখল করে কৃশ্চান্‌দের তীর্থযাত্রা বন্ধ করে দিলে, অনেক কৃশ্চান্ মেরে ফেল্‌লে। কৃশ্চান্ ধর্ম্মের গুরুরা ক্ষেপে উঠ্‌লো; ইউরোপময় তাদের সব বর্ব্বর চেলা; রাজা প্রজাকে ক্ষেপিয়ে তুল্‌লে,—পালে পালে ইউরোপী বর্ব্বর জিরুশালম্ উদ্ধারের জন্য আসিয়া মাইনরে চল্‌লো। কতক নিজেরাই কাটাকাটি করে মলো, কতক রোগে মলো, বাকি মুষলমানে মার্‌তে লাগ্‌লো। সে ঘোর বর্ব্বর ক্ষেপে উঠেছে,—মুষলমানেরা যত মারে, তত আসে। সে বুনোর গোঁ। আপনাদের দলকেই লুঠ্‌ছে, খাবার না পেলে মুষলমান ধরেই খেয়ে ফেল্‌লে। ইংরেজ রাজা রিচার্ড মুষলমান মাংসে বিশেষ খুসি ছিলেন, প্রসিদ্ধি আছে।

বুনো মানুষ, আর সভ্য মানুষের লড়ায়ে যা হয়, তাই হল,—জিরুসালম্ প্রভৃতি অধিকার করা হলো না। কিন্তু ইউরোপ সভ্য হতে লাগলো। সে চামড়া পরা, আম মাংস খেকো বুনো, ইংরেজ, ফরাসী, জর্ম্মান্ প্রভৃতি এসিয়ার সভ্যতা শিখ্‌তে লাগ্‌লো, ইতালি প্রভৃতি স্থানের নাগা ফৌজ দার্শনিক মত শিখ্‌তে লাগ্‌লো; একদল কৃশ্চান্ নাগা (Knights templars) ঘোর অদ্বৈত বেদান্তী হয়ে উঠ্‌লো, শেষ তারা কৃশ্চানীকে ঠাট্টা কর্‌তে লাগ্‌লো; এবং তাদের ধনও অনেক সংগৃহীত হয়েছিল; তখন পোপের হুকুমে, ধর্ম্ম রক্ষার ভানে, ইউরোপী রাজারা তাদের নিপাত করে ধন লুটে নিলে।

এদিকে মুর নামক মুষলমান জাতি স্পান দেশে অতি সুসভ্য রাজ্য স্থাপন কর্‌লে, নানাবিদ্যার চর্চ্চা কর্‌লে, ইউরোপে প্রথম ইউনিভার্সিটি হলো; ইতালি, ফ্রান্স, সুদূর ইংলণ্ড হতে বিদ্যার্থী বিদ্যা শিখ্‌তে এলো; রাজা রাজড়ার ছেলেরা

যুদ্ধবিদ্যা, আচার, কায়দা, সভ্যতা শিখ্‌তে এলো। বাড়ি ঘর দোর মন্দির সব নূতন ঢঙ্গে বন্‌তে লাগ্‌লো।

কিন্তু সমগ্র ইউরোপ হয়ে দাঁড়াল এক মহা সেনা-নিবাস—সে ভাব এখনও। মুষলমানেরা একটা দেশ জয় করে, রাজা আপনার এক বড় টুক্‌রা রেখে, বাকি সেনাপতিদের বেঁটে দিতেন। তারা খাজনা দিত না, কিন্তু রাজার আবশ্যক হলেই এত গুলি সৈন্য দিতে হবে। এই রকমে সদা প্রস্তুত ফৌজের অনেক হাঙ্গামা না রেখে, আবশ্যক কালে হাজির প্রবল ফৌজ প্রস্তুত রইল। আজও রাজপুতানায় সে ভাব কতক আছে ;—ওটা মুষলমানেরা এদেশে আনে। ইয়ুরোপীরা মুষলমানের এ ভাব নিলে। কিন্তু মুসলমান্‌দের ছিল রাজা, সামন্ত-চক্র ফৌজ ও বাকি প্রজা। ইউরোপে রাজা সামন্তচক্র আর বাকি সব প্রজাকে করে ফেললে একরকম গোলাম। প্রত্যেক মানুষ কোনও সামন্তের অধিকৃত মানুষ হয়ে, তবে জীবিত রইল—হুকুম মাত্রেই প্রস্তুত হয়ে যুদ্ধ যাত্রায় হাজির হতে হবে।

ইউরোপি সভ্যতা নামক বস্ত্রের এই সব হলো উপকরণ। এর তাঁত হচ্ছে—এক নাতিশীতোষ্ণ পাহাড়ি সমুদ্রতটময় প্রদেশ ; এর তুলো হচ্ছে—সর্ব্বদা যুদ্ধপ্রিয়, বলিষ্ঠ, নানাজাতের মিশ্রণে এক মহা খিচুড়ী জাত। এর টানা হচ্ছে—যুদ্ধ। আত্মরক্ষার জন্য, ধর্ম্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ ; যে তলওয়ার চালাতে পারে, সে হয় বড় ; যে তলওয়ার না ধরতে পারে, সে স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়ে, কোনও বীরের তলওয়ারের ছায়ায় বাস করে, জীবন ধারণ করে। এর পোড়েন—বাণিজ্য। এ সভ্যতার উপায় তল্‌বার, সহায় বীরত্ব, উদ্দেশ্য ইহ পারলৌকিক ভোগ।

আমাদের কথাটা কি ? আর্য্যারা শান্তিপ্রিয়, চাস বাস করে, শস্যাদি উৎ-পন্ন করে, শান্তিতে স্ত্রী পরিবার পালন কর্ত্তে পেলেই খুসী। তাতে হাঁপ ছাড়বার অবকাশ যথেষ্ট ; কাজেই চিন্তাশীলতার, সভ্য হবার অবকাশ অধিক। আমাদের জনক রাজা স্বহস্তে লাঙ্গল চালাচ্ছেন এবং সে কালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আত্ম-বিৎও তিনি। ঋষি, মুনি, যোগীর অভ্যুদয়—গোড়া থেকে ; তাঁরা প্রথম হতেই জেনেছেন, যে সংসারটা ধোঁকা, লড়াই কর, আর লুঠই কর ; ভোগ বলে যা খুঁজছ, তা আছে শান্তিতে, শান্তি আছেন শারীরিক ভোগ বিসর্জ্জনে ; ভোগ আছে মনঃশীলতায়, বুদ্ধিচর্চ্চায়, শরীরচর্চ্চায় নাই। জঙ্গল আবাদ করা তাঁদের কাজ।

তার পর, প্রথমে সে পরিষ্কৃত ভূমিতে নির্ম্মিত হল যজ্ঞবেদী, উঠ্‌লো সে নির্ম্মল আকাশে যজ্ঞের ধূম, সে বায়ুতে বেদমন্ত্র প্রতিধ্বনিত হতে লাগ্‌লো, গবাদি পশু নিঃশঙ্কে চরতে লাগ্‌লো। বিদ্যা, ধর্ম্মের, পায়ের নীচে, তলওয়ার রইল। তার একমাত্র কাজ ধর্ম্ম রক্ষা করা, মানুষ ও গবাদি পশুর পরিত্রাণ করা, বীরের নাম আপত্ত্রাতা, ক্ষত্রিয়।

লাঙ্গল, তলওয়ার, সকলের অধিপতি রক্ষক রইলেন ধর্ম্ম। তিনি রাজার রাজা, জগৎ নিদ্রিত হলেও তিনি সদা জাগরূক। ধর্ম্মের আশ্রয়ে সকলে রইল স্বাধীন।

ঐ যে ইয়ুরোপী পণ্ডিত বল্‌ছেন যে,আর্য্যেরা কোথা হতে উড়ে এসে ভারতের বুনোদের মেরে কেটে জমী ছিনিয়ে নিয়ে বাস কর্‌লেন, ও সব আহাম্মকের কথা। আমাদের পণ্ডিতরাও দেখ্‌ছি সে গোঁয়ে গোঁ—আবার ঐ সব বিরূপ মিথ্যা ছেলে পুলেদের শিখান হচ্ছে, এ অতি অন্যায়।

আমি মূর্খ মানুষ, যা বুঝি তাই নিয়েই পারিস সভায় বিশেষ প্রতিবাদ করেছি। বিদেশী এবং স্বদেশী পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা কর্‌ছি। সময় পেলে আরও সংশয় ওঠাবার আশা আছে। এ কথা তোমাদেরও বলি—তোমরা পণ্ডিত মনিষ্যি, পুঁথি পাতড়া খুঁজে দেখ।

ইউরোপীরা যে দেশে বাগ পান, আদিম মানুষকে নাশ করে নিজেরা সুখে বাস করেন, অতএব আর্য্যরাও তাই করেছে!! ওরা হা-ঘরে, হা অন্ন হা অন্ন করে, কাকে লুঠবে মার্‌বে বলে ঘুরে বেড়ায়—আর্য্যরাও তাই করেছে!! বলি এর প্রমাণটা কোথায়—আন্দাজ? ঘরে তোমার আন্দাজ রাখগে।

কোন্ বেদে, কোন্ সূক্তে, কোথায় দেখ্‌চো যে আর্য্যরা কোন্ বিদেশ থেকে এ দেশে এসেছে? কোথায় পাচ্ছ যে তাঁরা বুনোদের মেরে কেটে ফেলেছেন? খামকা আহাম্মকির দরকারটা কি? আর রামায়ণ পড়া ত হয় নি,—খামকা এক বৃহৎ গল্প রামায়ণের উপর কেন বানাচ্ছ?

রামায়ণ কি না আর্য্যদের দক্ষিণি বুনো বিজয়!! বটে—রামচন্দ্র আর্য্য রাজা সুসভ্য, লড়ছেন কার সঙ্গে? লঙ্কার রাবণ রাজার সঙ্গে। সে রাবণ, রামায়ণ পড়ে দেখ, ছিলেন রামচন্দ্রের দেশের চেয়ে সভ্যতায় বড় বই কম নয়। লঙ্কার সভ্যতা অযোধ্যার চেয়ে বেশী ছিল বরং, কম ত নয়ই। তার পর বানরাদি দক্ষিণি লোক বিজিত হলো কোথায়? তারা হলো সব শ্রীরামচন্দ্রের বন্ধু মিত্র। কোন্ গুহকের, কোন্ বালির রাজ্য, রামচন্দ্র ছিনিয়ে নিলেন—তা বল না?

হতে পারে দু এক যায়গায় আর্য্য আর বুনোদের যুদ্ধ হয়েছে, হতে পারে দু একটা ধূর্ত্ত মুনি রাক্ষসদের জঙ্গলের মধ্যে ধুনি জ্বালিয়ে বসেছিল। মটকা মেরে চোখ বুজিয়ে বসেছে, কখন রাক্ষসে ঢিল ঢেলা হাড়্ গোড় ছোঁড়ে। যেমন হাড়গোড় ফেলা, অমনি নাকি কান্না ধরে রাজাদের কাছে গমন। রাজা লোহার জামা পরা, লোহার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘোঁড়া চড়ে এলেন ; বুনো হাড় পাথর ঠেঙ্গা নিয়ে কতকক্ষণ লড়্‌বে ? রাজারা মেরে ধরে চলে গেল। এ হতে পারে ; কিন্তু এতেও বুনোদের জঙ্গল কেড়ে নিয়েছে, কোথায় পাচ্ছ ?

অতি বিশাল নদ নদী পূর্ণ, উষ্ণপ্রধান, সমতল ক্ষেত্র—আর্য্যসভ্যতার তাঁত। আর্য্যপ্রধান, নানাপ্রকার সুসভ্য, অর্দ্ধসভ্য, অসভ্য মানুষ—এ বস্ত্রের তুলো ; এর টানা হচ্ছে—বর্ণাশ্রমাচার। এর পোড়েন—প্রাকৃতিক দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ নিবারণ।

তুমি ইউরোপী, কোন্ দেশকে কবে ভাল করেছ ? অপেক্ষাকৃত অবনত জাতিকে তোলবার তোমার শক্তি কোথায় ? যেখানে দুর্ব্বল জাতি পেয়েছ, তাদের সমূলে উৎসাদন করেছ ; তাদের জমীতে তোমরা বাস করছ, তারা একেবারে বিনষ্ট হয়ে গেছে। তোমাদের আমেরিকার ইতিহাস কি ? তোমাদের অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলণ্ড, পাসিফিক্ দ্বীপপুঞ্জ, তোমাদের আফ্রিকা ?

কোথা সে সকল বুনো জাত আজ ? একেবারে নিপাত, বন্য পশুবৎ তাদের তোমরা মেরে ফেলেছ ;—যেখানে তোমাদের শক্তি নাই, সেথা মাত্র অন্য জাত জীবিত।

আর ভারতবর্ষ তা কস্মিন্ কালেও করেন নাই। আর্য্যেরা অতি দয়াল ছিলেন, তাঁদের অখণ্ড সমুদ্রবৎ বিশাল হৃদয়ে, অমানব-প্রতিভা-সম্পন্ন মাথায়, ও সব আপাততঃ রমণীয় পাশবপ্রণালী কোনও কালেও স্থান পায় নাই। স্বদেশী আহাম্মক! যদি আর্য্যেরা বুনোদের মেরে ধরে বাস করত, তা হলে এ বর্ণাশ্রমের সৃষ্টি কি হত ?

ইউরোপের উদ্দেশ্য—সকলকে নাশ করে, আমরা বেঁচে থাক্‌বো। আর্য্যদের উদ্দেশ্য—সকলকে আমাদের সমান করবো, আমাদের চেয়ে বড় করবো। ইউরোপের সভ্যতার উপায়—তলওয়ার ; আর্য্যের উপায়—বর্ণ বিভাগ। শিক্ষা, সভ্যতার তারতম্যে, সভ্যতা শিখবার সোপান, বর্ণবিভাগ। ইউরোপে বলবানের জয়, দুর্ব্বলের মৃত্যু ; ভারতবর্ষের প্রত্যেক সামাজিক নিয়ম দুর্ব্বলকে রক্ষা করবার জন্য।

দেরাদূন।

(শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি, এ।)

হিন্দুরা বলেন, হিমালয় দেবগণের লীলাভূমি; বৈজ্ঞানিক বলেন, প্রকৃতির সুসজ্জিত রঙ্গভূমি; অধ্যাত্মবাদী বলেন, যোগীগণের যোগভূমি; এবং ভূবিদ্যা ও উদ্ভিদ্‌বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণ ইহাকে অনন্তরত্নাধার, অনন্ত ফলফুলপ্রসবী সুরম্য উদ্যান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ফলতঃ ইহাদের বিভিন্ন উক্তিগুলির কোনটীই অসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয় না। কত কত মহাকবি ইহার শোভা বর্ণনে পরাস্ত মানিয়াছেন। কুমারসম্ভবের সেই "হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ" প্রভৃতির বর্ণনা পড়িয়া আর "গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্" হইবার ইচ্ছা হয় না। তবে উদ্বোধন সম্পাদক মহাশয়ের আদেশানুসারে হিমাচলের বিস্তৃত ও সুরম্য দেরাদূন উপত্যকার বিষয় কিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করিতেছি। পাঠকবর্গের তৃপ্তি হইবে কি না বলিতে পারি না।

হিমাচলের উপত্যকাগুলির মধ্যে দেরাদূন একটী প্রধান উপত্যকা। ইহার নৈসর্গিক শোভা ও ঐতিহাসিক ইতিবৃত্ত অনেক চিন্তাশীলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এই উপত্যকার উত্তর-পশ্চিম দিকে যমুনা এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে ভাগিরথী প্রবাহিতা হইতেছেন। ইহার উত্তর-পূর্ব্ব দিকে হিমাচল (মৈশুরী), দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে শিবালীক পর্ব্বতমালা শোভা পাইতেছে। এই উপত্যকার দৈর্ঘ্য প্রায় ৪৫ ও প্রস্থ ১৫ মাইল হইবে। সমুদ্র সমতল হইতে এ স্থান ২৩২৩ ফিট উচ্চ। দেরাদূনের ৫ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে আর একটী পর্ব্বত আছে; তাহার নাম নৌয়াদা; ইহা শিবালীক পর্ব্বতেরই অংশ। চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতব্যূহ-পরিবেষ্টিত দেরাদূনকে প্রকৃতির দুর্ভেদ্য দুর্গ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পূর্ব্বে সমতল প্রদেশ হইতে দেরাদূনে আসিবার দুইটী গিরিসঙ্কট ছিল। যমুনা নদীর ৭ মাইল পূর্ব্বে টিমলীপাশ ও গঙ্গাযমুনার অন্তর্গত ভূভাগের ঠিক মধ্যস্থলে খীরি বা মোহনপাশ। অধুনা হরিদ্বার হইতে দেরা পর্য্যন্ত রেলওয়ে লাইন বসিয়াছে; সুতরাং এক্ষণে সকলে সেই পথেই এখানে যাতায়াত করে। পশ্চিম দেরাতে বেশী জঙ্গল বা জলাভূমি নাই, কিন্তু পূর্ব্ব দেরাতে অনেক জলাভূমি ও জঙ্গল আছে; এ দিকে যোগীবালা ঝিল ভিন্ন আরও ৫। ৬টী ঝিল আছে; সকলগুলিই নলবনে পরিপূর্ণ এবং ম্যালেরিয়া বিষের জন্মভূমি।

মোহনপাশের মধ্য দিয়া রাজপুর (দেরা হইতে ৭ মাইল উত্তর-পূর্ব্ব ; মৈশুরী পাহাড়ে চড়িবার রাস্তা) পর্য্যন্ত একটী পাকা রাস্তা সমতল প্রদেশ হইতে দেরার মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। দেরা হইতে ২৩ মাইল দূরস্থ যমুনা তীরবর্ত্তী রাজঘাট পর্য্যন্ত আর একটী কাঁচা রাস্তা গিয়াছে ; ইহাকে চক্রোদা রোড বলে ; কারণ যমুনার অপর পারস্থিত শৈলনিবাস চক্রোধা এই রাস্তায় যাওয়া যায়। দেরার পূর্ব্বদিকে দেরা হইতে হরিদ্বার পর্য্যন্ত আর একটী রাস্তা আছে ; ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৩১ মাইল। অধুনা ঐ রাস্তায় প্রায় লোক চলে না। রেলওয়ে হইয়া সাধারণের চলা ফিরা করিবার সুবিধা হইয়াছে। হরিদ্বার হইতে দেরা পর্য্যন্ত ৩২ মাইল রেলওয়ে বসিয়াছে।

দেরাদুনের জল হাওয়া অতিশয় স্বাস্থ্যকর। উপত্যকায় প্রবেশ করিলে বোধ হয় যেন বঙ্গদেশে প্রবেশ করিলাম। স্থানে স্থানে ধান্যক্ষেত্র, ইক্ষুক্ষেত্র ও কদলীর বাগান ইহার অপূর্ব্ব উর্ব্বরতাশক্তির পরিচয় দিতেছে। বর্ষা ভিন্ন অন্য সময় ইহার জল হাওয়া অতিশয় পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর হয়। শীতকালে সময় সময় এখানেও বরফ পড়ে। গড়পড়তা তাপের পরিমাণ ৩৭° হইতে ১০১° ডিগ্রি। এখানে শাল, তুন্ (পেয়োঁ), শিশু ও পাইনগাছ বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। নেশ্‌পাতি, ষ্ট্রবেরী, জাম, আম, চা, রিয়া ও নানাবিধ সুগন্ধি ধান্যের চাষ হয়। নিকটবর্ত্তী শিবালীক পর্ব্বতে হস্তী, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, হায়না, চিতাহারণ, চতুঃশৃঙ্গহরিণ, বন্যকুকুর ও শব্দকারী একপ্রকারের হরিণ (Barking Deer) পাওয়া যায়। দেরাদুনে ইংরেজের মিলিটারী কেণ্টনমেণ্ট হওয়া অবধি উহাদের বংশ ধ্বংসপ্রায় হইয়াছে। এখানে মহাগের মাছ পাওয়া যায় ; প্রায় রুই মাছের মত, খেতে খুব সুস্বাদু।

এ স্থান হইতে মৈশুরীর দৃশ্য অতীব মনোহর। মৈশুরীর সাদা সাদা বাড়ীগুলি মরুভূমে ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত অস্থিখণ্ডের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। অনেক সময়ে মৈশুরী পাহাড়ের নিম্নদেশ মেঘে ঢাকিয়া থাকে ; কিন্তু উপরে হিমশুভ্র সৌধাবলি যেন দেবলোকের চিত্র উপস্থিত করে। মৈশুরী সমুদ্র সমতল হইতে প্রায় ৭০০০ হাজার ফিট উচ্চ ; দেরাদুন হইতে ১২ মাইল দূরে। প্রবল বর্ষারম্ভ বিধায়ে আমি মৈশুরী উঠিতে পারি নাই ; সুতরাং তথাকার বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিতে পারিলাম না। তবে শুনিতে পাইলাম, বায়ুমণ্ডল মেঘশূন্য থাকিলে মৈশুরীর হাইলেণ্ড হইতে হিমালয়ের চির নীহারাবৃত গরিষ্ঠশেখর ও কেদারনাথ দর্শন করা যায়।

দেরাদুনে দেখিবার দুটী সুন্দর দৃশ্য আছে। একটী সহস্রধারা—ইহা রাজপুরের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। একটী গিরিপৃষ্ঠ বহিয়া যেন অজস্র বৃষ্টিপাত হইতেছে; জল কোথা হইতে আসে, সহস্রধারার নিম্নে গেলে তাহা বুঝা যায় না। উপরের কোন ঝরণা অন্তঃসলিলা হইয়া বোধ হয় সহস্র ধারায় আসিয়া বিন্দু বিন্দু বৃষ্টিরূপে পরিণত হইয়াছে। সহস্রধারার নিকটে, অনেক গাছ পাতা কিরূপে পাথরে পরিণত হয়, তাহা দেখা যায়। অনেক পর্য্যটক এখানে প্রস্তরীভূত (Petrified) গাছ পাতা সংগ্রহ করিয়া থাকেন। দেরাদুনের উত্তরপশ্চিমে প্রায় ৫ মাইল দূরে টপ্‌কেশ্বর নামক একটী গিরিগুহা আছে। সেখানে একটী শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছেন। টপ্ টপ্ শব্দে পূর্ব্বে ঐ শিবের মাথায় জল (কেহ কেহ বলেন দুগ্ধ) পড়িত বলিয়া উহার নাম টপ্‌কেশ্বর হইয়াছে—এরূপ জনশ্রুতি। কলিকাতার দানশীল জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহোদয় (যিনি দেরাতে রাজাসাহেব বলিয়া পরিচিত) বহু অর্থব্যয় করিয়া যাত্রিগণের যাতায়াতের রাস্তা বান্ধাইয়া দিয়াছেন। এ স্থানটী যোগীদিগের তপস্যার উৎকৃষ্ট স্থান বলিয়া মনে হয়।

দেরাদুনের পূর্ব্বাপর ইতিবৃত্ত বড়ই অদ্ভুত। ইহা কেদার খণ্ডের মধ্যে অবস্থিত। শিবালীক পর্ব্বত শিবালয় নামেরই অপভ্রংশ হইবে। এ স্থান ভূতভাবন ভূতনাথের আদি লীলাভূমি বলিয়া হিন্দুরা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কেহ বলেন এ স্থানেই দেবাসুর যুদ্ধ হয়; গত শতাব্দীতে সমতলনিবাসী ও পার্ব্বত্যবাসীদের মধ্যে যে সকল যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, অতি প্রাচীন সময়ে যে সেরূপ বা তদপেক্ষা ভীষণতর যুদ্ধ না হইয়াছিল, কে জানে? সে সকল যুদ্ধবিগ্রহই সুদূর দেশবাসিগণের নিকট দেবাসুর যুদ্ধ বলিয়া পরিচিত কি না বলা যায় না। দ্রোণাচার্য্য এ স্থানে তপস্যার জন্য আসিয়াছিলেন; একটী গুহা এখনও "দ্রোণাশ্রম" বলিয়া অভিহিত হয়। দেরাদুনের নাম দ্রোণাচার্য্যের নামের সহিত সংশ্লিষ্ট কিনা, বিবেচনার বিষয়। কথিত আছে পঞ্চপাণ্ডবগণ এই উপত্যকা পথেই মহাপ্রস্থানে গিয়াছিলেন। বালখিল্য মুনিগণের দ্বিতীয় ইন্দ্র সৃষ্টির সংকল্প, এই স্থানেই উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া জনশ্রুতি আছে। খর্ব্বাকৃতি গুর্খাগণ বালখিল্যমুনিগণেরই রূপান্তরিত বংশধর কিনা সুধীগণ বিবেচনা করুন।

প্রায় ৭০০।৮০০ বৎসর পূর্ব্বে দেরাদুন গরোয়াল রাজার অধীন ছিল। অল্পসংখ্যক নেগীরা আসিয়া এখানে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করে। সময়ে

সময়ে মুসলমানেরা এস্থান অধিকার করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ১০৭৯ খ্রীষ্টাব্দে স্থলতান্ ইব্রাহিম ৩ মাস অবরোধের পর দেরা দখল করেন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সাহারণপুরের গবর্ণর নাজীবুদ্দৌলা পুনরায় এ স্থান অধিকার করেন। শিক সেনাপতি ভাগল সিং ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে এ স্থান অধিকার করিয়া লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রোহিল্লাধিনায়ক গোলাম কাদের এ দেশ জয় করিয়া ভয়ানক অত্যাচার করেন। এইরূপ সাময়িক আক্রমণের অধীন হইলেও, বিজেতারা কেহই এখানে অবস্থান করেন নাই। লুঠ পাট করিয়া চলিয়া যাইতেন। অথবা কাহাকেও রাজপ্রতিনিধি পদে স্থাপন করিয়া রাখিতেন ; কিন্তু গবর্ণরেরা সর্ব্বদাই গরোয়ালের প্রাধান্য ও বশ্যতা অল্পাধিক স্বীকার করিত। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে নেপাল হইতে রণবীর সিংহের নির্ব্বাসনের পর গুর্খা সর্দ্দার ওমর সিং ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে দেরাদূন অধিকার করেন। তদবধি ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহা নেপালের অধীন ছিল। লর্ড ময়রার শাসনকালে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ইংরেজের সহিত নেপালীদের যে যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধের সন্ধিসূত্রে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে দেরাদূন ইংরেজের অধীনে আসিয়াছে।

যে যুদ্ধে দের'দূন ইংরেজদিগের হস্তগত হয়, সে যুদ্ধের বৃত্তান্ত অল্পাধিক সকলেই বিদিত আছেন। কিন্তু তাহার দুএকটী ঘটনা এখানে লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজনীয় মনে করিতেছি। গুর্খা সৈন্য ইংরেজদিগের ২টী পোলিস্ ষ্টেশন আক্রমণ করিয়া সমস্ত আফিসারদিগকে বধ করেন। লর্ড ময়রা নেপাল-দরবারে এ বিষয় জানাইলে নেপাল গবর্ণমেণ্ট তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া বরং ভর্ৎসনাসূচক উত্তর প্রদান করেন। সুতরাং যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠে। দেরাদূনের ৩॥ মাইল উত্তরপূর্ব্বে কালেঙ্গা নামক গুর্খাদের একটী জীর্ণ দুর্গ ছিল। ইংরেজ জেনারল জিলিস্পি ৩৫০০ সৈন্য লইয়া ঐ দুর্গ আক্রমণ করেন। ওমরসিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র মহাবীর বলভদ্র সিং অত্যল্পসংখ্যক (৩০০। ৪০০) সৈন্য লইয়া তথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। ইংরেজেরা ১ম বার হারিয়া দেরাদূনে আসেন ; অনেক সৈন্য ও জিলিসপি হত হন। ১ মাস পরে পুনরায় বহু সৈন্য সমাবেশ করিয়া ইংরেজেরা বলভদ্রসিংকে আক্রমণ করেন ; সেবারেও ইংরেজের বহু সৈন্য হত ও আহত হয়। বলভদ্র সিং অবশেষে দুর্গ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। যখন বলভদ্র বাহির হইলেন, তখন দেখা গেল, মাত্র ৭০ জন সৈন্য তাহার সঙ্গে আছে। এই ৭০ জন সৈন্য অগণ্য ইংরেজ সৈন্যব্যূহ ভেদ করিয়া "জস্তগড়ে" নির্ব্বিঘ্নে ফিরে গিয়াছিলেন ; মেজর লাড্লো ৪০০ সৈন্য লইয়া

তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াও কিছু করিতে পারেন নাই। তৎপর কালেঙ্গা দুর্গ ইংরেজ ভূমিসাৎ করিয়া ফেলেন। বলভদ্র সিংএর বীরত্ব কাহিনী হিমাচলের গভীর গহ্বরে এখনও প্রতিধ্বনিত হয়। কালেঙ্গার নাম এখন "নালাপানী"। বীরের মর্য্যাদাকারী সহৃদয় ইংরেজগণ কালেঙ্গা ফোর্টের সম্মুখে দুইটি মনুমেণ্ট নির্ম্মাণ করিয়াছেন। একটি জেনারেল জিলিস্‌পি ও ২য়টি বলভদ্র সিংহের। বলভদ্র সিংএর মনুমেণ্টের গায় এরূপ লিখিত আছে। "This is inscribed as a tribute of respect for our Gallant Adversary Bulbudder, commander of the Fort and his brave Goorkhas, who were afterwards while in the Service of Ranjit Singh shot down in their ranks to the last man by Afghan Artillery".

দেরাদূনের প্রধান কীর্ত্তি গুরুদ্বারের শিখ মন্দির। ইহার ইতিহাস দেরাদূনের ইতিহাসের সহিত সম্মিলিত। গুরু নানকের বংশোদ্ভব হরগোবিন্দ রায়ের পৌত্র, হররায়ের পুত্র গুরু রাম রায় ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দে দেরাদূনে আগমন করেন। দারা শেকোকে হর রায় সাহায্য করায়, তিনি স্বীয় পুত্র গুরু রাম রায়কে আরাঞ্জীবের নিকটে প্রতিভূস্বরূপে রাখিতে বাধ্য হন। এই গুরু রাম রায়ের জন্ম সম্বন্ধে সন্দেহ থাকায়, হরগোবিন্দের ২য় পুত্র তেগ বাহাদুর শিখদিগের ৯ম গুরু হন। এই গুরু রাম রায়কেই তেগ বাহাদুরের প্রাণদণ্ডের কারণ বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। তেগ বাহাদুরের মৃত্যুর পর অমিততেজা গুরু গোবিন্দের প্রতিপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় হতাশ হইয়া গুরু রাম রায় আরাঞ্জীবের সাহায্যে গরোয়ালের অধিপতি ফতেসাহার নিকট আগমন করত দেরাদূনে বাস ও মন্দির তুলিবার আদেশ পান। ফতেসাহা ঐ মন্দিরের ও গুরু রাম রায়ের সঙ্গতদিগের ভরণ পোষণার্থ অনেকগুলি গ্রাম দেন। এক্ষণে গুরুদ্বারের মহান্ত মহারাজের বিস্তর আয়; বড় জমীদার বলিয়া পরিচিত। উক্ত গুরুরামরায়ের সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত গল্প প্রচলিত আছে। তিনি নাকি ইচ্ছায় মরিতে ও বাঁচিতে পারিতেন। তিন দিন ব্যাপী সমাধির পর তাহার দেহপাত হয়; মৃত্যুকালে স্ত্রী সম্মুখে ছিলেন। গুরুরামের গদি ও বিছানা এখনও মন্দির মধ্যে সযত্নে রক্ষিত আছে। চেলাদিগের মধ্য হইতে একজন করিয়া মহান্ত নির্দ্দিষ্ট হয়। গুরুদ্বারে একটি মনোহর পুষ্করিণী আছে। তাহাতে হাজার হাজার লাল মাছ খেলিয়া বেড়ায়। প্রতি বৎসরের ১লা চৈত্র গুরুদ্বারে সঙ্গত (মেলা) হয়। ১০ দিন পর্য্যন্ত থাকে। সে সময় পঞ্জাব হইতে বিস্তর সাধুর সমাগম হয়। ৬ই চৈত্র এক প্রকাণ্ড নিশান

উঠান হয়। এবং বহু সাধু সন্ন্যাসীকে ভাণ্ডারা দেওয়া হয়। দেরাদুনে এইটি দেখিবার স্থান বটে।

দেরাদুন উত্তরপশ্চিম প্রদেশের লেফ্‌টনেণ্ট গবর্ণরের অধীন। এস্থান হইতে পঞ্জাবের সীমাদেশ নিকটবর্ত্তী। গবর্ণমেণ্টের স্কুল ভিন্ন আমেরিকা মিশনের একটী স্কুল বালিকাবিদ্যালয় ও অনাথাশ্রম আছে। অধিবাসী মাত্রই হিন্দু ও শৈব। মুসলমান্ প্রায় নাই; ৩।৪টি মস্‌জিদ্ মাত্র আছে। ব্রাহ্মরা এখানে দু একবার ধর্ম্মপ্রচারে আসিয়াছিলেন; কিন্তু বিশেষ ফল হয় নাই। ইহা হিন্দু ধর্ম্ম প্রচারের স্থল বটে। গুরুদ্বারের উদাসীগণ নানকপন্থী।

দেরাদুনের মিলিটারী কেণ্টনমেণ্ট হিমাচলের উত্তর পশ্চিম রক্ষার অন্যতর প্রধান সেনানিবাস। ইহাতে সমস্তই গুর্‌খা সৈন্য। একটী সৈন্যকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, তারা ৭্ হইতে ১৫্ মাহিয়ানা পর্য্যন্ত পাইয়া থাকে। বন্দুক ও সঙ্গিন ভিন্ন সকলের সঙ্গেই কাত্রী (a kind of dagger) থাকে। ইহারা বড়ই কষ্ট সহিষ্ণু; পার্ব্বত্য যুদ্ধে অসীমশক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে। এস্থানে কূপ হয় না; মিঃ সোর্ ১১০০০্ হাজার টাকা খরচ করিয়া কাছারীর নিকট ২২৫ ফিট্ গভীর একটি কূপ খনন করাইয়া ছিলেন। হিমালয়ের উপরের ঝরণার জল কেনাল করিয়া দেরাদুনে আনা হইয়াছে। তদ্দ্বারা সকলের স্নানাহার নির্ব্বাহিত হয়।

কাবুলের ভূতপূর্ব্ব আমীর ইয়াকুব্ খাঁ এখানেই ইংরাজের নজরবন্দী হইয়া কাল কাটাইতেছেন। ইংরেজেরা ইঁহাকে উৎকৃষ্ট বাড়ী বাগান দিয়াছেন। একদিন বেড়াইবার কালে আমি সেই তেজঃপুঞ্জমূর্ত্তি আমারকে দেখিয়াছিলাম। বড়লাট্ সাহেবের 'বডিগার্ড' এখানেই থাকে।

উদ্বোধন সম্পাদক মহাশয়ের আদেশ মত পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত দেরাদুনের ইতিহাস কথঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করিলাম। জি, আর, সি, উইলিয়মের ইতিহাসে দেরাদুনের বিস্তৃত ইতিবৃত্ত লিখিত আছে। ইতি—

মস্তিষ্ক ও শিক্ষা।

(স্বামী শুদ্ধানন্দ)

আমেরিকায় আজকাল সকল বিষয়েরই উন্নতি দেখা যাইতেছে। এক্ষণে আমেরিকার অন্তর্গত কলম্বিয়া ডিষ্ট্রীক্টে মানুষের মস্তিষ্কের ক্রমবিকাশ ও শিক্ষার

সহিত উহার সম্বন্ধ লইয়া আলোচনা হইতেছে। ডাক্তার জনষ্টোন সাহেব ছেলেদের মস্তিষ্কের উন্নতি সম্বন্ধে বিশেষ পরীক্ষা করিয়া কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তিনি বলেন, আট বৎসর বয়সে মস্তিষ্ক উহার পূর্ণ ওজন প্রাপ্ত হয়। জন্মের সময় মস্তিষ্কের ওজন থাকে—আন্দাজ আধ সের। প্রথম বর্ষে খুব দ্রুতগতিতে বাড়িতে থাকে—এক বছরের শেষে ওজনে প্রায় ৫ পোয়া হয়। চারি বৎসরে ওজন হয় প্রায় দেড় সের। ঐ সময় হইতেই উহার বাড় খুব অল্প হয়। আট বৎসরে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া বার বছরের পর আর বাড়ে না। ২৪ বৎসরের পর আবার ধীরে ধীরে ওজনে কমিতে থাকে।

ডাক্তার জনষ্টোন বলেন, মনের উন্নতির সঙ্গে মস্তিষ্কের উন্নতির বিশেষ সম্বন্ধ থাকার দরুন, আট বৎসর বয়সের কমে লেখা পড়া আরম্ভ করা ঠিক নহে। আর পড়া শুনা প্রথম আরম্ভের সময় বেশী পীড়াপীড়ি করা ভাল নয়। ছেলে 'এঁচড়ে পাকা' হইলে খারাপই হয়, ভাল হয় না।

বেটা ছেলের মস্তিষ্ক জন্মের সময় মেয়ের মস্তিষ্কের চেয়ে বেশী ভারী হয়। আর পূর্ণ বয়স্ক লোকের অপেক্ষা বালকের মস্তিষ্কে জল বেশী থাকে। জন্মের সময় ছেলের মস্তিষ্কে শতকরা ৮৯ ভাগ জল থাকে, আর পূর্ণবয়স্ক লোকের ৭১ ভাগ জল থাকে। মস্তিষ্কের মধ্যস্থ cell গুলি ক্রমশঃ ৪৫০ গুণ, কোন কোনটা আবার ১০০০০ গুণ বাড়িয়া যায়; আবার cell গুলি যে, শুধু পরিমাণে বাড়ে, তাহা নয়, তাহাদের সংখ্যাও বাড়িতে থাকে।

ডাক্তার জনষ্টোন এখনও ঠিক করিয়া বলিতে পারেন নাই বটে যে, কয় ঘণ্টা ছেলেদের পড়া দেওয়া উচিত, প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাহাদের উন্নতির অথবা অবনতির সাধক; কিন্তু ইহা নিশ্চয় হইয়াছে যে, সচরাচর যেরূপ স্কুলে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে ছেলেদের যতটা মস্তিষ্ক চালনা আবশ্যক, তাহার অধিক হইয়া থাকে।

অনুসন্ধান দ্বারা বিশেষরূপে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, অনেক ছাত্রেরই এইরূপ অনিয়মিত শিক্ষা করিতে গিয়া শরীরটা একেবারে মাটি হইয়াছে। ডাক্তার জনষ্টোন বলেন, চক্ষু ও স্নায়ুরোগই স্কুলের ছেলেদের বিশেষ ব্যারাম। আর অনিদ্রা, বুক ধড় ফড় করা এবং অন্যান্য স্নায়বীয় রোগও স্কুল হইতে উৎপন্ন হয়। যত পড়িবার ঘণ্টা বাড়ান হয়, আর ছেলেরা যত ক্লাসে উঠে, ততই এই সব বেশী আরম্ভ হয়। সুইডেনে এই সম্বন্ধে একবার অনুসন্ধান হয়।

তাহাতে স্থির হয় যে, নীচু ক্লাসে শতকরা ছয় জন চোখে কম দেখে, আর উঁচু ক্লাসে শতকরা ৩৭ জনের চোখের দৃষ্টি কম।

পরীক্ষা করিয়া আরো দেখা গিয়াছে, অনিদ্রা, ঘুমের সময় বকা এবং নিদ্রাবস্থায় বেড়ান, স্কুলের ছেলেদের মধ্যে যত দেখা যায়, অন্য স্থলে তত দেখা যায় না। লণ্ডনের প্রাথমিক বিদ্যালয় সকলে এই বিষয়ের অনুসন্ধান হয়। তাহাতে স্থির হয়, তথাকার শতকরা ৩৮ জন ছেলের রাত্রে ঘুম হয় না। বালিকাদের অপেক্ষা বালকদের আবার বেশী। একটি স্কুলে ৩৮১ জন বালক ছিল। তার মধ্যে ১২৯ জন ঘুমের সময় বকে, আর ২৮ জন ঘুমন্ত অবস্থায় বেড়াইয়া বেড়ায়। শিক্ষকেরা বলেন, ছেলেদের বাপ প্রায়ই অভিযোগ করেন যে, তাঁহাদের ছেলেরা রাত্রে পড়ার সময় বকে, আর অঙ্কতেই বেশী গোল বাঁধায়। প্রসিয়াতে ১৮৮৩ হইতে ১৮৮৮ পর্য্যন্ত পাঁচ বছরের ভিতর প্রায় কমবেশ ২৮৯ জন লোক আত্মহত্যা করিয়াছিল; ইহার মধ্যে ১২১ জন পরীক্ষার ভয়, ক্লাসে উঠিতে না পারা, শাস্তির ভয় ও অন্যান্য কারণে।

ডাক্তার জনষ্টোন বলেন, বেশী বুদ্ধিমান্ ছেলের শরীর সচরাচর খারাপ হইয়া থাকে। ইহারা রোগাক্রান্ত হইলে প্রায় বাঁচে না। অস্বাভাবিক বুদ্ধি দেখিলে বাপ মায়ের খুব আনন্দ হয় বটে, কিন্তু উহা স্নায়ুকেন্দ্রগুলির অস্বাভাবিক অবস্থার চিহ্ন মাত্র। তাহার প্রমাণস্বরূপ তিনি বলিতেছেন, নিগ্রো বালক সাহেব-বালককে প্রথম অবস্থায় খুব ছাড়াইয়া যায়। শেষে কিন্তু আর মোটেই উন্নতি করিতে পারে না। শরীর যতই ভাল হয়, ততই উহার উন্নতি ধীরে ধীরে হয়, ইহাই জীব সৃষ্টির একটী নিয়ম।

মস্তিষ্কের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের খুলিও ঠিক পরিমাণ অনুসারে বাড়িতে থাকে। যদি নবজাত শিশুর খুলি ধরা যায় ১০, তবে ২২শ মাসে উহা হয় ১৫, আর ১৪ বৎসরে হয় ২০। আধা বয়স হইলে খুলির স্থূলতা ক্রমশঃ কমিতে থাকে। বুড়ো লোকের মাথার খুলি খুব পাতলা ও ভঙ্গপ্রবণ।

ছেলেদের মস্তিষ্ক ও শিক্ষা সম্বন্ধে খুব আধুনিক উন্নত মত প্রকাশ করা গেল। এক্ষণে আমাদের দেশের প্রাচীন মত ও বর্ত্তমান কালের শিক্ষাসম্বন্ধে দুই কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। এই বিষয় যোগ্য ব্যক্তিগণের রীতিমত আলোচনার বিষয়, কারণ Child is the father of the man.

আমরা প্রাচীন স্মৃতিতে দেখিতে পাই, গর্ভাষ্টমে ব্রাহ্মণের উপনয়নের সর্ব্বপ্রথম কাল। উপনয়ন ব্যতীত দ্বিজের পাঠ আরম্ভ হইত না। সুতরাং

দেখা যাইতেছে,সাত বৎসরের কমে শিক্ষা কিছুতেই আরম্ভ হইত না। ক্ষত্রিয়ের, বৈশ্যের আরো বিলম্বে। আর এক কথা বলি। তখন ব্রহ্মচর্য্যের উপর একটা বিশেষ ঝোঁক ছিল। তাহাই ছিল শরীর ভাল থাকিবার এক প্রধান কারণ। এখন সেই দিকে দৃষ্টি ও সেই বিষয়ের শিক্ষা একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। ছেলেকে কতকগুলা জিনিষ গিলানকে যদি শিক্ষা বলে, এখন হইতেছে তাহাই। ধর্ম্ম আর শরীরের দিকে ত দৃষ্টিই নাই। আমরা যেমন, আমাদের ছেলেরাও তদ্রূপ হইতেছে। এখন চেষ্টা কেবল কোন মতে ২৫ টাকা উপার্জ্জন করিয়া অন্নসংস্থান করা। কাযে কাযেই তাহার উপায়স্বরূপ লেখা পড়া না শিখিলে হইবে কি? আমরা বলি, পুস্তক পড়া কমাইয়া Kindergarten system ক্রমশঃ ক্রমশঃ প্রবেশ করাইলে ভাল হয় নাকি? বইয়ের কীট কতকগুলি সৃজন করিয়া লাভ কি? বই একটী উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। সেই উদ্দেশ্য হইতেছে—শরীর মন ও ধর্ম্মে উন্নত একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীব হওয়া। তা কই হইতেছে? এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে। আলোচনাও যথেষ্ট হইতেছে। কিন্তু অধিক পরিমাণে কার্য্যে পরিণত হইতেছে না কেন? তাহার প্রধান কারণ বোধ হয় অন্নচিন্তা। এই 'অন্ন' সমস্যা যদি কেহ পূরণ করিতে পারেন, তবেই বোধ হয়, 'শিক্ষা' সমস্যাও একদিন পূর্ণ হইবে।

নূতন বৎসর।

(শ্রীহরিদাস দত্ত।)

সংসার নাটক গেহে নববেশ ধরি,
　　আইল হে নববর্ষ প্রফুল্ল অন্তরে ;—
নব সুখ ভোগ আশে আহা মরি মরি,
　　সবার মানস যেন আনন্দে বিহরে।
কি এনেছ, হে বৎসর, আমাদের তরে ?
তোমার রাজত্বে বল কি ভুঞ্জাবে নরে ?

পাইবে রাজত্ব তুমি নিখিল জগতে ;
　　অসংখ্য অসংখ্য প্রজা তোমার অধীন ;

সাবধান, হে রাজন্, যেন তোমা হতে,
দীন প্রজাদের মুখ না হয় মলিন।

বসন্তের সুশীতল মলয় পবন,
সুশোভনা প্রকৃতির ভূষণ সুন্দর,
চাহি না আমরা, তাতে কিবা প্রয়োজন ?
শোভুক সরসে পদ্ম, গগনে ভাস্কর,
শরতের শশী পানে চাহিব না আর,
হবে না উহাতে মোদের আশার সুসার।

চাহি না এ সবে মোরা, নাহি চাহি ধনে,—
আশায় উন্মত্ত হয়ে কিবা প্রয়োজন ?
কিবা কাজ তায়, যার তরে অকারণে
অবিরল হইতেছে শোণিত বর্ষণ।
বর্ষে বর্ষে হইতেছি মোরা জর জর,
তোমার উপর এবে করিনু নির্ভর।

ধরিয়া সুন্দর বেশ এস শুভক্ষণে,
জগতের সিংহাসনে কর আরোহণ ;
ধরি শাস্তিদণ্ড সবে রাখহ শাসনে,
আর যেন নাহি সহে এ ক্ষুদ্র জীবন
সংসার অসুখ জ্বালা অশান্তি যাতনা।
"শান্তির রাজত্ব" তুমি করাও ঘোষণা।

হে নব বৎসর, তোমা করি এ মিনতি,
আছি বড় আশা করে, তোমার শাসনে
পাইব হে শান্তিসুখ, যাবে এ দুর্গতি,
বিজয় পতাকা তব শোভিবে গগনে,
হাসিবে সংসার তব শাসনের গুণে,—
আর না দহিব মোরা অসুখ আগুনে।

স্ববিরোধী। এই জন্যই এই প্রশ্নের উত্তর এ পর্য্যন্ত হয় নাই; কারণ, যদি ইহার উত্তর হয়, তাহা হইলে তিনি অসীম রহিলেন না; ঈশ্বর 'জ্ঞাত' হইলে তাঁহার আর ঈশ্বরত্ব থাকে না—তিনি আমাদেরই মত একজন—এই চেয়ার খানার মত একটা জিনিষ হইয়া গেলেন। তাঁহাকে জানা যায় না, তিনি সর্ব্বদাই অজ্ঞেয়। তবে অদ্বৈতবাদী বলেন, তিনি শুধু 'জ্ঞেয়' হইতেও আরো কিছু বেশী। এই কথাটী আবার বুঝিতে হইবে। তোমরা যেন অজ্ঞেয়বাদীদের মত ঈশ্বর অজ্ঞেয় মনে করিয়া বাড়ীতে যাইও না। মনে কর এই চেয়ারখানি রহিয়াছে, উহাকে আমি জানিতেছি। আবার আকাশের বহির্দ্দেশে কি আছে, সেখানে কোন লোকের বসতি আছে কি না, এ বিষয় হয়ত একেবারে অজ্ঞেয়। কিন্তু ঈশ্বর পূর্ব্বোক্ত পদার্থগুলির ন্যায় জ্ঞাতও নন, অজ্ঞেয়ও নন। ঈশ্বর বরং যাহাকে 'জ্ঞাত' বলা হইতেছে, তাহা হইতেও আরো কিছু বেশী—ঈশ্বর অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বলিলে ইহাই বুঝায়, কিন্তু যে অর্থে কেহ কেহ কোন কোন প্রশ্নকে অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় বলেন, সে অর্থে নহে। ঈশ্বর জ্ঞাত হইতে আরো কিছু অধিক। এই চেয়ার আমাদের জ্ঞাত; বাস্তবিক উহা সেই পূর্ণ জ্ঞানের একটী নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ মাত্র। কিন্তু ঈশ্বর তাহা হইতেও আমাদের অধিক জ্ঞাত, কারণ তাঁহাকে অগ্রে জানিয়া—তাঁহারই ভিতর দিয়া—তবে আমাদিগকে চেয়ারের জ্ঞানলাভ করিতে হয়। তিনি সাক্ষিস্বরূপ, সকল জ্ঞানের তিনি অনন্ত সাক্ষিস্বরূপ। যাহা কিছু আমরা জানি, সবই অগ্রে তাঁহাকে জানিয়া—তাঁহারই ভিতর দিয়া—তবে জানিতে হয়। তিনিই আমাদের আত্মার সারসত্তা স্বরূপ। তিনিই প্রকৃত আমি—সেই 'আমিই' আমাদের এই 'আমি'র সারসত্তাস্বরূপ; আমরা সেই 'আমি'র ভিতর দিয়া ব্যতীত কিছুই জানিতে পারি না, সুতরাং সমুদয়ই আমাদিগকে ব্রহ্মের ভিতর দিয়া জানিতে হইবে। অতএব এই চেয়ারখানিকে জানিতে হইলে উহাকে ব্রহ্মের মধ্য দিয়া তবে জানিতে হইবে। অতএব ব্রহ্ম, চেয়ার অপেক্ষা আমাদের নিকটবর্ত্তী হইলেন, কিন্তু তথাপি তিনি আমাদের হইতে অনেক উচ্চে রহিলেন। জ্ঞাতও নহেন, অজ্ঞাতও নহেন, কিন্তু উভয় হইতেই অনন্তগুণে উচ্চ। তিনি তোমার আত্মস্বরূপ। কে এ জগতে এক মুহূর্ত্তও জীবন ধারণ করিতে পারিত, কে এ জগতে এক মুহূর্ত্তও শ্বাসপ্রশ্বাসকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিত, যদি সেই আনন্দস্বরূপ ইহার প্রতি পরমাণুতে বিরাজমান না থাকিতেন? কারণ, তাঁহারই শক্তিতে আমরা শ্বাসপ্রশ্বাসকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছি এবং তাঁহারই অস্তিত্বে

আমাদেরও অস্তিত্ব। তিনি যে এক জায়গায় দাঁড়াইয়া আমার রক্তসঞ্চালন করিতেছেন, তাহা নহে। তাৎপর্য্য এই যে, তিনিই সমুদয়ের সত্তাস্বরূপ—তিনিই আমার আত্মার আত্মা। তুমি কোনরূপেই বলিতে পার না যে, তুমি তাঁহাকে জান—উহাতে তাঁহাকে অত্যন্ত নামাইয়া ফেলা হয়। তুমি লাফাইয়া নিজের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিতে পার না, সুতরাং তুমি তাঁহাকে জানিতেও পার না। জ্ঞান বলিতে 'বিষয়ীকরণ'—(Objectification) জিনিষকে বাহিরে আনিয়া বিষয়ের ন্যায় (জ্ঞেয় বস্তুর ন্যায়) প্রত্যক্ষীকরণ—বুঝায়। উদাহরণস্বরূপ দেখ, স্মরণকার্য্যে তোমরা অনেক জিনিষকে 'বিষয়ীকৃত' করিতেছ—যেন তোমাদের নিজেদের স্বরূপ হইতে বাহিরে প্রক্ষেপ করিতেছ। সমুদয় স্মৃতি—যাহা কিছু আমি দেখিয়াছি এবং যাহা কিছু আমি জানি, সবই আমার মনে অবস্থিত। ঐ সকল বস্তুর ছাপ বা ছবি যেন আমার অন্তরে রহিয়াছে। যখনই আমি উহাদের বিষয় চিন্তা করিতে ইচ্ছা করি, উহাদিগকে জানিতে যাই, তখন প্রথমেই ঐ গুলিকে যেন বাহিরে প্রক্ষেপ করিতে হয়। ঈশ্বরসম্বন্ধে এরূপ করা অসম্ভব ; কারণ, তিনি আমাদের আত্মার আত্মা স্বরূপ, আমরা তাঁহাকে বাহিরে প্রক্ষেপ করিতে পারি না। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে,

'স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' ইহার অর্থ এই, ' সেই সূক্ষ্মস্বরূপ জগৎকারণ জগতস্থ সকল বস্তুর আত্মা, তিনিই সত্যস্বরূপ, হে শ্বেতকেতো, তুমিই তাহাই।' এই 'তত্ত্বমসি' বাক্য বেদান্তের মধ্যে অতিশয় পবিত্রতম বাক্য—মহাবাক্য—বলিয়া কথিত হয়, আর ঐ পূর্ব্বোদ্ধৃত বাক্যাংশ দ্বারা 'তত্ত্বমসি'র প্রকৃত অর্থ কি, তাহাও বুঝা গেল। 'তুমিই সেই'—ঈশ্বরকে এতদ্ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় তুমি বর্ণনা করিতে পার না। ভগবানকে পিতা মাতা ভ্রাতা বা প্রিয় বন্ধু বলিলে তাঁহাকে 'বিষয়ীকৃত' করিতে হয়—তাঁহাকে বাহিরে আনিয়া দেখিতে হয়—তাহা ত কখন হইতে পারে না। তিনিই সকল বিষয়ের অনন্ত বিষয়ী। যেমন আমি চেয়ারখানি দেখিতেছি, আমি চেয়ারখানির দ্রষ্টা—আমি উহার বিষয়ী। তদ্রূপ ঈশ্বর আমার আত্মার নিত্যদ্রষ্টা—নিত্যজ্ঞাতা—নিত্য বিষয়ী। কিরূপে তুমি তাঁহাকে তোমার আত্মার অন্তরাত্মাকে—সকল বস্তুর সারসত্তাকে 'বিষয়ীকৃত' করিবে—বাহিরে আনিয়া দেখিবে? অতএব আমি তোমাদের নিকট পুনরায় বলিতেছি, ঈশ্বর জ্ঞেয়ও নহেন, অজ্ঞেয়ও নহেন, তিনি জ্ঞেয় অজ্ঞেয় হইতে

অনন্তগুণ উচ্চে—তিনি আমাদের সহিত অভেদ, আর যাহা আমার সহিত এক, তাহা কখন আমার জ্ঞেয় বা অজ্ঞেয় হইতে পারে না, যেমন তোমার আত্মা, আমার আত্মা জ্ঞেয়ও নহে, অজ্ঞেয়ও নহে। তুমি তোমার আত্মাকে জানিতে পার না, তুমি উহাকে নাড়িতে চাড়িতে পার না, অথবা উহাকে 'বিষয়' করিয়া উহাকে দৃষ্টিগোচর করিতে পার না, কারণ তুমি নিজেই তাহাই, তুমি তোমাকে উহা হইতে পৃথক্ করিতে পার না। আবার উহাকে অজ্ঞেয়ও বলিতে পার না কারণ অজ্ঞেয় বলিতে গেলে অগ্রে উহাকে 'বিষয়ী-করিতে হইবে—তাহাত করা যায় না। আর তুমি নিজে যেমন তোমার নিকট পরিচিত—জ্ঞাত, আর কোন্ বস্তু তদপেক্ষা তোমার অধিক জ্ঞাত? যে অর্থে ঈশ্বর জ্ঞাতও নহেন, অজ্ঞেয়ও নহেন, তদপেক্ষা অনন্তগুণে উচ্চ; তদ্রূপ আমাদের আত্মাও আমাদের জ্ঞানের কেন্দ্রস্বরূপ।

অতএব আমরা দেখিতেছি, প্রথম, এই প্রশ্নই স্ববিরোধী, আর দ্বিতীয়তঃ, আমরা দেখিতে পাই, অদ্বৈতবাদে ঈশ্বরের ধারণা এই—একত্ব—সুতরাং আমরা তাঁহাকে 'বিষয়ীকৃত' করিতে পারি না, কারণ, জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক, আমরা সর্ব্বদাই তাঁহাতে সঞ্জীবিত এবং তাঁহাতেই থাকিয়া সমুদয় কার্য্যকলাপ করিতেছি। আমরা যাহা কিছু করিতেছি সবই সর্ব্বদাই তাঁহারই মধ্য দিয়া করিতেছি। এক্ষণে প্রশ্ন এই, দেশকালনিমিত্ত কি? অদ্বৈতবাদের অর্থই এই, একটী মাত্র বস্তু আছে, দুইটী নাই। এক্ষণে আবার এই এক মত বলা হইল যে, সেই অনন্ত ব্রহ্ম দেশকালনিমিত্তের আবরণের দ্বারা নানারূপে প্রকাশ পাইতেছেন। অতএব এক্ষণে বোধ হইতেছে, দুইটী বস্তু আছে,—সেই অনন্ত ব্রহ্ম একটী বস্তু, আর মায়া অর্থাৎ দেশকালনিমিত্তের সমষ্টি আর এক বস্তু। আপাততঃ দুইটী বস্তু আছে, ইহাই যেন স্থিরসিদ্ধান্ত বলিয়া বোধ হয়। অদ্বৈতবাদী ইহার উত্তরে বলেন, বাস্তবিক ইহাতে দুই হয় না। দুটী বস্তু থাকিতে হইলে ব্রহ্মের ন্যায়—যাঁহার উপর কোন নিমিত্ত কার্য্য করিতে পারে না,—এরূপ দুইটী স্বতন্ত্র বস্তু থাকা আবশ্যক। প্রথমতঃ, দেশকালনিমিত্তের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, বলা যাইতে পারে না। কাল আমাদের মনের প্রতি পরিবর্ত্তনের সহিত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, সুতরাং উহা একটী স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নহে। কখন কখন স্বপ্নে দেখা যায়, আমি যেন অনেক বৎসর জীবন ধারণ করিয়াছি—কখন কখন আবার এক মুহূর্ত্তের মধ্যে লোকে কয়েক মাস অতীত হইল, বোধ করিয়াছে। অতএব দেখা গেল, কাল তোমার মনের

অবস্থার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, কালের জ্ঞান সময়ে সময়ে একেবারে উড়িয়া যায়, আবার অপর সময়ে আসিয়া থাকে। দেশ সম্বন্ধেও এইরূপ। আমরা দেশের স্বরূপ জানিতে পারি না। তথাপি উহার নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ করা অসম্ভব হইলেও, উহা রহিয়াছে, উহা আবার কোন পদার্থ হইতে পৃথক হইয়া থাকিতে পারে না। নিমিত্ত বা কার্য্যকারণভাব সম্বন্ধেও এইরূপ। এই দেশকালনিমিত্তের ভিতর এই একটী বিশেষত্ব দেখিতেছি যে, উহারা অন্যান্য বস্তু হইতে পৃথক্ ভাবে অবস্থান করিতে পারে না। তোমরা 'শুদ্ধ দেশের' বিষয় ভাবিতে চেষ্টা কর, যাহাতে কোন বর্ণ নাই, যাহার সীমা নাই, চতুর্দ্দিকস্থ কোন বস্তুর সহিত যাহার কোন সংশ্রব নাই। তুমি উহার বিষয় চিন্তা করিতেই পারিবে না। তোমাকে দেশের বিষয় চিন্তা করিতে হইলে দুইটী সীমার মধ্যস্থিত অথবা তিনটী বস্তুর মধ্যে অবস্থিত দেশের বিষয় চিন্তা করিতে হইবে। তবেই দেশের অস্তিত্ব অন্য বস্তুর উপর নির্ভর করিতেছে। কাল সম্বন্ধেও তদ্রূপ; শুদ্ধ 'দেশ' সম্বন্ধে তুমি কোন ধারণা করিতে পার না; দেশের ধারণা করিতে হইলে তোমাকে একটী পূর্ব্ববর্ত্তী আর একটী পরবর্ত্তী ঘটনা লইতে হইবে এবং কালের ধারণা দ্বারা ঐ দুইটীকে যোগ করিতে হইবে। যেমন দেশ বহিঃস্থ দুইটী বস্তুর উপর নির্ভর করিতেছে, তদ্রূপ কালও দুইটী ঘটনার উপর নির্ভর করিতেছে। আর এই 'নিমিত্ত' বা 'কার্য্যকারণ ভাবের' ধারণ এই দেশ কাল এবং আর যাহা কিছু, সকলের উপর নির্ভর করিতেছে। এই 'দেশকালনিমিত্ত' সকল গুলিরই ভিতর বিশেষত্ব এই যে, উহাদের স্বতন্ত্র সত্তা নাই। এই চেয়ারখানা বা ঐ দেয়ালটার যেরূপ অস্তিত্ব আছে, উহাদের তাহাও নাই। এ যেন সকল বস্তুরই পশ্চাদ্দেশস্থ ছায়াস্বরূপ, তুমি কোন মতে উহাকে ধরিতে পার না। উহাদের ত কোন সত্তা নাই—আমরা দেখিলাম, উহাদের বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। খুব জোর না হয় ছায়া কিন্তু উহা যে কিছুই নয়, তাহাও বলিতে পারা যায় না; কারণ, উহারই ভিতর দিয়া জগতের প্রকাশ হইতেছে—এ যেন তিনগুণের এক স্বাভাবিক মিশ্রণস্বরূপ—নানারূপ প্রসব করিতেছে। অতএব আমরা দেখিলাম এই দেশকালনিমিত্তের সমষ্টির অস্তিত্বও নাই এবং উহারা একেবারে অসৎ ও (অস্তিত্বশূন্য) নহে। এ যেন ছায়ার ন্যায় সকল বস্তুকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, উহারা আবার এক সময়ে একেবারে অন্তর্হিত হইয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ সমুদ্রের তরঙ্গ সম্বন্ধে চিন্তা কর। তরঙ্গ অবশ্যই সমুদ্রের সহিত

অভেদ, তথাপি আমরা উহাকে তরঙ্গ বলিয়া সমুদ্র হইতে পৃথক্‌রূপে জানিতেছি। এই বিভিন্নতার কারণ কি?—নামরূপ। নাম অর্থাৎ সেই বস্তুসম্বন্ধে আমাদের মনে যে একটী ধারণা রহিয়াছে; আর, রূপ অর্থাৎ আকার। আবার তরঙ্গকে সমুদ্র হইতে পৃথক্‌রূপে কি আমরা চিন্তা করিতে পারি? কখনই না। উহা সকল সময়েই ঐ সমুদ্রের ধারণার উপর নির্ভর করিতেছে। যদি ঐ তরঙ্গ চলিয়া যায়, তবে রূপও অন্তর্হিত হইল, কিন্তু ঐ রূপটী যে একেবারে ভ্রমাত্মক ছিল, তাহা নহে। যতদিন ঐ তরঙ্গ ছিল, তত দিন ঐ রূপটী ছিল এবং তোমাকে বাধ্য হইয়া ঐ রূপ দেখিতে হইত। ইহাই মায়া। অতএব এই সমুদয় জগৎ যেন সেই ব্রহ্মের এক বিশেষ রূপ। ব্রহ্মই সেই সমুদ্র এবং তুমি আমি সূর্য্য তারা সবই সেই সমুদ্রে ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গমাত্র। তরঙ্গগুলিকে সমুদ্র হইতে পৃথক্ করে কে?—ঐ রূপ। আর, ঐ রূপ—কেবল দেশকালনিমিত্ত ঐ দেশকালনিমিত্ত আবার সম্পূর্ণরূপে ঐ তরঙ্গের উপর নির্ভর করিতেছে। তরঙ্গও যাই চলিয়া যায়, অমনি তাহারাও অন্তর্হিত হয়। জীবাত্মা যখনই এই মায়া পরিত্যাগ করে, তখনি তাহার পক্ষে উহা অন্তর্হিত হইয়া যায়, সে মুক্ত হইয়া যায়। আমাদের সমুদয় চেষ্টাই এই দেশকালনিমিত্তের উপর নির্ভর হইতে আপনাকে রক্ষা করা। উহারা সর্ব্বদাই আমাদের পক্ষে বাধা দিতেছে, আর আমরা সর্ব্বদাই উহাদের কবল হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছি। পণ্ডিতেরা 'ক্রমবিকাশবাদ' (Theory of Evolution) কাহাকে বলেন? উহার ভিতর দুইটী ব্যাপার আছে। একটী এই যে, এক ভয়ানক অন্তর্নিহিত গূঢ়শক্তি আপনাকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে, আর বহিঃস্থ অনেক ঘটনাবলি উহাকে বাধা দিতেছে—চতুর্দ্দিকস্থ অবস্থাপুঞ্জ উহাকে প্রকাশিত হইতে দিবে না। সুতরাং এই অবস্থাপুঞ্জের সহিত সংগ্রামের জন্য ঐ শক্তি নব নব কলেবর ধারণ করিতেছেন। একটী ক্ষুদ্রতম কীটাণু, এই উন্নত হইবার চেষ্টায় আর একটী শরীর ধারণ করেএবং কতকগুলি বাধাকে জয় করিয়া থাকে, এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন শরীর ধারণ করিয়া অবশেষে মনুষ্যরূপে পরিণত হয়। এক্ষণে যদি এই তত্ত্বটীকে উহার স্বাভাবিক চরম সিদ্ধান্তে লইয়া যাওয়া যায়, তবে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, এমন সময় আসিবে, যখন, যে শক্তি কীটাণুর ভিতরে ক্রীড়া করিতেছিল এবং যাহা অবশেষে মনুষ্যরূপে পরিণত হইয়াছিল, তাহা সমস্ত বাধা অতিক্রম করিবে, বহিঃস্থ ঘটনাপুঞ্জ আর উহাকে কোন বাধা দিতে পারিবে না। এই তত্ত্বটী দার্শনিক ভাষায় প্রকাশিত

হইলে এইরূপ বলিতে হইবে :—প্রত্যেক কার্য্যের দুইটী করিয়া অংশ আছে, একটী বিষয়ী, অপরটী বিষয়। একজন আমাকে তিরস্কার করিল, আমি আপনাকে অসুখী বোধ করিলাম —এখানেও এই দুইটী ব্যাপার রহিয়াছে। আর আমার সারাজীবনের চেষ্টা কি? না, নিজের মনকে এতদূর সবল করা, যাহাতে বাহিরের অবস্থাগুলির উপর আমি আধিপত্য করিতে পারিব, অর্থাৎ সে আমাকে তিরস্কার করিলেও আমি কিছু কষ্ট অনুভব করিব না। এই-রূপেই আমরা প্রকৃতিকে জয় করিবার চেষ্টা করিতেছি। নীতির অর্থ কি? 'নিজে'কে দৃঢ় করা—উহাকে ক্রমশঃ সর্ব্বপ্রকার অবস্থা সহাইয়া লওয়া, যেমন তোমাদের বিজ্ঞান বলেন যে, মনুষ্যশরীর কালে সর্ব্বাবস্থাসহনক্ষম হয়, আর যদি বিজ্ঞানের একথা সত্য হয়, তবে আমাদের দর্শনের এই সিদ্ধান্ত, (অর্থাৎ এমন এক সময় আসিবে, যখন আমরা সর্ব্বপ্রকার অবস্থা জয় করিতে পারিব), অকাট্য যুক্তির উপর স্থাপিত হইল, বলিতে হইবে; কারণ, প্রকৃতি সসীম।

এই একটী কথা আবার বুঝিতে হইবে—প্রকৃতি সসীম। 'প্রকৃতি সসীম' কি করিয়া জানিলে? দর্শনের দ্বারা উহা জানা যায়। প্রকৃতি সেই অনন্তেরই সীমাবদ্ধভাবমাত্র, অতএব উহা সসীম। অতএব এমন এক সময় আসিবে, যখন আমরা বাহিরের অবস্থাগুলিকে জয় করিতে পারিব। উহা-দিগকে জয় করিবার উপায় কি? আমরা বাস্তবিক পক্ষে বাহিরের বিষয়গুলিতে কোন পরিবর্ত্তন উৎপাদন করিয়া উহাদিগকে জয় করিতে পারি না। ক্ষুদ্রকায় মৎস্যটী তাহার জলস্থ শত্রুগণ হইতে আত্মরক্ষায় ইচ্ছুক। সে কি করিয়া উহা সাধন করে? আকাশে উড়িয়া—পক্ষী হইয়া। মৎস্যটী জল বা বায়ুতে কোন পরিবর্ত্তন সাধন করিল না—পরিবর্ত্তন যাহা কিছু হইল, তাহা তাহার নিজের ভিতরে। পরিবর্ত্তন সর্ব্বদাই 'নিজের ভিতরেই হইয়া থাকে। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই, সমুদয় ক্রমবিকাশ ব্যাপারটীতে পরিবর্ত্তন 'নিজে'র ভিতর হইয়া হইয়া প্রকৃতির জয় হইতেছে। এই তত্ত্বটী ধর্ম্ম এবং নীতিতে প্রয়োগ কর—দেখিবে, এখানেও 'অশুভজয়' 'নিজে'র ভিতরে পরিবর্ত্তনের দ্বারাই সাধিত হইতেছে। সবই নিজের উপর নির্ভর করে, এই 'নিজেটী'র উপর ঝোঁক দেওয়াই অদ্বৈতবাদের প্রকৃত দৃঢ় ভূমি। 'অশুভ দুঃখ' এ সকল কথা বলাই ভুল, কারণ বহির্জ্জগতে উহাদের কোন অস্তিত্ব নাই। ক্রোধের কারণসমূহ পুনঃ পুনঃ ঘটিলেও ঐ সকল ঘটনায় স্থিরভাবে থাকা যদি আমার অভ্যাস হইয়া যায়, তাহা হইলেই আমার কখনই ক্রোধের উদ্রেক হইবে

না। এইরূপে লোকে আমাকে যতই ঘৃণা করুক, যদি সে সকল আমি গায়ে না মাখি, তাহা হইলে আমারও তাহার প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হইবে না। এইরূপেই 'অশুভজয়' করিতে হয়—'নিজে'র উন্নতিসাধন করিয়া। অতএব তোমরা দেখিতেছ, অদ্বৈতবাদই একমাত্র ধর্ম্ম, যাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের সিদ্ধান্তসমূহের সহিত ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় দিকেই শুধু মেলে, তাহা নয়, বরং ঐ সকল সিদ্ধান্ত হইতেও উচ্চতর সিদ্ধান্ত সমূহ স্থাপন করে, আর এই জন্যই আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের প্রাণে ইহা খুব লাগিতেছে। তাঁহারা দেখিতেছেন, প্রাচীন দ্বৈতবাদাত্মক ধর্ম্মসমূহ তাঁহাদের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে, উহাতে তাঁহাদের জ্ঞানের ক্ষুধা মিটিতেছে না। কিন্তু এই অদ্বৈতবাদে তাঁহাদের জ্ঞানের ক্ষুধা মিটিতেছে। শুধু প্রাণের বিশ্বাস থাকিলে মানুষের চলিবে না, এমন বিশ্বাসও থাকা চাই, যাহাতে তাহার জ্ঞানবৃত্তি চরিতার্থ হয়। যদি মানুষকে যাহা দেখিবে, তাহাই বিশ্বাস করিতে বলা হয়, তবে সে শীঘ্রই বাতুলালয়ে যাইবে। * * *। এইরূপ অন্ধবিশ্বাস শুধু আমেরিকাতে নহে, সকল দেশেই আছে,আমাদের দেশে এই অন্ধবিশ্বাসের প্রবল রাজত্ব। অদ্বৈতবাদ কখন সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচারিত হইতে দেওয়া হয় নাই। সন্ন্যাসীরাই অরণ্যে উহার সাধনা করিতেন, সেই জন্যই বেদান্তের এক নাম হইয়াছিল 'আরণ্যক'। অবশেষে ভগবৎ কৃপায় বুদ্ধদেব আসিয়া আপামর সাধারণের ভিতর উহা প্রচার করিলেন, তখন সমস্ত জাতি বৌদ্ধধর্ম্মে জাগিয়া উঠিল। অনেক দিন পরে আবার যখন নাস্তিকেরা সমুদয় জাতিকে একেবারে ধ্বংশ করিয়া ফেলিল, তখন জ্ঞানীরা একমাত্র এই ধর্ম্মকেই ভারতের এই নাস্তিকতান্ধকার মোচনের একমাত্র উপায় দেখিলেন। দুইবার উহা ভারতকে নাস্তিকতা হইতে রক্ষা করিয়াছিল। প্রথম বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের ঠিক পূর্ব্বে নাস্তিকতা অতি প্রবল হইয়াছিল—ইয়ুরোপ আমেরিকার পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে এখন যেরূপ নাস্তিকতা, সেরূপ নাস্তিকতা নহে ; উহা হইতে অনেক জঘন্য নাস্তিকতা। আমি এক প্রকারের নাস্তিক , কারণ, আমার বিশ্বাস—একমাত্র পদার্থেরই অস্তিত্ব আছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক নাস্তিকও তাই বলেন, তবে তিনি উহাকে 'জড়' আখ্যা প্রদান করেন, আমি উহাকে 'ব্রহ্ম' বলি। এই 'জড়বাদী' নাস্তিক বলেন, এই 'জড়' হইতেই মানুষের আশা ভরসা ধর্ম্ম সবই আসিয়াছে। আমি বলি, ব্রহ্ম হইতে সমুদায় হইয়াছে। আমি এরূপ নাস্তিকতার কথা বলিতেছি না, আমি চার্ব্বাকের মতের কথা বলিতেছি—খাও দাও মজা উড়াও ; ঈশ্বর আত্মা

বা স্বর্গ কিছুই নাই; ধর্ম্ম কতকগুলি ধূর্ত্ত দুষ্ট পুরোহিতের কল্পনামাত্র—'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।' এইরূপ নাস্তিকতা বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে এত বিস্তৃত হইয়াছিল যে, উহার এক নাম 'লোকায়ত দর্শন'। এইরূপ অবস্থায় বুদ্ধদেব আসিয়া সাধারণের মধ্যে বেদান্ত প্রচার করিয়া ভারতবর্ষকে রক্ষা করিলেন। বুদ্ধদেবের তিরোভাবের সহস্র বর্ষ পরে আবার ঠিক এইরূপ ব্যাপার ঘটিল। আচণ্ডালে বৌদ্ধ হইতে লাগিল। নানাবিধ বিভিন্ন জাতি বৌদ্ধ হইতে লাগিল। অনেকে অতি নীচ জাতি হইলেও বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বেশ সদাচারপরায়ণ হইল। ইহাদের কিন্তু নানাপ্রকার কুসংস্কার ছিল—নানা প্রকার ছিটা, ফোঁটা, মন্ত্র তন্ত্র ভূতদেবতায় বিশ্বাস ছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভাবে ঐ গুলি দিনকতক চাপা থাকিল বটে, কিন্তু সেগুলি আবার প্রকাশ হইয়া পড়িল। অবশেষে ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম নানা প্রকার বিষয়ের খিচুড়ি হইয়া দাঁড়াইল। তখন আবার নাস্তিকতার মেঘে ভারতগগন আচ্ছন্ন হইল—সম্ভ্রান্ত লোকে যথেচ্ছাচারী ও সাধারণ লোকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইল। এমন সময়ে শঙ্করাচার্য্য উঠিয়া বেদান্তের পুনরুদ্দীপন করিলেন। তিনি উহাকে একটী যুক্তিসঙ্গত বিচারপূর্ণ দর্শনরূপে প্রচার করিলেন। উপনিষদে বিচারভাগ বড় অস্ফুট। বুদ্ধদেব উপনিষদের নীতিভাগের দিকে খুব ঝোঁক দিয়াছিলেন, শঙ্করাচার্য্য ইহার জ্ঞানভাগের দিকে বেশী ঝোঁক দিলেন। তদ্দ্বারা উপনিষদের সিদ্ধান্তগুলি যুক্তিবিচারের দ্বারা প্রমাণিত ও প্রণালীবদ্ধ রূপে লোকসমক্ষে স্থাপিত হইয়াছে। ইউরোপেও আজকাল ঠিক সেই অবস্থা উপস্থিত। এই নাস্তিকগণের মুক্তির জন্য—তাহারা যাহাতে বিশ্বাস করে তজ্জন্য তোমরা জগৎ জুড়িয়া প্রার্থনা করিতে পার, কিন্তু তাহারা বিশ্বাস করিবে না; তাহারা যুক্তি চায়। সুতরাং ইউরোপের মুক্তি এক্ষণে এই বিচারপূত ধর্ম্ম—অদ্বৈতবাদের উপর নির্ভর করিতেছে; আর একমাত্র এই অদ্বৈতবাদ, এই নির্গুণ ব্রহ্মের ভাবই পণ্ডিতদিগের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ। যখনই ধর্ম্ম লুপ্ত হইবার উপক্রম হয়, এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই ইহা আসিয়া থাকে। এই জন্যই ইউরোপ আমেরিকায় ইহা প্রবেশ লাভ করিয়া দৃঢ়মূল হইতেছে। প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলি অতি উচ্চ কবিত্বপূর্ণ; এই সকল উপনিষদ্বক্তা ঋষিগণ কবি ছিলেন। তাঁহারা প্রচারও করিতেন না, অথবা দার্শনিক বিচারও করিতেন না, অথবা লিখিতেনও না। তাঁহাদের হৃদয়-উৎস হইতে সঙ্গীতের ফোয়ারা বহিত। তার পর বুদ্ধদেবে আমরা দেখি—হৃদয়, অনন্ত

অবশ্যই দীর্ঘ ঈকার ও দীর্ঘ ঊকার হইবে। কিন্তু ইহা শাস্ত্রে অব্যবহার্য্য বলিয়া পুনরায় তাহার নিষেধ বিধান করিতে হইবে। নতুবা "গঙ্গে ইন্দ্র", "বায়ো উদকম্" এই সকল স্থলে একারের শেষাংশে ইকার এবং ওকারের শেষাংশে উকার থাকাতে "অকঃ সবর্ণে দীর্ঘঃ" ৬।১।১০১। (অক্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ অর্থাৎ অ ই উ ঋ ৯ ইহাদের পরে, সমান অচ্ অর্থাৎ অ ই উ ঋ ৯ থাকিলে, উভয়ে মিলিয়া দীর্ঘ একাদেশ হয়) এই সূত্রানুসারে, দীর্ঘত্ব প্রাপ্তি হইবে। অর্থাৎ গঙ্গে-ঈন্দ্র, এইস্থলে "গঙ্গ ইন্দ্র" এইরূপ সঙ্গত প্রয়োগ না হইয়া, "গঙ্গেন্দ্র" এইরূপ অসঙ্গত প্রয়োগ হইতে থাকিবে।

ভাষ্যমূল।—হ্রস্ববিধিপ্রতিষেধঃ*। দীর্ঘে হ্রস্বাশ্রয়ো বিধিঃ প্রাপ্নোতি স প্রতিষেধ্যঃ। আলূয়। প্রলূয়। হ্রস্বস্য পিতি কৃতি তুগ্ ভবতীতি তুক্ প্রাপ্নোতি। নৈষ দোষঃ। আচার্য্যপ্রবৃত্তির্জ্ঞাপয়তি ন দীর্ঘে হ্রস্বাশ্রয়ো বিধির্ভবতি। যদয়ং দীর্ঘাচ্ছে একং শাস্তি। নৈতদস্তি জ্ঞাপকম্। অস্তি হ্যন্যদেতস্য বচনে প্রয়োজনম্। কিম্। পদান্তাদ্বেতি বিভাষাং বক্ষ্যামীতি।

বঙ্গানুবাদ।—এক্ষণে ইহাতে অন্য দোষও দেখান হইতেছে। দীর্ঘ কার্য্যে হ্রস্ব বিধি নিষিদ্ধ হইবে। *।

দীর্ঘ কার্য্য কর্ত্তব্য হইলে, যে সকল স্থলে হ্রস্ব নিমিত্ত বিধি প্রাপ্ত হয়, সেই সকল বিধি নিষেধ করিতে হইবে। যথা:—আ+লূ+ক্যপ্=আলূয়। প্র+লূ+ক্যপ্=প্রলূয়। যদি দীর্ঘাদেশ কালে হ্রস্ব নিমিত্ত বিধি নিষেধ করা না হইত; তবে এখানেও "হ্রস্বস্য পিতি কৃতি তুক্" ৬।১।৭১। (পকার ইৎ প্রত্যয় ও ককার ইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে, হ্রস্বের পরে তুক্ আগম হয়) এই সূত্রানুসারে এই স্থলেও তুক্ আগম হইত। তাহা হইলে বিশুদ্ধ 'আলূয়' 'প্রলূয়' প্রয়োগ না হইয়া, 'আলূত্য' 'প্রলূত্য' প্রভৃতি অশুদ্ধ প্রয়োগ হইতে থাকিত।

তাৎপর্য্যার্থঃ—যদি দীর্ঘ উকার গ্রহণে, তদংশবর্ত্তী হ্রস্ব উকারেরও উ+উ=ঊ হওয়াতে, ঊর শেষাংশও উ হওয়াতে) গ্রহণ হইত, তবে লূ ধাতুর ঊকারে, হ্রস্ব উ থাকাতে, হ্রস্ব উকারান্ত ধাতুর উত্তর যেরূপ তুক্ আগম হইয়া থাকে, সেরূপ দীর্ঘ ঊকারান্ত ধাতুর উত্তরও তুক্ আগম হইয়া, অসঙ্গত প্রয়োগ হইবে।

এই স্থলে দোষ হইবে না। কেন না এরূপ অভিপ্রায় আচার্য্য পাণিনিই জানাইয়াছেন যে, দীর্ঘ নিমিত্তক কার্য্য কর্ত্তব্য হইলে, হ্রস্ব নিমিত্তক বিধি প্রাপ্তি

হয় না। যেহেতু তিনি "দীর্ঘাৎ" ৬।১।৭৫। (দীর্ঘের পরে ছ থাকিলে, তুক্ আগম হয়) এই সূত্রে 'দীর্ঘের পরে ছ থাকিলে, তুক্ আগম হয়,'' এইরূপ বিধান করিয়াছেন। যদি হ্রস্বগ্রহণে দীর্ঘেরও গ্রহণ হইত, তবে "হ্রস্বস্য পিতি কিতি তুক্" এই সূত্রের দ্বারায় সর্ব্বত্র তুক্ আদেশ প্রাপ্ত হইত। "দীর্ঘাৎ" এই সূত্রের দ্বারায় আর দীর্ঘের পরে ছ থাকিলে, তুক্ আদেশ করিবার প্রয়োজন হইত না।

এ স্থলে ইহা জ্ঞাপক হইতে পারে না। কেননা এ স্থলে ছে চ ৬।১।৭৩। (হ্রস্বের পরে ছ থাকিলে তুক্ আগম হয়) এই সূত্রে অনুবৃত্তি আসিয়াই কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে। সুতরাংই পুনঃ 'দীর্ঘাৎ' এই সূত্র করিবার অন্য প্রয়োজন আছে।

কিসেই প্রয়োজন?

পদান্তাদ্বা ৬।১।৭৬। (পদান্ত দীর্ঘবর্ণের পরে ছ থাকিলে, বিকল্পে তুক্ আগম হয়) এই সূত্রানুসারে "পদান্ত দীর্ঘের পরে ছ থাকিলে, বিকল্পে তুক্ আগম হয়'', এইরূপ বলা হইবে। এবং সেই জন্যই এখানে 'দীর্ঘাৎ' এই সূত্র করা হইয়াছে।

ভাষ্যমূল।—যত্তর্হি যোগবিভাগং করোতি ইতরথা হি দীর্ঘাৎপদান্তাদ্বেত্যেব ব্রূয়াৎ। ইহ তর্হি খট্বাভিঃ মালাভিঃ। অতো ভিস্ঐসিতৈাসভাবঃ প্রাপ্নোতি। তপরকরণসামর্থ্যান্ন ভবিষ্যতি। ইহ তর্হি যাতা বাতা অতো লোপ। আর্দ্ধধাতুকে ইত্যকারলোপঃ প্রাপ্নোতি। ননু চাত্রাপি তপরকরণ সামর্থ্যাদেব ন ভবিষ্যতি। অস্তিহন্যত্তপরকরণে প্রয়োজনম্। কিম্। সবর্ণস্য লোপো মা ভূদিতি। অথ ক্রিয়মাণেঽপি তপরে পরস্য লোপে কৃতে পূর্ব্বস্য কস্মান্ন ভবতি। পরলোপস্য স্থানিবদ্ভাবাদসিদ্ধত্বাচ্চ।

বঙ্গানুবাদ।—তবে যদি এই সূত্রে যোগ বিভাগ করা যায়, তাহা হইলে কি দোষ হইবে?

তাহা হইলে, অন্য প্রকার অর্থ হইবে। "দীর্ঘাৎ পদান্তাদ্বা" (দীর্ঘের পরেত তুক্ আগম হইবেই, পদান্ত দীর্ঘের পরেও বিকল্পে তুক্ আগম হইবে।) তাহা হইলে সিদ্ধান্তস্বরূপে এইরূপ অর্থই হইবে যে, "দীর্ঘ বর্ণের পরে নিয়ত তুক্ আগম হয় এবং পদান্ত দীর্ঘের পরে বিকল্পে তুক আগম হইবে" এইরূপ বলিতে হইবে।

এখানেও তবে, খট্বা ও মালা শব্দের উত্তর, তৃতীয়ার বহুবচনে ভিস্ প্রত্যয়

করিয়া অকারান্ত শব্দের উত্তর "অতোভিসঐস্" ৭।১।৯। (অকারান্ত অঙ্গের পরস্থিত ভিস্ স্থানে ঐস্ আদেশ হয়) এই সূত্রানুসারে ঐস্ আদেশ প্রাপ্ত হইবে। কেননা, খট্বা শব্দের আকারের অন্তর্বর্ত্তী দুই অকার থাকাতে, অকার প্রযুক্ত যে কার্য্য হইয়া থাকে, আকার প্রযুক্তও সেই কার্য্য হইবে। অতএব 'খট্বাভিঃ' এইরূপ সঙ্গত প্রয়োগ না হইয়া খট্বৈঃ এইরূপ অসঙ্গত প্রয়োগ হইবে।

এরূপ অসঙ্গত প্রয়োগ হইবে না। যেহেতু "অতোভিসঐস্" এই সূত্রে ত কার পরে আছে এমন যে অকার, তৎপরস্থিত ভিস্ স্থানে ঐস্ আদেশ হয়। সুতরাং কেবলমাত্র হ্রস্ব অকারের পরেই ঐস্ হইবে, দীর্ঘ আকারের পরে ঐস হইবে না। তাহা হইলেই খট্বা শব্দের পরে ঐস্ হইয়া যে অশুদ্ধ প্রয়োগ হওয়ার সম্ভব ছিল, তাহা হইবে না।

এই স্থানে দোষ না হইলেও যাতা বাতা এইস্থলে "অতোলোপ আর্দ্ধধাতুকে" ৬।৪।৪৬। (আর্দ্ধধাতুক উপদেশ কালে যে অকারান্ত শব্দ, তাহার অকারের লোপ হয়, আর্দ্ধধাতুক (১) পরে থাকিলে) এই সূত্রানুসারে আকারের লোপ হইবে।

যদি বল যে, এইস্থলেও 'অতোলোপ' সূত্র, অকারের পরে ত কার থাকাতে, কেবল মাত্র হ্রস্ব অকারেরই লোপ হইবে, আকারের লোপ হইবে না; কিন্তু তাহা ঠিক নহে, কেননা এ স্থলে তকারান্ত শব্দ প্রয়োগ করিবার অন্য উদ্দেশ্য আছে।

কি সেই উদ্দেশ্য?

সর্ব্বাংশের লোপ যাহাতে না হয় অর্থাৎ যাতা, বাতা এই শব্দদ্বয়ের এক একটী আকারের মধ্যে যে দুই দুইটী অকার আছে, সেই অকারের লোপ না হইয়া কেবলমাত্র, অন্তে স্থিত একটী অকারেরই যাহাতে লোপ হয়, ইহাই উদ্দেশ্য। অতএব, এস্থানে তকার পরে, থাকিলেও পরের অকারের লোপ করিয়া, পূর্ব্ব অকার মাত্রেরই কেন লোপ হয় না?

পরের অকার লোপ হইলেও "স্থানিবদ্ভাব" (যে বর্ণের স্থানে যে বর্ণ আদেশ হয়, সেই বর্ণ তাহার স্থানির (১) ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়) প্রযুক্ত পুনরায

(১) তিপ্ তস্ ঝি প্রভৃতি তিঙন্ত প্রত্যয় সমূহ এবং শকার ইৎ বিশিষ্ট প্রত্যয় সমূহকে সার্ব্বধাতুক বলে। তদ্ভিন্ন অন্যান্য প্রত্যয়সমূহকে আর্দ্ধধাতুক সংজ্ঞা বলে।

অকারস্থ ধর্ম্মই প্রাপ্ত হইবে। অথবা "অসিদ্ধবদত্রাভাৎ ৬।৪।২২। (ষষ্ঠ অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের এই দ্বাবিংশতি সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া এই অধ্যায় সমাপ্তি পর্য্যন্ত, সমান আশ্রয় প্রযুক্ত কোনও কার্য্য প্রাপ্তি হইলে, তাহা পর-সূত্রের দৃষ্টিতে পূর্ব্ব সূত্র অসিদ্ধ হয়) সুতরাং পূর্ব্বের প্রতি পর সূত্র অসিদ্ধ হয় বলিয়া, এই স্থলেও লোপ বিধায়ক শাস্ত্র পরে বিধান করাতে লোপ হইবে না।

ভাষ্যমূল।—এবং তর্হ্যাচার্য্য প্রবৃত্তির্জ্ঞাপয়তি ন আকারস্থস্যাকারস্য লোপো ভবতীতি যদয়মাতোঽনুপসর্গে ক ইতি ককারমনুবন্ধং করোতি কথং কৃত্বা জ্ঞাপকম্। কিৎকরণে এতৎ প্রয়োজনং। কিতীত্যাকারলোপো যথা স্যাদিতি। যদ্যাকারস্থাকারস্য লোপঃ স্যাৎ কিৎকরণমনর্থকং স্যাৎ। পরস্য অকারস্যালোপে কৃতে দ্বয়োরকারয়োঃ পররূপে হি সিদ্ধং রূপং স্যাদ্ গোদঃ কম্বলদ ইতি।

বঙ্গানুবাদ।—এই প্রকারে আচার্য্য পাণিনির অভিপ্রায়ই জানা যাইতেছে যে, আকারস্থিত অকারের লোপ হয় না। যেহেতু তিনি "আতোঽনুপসর্গে কঃ" ৩।২।৩। (উপসর্গ ভিন্ন কর্ম্ম উপপদে থাকিলে, আকারান্ত ধাতুর ক প্রত্যয়ই হয়, অন্ প্রত্যয় হয় না।) এই সূত্রে যে অ প্রত্যয় না করিয়া ক কার লোপ বিশিষ্ট প্রত্যয় করিয়াছেন, তাহা কেবল আকারস্থিত অকারের লোপ হয় না, ইহাই জানাইবার জন্য।

ইহাতে কি প্রকারে আচার্য্যের এইরূপ অভিপ্রায় জ্ঞাপিত হইতেছে?

এই স্থলে অ প্রত্যয়ের দ্বারায় কর্ম্মসিদ্ধি হইলেও যখন পুনরায় ক কার ইৎ (লোপ) বিশিষ্ট প্রত্যয় করা হইয়াছে, তখন তাহাতে ইহাই জানা যাইতেছে যে, "আতো লোপ ইটি চ" ৬।৪।৬৪। (স্বরবর্ণ আদিতে আছে এমন যে, আর্দ্ধধাতুক সংজ্ঞক গকার ইৎ ককার ইৎ ঙকার ইৎ ধাতু তাহাদের এবং ইট্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণসমূহের পরে যে আকার, তাহার লোপ হয়) এই সূত্রে, ক কার লোপবিশিষ্ট প্রত্যয় করিবার ইহাই প্রয়োজন যে, যেন আকারের লোপ হইতে পারে। যদি আকারাভ্যন্তরস্থিত অ কারের লোপই হইত, তাহা হইলে এই সূত্রে ককার ইৎবিশিষ্ট প্রত্যয় করা অনর্থক হইত। কেনই বা সূত্রে ককার ইৎবিশিষ্ট প্রত্যয় করা ব্যর্থ হইবে? আকারের শেষ অংশ অকারের লোপ করিলেও ত পদ সিদ্ধ হইবেই। যেমন—"গাং দদাতি ইতি গোদঃ, কম্বলং দদাতি ইতি কম্বলদ", এই স্থলে, দা ধাতুর আকারের শেষাংশস্থিত অকার, ক প্রত্যয় করিয়া লোপ করিলে, যে দকার থাকিবে, তাহার

অকারের সহিত, ক প্রত্যয়ের অকারের পররূপ (১) করিয়া, গোদঃ কম্বলদঃ রূপ সিদ্ধ হইবে।

পুনঃ যদি ফলে সেই হইল, তবেও ত সূত্রে ককার ইৎবিশিষ্ট প্রত্যয় করা নিষ্ফলই হইল ?

ভাষ্যমূল।—পশ্যতি ত্বাচার্য্যো নাকারস্থস্যাকারস্য লোপঃ স্যাদিতি। অতঃ ককারমনুবন্ধনং করোতি। নৈতদস্তিজ্ঞাপকম্। উত্তরার্থমেতৎস্যাৎ তুন্দ-শোকয়োঃ পরিমৃজাপনুদোরিতি। যত্তর্হি গাপোষ্টগিত্যনন্যার্থং ককারমনুবন্ধং করোতি।

বঙ্গানুবাদ।—পাণিনি ইহা দেখিয়াছিলেন এবং এই জন্যই আকারস্থিত অকারের যাহাতে লোপ না হয়, তন্নিমিত্ত এই সূত্রে ককার অনুবন্ধ (লোপ) বিশিষ্ট প্রত্যয় করিয়াছেন।

ইহা কখনও ককার অনুবন্ধের জ্ঞাপক হইতে পারে না। এই স্থলে ককার অনুবন্ধ বিশিষ্ট প্রত্যয় করিবার অন্য প্রয়োজন আছে। যাহাতে পরবর্ত্তী "তুন্দশোকয়োঃ পরিমৃজাপনুদো" ৩।২।৫। [তুন্দ এবং শোক এই দুই কর্ম্মপদ উপপদে (পূর্ব্বপদে) আছে যাহার; এমন যে পরিপূর্ব্বক মৃজ্ ধাতু, এবং অপ্ পূর্ব্বক নুদ্ ধাতু ইহাদের উত্তর ক প্রত্যয় হয়] এই সূত্রে ককার ইৎ প্রযুক্ত অকারের লোপ হইয়া থাকে ; এই ফল দেখাইবার জন্যই পূর্ব্ব সূত্রে ককারানুবন্ধ বিশিষ্ট প্রত্যয় করা প্রয়োজন ; অন্যথা "পরিমৃজ" এইরূপ প্রয়োগ না হইয়া, "পরিমার্জ" এইরূপ প্রয়োগ হইত।

এই সকল এইরূপ হইলেও "গাপোষ্টক্" ৩।২।৮ (উপসর্গ পূর্ব্বে না থাকিলে, অথচ কর্ম্মপদ পূর্ব্বে না থাকিলে, অথচ কর্ম্মপদ পূর্ব্বে থাকিলে, গা ধাতু এবং পা ধাতুর উত্তর টক্ প্রত্যয় হয়। যথা সামং গায়তি ইতি সামগঃ) এই সূত্রে ককার অনুবন্ধবিশিষ্ট প্রত্যয় করিবার, আকার লোপ ভিন্ন অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই ; সুতরাং এই অনন্যোপায় স্থলে অন্য অর্থ না হয়, এই জন্যই ককার অনুবন্ধবিশিষ্ট প্রত্যয় করিয়াছেন। এবং ইহাতেই আচার্য্যের অভিপ্রায়ও এইরূপ জানা যাইতেছে।

ভাষ্যমূল।—একবর্ণবচ্চ *। একবর্ণবচ্চ দীর্ঘো ভবতীতি বক্তব্যম্। কিং

(১) পূর্ব্ব এবং পরের স্থানে যে একটীমাত্র আদেশ, তাহাকে পররূপ বলে। অতোগুণে ৬।১।৯৭। (পদান্ত ভিন্ন অকারের পরে গুণবিশিষ্ট কোনও বর্ণ থাকিলে অর্থাৎ অ, এ, ও থাকিলে, পররূপ একাদেশ অর্থাৎ পূর্ব্বাপর স্থানে অ, এ অথবা ও হইয়া থাকে।

প্রয়োজনম্। বাচা ভবতীতি দ্ব্যজ্লক্ষণঃ ঠন্মা ভূদিতি। ইহ চ বাচো নিমিত্তং তস্য নিমিত্তং সংযোগোৎপাতাবিত্যনুবর্ত্তমানে গো দ্ব্যচ ইতি দ্ব্যজ্লক্ষণো যন্মা ভূদিতি। অত্রাপি গোনৌগ্রহণং জ্ঞাপকং দীর্ঘাদ্ দ্ব্যজ্লক্ষণো বিধির্ন ভবতীতি। অয়ং তু সর্ব্বেষামেব পরিহারঃ।

বঙ্গানুবাদ।—দীর্ঘশব্দ একবর্ণ বিশিষ্ট হইবে। *

"দীর্ঘ বর্ণ সমূহ একবর্ণ বিশিষ্ট হয়" এইরূপ বলিতে হইবে।

কেন এরূপ বলিতে হইবে? ভাবার্থঃ—অ+অ এই দুই বর্ণ মিলিয়াই যখন দীর্ঘ আ এবং ই+ই এই দুই বর্ণ মিলিয়া যখন দীর্ঘ ঈ প্রভৃতি বর্ণ হইয়াছে, তখন দীর্ঘ বর্ণকে একটী বর্ণ কেন বলিতে হইবে?

যদি দীর্ঘ বর্ণও দুইটী স্বরবর্ণ বলিয়া গ্রহণ; তবে "বাচা তরতি" (বাক্য প্রয়োগ দ্বারা পার হইতেছে) এই স্থলে বাক্ শব্দের উত্তর 'ঠন্' প্রত্যয় হইবে না। যেহেতু "নৌদ্ব্যচষ্ঠন" ৪।৪।৭ (নৌশব্দের উত্তর এবং দুই স্বরবর্ণ বিশিষ্ট শব্দের উত্তর 'ঠন্' প্রত্যয় হয়, যথা বাহুভ্যাং তরতি ইতি বাহুক) এই সূত্রানুসারে, বাক্শব্দের আকারে দুই স্বরবর্ণ থাকাতে, বাক্শব্দের উত্তরও 'ঠন' প্রত্যয় হইবে। এইরূপ অসঙ্গত প্রয়োগ না হয়, এই জন্যও দীর্ঘ বর্ণকে দুই বা ততোধিক বর্ণ না বলিয়া একস্বর বিশিষ্ট বর্ণই বলিতে হইবে।

অথবা "গোদ্ব্যচোঽসংখ্যা পরিমাণাশ্বদের্য্যৎ" ৫।১।৩৯ (গো শব্দের উত্তর সংখ্যা ও পরিমাণ ভিন্ন দুই স্বরবর্ণবিশিষ্ট শব্দের উত্তর, অশ্বাদিগণের উত্তর; নিমিত্ত, সংযোগ বা উপ, অবগম্যমান হইলে, 'যৎ' প্রত্যয় হয়। যথাঃ— গব্যঃ যশস্ত ইত্যাদি) এই সূত্রানুসারে, 'বাক্' এই শব্দের স্থানে, ও বাক্যের যে নিমিত্ত এবং তন্নিমিত্ত যে সংযোগ, উৎপাত, পশ্চাৎ বর্ত্তমান থাকিলে, 'বাক্' শব্দের আকারে দুই স্বরবর্ণ লক্ষণ মানিয়া যৎ প্রত্যয় হইবে। আর এই সূত্রদ্বয়ে, গো শব্দ এবং নৌ শব্দ গ্রহণ করাতে, ইহাও বিজ্ঞাপিত হইতেছে যে, দীর্ঘ বর্ণে দুই স্বরবর্ণ লক্ষণ নিমিত্ত বিধি হয় না। যদি দীর্ঘ গ্রহণে, দুই স্বরবর্ণেরই গ্রহণ হইত; তবে পূর্ব্বোক্ত সূত্রদ্বয়ে, দুই স্বরবর্ণেরই গ্রহণ হইত, তবে পূর্ব্বোক্ত সূত্রদ্বয়ে, দুই স্বরবর্ণের উত্তর 'ঠন্' ও 'যৎ' প্রত্যয় করাতেই, গো শব্দের দীর্ঘবর্ণ ওকারে এবং নৌশব্দের দীর্ঘ বর্ণ ঔকারে দুই স্বরবর্ণ থাকাতেই প্রয়োগ সিদ্ধি হইত। সূত্রদ্বয়ে গো এবং নৌ শব্দ প্রয়োগ করিবার কোনও প্রয়োজন হইত না। অতএব সূত্রেতে যখন কেবল দুই স্বর-বর্ণবিশিষ্ট শব্দের উত্তর ঠন্ ও যৎ প্রত্যয় না করিয়া, গো এবং নৌশব্দ গ্রহণ

করা হইয়াছে, তখন তাহাতে ইহাই জানা যাইতেছে যে, দীর্ঘ বর্ণে দুই স্বরবর্ণ বিশিষ্ট বিধি প্রাপ্ত হয় না। এবং এই প্রকারে সকল প্রকার শঙ্কারই পরিহার হইতেছে।

ভাষ্যমূল।—নাব্যপবৃক্তস্যাবয়বস্য তদ্বিবির্যথা দ্রব্যেষু*। নাব্যপবৃক্তস্যাবয়বাশ্রয়ো বিধি র্ভবতি যথা দ্রব্যেষু। তদ্যথা। দ্রব্যেষু সপ্তদশ সামিধেন্যো ভবন্তীতি ন সপ্তদশারত্নিমাত্রং কাষ্ঠমগ্নাবভ্যাধীয়তে।

বঙ্গানুবাদ।—অভিন্ন অবয়বের ভিন্ন বুদ্ধি হয় না, যেমন দ্রব্যাদিতে*। যেমন কোনও ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য সমূহে একত্ব বুদ্ধি হয় না, সেইরূপ একটী মাত্র অভিন্ন অবয়ব বিশিষ্ট বর্ণে, ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব প্রযুক্ত বিধি প্রাপ্ত হইবে না। তাহার দৃষ্টান্ত এই যে, যজ্ঞের ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য সকলের মধ্যে ১৭টী সামধেনীর (১) প্রয়োজন হয়। সেই স্থলে এক এক অরত্নি বিশিষ্ট সতেরটী সামধেনী প্রয়োগ না করিয়া একেবারে সতের অরত্নিবিশিষ্ট একটী সামধেনী কদাপি অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়-না।

ভাষ্যমূল।—বিষম উপন্যাসঃ। প্রত্যচ্যং চৈব হি তৎকর্ম্ম চোদ্যতে। অসংভবশ্চাগ্নৌ বেত্যাং চ। যথা তত্র সপ্তদশ প্রাদেশমাত্রীরাশ্বত্থাঃ সামিধোভ্যাদধীতেতি ন সপ্তদশ প্রাদেশমাত্রং কাষ্ঠমগ্নাবভ্যাধীয়তে। অত্রাপি প্রতিপ্রনবং চৈত তৎকর্ম্ম চোদ্যতে। তুল্যশ্চাসংভবোহগ্নৌ বেদ্যাং চ।

বঙ্গানুবাদ।—এই দৃষ্টান্ত এই স্থলে অতুল্যরূপে প্রয়োগ করা হইতেছে। এখানে ইহা কদাপি তুল্য দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। যেহেতু যজ্ঞকর্ম্মে যে সপ্তদশ সামধেনীর দ্বারা আহুতির ব্যবস্থা বেদে আছে, সেই স্থলে এইরূপও বিধান আছে যে, এক একটী মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক এক একটী সামধেনী অগ্নিতে প্রয়োগ করিতে হইবে। যদি একেবারে সপ্তদশ অরত্নিপারমিত সামধেনী অগ্নিতে আহুতি দেওয়া যায়, তাহা হইলে বেদেতে যে প্রতি মন্ত্র পড়িয়া এক এক অরত্নিপরিমিত প্রত্যেকটী সামধেনী প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে, সেই ব্যবস্থা রক্ষিত হয় না। বিশেষতঃ আহুতি প্রদানের যোগ্য ক্ষুদ্র অবয়ব বিশিষ্ট অগ্নিকুণ্ডে এবং বেদিতে সতের হাত বিশিষ্ট এক খান কাষ্ঠ আহুতি দেওয়াও একান্ত অসম্ভব।

ভাল, তবে সপ্তদশ অরত্নিবিশিষ্ট একটী কাষ্ঠ একেবারে অগ্নিতে প্রয়োগ করা অসম্ভব বলিয়া, এই দৃষ্টান্ত না হয় অসঙ্গতই হইল; কিন্তু যে স্থানে "সতের প্রাদেশমাত্র অশ্বত্থ শাখা দ্বারা সমিধ আধান (আহুতি প্রদান) করিবে" এইরূপ

বেদে বিধান আছে, এই স্থলে ত আহুতি প্রদান ক্ষুদ্র কাষ্ঠ বলিয়া আহুতি প্রদান অসম্ভব না হইলেও সপ্তদশ প্রাদেশপরিমিত একখানি কাষ্ঠ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করে না।

ইহাও তুল্য দৃষ্টান্ত হইল না। এই স্থলেও এক একটী প্রণব উচ্চারণ করিয়া, এক এক প্রাদেশ পরিমিত এক একটী অশ্বথ শাখা আহুতি প্রদানের ব্যবস্থা আছে। সুতরাং একবারে সপ্তদশ প্রাদেশ বিশিষ্ট একটী অশ্বথ শাখা আহুতি প্রদান করিলে, বেদের সেই ব্যবস্থাও সুরক্ষিত হইবে না। আর এই স্থলে কাষ্ঠ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইলেও অতি ক্ষুদ্রাবয়ব বিশিষ্ট অগ্নিকুণ্ডে বা বেদীতে, সতের প্রাদেশপরিমিত একটী কাষ্ঠ আহুতি প্রদান করা, পূর্ব্বোক্ত গাভের অবভ্রির ন্যায়, তুল্য অসম্ভবই হইবে। কিন্তু বর্ণসমূহে ভিন্ন ভিন্ন *অবয়ব প্রযুক্ত কার্য্য করা সেরূপ অসম্ভব নহে। এই জন্যই এই দৃষ্টান্ত তুল্য* হইতে পারে না।

ভাষ্যমূল।—যথা তর্হি তৈলং ন বিক্রেতব্যং মাংসং ন বিক্রেতব্যমিতি ব্যপবৃক্তং চ ন বিক্রীয়তে। অব্যপবৃক্তং গাবঃ সর্ষপাশ্চ বিক্রীয়ন্তে। তথা লোমনখং স্পৃষ্ট্বা শৌচং কর্ত্তব্যমিতি ব্যপবৃক্তং স্পৃষ্ট্বা নিয়োগতঃ কর্ত্তব্যম্। অব্যপবৃক্তে কামচারঃ যত্র তর্হি ব্যপবর্গোঽস্তি। ক চ ব্যপবর্গোঽস্তি। সন্ধ্যক্ষরেষু। সন্ধ্যক্ষরেষু বিবৃততরাৎ *। যদত্রাবর্ণং বিবৃততরং তদন্যস্মাদবর্ণাদন্যেপীবর্ণোবর্ণে বিবৃততরে তে অন্যাভ্যামিবর্ণোবর্ণাভ্যাম্।

বঙ্গানুবাদ।—এস্থানে অসঙ্গত হইলেও, দৃষ্টান্তান্তর গ্রহণ করা যাইতেছে। যেমন "ব্রাহ্মণের তৈল বিক্রয় করা কর্ত্তব্য নহে, মাংস বিক্রয় করা কর্ত্তব্য নহে" শাস্ত্রে যেখানে এইরূপ ব্যবস্থা আছে, সেখানে ইহাই জানিতে হইবে যে, তিলের সারাংশ এবং মাংসের যে খণ্ডসমূহ, তাহাই বিক্রয় করিতে নিষেধ করা হইয়াছে; কিন্তু অখণ্ড গো বা অপিষ্ট সর্ষপ বিক্রয় করিয়াই থাকে। অথবা যেমন, যেখানে লোম নখ স্পর্শ করিলে, হস্তাদি প্রক্ষালন ব্যবস্থা আছে, সেখানে ছিন্ন লোম, খণ্ড নখ স্পর্শ করিলে, হস্তাদি প্রক্ষালন করা, শাস্ত্রের বিধান অনুসারেই কর্ত্তব্য; কিন্তু অভিন্ন লোম অখণ্ড নখ স্পর্শ করিয়া হস্ত প্রক্ষালন করা না করা নিজের ইচ্ছাধীন। সুতরাং ইহাতে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, বর্ণগ্রহণে বর্ণের একদেশ গ্রহণ হইতে পারে না।

আ ঈ ঊ প্রভৃতি স্থলে না হয়, বর্ণের একদেশ গ্রহণ নাই হইল, যেখানে সুস্পষ্টরূপে বর্ণের শ্রবণ হয়, সেখানে কি হইবে?

একত্ব ও বহুত্ব।

(শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।)

নানাত্বের মধ্যে একত্ব অনুভব করাই জ্ঞানের উৎকর্ষ অবস্থা। এ জ্ঞান বলিতে বিচার সিদ্ধ জ্ঞান বুঝিতে হইবে। যেমন এক খণ্ড মৃত্তিকা বিচার করিয়া মৃত্তিকানির্ম্মিত ঘটশরাবাদিকে মৃত্তিকা হইতে অভেদ মনে করা। ঘট শরাবাদি নানাত্বে তদ্রূপ একত্ব জ্ঞান বিচারসিদ্ধ জ্ঞান। এই বিচারসিদ্ধ জ্ঞানে আমাদিগকে আপাতবিরুদ্ধ বস্তুবৈষম্যের মধ্যে সাম্যভাবের ছায়া আনিয়া দেয়। বিচারপ্রণালীতে এইরূপ একত্ব জ্ঞানলাভ পরোক্ষ জ্ঞান। প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ জ্ঞানে মৃত্তিকার অস্তিত্ব ভিন্ন মৃদ্ বা ঘটশরাবাদি বলিয়া পৃথক্ কোন জ্ঞান থাকে না।

জাগতিক জ্ঞান মাত্রই দ্বৈতসংঘাতোৎপন্ন বা দ্বন্দ্বসাপেক্ষী। তুলনা ভিন্ন বাহ্যিক বা আন্তরিক জগতের বস্তুজ্ঞান জন্মিতে পারে না। যেখানে তুলনা সেখানেই দ্বৈতকল্পনা। নতুবা তুলনা করিবে কাহার সহিত? অতএব যেখানে বাহ্যিক বা আন্তরিক ভাব (Ideas), সেখানেই দ্বৈতভাব। আলো আছে, তাই আঁধার জ্ঞান। সুখ আছে তাই দুঃখ জ্ঞান। অথবা আঁধার আছে তাই আলো জ্ঞান; দুঃখ আছে তাই সুখজ্ঞান। এই দ্বন্দ্বভাব বীজাঙ্কুর ন্যায়ে অনাদিকাল প্রবহমান। দ্বন্দ্বভাব যদি অনাদিসিদ্ধ হয়, তবে বেদান্তবেদ্য একত্বজ্ঞান কিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে? ইহাই এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

পূর্ব্বকথিত মৃত্তিকা ও ঘটাদি দৃষ্টান্ত অবশ্যই বলিতে হইবে যে, নামরূপাদি উপাধিবশতঃ মৃত্তিকা ও ঘটাদি বিভিন্ন হইলেও প্রকৃতপক্ষে উভয়ই এক পদার্থ। ঘটশরাবাদি ভাঙ্গিয়া স্তূপাকার কর; দেখিবে "মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্"। এইরূপ যাহাকে তুমি দ্বন্দ্বভাবাপন্ন মনে করিতেছ সূক্ষ্ম বিচারে তাহা একেরই বিভিন্ন পরিণাম মাত্র প্রতীত হইবে। স্থূলদৃষ্টিতে আলো আঁধারে নিতান্ত বিরুদ্ধ প্রতীয়মান হইলেও বিচারসিদ্ধ জ্ঞানে তাহা একই পদার্থ। এক স্থলে আলো-পরমাণুর পরিস্পন্দনাভাব; অন্যত্র পূর্ণপরিস্পন্দন। তীব্র আলোকগোলকে দৃষ্টিপাত করিয়া অন্ধকার দেখিতে পাইবে; অন্ধকারে অন্ধকারজ্ঞান ত স্বতঃসিদ্ধ। ফলে একই দাঁড়াইতেছে। কারণ ভাবিয়া দেখ "ভাবরাজ্যে নিরপেক্ষ সত্তা ও অসত্তা একই পদার্থ"। সুখ যাকে মনে কর তা

অবশ্যই আপেক্ষিক দুঃখের তুলনায়। সে সুখ পদার্থকে বুদ্ধির অনুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করিয়া দেখ, তাহাতে অনন্ত দুঃখের কীটাণু দেখিতে পাইবে। দুঃখেও সেরূপ অনন্ত সুখকীটাণু দৃষ্ট হইবে। সুতরাং ফল যখন একই দাঁড়াইতেছে, তখন সুখ দুঃখকে আর বিভিন্ন বলিয়া মনে কর কেন? উপকারের সঙ্গে সঙ্গেই অপকারের বীজ অঙ্কুরিত; আবার অপকারের সঙ্গে সঙ্গেই পরোপকারের অযুত উৎসা উন্মুক্ত হইতেছে। ভালতে মন্দের বীজ মন্দে ভালর বীজ সমপরিমাণে উক্ত হইতেছে। সুতরাং ভাল মন্দ বা সুখ দুঃখের নির্দ্দোষ সংজ্ঞা হইতে পারে কি? সরল রেখাকে বাড়াইয়া দেও; ক্রমে বক্র হইয়া আসিবে; বক্র রেখাতে আবার অনন্ত সরল রেখার সমষ্টি দেখিতে পাইবে। তবে আর সরল ও বক্র রেখার ভিন্নতা কোথায়? ভালবাসা ও বিরহে সমসুখ; একথা ভুক্তভোগী প্রেমিক ও বিরহীর অভিমত। স্বর্গে নরকভীতি, নরকে আবার স্বর্গলাভেচ্ছা সমভাবে মনের শান্তি বিনষ্ট করিতেছে। অতি নিম্ন ও অত্যুচ্চ দেশ বিভিন্ন দিক্ হইতে এক পদার্থ নয় কি? পূর্ণ শক্তির বিকাশে নিষ্পন্দতা আনয়ন করে. আবার নিষ্পন্দনাবস্থা পূর্ণশক্তির বিকাশভূমি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, এক সাপেরই চল ও অচলভাব মহাশক্তি ও ব্রহ্মের ভাব প্রকাশ করে। পূর্ণ বাগ্মীতা মৌনভাবের পরিচায়ক; পক্ষান্তরে মৌন ভাব বাচালতার উন্মেষক। জড়পদার্থ (matter) এবং মন (mind) একেরই স্থূল ও সূক্ষ্মাবস্থা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। একটী পদার্থের মাত্র প্রান্তদ্বয় দেখিয়া তাহাকে দুই মনে করা ত অজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া মাত্র। তড়িদনুপ্রাণিত কোন লৌহদণ্ডের দুই প্রান্তে পজিটিব্ (positive) এবং নেগেটিব্ (negative) তড়িচ্ছক্তি দেখিয়া লৌহদণ্ডকে দুই মনে করা নির্বুদ্ধিতার চিহ্ন। পণ্ডিত বলিতেছেন, একেরই এক মহাশক্তি দ্বিধা স্ফুরিত হইয়া positive ও negative আখ্যা প্রাপ্ত হইতেছে।

এইরূপ জগতের যে কোন দ্বন্দ্বভাব কেন বিশ্লেষণ করিয়া দেখনা, দেখিতে পাইবে, একই সত্তা বিভিন্নরূপে স্ফুরিত হইতেছে। শৈত্য ও উষ্ণতার নিঃশেষস্ফুরণ একই অবস্থার পরিচায়ক। অত্যন্ত শৈত্য এবং অত্যন্ত তাপে জল ফুটিয়া উঠে; ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ ও বিজ্ঞাননিষ্পাদিত তত্ত্ব। অত্যন্তাভাব পূর্ণভাবের উদ্ভাবক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে, আপাতসত্য জীবজগদাদি জ্ঞানীর চক্ষে ইন্দ্রজালবৎ অলীক; জ্ঞানীর জগদিন্দ্রজাল জ্ঞান অজ্ঞের উপহাসাস্পদ বিষয়। কাহারো মতে জন্ম কাহারও মতে মৃত্যু ভাবী সুখসোপান বলিয়া

বর্ণিত দৃষ্ট হয়। কেহ ক্রমোন্নতি (Evolution) কেহ বা ক্রমাবনতি (Involution) মতে এক ঘূর্ণিত চক্রেই অবস্থান করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দিকের বর্ণনা করিতেছে মাত্র। অত্যন্ত তাপ ভাবী জলধারা বর্ষণের এবং অত্যন্ত বর্ষণ ভাবীতীক্ষ্ণতাপদ্যোতক প্রতিপন্ন হইতেছে। স্তিমিত বায়ুমণ্ডলে প্রবল ঝড়ের পূর্ব্বাভাস এবং প্রবল ঝড়ে বায়ুমণ্ডলের ভাবী নিস্পন্দতা সূচিত হয়। অত্যন্ত দুঃখদুর্দ্দশা ভাবীসুখসূর্য্যোদয়ের এবং অত্যন্ত সুখলাভ ভাবী দুঃখদুর্দ্দশার স্পষ্ট পরিচায়ক। বৃক্ষ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া বীজে, এবং বীজ আবার বৃক্ষে পরিণত। জন্মে মৃত্যু এবং মৃত্যুতে ভাবী জন্মবীজ প্রোথিত রহিয়াছে। পূর্ণস্বাস্থ্যবান্ মৃত্যুপথে অগ্রসর; চিররোগী পূর্ণস্বাস্থ্য লাভে পুনর্জীবিত। জ্ঞানী মানবে মহা অজ্ঞতার চিহ্ন এবং অজ্ঞানী পশুপক্ষী কীট পতঙ্গকে অনন্ত জ্ঞানের প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। কখনো বা ধর্ম্মে অধর্ম্মের, অধর্ম্মে আবার ধর্ম্মের ভাবী বীজ নিহিত দৃষ্ট হইতেছে। বর্ত্তমান উন্নতি ও দিগোদ্ভাসী সভ্যতালোকে মৃত্যুর ছায়া এবং অনুন্নত অসভ্য অন্ধকারে ভাবী জীবনী চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছে। বৈজ্ঞানিক কল-যন্ত্রাদি সৃষ্টি করিয়া জগতের সুখ সুবিধা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যম্ভাবী বিপদাশঙ্কার সহস্রফণা বিস্তার করিতেছেন; পক্ষান্তরে বিপদাশঙ্কা দূরীকরণমানসে মানব নানা পন্থা আবিষ্কার করিতেছে। দুর্ভিক্ষে সুভিক্ষ এবং সুভিক্ষে দুর্ভিক্ষ সূচনা করিতেছে। দেশ বিশেষে কতিপয় ক্রোড়পতির অভ্যুত্থান স্বদেশবাসী অপর সাধারণের দীনদরিদ্রতা সূচনা করিতেছে; আবার ইতর সাধারণের নৈরুৎসাহ ও দৈন্য ভাবী ক্রোড়পতির অভ্যুত্থান প্রকাশ করিতেছে। ধর্ম্মগ্লানি ধর্ম্মসংস্থাপক মহাপুরুষগণের আগমন বিজ্ঞাপক। পক্ষান্তরে দেশবিশেষে মহাপুরুষ সংস্কারকগণের আগমন ধর্ম্মনামধারী তত্তদ্দেশবাসিগণের উচ্ছেদসাধক। রাজকার্য্যে উদাসীন বিলাসপরতন্ত্র নরপতি প্রজাবিদ্রোহানলে নিজ শোণিত দানে কর্ত্তব্য অপালনরূপ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন; প্রজাতন্ত্রমতের বিজয় দুন্দুভি ঘোষণা আবার রাজার অকর্ম্মণ্যতা ও অপারগতা সূচনা করিতেছে। সর্ব্বদেশে নৌবল ও সৈন্যবৃদ্ধি ভাবী কুরুক্ষেত্রের যবনিকা উত্তোলন করিতেছে; আবার মহাযুদ্ধের আয়োজনে নৌবল ও সৈন্যবল বৃদ্ধি হইতেছে। রাজার রাজ্যবহুদেশকে একত্রিত করিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ক্ষুদ্ররাজ্যের ভাবী সংস্থাপনা সূচনা করিতেছে; আবার বহুধাবিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যাদি ভাবী সাম্রাজ্য সংস্থাপক দিগ্বিজয়ীর রাজ্য পিপাসা বলবতী করিতেছে। অত্যন্ত অবসাদ অতি উদ্দী-

পনার কারণ হইয়া দাঁড়াইতেছে। অত্যন্ত কামকাঞ্চনাসক্তির অবকোটে বিল্বমঙ্গলকে ঈশ্বর লাভ করিতে দেখা যাইতেছে ; আবার সৃষ্টিস্থিতিলয়ে সিদ্ধকল্প বিশ্বামিত্রকে মেনকার রমণোন্মত্ত হইয়া আত্মবিস্মৃত দৃষ্ট হইতেছে। তরঙ্গের প্রবলোচ্ছ্বাস গভীর পতনের এবং গভীর পতন আবার ভাবী অভ্যুত্থানের সূচনা করিতেছে। কখনো বা বৈরাগ্য ভূয়সী ভোগাসক্তির ও বহুভোগাসক্তি বৈরাগ্যের সূচনা করিতেছে। এইরূপ একভাবই দুইরূপে স্ফুরিত হইয়া জগতের বিচিত্রতা উৎপাদন করিয়াছে।

একই বস্তু বা ভাব দর্শনে বিভিন্ন মানব আবার বিভিন্ন ভাবে অনুপ্রাণিত। একই স্ত্রীকে কেহ জননী কেহ প্রণয়িনী কেহ আবার নিরয়রূপিণী দর্শন করিতেছে। এক মানবই সম্বন্ধ বিশেষে কখন পিতা কখন পুত্র, কখন ভ্রাতা কখন বা মাতুলরূপে অভিহিত হইতেছে। ঘোর পূতিগন্ধ পরিপূর্ণ মহাশ্মশানে কেহ কালের বিকট ব্যাদান দর্শন করিয়া তাহা মহাদুর্নিরীক্ষ্য ও অপবিত্র মনে করিতেছে ; কেহ আবার সর্ব্বজনপরিত্যক্তাবস্থায় একমাত্র আশ্রয়দাতা জীবন্তবৈরাগ্যভূমি শ্মশানকে মহাপবিত্র মনে করিতেছে। একই শুক্তিতে কাহারো শুক্তিজ্ঞান কাহারো বা রজতভ্রম উপস্থিত হইতেছে। একই জল বারি, পাণি, ওয়াটার নাম ধারণ করিয়াছে। একই কাল জন্ম মৃত্যুরূপে অবস্থান করিতেছে। একই ভাবপ্রবণতা প্রেম প্রীতি, সৌহার্দ্দ ভক্তি, দ্বেষ, ঈর্ষারূপে স্ফুরিত হইতেছে। একই দেব ৩৩ কোটী দেবতারূপে, একই বায়ু প্রাণাপানাদিরূপে, একই তেজ অগ্নি বিদ্যুৎ সূর্য্যাদি রূপে স্ফুরিত হইয়া জগতের বিচিত্রতা উৎপাদন করিতেছে। একই দেব সর্ব্বভূতে গূঢ় অবস্থান করিতেছেন। একই গতি (motion) শব্দ, আলো, বিদ্যুৎ ও আকর্ষণ শক্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছে। এই সকলের ভিত্তিভূমি একই আত্মা এইরূপে বহুধা বর্ণিত হইতেছেন।

এই জগতের যে কোন বিষয় কেন পরিক্ষা করিয়া দেখ না, দেখিবে একই পদার্থ ক্রিয়ার পর প্রতিক্রিয়াতে,এবং প্রতিক্রিয়ার পর পুনঃ ক্রিয়াতে পরিণত হইয়া দ্বৈতাভাসে জীবকে প্রতারিত করিতেছে। মূলে একপদার্থই যেন দ্বৈত ও বহুত্বে পরিণত হইয়া জীবভ্রান্তি উৎপাদন করিতেছে, কিন্তু শ্রুতি এই বহুত্বের মধ্য দিয়া একাত্মানুভব করিয়া বলিতেছেন "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"। যখনই অলীক নানাত্বে জীবকে বিক্ষিপ্তচিত্ত করিতেছে আর্য্য ঋষি তখনই বলিতেছেন "নেহনানাস্তি কিঞ্চন"। এই একত্ব প্রথমতঃ বিচার প্রণালীতে

বুদ্ধিস্থ করিতে হইবে। পরে আত্মানুভব করিয়া পরমজ্ঞান পরমআনন্দে পরিমগ্ন হইবে। এই একত্বানুভূতিই জ্ঞান ও তপস্যার চরম ফল। এই একত্বই অনুভব করিলেই জীব বলিতে পারে,—

"প্রত্যগেকরসং পূর্ণমনন্তং সর্ব্বতোমুখম্।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ ন নাস্তিকিঞ্চন॥"

স্বামী বিবেকানন্দ

ঢাকা)

উদ্বোধনের পাঠকগণ শুনিয়া সুখী হইবেন যে, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার কয়েকজন সন্ন্যাসী শিষ্য সমভিব্যাহারে বিগত ১৮ই মার্চ্চ ঢাকা যাত্রা করিয়া তৎপরদিন তথায় পৌঁছিয়াছিলেন। নারায়ণগঞ্জে গোয়ালন্দের ষ্টীমার পৌঁছিবা-মাত্র ঢাকানিবাসী কতকগুলি ভদ্রলোক আসিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। ঢাকায় অপরাহ্নে ট্রেণ পৌঁছিবামাত্র স্থানীয় বিখ্যাত উকীল বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ ও গগনচন্দ্র ঘোষ মহাশয়দ্বয় সমগ্র ঢাকাবাসীর নামে স্বামীজিকে অভ্যর্থনা করিয়া ভূতপূর্ব্ব জমিদার ৺মোহিনীমোহন দাস মহাশয়ের বাটীতে লইয়া গেলেন। ষ্টেশনে অনেক ভদ্রলোক ও ছাত্রাদি আসিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে আনন্দে 'জয় রামকৃষ্ণদেবকী জয়' ধ্বনিতে গগন পরিপূরিত করিতে লাগিলেন। ছাত্রগণ স্বামীজির গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইয়া যাইতে লাগিলেন। মোহিনী বাবুর বাটীতে অনেক ভদ্রলোক সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহারা স্বামীজির সন্দর্শনে আপনাদিগকে কৃতার্থম্মন্য বোধ করিতে লাগিলেন।

স্বামীজির নিকট, সদা সর্ব্বদাই ভদ্রলোকগণ তাঁহার উপদেশামৃত পান করিতে আসিতে লাগিলেন। অপরাহ্নে তিন দিন প্রায় দুই তিন ঘণ্টা ধরিয়া জ্ঞান, ভক্তি, বিশ্বাস, ত্যাগ, বিবেক, বৈরাগ্য কর্ম্ম প্রভৃতি নানাবিধ আধ্যাত্মিক বিষয়ে আলোচনা হয়। প্রায় শতাবধি লোকের সমাগম হইত। সকলেই তাঁহার বিশ্বাসভক্তি ও তেজঃপূর্ণ উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়া বিশেষ তৃপ্ত হইয়াছিলেন। গত বুধাষ্টমী উপলক্ষে ব্রহ্মপুত্রস্নানের মানসে স্বামীজি সশিষ্যে নৌকাযোগে লাঙ্গলবাঁধ নামক স্থানে যাত্রা করেন। নারায়ণগঞ্জের নিকট শীতলাক্ষ নদীর দৃশ্য বড় মনোহর। তথা হইতে ধলেশ্বরীতে পড়িয়া পরে ব্রহ্মপুত্রে প্রবেশ করিতে হয়। এই স্থানে ব্রহ্মপুত্র খুব সরু। শুনা যায় নাকি ভগবান্

পরশুরাম এই তীর্থে স্নান করিয়া মাতৃহত্যা পাপ হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন। তাই দলেদলে এখানে আবালবৃদ্ধবনিতা পাপক্ষয়ের জন্য আগমন করিয়া থাকে। এই মেলায় খুব জনতা হইয়াছিল। যাত্রিগণের নৌকা হইতে অবিরাম আনন্দ-সূচক হুলুধ্বনি উত্থিত হইতেছে—কোথাও হরিনামের মধুরধ্বনি কর্ণকুহর পবিত্র করিতেছে। স্নানান্তে স্বামীজি ব্রহ্মপুত্র হইতে ধলেশ্বরী—তথা হইতে বুড়ি গঙ্গায় প্রবেশ করিয়া ঢাকানগরে পুনঃ প্রবেশ করিলেন। ঢাকাবাসিগণের অত্যন্ত অনুরোধে স্বামীজি গত কল্য এখানকার জগন্নাথকলেজগৃহে প্রায় দুই সহস্র শ্রোতার সমক্ষে 'আমি কি শিখিয়াছি?' এই সম্বন্ধে ইংরাজি ভাষায় প্রায় এক ঘণ্টাকাল বক্তৃতা প্রদান করেন। এখানকার বিখ্যাত উকীল রমাকান্ত নন্দী মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন। বক্তৃতার সার মর্ম্ম এই—

আমি নানা দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিয়াছি—কিন্তু আমি কখন নিজের জন্মভূমি বাঙ্গালাদেশের সবিশেষ দর্শন করি নাই। জানিতাম না, এদেশের জলে স্থলে সর্ব্বত্র এত সৌন্দর্য্য। কিন্তু নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া আমার এই লাভ হইয়াছে যে, আমি ইহার সৌন্দর্য্য বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। এইরূপই, আমি প্রথমে ধর্ম্মের জন্য নানা সম্প্রদায়—বৈদেশিক-ভাববহুল বহুবিধ সম্প্রদায়ে ভ্রমণ করিতেছিলাম, অপরের দ্বারে ভিক্ষা করিতেছিলাম—জানিতাম না যে, আমার দেশের ধর্ম্মে, আমার জাতীয় ধর্ম্মে এত সৌন্দর্য্য আছে। আজকাল একদল আছেন, তাঁহারা ধর্ম্মের ভিতর বৈদেশিক ভাব চালাইবার বিশেষ পক্ষপাতী—ইঁহারা 'পৌত্তলিকতা' বলিয়া একটী কথা রচনা করিয়াছেন, ইঁহারা বলেন, হিন্দুধর্ম্ম সত্য নয়, কারণ উহা পৌত্তলিক। পৌত্তলিকতা কি, উহা ভাল কি মন্দ, তাহা কেহ অনুসন্ধান করেন না, কেবল ঐ শব্দেরই প্রভাবে তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মকে ভুল বলিতে সাহস করেন। আর এক দল আছেন, তাঁহারা হাঁচি টিকটীকির পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বাহির করেন। তাঁহারা কোন্ দিন ভগবান্‌কেই তড়িতের পরিণামবিশেষ বলিয়া ব্যাখ্যা করিবেন! যাহা হউক, মা ইঁহাদিগকেও আশীর্ব্বাদ করুন। তিনিই ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির দ্বারা আপন কার্য্য সাধন করিয়া লইতেছেন। ইহাঁদের অতিরিক্ত দল—প্রাচীন সম্প্রদায়—যাঁহারা বলেন—আমি তোমার অত শত বুঝি না—বুঝিতে চাহিও না, আমি চাই ঈশ্বরকে আমি চাই আত্মাকে—চাই জগৎকে ছাড়িয়া সুখ দুঃখকে ছাড়িয়া ইহার অতীত প্রদেশে যাইতে—যাঁহারা বলেন—বিশ্বাস সহকারে গঙ্গাস্নানে মুক্তি হয়—যাঁহারা বলেন, শিব রাম প্রভৃতি যাঁহার

প্রতিই হউক না কেন, ঈশ্বর বুদ্ধি করিয়া উপাসনা করিলে মুক্তি হইয়া থাকে। আমি এই প্রাচীন সম্প্রদায়ভুক্ত। আজকালকার এক সম্প্রদায় বলেন, ঈশ্বর ও সংসার এক সঙ্গে কর। ইহঁাদের—মনমুখ এক নহে। যাঁহা রাম তাঁহা কাম নহি, যাঁহা কাম তাঁহা নহি রাম, রব্‌ রজনী কবি দোনা নহি এক ঠাম। যেখানে ভগবান্ সেখানে কখন সংসার থাকিতে পারে না। অন্ধকার ও আলোক কি কখন এক সঙ্গে থাকিতে পারে? এই জন্য ইহঁারা বলেন, যদি ভগবান্ পাইতে চাও, কামকাঞ্চন ত্যাগ করিতে হইবে। এই সংসারটাত ভুয়া, শূন্য কিছুই—নয়—ইহাকে না ছাড়িলে কিছুতেই তাঁহাকে পাইবে না। যদি তাহা না পার, তবে স্বীকার কর যে, আমি দুর্ব্বল, কিন্তু তা বলিয়া আদর্শকে নিম্ন করিও না। মড়াকে সোনার পাত মুড়িয়া ঢাকিও না। এই জন্য ইহঁাদের মতে এই ধর্ম লাভ করিতে হইলে, ঈশ্বর লাভ করিতে হইলে ভাবের ঘরে চুরী প্রথম ছাড়িতে হইবে। আমি কি শিখিয়াছি? এই প্রাচীন সম্প্রদায়ের নিকট আমি কি শিখিয়াছি? শিখিয়াছি—দুর্লভং ত্রয়মেবৈতৎ দেবানুগ্রহ-হেতুকং মনুষ্যত্বং মুমুক্ষত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ। প্রথম চাই—মনুষ্যত্ব—মানুষ জন্ম—ইহাতেই মুক্তিলাভের বিশেষ সুবিধা—তার পর চাই—মুমুক্ষুতা—আমাদের সম্প্রদায় ও ব্যক্তি ভেদে সাধন প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন—অধিকার বিভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন—কিন্তু মোটামুটি এই বলা যাইতে পারে যে, মুমুক্ষুতা ব্যতীত ঈশ্বরের—উপলব্ধি অসম্ভব। মুমুক্ষুতা কি? মোক্ষের জন্য—এই সুখ দুঃখ হইতে বাহির হইবার জন্য প্রবল আগ্রহ—এই সংসারে প্রবল ঘৃণা—যখন ভগবানের জন্য এই তীব্র ব্যাকুলতা হইবে, তখনই জানিবে, তুমি ঈশ্বর-লাভের অধিকারী হইয়াছ। তার পর চাই মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ—গুরুলাভ। গুরুপরম্পরাক্রমে যে শক্তি আসিয়াছে, তাহারই সহিত আপনার সংযোগ সংস্থাপন। তদ্ব্যতীত মুমুক্ষুতা থাকিলেও কিছু হইবে না অর্থাৎ তোমার গুরু-করণ আবশ্যক। কাহাকে গুরু করিব? 'শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতো যো ব্রহ্মবিত্তমঃ।' যিনি শাস্ত্রের সূক্ষ্মরহস্য জানেন—'পুঁথি পড়্কে তুত্তি ভয়ো পণ্ডিত ন ভয়া কোই—এক অক্ষর প্রেম্‌সে পড়ে ওহ পণ্ডিত হোই।' শুধু পণ্ডিত হইলে চলিবে না। আজকাল যে সে গুরু হইতে চাহে। ভিক্ষুকও লক্ষ মুদ্রা দান করিতে চায়। 'অবৃজিনঃ'—যিনি নিষ্পাপ—'অকামহত'—যাঁহার কেবল জীবের হিত ব্যতীত আর কোন অভিসন্ধি নাই—যিনি অহেতুক-

দয়াসিন্ধু, যিনি কোন লাভের উদ্দেশে অথবা নাম বা যশের জন্য উপদেশ না দেন—আর যিনি ব্রহ্মকে বিশেষ করিয়া জানেন—যিনি তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—যিনি করতলামলকবৎ করিয়াছেন। তিনিই গুরু—তাঁহারই সহিত আধ্যাত্মিক যোগ স্থাপিত হইলে তবে ঈশ্বর লাভ—ঈশ্বর প্রত্যক্ষ সুগম হইবে। তার পর চাই অভ্যাস। ব্যাকুলই হও, আর গুরুই লাভ কর, অভ্যাস না করিলে, সাধন না করিলে কখন উপলব্ধি হইতে পারে না। এই কয়টী যখন দৃঢ় হইবে, তখনই প্রত্যক্ষ হইবে। তাই বলি, হে হিন্দুগণ—হে আর্য্যসন্তানগণ—তোমরা এই আদর্শ কখন বিস্মৃত হইও না যে, হিন্দুর লক্ষ্য ঐই সংসারের বাহিরের যাওয়া—শুধু এই জগৎকে ত্যাগ করিতে হইবে, তাহা নয়, স্বর্গকেও ত্যাগ করিতে হইবে, মন্দত্যাগ করিতে হইবে, শুধু তাহা নয়,ভালকেও ত্যাগ করিতে হইবে – এই সকলের অতীত প্রদেশে যাইতে হইবে।

৩১শে মার্চ্চ স্বামীজি পোকস কলেজের বিস্তৃত খোলা ময়দানে প্রায় তিন সহস্র শ্রোতার সমক্ষে 'আমরা যে ধর্ম্মে জন্মিয়াছি' (The Religion we are born in) সম্বন্ধে প্রায় দুই ঘণ্টা কালব্যাপী এক বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতাও ইংরাজী ভাষায়ই হইয়াছিল। শ্রোতৃগণ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নিস্তব্ধ ছিলেন। ইহারও সার মর্ম্ম নিম্নে সঙ্কলিত হইল।

প্রাচীনকালে আমাদের দেশে আধ্যাত্মিক ভাবের অতিশয় উন্নতি হইয়াছিল। আমাদিগকে আজ সেই প্রাচীন কাহিনী স্মরণ করিতে হইবে। প্রাচীনকালের গৌরবের চিন্তার এক বিপদাশঙ্কা এই যে, আমরা আর নূতন কিছু করিতে চাই না—কেবল সেই প্রাচীন গৌরব স্মরণে ও কীর্ত্তনে কালাতিপাত করি। প্রাচীনকালে অনেক ঋষি মহর্ষি ছিলেন—তাঁহারা সত্যের সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রাচীনকাল স্মরণে প্রকৃত উপকার লাভ করিতে হইলে আপনাদিগকেও ঋষি করিতে হইবে – শুধু তাহাই নহে—আমার বিশ্বাস,আমরা আরও উচ্চতর ঋষি হইব। অতীতকালে আমাদের খুব উন্নতি হইয়াছিল—আমি তাহা স্মরণ করিয়া গর্ব্বিত। বর্ত্তমানকালের অবনত অবস্থা দেখিয়াও আমি আনন্দিত, আর ভবিষ্যতে যাহা হইবে, তাহা ভাবিয়াও আমি আশান্বিত। কারণ আমি জানি, বীজের বীজত্বভাব নষ্ট হইয়া তবে বৃক্ষ হয়। সেইরূপ বর্ত্তমান অবস্থার অবনত ভাবের ভিতর ভবিষ্যৎ মহত্ত্বভাব নিহিত রহিয়াছে।

আমরা যে ধর্ম্মে জন্মিয়াছি, তাহার ভিতরে সাধারণ ভাব কি কি? আপা-

ততঃ দেখিতে পাই, নানা বিরোধ। মতসম্বন্ধে কেহ অদ্বৈতবাদী, কেহ বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদী, কেহ বা দ্বৈতবাদী। কেহ অবতার মানেন, মূর্ত্তিপূজা মানেন, কেহ বা নিরাকারবাদী। আবার আচার সম্বন্ধে ত নানা বিভিন্নতা দেখিতে পাই। জাটেরা, মুসলমান বা খ্রীশ্চান পর্য্যন্ত বিবাহ করিলেও, জাতিচ্যুত হয় না। তাহারা অবাধে সকল দেবমন্দিরে প্রবেশ করিতে পারে। পঞ্জাবের অনেক গ্রামে যে হিন্দু, শূকরভক্ষণ না করে, সে মুসলমান বলিয়া বিবেচিত হয়। নেপালে ব্রাহ্মণ, চারিবর্ণেই বিবাহ করিতে পারেন, আবার বাঙ্গালা দেশে ব্রাহ্মণের অবান্তর বিভাগের ভিতরও বিবাহ হইবার যো নাই। এইরূপ নানা বিভিন্নতা দেখিতে পাই। কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে এই একটী বিষয়ে একত্ব দেখিতে পাই যে, কোন হিন্দু গোমাংস ভক্ষণ করে না।

এইরূপ আমাদের ধর্ম্মের ভিতরেও এক মহান সামঞ্জস্য আছে। প্রথমতঃ—শাস্ত্রের কথা লইয়া একটু আলোচনা করা যাক। যে সকল ধর্ম্ম এতদূর উন্নত হইয়াছিল যে তাহাদের ভিতর একখানি বা বহু শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছিল, সেই সকল ধর্ম্ম নানাবিধ অত্যাচার সত্ত্বেও এতদিন টিকিয়া রহিয়াছে। গ্রীক ধর্ম্মে নানাবিধ সৌন্দর্য্য থাকিলেও শাস্ত্র অভাবে উহা লোপ পাইয়া গেল কিন্তু য়াহুদীধর্ম্ম ওল্ডটেষ্টামেণ্টের বলে এখনও অক্ষুণ্ণ প্রতাপ। হিন্দুধর্ম্মও তদ্রূপ। উহার শাস্ত্র 'বেদ' জগতের সর্ব্বপ্রাচীন গ্রন্থ। উহার দুইটী ভাগ—কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। ভারতের সৌভাগ্যই হউক দুর্ভাগ্যই হউক, কর্ম্মকাণ্ড এখন লোপ পাইয়াছে। দাক্ষিণাত্যে কতকগুলি ব্রাহ্মণ মধ্যে মধ্যে ছাগবধ করিয়া যজ্ঞ করিয়া থাকে, আর বিবাহ শ্রাদ্ধাদির মন্ত্রে মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়। এখন আর উহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার উপায় নাই। কুমারিল্ল ভট্ট একবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে অকৃতকার্য্য হন। তার পর বেদের জ্ঞানকাণ্ড—যাহার নাম উপনিষদ্—বেদান্ত। উহাকেই শ্রুতিশির বলিয়া থাকে। আচার্য্যগণ শ্রুতি উদ্ধৃত যেখানে করিতেছেন, সেই খানেই এই উপনিষদ্ উদ্ধৃত করিতেছেন। এই বেদান্তের ধর্ম্মই এক্ষণে ভারতের ধর্ম্ম। কোন সম্প্রদায় নিজের গৌরব স্থাপন করিতে হইলে তাঁহা-দিগকে বেদান্তের দোহাই দিতে হয়। কি—দ্বৈতবাদী, কি অদ্বৈতবাদী সকলকেই—ইহার দোহাই দিতে হয়। বৈষ্ণবও আপন মত প্রমাণ করিতে গোপালতাপনী উপনিষদ্ উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। নিজের মনোমত বচনাবলী না পাইলে কেহ কেহ—উপনিষদ্ রচনা পর্য্যন্ত করিয়া লন। এক্ষণে বেদ-

সম্বন্ধে হিন্দুদিগের মত এই যে,উহা কোন পুস্তক বিশেষ বা কাহার রচনা নহে। উহা ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানরাশি—কখন ব্যক্ত হয়, কখন বা অব্যক্ত থাকে সায়নাচার্য্য এক স্থলে বলিয়াছেন 'যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ নির্ম্মমে'—যিনি বেদজ্ঞানের প্রভাবে সমুদয় জগৎ সৃষ্টি করেন। বেদের রচয়িতা কেহ কখন দেখেন নাই সুতরাং উহা কল্পনা করাও অসম্ভব। ঋষিগণ কেবল ঐ সকল প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন—ঋষি অর্থাৎ দ্রষ্টা, মন্ত্রদ্রষ্টা। তাঁহারা—অনাদিকাল হইতে স্থিত বেদ সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন মাত্র। এই ঋষিগণ কে? বাৎস্যায়ন বলেন,—যিনি যথাবিহিত সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা—তিনি ম্লেচ্ছ হইলেও ঋষি হইতে পারেন। তাই প্রাচীন কালে বেশ্যাপুত্র বশিষ্ঠ, ধীবরতনয় ব্যাস, দাসীপুত্র নারদ প্রভৃতি সকলেই ঋষিপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রকৃত উপায়ে এই ধর্ম্মের সাক্ষাৎকার লাভ হইলে আর কোন ভেদ থাকে না। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি-গণ যদি ঋষি হইয়া থাকেন—তবে আধুনিক কালের কুলীন ব্রাহ্মণগণ—তোমরা আরও কত উচ্চ ঋষি হইতে পার। সেই ঋষিত্বলাভের চেষ্টা কর—জগৎ তোমার নিকট আপনা আপনিই নত হইবে। এই বেদই আমাদের এক মাত্র প্রমাণ—আর ইহাতে সকলেরই অধিকার। যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ। ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায় চারণায় ॥—শুক্লযজুর্ব্বেদ, মাধ্যন্দিনীয়া শাখা, ২৬ অধ্যায়, ২ মন্ত্র। এই বেদ হইতে এমন কোন প্রমাণ দেখাইতে পার যে, ইহাতে সকলের অধিকার নাই? পুরাণ বলিতেছে, বেদের অমুক শাখায় অমুক জাতির অধিকার অমুক অংশ সত্য অমুক অংশ কলিযুগের জন্য। কিন্তু বেদ ত এ কথা বলিতেছেন না। ভৃত্য কি কখন প্রভুকে আজ্ঞা করিতে পারে; স্মৃতি পুরাণ তন্ত্র এ সকলগুলিই ততটুকু গ্রাহ্য, যতটুকু বেদের সহিত মেলে। না মিলিলে—অগ্রাহ্য; কিন্তু এখন আমরা পুরাণকে বেদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছি। বেদের চর্চ্চাত বাঙ্গালা দেশ হইতে লোপই পাইয়াছে। আমি সেই দিন শীঘ্র দেখিতে চাই যখন প্রত্যেক বাটীতে শালগ্রাম শিলার সহিত বেদও পূজিত হইবে। আবালবৃদ্ধবনিতা বেদের পূজা করিবে। বেদসম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে আমার কোন আস্থা নাই। তাঁহারা বেদের কাল আজ এই নির্ণয় করিতেছেন, কাল আবার উহা বদলাইয়া সহস্রবর্ষ পিছাইয়া যাইতেছে। যাহা হউক, এক্ষণে পুরাণের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পুরাণের যতটুকু বেদের সহিত মিলে, ততটুকুই গ্রাহ্য। পুরা-ণের অনেক কথা দেখিতে পাই, যাহা বেদের সহিত মিলে না, যথা পুরাণে

লিখিত আছে, কেহ দশ সহস্র কেহ বা বিশ সহস্র বর্ষ জীবিত রহিয়াছেন, কিন্তু বেদে দেখিতে পাই—শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ—এখানে বেদের কথাই গ্রাহ্য। তাহা হইলেও পুরাণে অনেক সুন্দর সুন্দর যোগ ভক্তি জ্ঞান কর্ম্মের কথা দেখিতে পাই, সে গুলি অবশ্য লইতে হইবে। তার পর তন্ত্র। তন্ত্র শব্দের প্রকৃত অর্থ শাস্ত্র, যেমন কাপিল তন্ত্র। কিন্তু এখানে তন্ত্র শব্দ সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী রাজগণের শাসনে বৈদিক যাগযজ্ঞ সব লোপ পাইলে কেহ আর রাজভয়ে হিংসা করিতে পারিল না। কিন্তু অবশেষে বৌদ্ধদেরই ভিতরে এই যাগযজ্ঞের ভাল ভাল অংশগুলি গোপনে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল—তাহা হইতেই তন্ত্রের উৎপত্তি। তন্ত্রে বামাচার প্রভৃতি কতকগুলি খারাপ জিনিষ থাকিলেও লোকে উহা যতদূর খারাপ ভাবে তাহা নহে। বাস্তবিক বেদের ব্রাহ্মণ-ভাগই সমস্ত একটু পরিবর্ত্তিত হইয়া তন্ত্রের মধ্যে বর্ত্তমান। আজ কালকার সমুদায় উপাসনা পূজাপদ্ধতি কর্ম্মকাণ্ড তন্ত্রমতেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এক্ষণে ধর্ম্মমত সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাউক।

ধর্ম্মমতেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিরোধ সত্ত্বেও কতকগুলি ঐক্য আছে। প্রথমতঃ—তিনটী বিষয়—তিনটী অস্তিত্ব—প্রায় সকলেই স্বীকার করেন। ঈশ্বর, আত্মা ও জগৎ। ঈশ্বর অর্থাৎ যিনি জগৎকে অনন্তকাল সৃজন পালন ও লয় করিতেছেন। সাংখ্যগণ ব্যতীত আর সকলেই ইহা স্বীকার করেন। আত্মা,—অসংখ্য জীবাত্মাগণ বারবার শরীর পরিগ্রহ করিয়া জন্মমৃত্যুচক্রে ভ্রাম্যমান; ইহাকে সংসারবাদ বলে—চলিত কথায় পুনর্জ্জন্মবাদ। আর, এই অনাদি অনন্ত জগৎ। এই তিনকে কেহ কেহ এক, কেহ বা পৃথক প্রভৃতি নানারূপ মানিলেও এই তিনটী সকলেই বিশ্বাস করেন। এখানে একটু বক্তব্য এই যে, আত্মাকে হিন্দুরা চিরকাল মন হইতে পৃথক বলিয়া জানিতেন। পাশ্চাত্যেরা কিন্তু মনের উপর আর উঠিতে পারেন নাই। পাশ্চাত্যগণ জগৎকে আনন্দপূর্ণ সম্ভোগ করিবার জিনিষ বলিয়া জানে—আর প্রাচ্যগণের জন্ম হইতে ধারণা—সংসার দুঃখপূর্ণ—উহা কিছুই নয়। এইজন্য পাশ্চাত্যেরা—প্রণালীবদ্ধ কর্ম্মে বিশেষ পটু, প্রাচ্যেরা তদ্রূপ অন্তর্জ্জগতের অন্বেষণে অতিশয় সাহসী। যাহা হউক—এক্ষণে হিন্দুধর্ম্মের আর দু একটী কথা লইয়া আলোচনা করা যাক। হিন্দুদের মধ্যে অবতারবাদ প্রচলিত। বেদে আমরা কেবল মৎস্য-অবতারের কথা দেখিতে পাই। যাহা হউক এই অবতারবাদের তাৎপর্য্য—মনুষ্যপূজা—মনুষ্যের ভিতর ঈশ্বর সাক্ষাৎই প্রকৃতই ঈশ্বর সাক্ষাৎ। হিন্দুগণ প্রকৃতি হইতে

প্রকৃতির ঈশ্বরে যান না—মনুষ্য হইতে মনুষ্যের ঈশ্বরে গমন করিয়া থাকেন। তারপর মূর্ত্তিপূজা—শাস্ত্রোক্ত পঞ্চ উপাস্যদেবতা ব্যতীত সকল দেবতাই এক একটী পদের নাম মাত্র—কিন্তু এই পঞ্চ উপাস্যদেবতা কেবল সেই এক ভগবানের নাম মাত্র। এই মূর্ত্তিপূজা আমাদের সকল শাস্ত্রেই অধমাধম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে—কিন্তু তা বলিয়া অন্যের নহে। এই মূর্ত্তিপূজার ভিতরে নানাবিধ কুৎসিৎ ভাব প্রবেশ করিয়া থাকিলেও আমি নিন্দা করি না। যদি সেই মূর্ত্তিপূজক ব্রাহ্মণের পদধূলি আমি না পাইতাম, তবে আমি কোথায় থাকিতাম! যে সকল সংস্কারক মূর্ত্তিপূজার নিন্দা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে আমি বলি, ভাই, তুমি যদি নিরাকার উপাসনার যোগ্য হইয়া থাক, তাহা কর, কিন্তু অপরকে গালি দাও কেন? সংস্কার কেবল পুরাতন বাটীর জীর্ণসংস্কার মাত্র। জীর্ণ সংস্কার হইয়া গেলে আর উহার প্রয়োজন কি? কিন্তু সংস্কারক-দল এক স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গঠন করিতে চান। তাঁহারা মহৎ কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহাদের মস্তকে ভগবানের আশীর্ব্বাদ পতিত হউক। কিন্তু তোমরা আপনাদিগকে পৃথক্ করিতে চাও কেন? হিন্দু নাম লইতে লজ্জিত হও কেন? আমাদের জাতীয় অর্ণবযানে আমরা সকলে আরোহণ করিয়াছি—হয়ত উহাতে একটু ছিদ্র হইয়াছে। আইস সকলে মিলিয়া উহা বন্ধ করিতে চেষ্টা করি, না পারি—একসঙ্গে ডুবিয়া মরি। আর ব্রাহ্মণগণকেও বলি, তোমরা বৃথা অভিমান আর রাখিও না—শাস্ত্রমতে তোমাদের ব্রাহ্মণত্ব আর নাই—কারণ তোমরা এতকাল ম্লেচ্ছ রাজ্যে বাস করিতেছ। যদি তোমরা নিজেদের কথায় নিজেরা বিশ্বাস কর, তবে সেই প্রাচীন কুমারিলভট্ট যিনি বৌদ্ধগণকে সংহার করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমে বৌদ্ধের শিষ্য হইয়াছিলেন, শেষে তাহাদিগকে হত্যা করার প্রায়শ্চিত্ত জন্য তুষানলে প্রবেশ করেন, সেইরূপ তোমরা সকলে মিলিয়া তুষানলে প্রবেশ কর; তাহা না পার, আপনাদের দুর্ব্বলতা স্বীকার করিয়া সর্ব্বসাধারণকে তাহাদের প্রকৃত অধিকার দাও।

অর্ঘ্য।

(শ্রীহরিদাস দত্ত।)

দুঃখের জীবন, করিতে বহন,
কবি আগমন হেথায় হায়।
সম্পদবিহীন, হয়ে যাপি দিন,
পরের অধীন নাহিক উপায়॥

বাল্য করি জয়, কৈশোর উদয়,
পরে পূর্ণপ্রায় যৌবন এই।
কোথা বাল্য কাল, সুখদ মৃণাল,
স্বভাবনির্ম্মল সময় সেই॥

মনের বেদন, না ছিল যখন,
এখন যেমন হয়েছে হায়।
না ছিল বিশাল, সংসারের জাল,
গিয়েছিল কাল অনিল প্রায়॥

যবে চিন্তানল, হয়নি প্রবল,
করেনি বিকল মনের দ্বার।
আহা সেই কালে, ক্রীড়া কুতূহলে,
পরেছিনু গলে সুখের হার॥

সে সুখ সময়, স্মরিলে হৃদয়,
বিদারিত হয় দুঃখের জোরে।
কালের কবলে, গিয়েছে সে চলে,
যৌবন অনলে ফেলিয়ে মোরে!

যৌবন সময়, সুখপ্রদ কয়,
মম বিষময় হইল কেন ?
সকলি আকাশ, হয়েছে প্রকাশ,
মরীচিকা বাস পরেছি যেন !!

যাতনা অশেষ, ধরি ভীম বেশ,
স্বদেশ বিদেশ যেথানে যাই।
সেইখানে হায়, ঘেরেরে আমায়,
কি বিষম দায় উপায় নাই !!

এত অভিমান, করেছি নির্ম্মাণ,
রাখিবার স্থান নাহিক আর।
হতাশ অনলে, সদা মন জ্বলে,
পরিয়াছি গলে লাজের হার॥

ঘৃণা অপমান, যেন খরশান,
করিছে নিশান হৃদয়োপরি।
ভাবিয়া না পাই, কাহারে সুধাই,
কোনখানে যাই কিরূপ করি॥

নাহি হেন জন, মনের বেদন,
বলে করি মন কতক খালি।
হইয়াছে ভারি, বহিবারে নারি,
যাই বলিহারি দুঃখের ডালি॥

অনর্থ আশায়, ধন পিপাসায়,
ভ্রমিতেছি হায় কতই স্থান।
বিহীন সম্বল, নাহি অনুবল,
একাকী কেবল আছয়ে প্রাণ॥

পর-অন্নপর, করিয়া নির্ভর,
আশাবায়ু সহ বেড়িয়ে হায়।
সঙ্কুচিত মন, হায় অনুক্ষণ,
থাকিতে জীবন মরার প্রায়॥

হায় কত জনে, পরুষ বচনে,
ব্যথা দেয় মনে সহিতে নারি।
কেহ পরিহাস, করে পরকাশ,
যাই যাঁর পাশ বদন ভারি॥

ক্ষমতা বিহীন, যাপিতেছে দিন,
আমাতে বিপিন উচিত হয়।
সংসারে আমার, কিবা অধিকার,
সদাই বিকার-বাতাস বয়॥

ওহে বৃথা ধন, তোমার কারণ,
এত জ্বালাতন হইয়ে মরি।
তোমারই তরে, সবে ঘৃণা করে,
অভিমান ভরে রোদন করি॥

তোমারই তরে, বচন না সরে,
বিষণ্ণ অন্তরে কাটাই দিন।
তোমারই তরে, সদা চিন্তা ধ'রে,
দেহ করে দাহ মানস অধীন॥

তোমারই তরে, সহাস্য অধরে,
আলাপ না করে আত্মীয় মোর।
তোমারই তরে, ভ্রমি দেশান্তরে,
আপনার ঘরে আপনি চোর॥

তোমার কারণ, মলিন বদন,
হয়েছে হে ধন নিশ্চয় মম।
তোমার কারণ, হায় দুনয়ন,
করে বরিষণ বরিষা সম॥

তোমার কারণ, বিজন গহন,
চাহে মম মন বাসিতে ভাল।
তোমার কারণ, বহু বিলোকন,
করিয়ে এমন কাটাই কাল॥

তোমার জ্বালায়, করি হায় হায়,
সদাই অপার ভাবি হে মনে।
তোমার জ্বালায়, সব শূন্য প্রায়,
সহবাস হায় চিন্তার সনে॥

হয় অনুমান, থাকিতে এ প্রাণ,
তোমার সন্ধান নাহি পাইব।
অতএব ধন, শুনহে বচন,
করিলাম পণ নাহি সেবিব॥

আর মম মন, তোমার স্মরণ,
লবে না হে ধন পণ করিল।
তব প্রিয়তম, নহে এ অধম,
তোমা হ'তে বহু দূরে রহিল॥

সহৃগুণ—তিনি ধর্ম্মকে সর্ব্বসাধারণের উপযোগী করিয়া প্রচার করিলেন। শঙ্করাচার্য্য উহাকে জ্ঞানের প্রখর আলোকে উদ্ভাসিত করিলেন—তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তি। আমরা এক্ষণে চাই—এই প্রখর জ্ঞানসূর্য্যের সহিত বুদ্ধদেবের এই অদ্ভুত হৃদয়—এই অদ্ভুত প্রেম ও দয়া সম্মিলিত হউক। খুব উচ্চ দার্শনিক ভাবও উহাতে থাকুক, খুব যুক্তিপূর্ণ হউক, আবার সঙ্গে সঙ্গে যেন উহাতে উচ্চ হৃদয়—প্রবল প্রেম ও দয়ার যোগ থাকে। তবেই মণিকাঞ্চনযোগ হইবে, তবেই বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম পরস্পরে কোলাকুলি করিবে। ইহাই ভবিষ্যতের ধর্ম্ম হইবে, আর যদি আমরা উহা ঠিক করিয়া তুলিতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চয় বলা যাইতে পারে, উহা সকল সময় এবং সর্ব্বপ্রকার অবস্থার উপযোগী হইবে। যদি আপনারা বাড়ী গিয়া মনে কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া দেখেন, তবে দেখিবেন, সকল বিজ্ঞানেরই কিছু না কিছু ত্রুটি আছে। কিন্তু আপনারা নিশ্চয় জানিবেন, এই আধুনিক বিজ্ঞানকে এই এক পথেই আসিতে হইবে— হইবে কি—এখনই প্রায় উহাতে আসিয়া পড়িয়াছে। যখন কোন প্রধান বিজ্ঞানাচার্য্য বলেন, সবই সেই এক শক্তির বিকাশ, তখন কি আপনাদের মনে হয় না যে, তিনি সেই উপনিষদুক্ত ব্রহ্মেরই মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন ?

'অগ্নির্যথৈকো ভুবনম্ প্রবিষ্টো রূপম্ রূপম্ প্রতিরূপো বভূব।

একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপম্ রূপম্ প্রতিরূপো বহিশ্চ।'

'যেমন এক অগ্নি জগতে প্রবিষ্ট হইয়া নানারূপে প্রকাশিত হইতেছেন, তদ্রূপ সেই এক ব্রহ্ম সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা নানারূপে প্রকাশিত হইতেছেন, আবার তিনি জগতের বাহিরেও আছেন।' বিজ্ঞানের গতি কি আপনারা বুঝিতেছেন না ? হিন্দুজাতি মনস্তত্ত্বের আলোচনা করিতে করিতে দর্শনের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইউরোপীয় জাতি বাহ্য প্রকৃতির আলোচনা করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা এক স্থানে পঁহুছিতেছেন। মনস্তত্ত্বের ভিতর দিয়া আমরা সেই এক অনন্ত সার্ব্বভৌমিক সত্তায় পঁহুছিতেছি—যিনি সকল বস্তুর অন্তরাত্মা স্বরূপ, যিনি সকলের সার ও সকল বস্তুর সত্যস্বরূপ, যিনি নিত্যমুক্ত, নিত্যানন্দময় ও নিত্যসত্তাস্বরূপ। বাহ্যবিজ্ঞানের দ্বারাও আমরা এই এক তত্ত্বে পঁহুছিতেছি। এই জগৎপ্রপঞ্চ সেই একেরই বিকাশ—জগতে যাহা কিছু আছে,উহা সেই সকলের সমষ্টিস্বরূপ।

আর সমুদয় মনুষ্যজাতির গতি বন্ধনের দিকে নয়, মুক্তির দিকে। মানুষ নীতি-পরায়ণ হইবে কেন? কারণ, নীতিই মুক্তির এবং দুর্নীতি বন্ধনের পথ।

অদ্বৈতবাদের আর একটী বিশেষত্ব এই যে, গোড়া হইতেও উহা অপর ধর্ম্মের বা অপর মতের উপর আঘাত করে না, প্রত্যুত উহাদিগকে আপন আদর্শে পঁহুছিবার পথস্বরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহা অদ্বৈতবাদের আর এক মহত্ত্ব—ইহা প্রচার করা মহা সাহসের কার্য্য যে,

'ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্।'

'জ্ঞানী, অজ্ঞ অতএব কর্ম্মে আসক্ত ব্যক্তিদিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেন না; বিদ্বান্ ব্যক্তি নিজে যুক্ত থাকিয়া তাহাদিগকে সকল প্রকার কর্ম্মে নিয়োগ করিবেন।'

অদ্বৈতবাদ ইহাই বলেন— কাহারও মতি বিচলিত করিও না, কিন্তু সকলকেই উচ্চ হইতে উচ্চতর পথে যাইতে সাহায্য কর। অদ্বৈতবাদ যে ঈশ্বর প্রচার করেন, তিনি সকল জগতের সমষ্টিস্বরূপ; এই মত যদি সত্য হয়, তবে উহা অবশ্যই সকল মতকে উহার বিশাল উদরে গ্রহণ করিবে। সর্ব্বসাধারণের উপযোগী সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মকে কেবল খণ্ডভাবে গ্রহণ করিলে চলিবে না, উহার সর্ব্বভাবের সমষ্টি হওয়া আবশ্যক। অন্য কোন মতে এই সমষ্টির ভাব তত স্পষ্টরূপে নাই। তাহা হইলেও, তাহারা সকলেই সেই সমষ্টিকে প্রাপ্ত হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। খণ্ডের অস্তিত্ব কেবল এই জন্য যে, উহা সর্ব্বদাই সমষ্টি হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। অদ্বৈতবাদের সহিত এই জন্যই ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রথম হইতে কোন বিরোধ ছিল না। ভারতে আজকাল অনেক দ্বৈতবাদী রহিয়াছেন—তাঁহাদের সংখ্যাও অত্যধিক; ইহার কারণ, অশিক্ষিত লোকের মনে স্বভাবতই দ্বৈতবাদের উদয় হয়। দ্বৈতবাদীরা বলিয়া থাকেন, ইহা জগতের খুব স্বাভাবিক ব্যাখ্যা—কিন্তু এই দ্বৈতবাদিদিগের সহিত অদ্বৈতবাদীর কোন বিবাদ নাই। দ্বৈতবাদী বলেন, ঈশ্বর জগতের বাহিরে কোথাও স্বর্গে বা অপর কোন স্থানে অবস্থিত—অদ্বৈতবাদী বলেন, জগতের ঈশ্বর তাঁহার নিজেরেই অন্তরাত্মাস্বরূপ, তাঁহাকে দূরবর্ত্তী বলা কেবল তাঁহার নিন্দা করা মাত্র। তাঁহাকে স্বর্গে বা অপর কোন দূরবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত কি করিয়া বল? তাঁহা হইতে পৃথগ্‌ভাব—ইহা মনে করাও যে ভয়ানক! আমরাই আমাদের নিজেদের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী। 'তুমিই তিনি', এই

কথা ব্যতীত আর কিরূপে কোন্ ভাষায় এই সন্নিহিতত্ব প্রকাশ করা যাইতে পারে? যেমন দ্বৈতবাদী অদ্বৈতবাদীর কথায় ভয় পান ও উহাকে ভগবন্নিন্দা বলেন, অদ্বৈতবাদীও তদ্রূপ দ্বৈতবাদীর কথায় ভয় পাইয়া থাকেন। মানুষ কি করিয়া তাঁহাকে নিজের জ্ঞেয় বস্তুর ন্যায় জ্ঞান করিতে সাহস করে? তাহা হইলেও তিনি জানেন, ধর্ম্মজগতে উহার স্থান কোথায়—তিনি জানেন, তাঁহার দিক্ হইতে তিনি ঠিক দেখিতেছেন, সুতরাং দ্বৈতবাদীর সহিত তাঁহার কোন বিবাদ নাই। যখন তিনি সমষ্টিভাবে না দেখিয়া ব্যষ্টিভাবে দেখিতেছেন, তখন তাঁহাকে অবশ্যই বহু দেখিতে হইবে। ব্যষ্টিভাবের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে তাঁহাকে অবশ্যই ভগবানকে বাহিরে দেখিতে হইবে। তাহা না হইয়া যাইতেই পারে না। তাঁহাদিগকে তাঁহাদের মতে থাকিতে দাও। তাহা হইলেও অদ্বৈতবাদী জানেন, দ্বৈতবাদীদের মতে অসম্পূর্ণতা যাহাই থাকুক না কেন, তাঁহারা সকলেই সেই এক চরম লক্ষ্যে চলিয়াছেন। এইখানে দ্বৈতবাদীর সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ প্রভেদ। পৃথিবীর সকল দ্বৈতবাদীই স্বভাবতঃই এমন একজন সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, যিনি একজন উচ্চশক্তি সম্পন্ন মনুষ্য মাত্র, আর যেমন মানুষের কতকগুলি প্রিয়পাত্র থাকে, কতকগুলি অপ্রিয় থাকে, দ্বৈতবাদীর ঈশ্বরেরও তাহা আছে। তিনি কোন কারণ ব্যতিরেকেই কাহারও প্রতি সন্তুষ্ট, আবার কাহারও প্রতি বা বিরক্ত। আপনারা দেখিবেন, সকল জাতিতেই এমন কতকগুলি লোক আছেন, যাঁহারা বলেন,আমরা ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ প্রিয়পাত্র,আর কেহ নহেন; যদি অনুতপ্ত হৃদয়ে আমাদের শরণাগত হও,তবেই আমাদের ঈশ্বর তোমায় কৃপা করিবেন। আবার কতকগুলি দ্বৈতবাদী আছেন, তাঁহাদের মত আরো ভয়ানক। তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর যাঁহাদের প্রতি সদয়, যাঁহারা তাঁহার অন্তরঙ্গ তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট আছেন—আর কেহ যদি মাথা কুটিয়া মরে, তথাপি উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। আপনারা দ্বৈতবাদাত্মক এমন কোন ধর্ম্ম দেখান, যাহার ভিতর এই সঙ্কীর্ণতা নাই। এই জন্যই এই সকল ধর্ম্ম চিরকালই পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিবে, করিতেছেও। আবার এই দ্বৈতবাদের ধর্ম্ম সকল সময়েই লোকপ্রিয় হয়, তাহার কারণ, অশিক্ষিতদিগের ভাব সকল সময়েই লোকপ্রিয় হইয়া থাকে। দ্বৈতবাদী ভাবেন, একজন দণ্ডধারী ঈশ্বর না থাকিলে কোন প্রকার নীতিই দাঁড়াইতে পারে না। মনে কর একটা ঘোড়া—ছেকড়া গাড়ীর ঘোড়া বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিল। সে বলিবে, লণ্ডনের লোক বড় খারাপ, কারণ, প্রত্যহ

তাহাদিগকে চাবুক মারা হয় না। সে নিজে চাবুক খাইতে অভ্যস্ত হইয়াছে। সে ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি বুঝিবে? বাস্তবিক কিন্তু চাবুকে লোককে আরোও খারাপ করিয়া তোলে। গাঢ় চিন্তায় অক্ষম সাধারণ লোক সকল সকল দেশেই দ্বৈতবাদী হইয়া থাকে। গরীব বেচারারা চিরকাল অত্যাচারিত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং তাহাদের মুক্তির ধারণা— শাস্তি হইতে অব্যাহতি পাওয়া। অপর পক্ষে, আমরা ইহাও জানি, সকল দেশেরই চিন্তাশীল মহাপুরুষগণ এই নির্গুণ ব্রহ্মের ভাব লইয়া কার্য্য করিয়াছেন। এই ভাবেই অনুপ্রাণিত হইয়াই ঈশা বলিয়াছেন, 'আমি ও আমার পিতা এক।' এইরূপ ব্যক্তিই লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির ভিতরে শক্তিসঞ্চারে সমর্থ। এই শক্তি সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া মানবগণের প্রাণে শুভ পরিত্রাণপ্রদ শক্তি-সঞ্চার করিয়া থাকে। আমরা আবার ইহাও জানি, সেই মহাপুরুষই অদ্বৈত-বাদী ছিলেন বলিয়া অপরের প্রতিও দয়াশীল ছিলেন। তিনি সাধারণকে 'আমাদের স্বর্গস্থ পিতা' এ কথাও শিক্ষা দিয়াছেন। সাধারণ লোকে, যাহারা সগুণ ঈশ্বর হইতে আর কোন উচ্চতর ভাব ধারণা করিতে পারে না, তাহা-দিগকে তিনি তাহাদের স্বর্গস্থ পিতার নিকট প্রার্থনা করিতে শিখাইলেন; কিন্তু ইহাও বলিলেন, যখন সময় আসিবে, তখন তোমরা জানিবে, 'আমি তোমা-দিগেতে, তোমরা আমাতে, যাহাতে তোমরা সকলেই সেই পিতার সহিত একীভূত হইতে পার, কারণ, আমি ও আমার পিতা অভেদ'। বুদ্ধদেব দেবতা ঈশ্বর প্রভৃতি বড় গ্রাহ্য করিতেন না। সাধারণ লোকে তাঁহাকে নাস্তিক আখ্যা দিয়াছিল, কিন্তু তিনি একটী সামান্য ছাগের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। এই বুদ্ধদেব মনুষ্য জাতির পক্ষে সর্ব্বোচ্চ যে নীতি গ্রহণীয় হইতে পারে, তাহা প্রচার করিয়াছিলেন। যেখানেই কোন প্রকার নীতিবিধান দেখিবে, সেখানেই দেখিবে, তাঁহার প্রভাব, তাঁহার আলোক। জগতের এই সকল উচ্চহৃদয় ব্যক্তিগণকে তুমি সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতরে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পার না, বিশেষতঃ এক্ষণে মনুষ্যজাতির ইতিহাসে এমন এক সময় আসিয়াছে—শতবর্ষ পূর্ব্বে যাহা কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই, এমন সকল জ্ঞানের উন্নতি হইয়াছে, এমন কি পঞ্চাশৎ পূর্ব্বে যাহা কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই, এমন সকল বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। এ সময়ে কি আর লোককে এরূপ সঙ্কীর্ণ ভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখা যায়? লোকে পশুতুল্য চিন্তাহীন জড়পদার্থে পরিণত না হইলে

ইহা অসম্ভব। এখন আবশ্যক, উচ্চতম জ্ঞানের সহিত উচ্চতম হৃদয়—অনন্ত জ্ঞানের সহিত অনন্ত প্রেমের যোগ। বেদান্তবাদী, সুতরাং, বলেন, সেই অনন্ত সত্তার সহিত একীভূত হওয়াই একমাত্র ধর্ম্ম; আর তিনি ভগবানের গুণ কেবল এই কয়েকটী বলেন,—অনন্ত সত্তা, অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত আনন্দ, আর তিনি বলেন, এই তিনই এক। জ্ঞান ও আনন্দ ব্যতীত সত্তা কখন থাকিতে পারে না। জ্ঞানও আনন্দ বা প্রেম ব্যতীত এবং আনন্দও কখনও জ্ঞান ব্যতীত থাকিতে পারে না। আমরা চাই এই সম্মিলন—এই অনন্ত সত্য, জ্ঞান ও আনন্দের মিলন। আমরা চাই সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি—সত্য, জ্ঞান ও আনন্দের চরমোন্নতি—একদেশী উন্নতি নহে। আমরা চাই সকল বিষয়ের সমভাবে উন্নতি। বুদ্ধদেবের ন্যায় মহান্ হৃদয়ের সহিত মহা জ্ঞানের যোগ হওয়া সম্ভব। আশা করি, আমরা সকলেই সেই এক লক্ষ্যে পঁহুছিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিব।

জগৎ।

বহির্জ্জগৎ।

সুন্দর কুসুমরাশি চতুর্দ্দিকে সুবাস বিতরিতেছে, প্রভাতারুণ অতি সুন্দর লোহিতবর্ণ ধরিয়া উঠিতেছে। প্রকৃতি নানা সুন্দর বর্ণ ধরিয়া শোভিতেছে। জগৎ সমস্তই সুন্দর, মানুষ পৃথিবীতে আসিয়া অবধি এই সৌন্দর্য্য ভুঞ্জিতেছে। শৈলমালা গম্ভীরভাবব্যঞ্জক ও ভয়োদ্দীপক, প্রবল খরবাহিনী সমুদ্রাভিমুখ-গামিনী স্রোতস্বিনী, পদচিহ্নহীন মরুদেশ, অনন্ত অসীম সাগর, তারকারাজি-মণ্ডিত গগন—এ সকলই গম্ভীরভাবপূর্ণ ও ভয়োদ্দীপক। প্রকৃতিশব্দব্যঞ্জিত সমুদয় অস্তিত্ব সমষ্টিই স্মৃতিপথাতীত সময় হইতেই মানবমনের উপর কার্য্য করিতেছে। উহা মানবচিন্তার উপর ক্রমাগত প্রভাব বিস্তারিতেছে, আর ঐ প্রভাবের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ক্রমাগত এই প্রশ্ন উঠিতেছে, উহা কি এবং কোথা হইতে? অতি প্রাচীন মানবরচনা বেদের প্রাচীন ভাগেও এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত দেখিতে পাই। কোথা হইতে ইহা আসিল? যখন অস্তি নাস্তি কিছুই ছিল না, তম তমে আবৃত ছিল, তখন কে এই জগৎ সৃজিল? কেমন করিয়াই বা

সৃজিল? কে এই রহস্য জানেন? বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এই প্রশ্ন চলিয়া আসিয়াছে। লক্ষ লক্ষ বার ইহার উত্তরের চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু আবার লক্ষ লক্ষ বার উহার উত্তর দিতে হইবে। ঐ প্রত্যেক উত্তরই যে ভ্রমপূর্ণ, তাহা নহে। প্রত্যেক উত্তরেই কিছু না কিছু সত্য আছে—কালের আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সত্যও ক্রমশঃ বল সংগ্রহ করিবে। আমি ভারতের প্রাচীন দার্শনিকগণের নিকট ঐ প্রশ্নের যে উত্তর সংগ্রহ করিয়াছি, বর্ত্তমান মানব জ্ঞানের সহিত মিলাইয়া তাহা আপনাদের সমক্ষে স্থাপনে চেষ্টা করিব।

আমরা দেখিতে পাই, এই প্রাচীনতম প্রশ্নের কতকগুলি বিষয় পূর্ব্ব হইতেই জ্ঞাত ছিল। প্রথম এই,—যখন অস্তি নাস্তি কিছুই ছিল না, তখন এই জগৎ ছিল না—এই গ্রহ জ্যোতিষ্কগণ, আমাদের জননী ধরণী, সাগর, মহাসাগর, নদী, শৈলমালা, নগর, গ্রাম, মানবজাতি, ইতরপ্রাণী, উদ্ভিদ্, বিহঙ্গম, এই অনন্ত বহুধা সৃষ্টি, এমন এক সময়ে ছিল, যখন ইহা ছিল না। আমরা কি এ বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ? কি করিয়া এই সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হওয়া গেল, তাহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব। মানুষ আপন চতুর্দ্দিকে দেখে কি? একটী ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্ লও। মানুষ দেখে, উদ্ভিদ্টী ধীরে ধীরে মাটী ঠেলিয়া উঠিতে থাকে, শেষে বাড়িতে বাড়িতে অবশেষে হয়ত একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষ হইয়া দাঁড়ায়, আবার মরিয়া যায়—রাখিয়া যায় কেবল বীজ। উহা ঘুরিয়া একটী বৃত্ত সম্পূরণ করে। বীজ হইতে উহা আইসে, বৃক্ষ হইয়া দাঁড়ায়, অবশেষে বীজে উহার পুনঃ পরিণাম। একটী পাখীকে দেখ, কেমন উহা ডিম্ব হইতে জন্মায়, সুন্দর পক্ষিরূপ ধরে, কিছুদিন বাঁচিয়া থাকে, পরে আবার মরিয়া যায়, রাখিয়া যায় কেবল অপর কতকগুলি ডিম্ব—ভবিষ্যৎ পক্ষিকুলের বীজ। তির্য্যগ্জাতি সম্বন্ধেও এইরূপ, মানুষ সম্বন্ধেও তাহাই। প্রত্যেক পদার্থেরই যেন, কতকগুলি বীজ, কতকগুলি মূল উপাদান, কতকগুলি সূক্ষ্ম আকার হইতে আরম্ভ, উহারা স্থূলাৎ স্থূলতর হইতে থাকে, কিছুকালের জন্য ঐরূপে চলে, পুনরায় ঐ সূক্ষ্ম-রূপে চলিয়া গিয়া উহাদের লয়। বৃষ্টির ফোঁটাটি, যাহার ভিতরে এক্ষণে সুন্দর সূর্য্যকিরণ খেলিতেছে, বাতাসে অনেক দূর চলিয়া গিয়া পাহাড়ে পৌঁছে, সেখানে উহা বরফে পরিণত হয়, আবার জল হয়, আবার শত শত মাইল ঘুরিয়া উহার উৎপত্তিস্থান সমুদ্রে পঁহুছে। আমাদের চতুর্দ্দিকস্থ প্রকৃতির সকল বস্তু সম্বন্ধেই এইরূপ; আর আমরা জানি, বর্ত্তমানকালে হিমশিলা ও নদীসমূহ, বড় বড় পর্ব্বতসমূহের উপর কার্য্য করিতেছে; উহারা ধীরে

অথচ নিশ্চিত তাহাদিগকে গুঁড়াইতেছে, গুঁড়াইয়া বালি করিতেছে, সেই বালি আবার সমুদ্রে বহিয়া চলিতেছে—সমুদ্রতলে স্তরে স্তরে জমিতেছে,পরিশেষে আবার পাহাড়ের ন্যায় শক্ত হইতেছে, ভবিষ্যতে আবার ফাঁপিয়া উঠিয়া ভবিষ্যদ্বংশীয়দের পর্ব্বত হইবে বলিয়া। আবার উহা পিষ্ট হইয়া গুঁড়া হইবে—এইরূপ চলিবে। বালি হতে উঠে এই পর্ব্বতগুলি বালিতে গিয়া আবার মিশায়। বড় বড় জ্যোতিষ্কগণ সম্বন্ধেও তাহাই; আমাদের এই পৃথিবী নীহারময় পদার্থ বিশেষ হইতে আসিয়াছে—ক্রমশঃ শীতল হইতে শীতলতর হইয়াছে, পরে এই আমাদের নিবাসভূমিরূপা এই বিশেষাকৃতিবিশিষ্টা ধরণী রচিয়াছে। ভবিষ্যতে উহা,আবার শীতল হইতে শীতলতর হইয়া নষ্ট হইবে, খণ্ড খণ্ড হইবে,গুঁড়াইবে, শেষে সেই মূল নীহারময় সূক্ষ্মরূপে যাইবে। প্রতিদিন আমাদের সম্মুখে ইহা ঘটিতেছে। স্মরণাতীত সময় হইতেই ইহা হইতেছে। ইহাই মানবের সমগ্র ইতিহাস, ইহাই প্রকৃতির সমগ্র ইতিহাস, ইহাই জীবনের সমগ্র ইতিহাস।

যদি ইহা সত্য হয় যে, প্রকৃতি তাঁহার সকল কার্য্যেই সমপ্রণালীক (Unifrom), যদি ইহা সত্য হয়, এবং এ পর্য্যন্ত কোন মনুষ্যজ্ঞানই ইহা খণ্ডন করে নাই যে, একটী ক্ষুদ্র বালুকণা যে প্রণালী ও যে নিয়মে সৃষ্ট, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সূর্য্য, তারা, এমন কি, সমুদয় জগদ্ব্রহ্মাণ্ড সৃজিতেও সেই একই প্রণালী, একই নিয়ম, যদি ইহা সত্য হয় যে, একটী পরমাণু যে কৌশলে নির্ম্মিত, সমুদয় জগৎও সেই কৌশলে নির্ম্মিত, যদি ইহা সত্য হয় যে, একই নিয়ম সমুদয় জগতে প্রতিষ্ঠিত, তবে, যেমন বেদে আগে হইতেই বলা হইয়াছে—"একখণ্ড মৃত্তিকাকে জানিয়া আমরা জগদ্ব্রহ্মাণ্ডস্থ সমুদয় মৃত্তিকা সম্বন্ধেই জানিতে পারি।" একটী ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্ লইয়া উহার জীবনচরিত আলোচনা করিলে আমরা জগদ্ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ জানিতে পারি। একটী বালুকণার গতি পর্য্যবেক্ষণে, সমুদয় জগতের রহস্য জানিতে পারা যাইবে। এক্ষণে এই তত্ত্ব এই জগদ্ব্রহ্মাণ্ডে খাটাইয়া দেখিতেছি, প্রথমতঃ যে, সকলই আদি ও অন্তে প্রায় সদৃশ। পর্ব্বত উঠে বালি হইতে, যায় আবার বালিতে; নদী হয় বাষ্প হইতে, যায় আবার বাষ্পে; উদ্ভিদ্‌জীবন আসে বীজ হইতে, যায় আবার বীজে; মানবজীবন আসে মনুষ্য-জীবাণু হইতে, যায় আবার জীবাণুতে। নক্ষত্রপুঞ্জ, নদী, গ্রহ, উপগ্রহ নীহারময় অবস্থা হইতে আসিয়াছে, যায় আবার সেই নীহারময় অবস্থায়। ইহাতে আমরা শিখি কি? শিখি এই যে, ব্যক্ত অর্থাৎ স্থূল অবস্থা—কার্য্য,

সূক্ষ্মভাব—উহার কারণ। সর্ব্বদর্শনজনক স্বরূপ মহর্ষি কপিল অনেক দিন প্রমাণ করিয়াছেন, 'নাশঃ কারণলয়ঃ।'

যদি এই টেবিলটীর নাশ হয়, উহা কেবল কারণ রূপে যাইবে—সেই সূক্ষ্মরূপ ও পরমাণুতে যাইবে, যাহারা মিলিয়া এই টেবিলনামক পদার্থটী করিয়াছিল। মানুষ যখন মরে, তখন যে সকল ভূতে তাহার দেহ নির্ম্মিত, তাহাতে তাহার পুনরাবৃত্তি। এই পৃথিবীর ধ্বংস হইলে, যে ভূতসমষ্টি উহাকে এই আকার দিয়াছিল,তাহাতে পুনরাবর্ত্তন করিবে। ইহাকেই নাশ বলে—কারণলয়। সুতরাং আমরা শিখিলাম, কার্য্য কারণের সহিত অভেদ, ভিন্ন নহে, উহা কেবল আর এক রূপধারিমাত্র। যে উপাদানগুলিতে ঐ টেবিলের উৎপত্তি, তাহারা কারণ, আর টেবিলটী কার্য্য, আর ঐ সকল কারণগুলিই এখানে বর্ত্তমান। এই গেলাসটী একটা কার্য্য—উহার কতকগুলি কারণ ছিল, সেই কারণগুলি এই কার্য্যেতে এখনই বর্ত্তমান দেখিতেছি। গেলাস নামক কতকটা জিনিষ আর তৎসঙ্গে গঠনকারীর হস্তস্থ শক্তি—এই দুইটাই কারণ, নিমিত্ত ও উপাদান। এই দুইটী কারণ মিলিয়া গেলাস নামক এই আকারটী হইয়াছে। ঐ দুই কারণই বর্ত্তমান। যে শক্তিটী কোন যন্ত্রের চাকায় ছিল, তাহা সংহতিশক্তিরূপে বর্ত্তমান—তাহা না থাকিলে গেলাসের ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডগুলি সব খসিয়া পড়িবে এবং ঐ গেলাসরূপ উপাদানটীও বর্ত্তমান। গেলাসটী কেবল ঐ সূক্ষ্ম কারণগুলির আর এক রূপে পরিণতি এবং যদি এই গেলাসটী ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়, তবে যে শক্তিটী সংহতিরূপে উহাতে বর্ত্তমান ছিল, তাহা ফিরিয়া পুনঃ নিজ উপাদানে মিশিবে, আর গেলাসের ক্ষুদ্র খণ্ডগুলি আবার পূর্ব্বরূপ ধরিবে ও সেইরূপেই থাকিবে, যতদিন না পুনরায় নব রূপ ধরে।

অতএব আমরা পাইলাম, কার্য্য কখন কারণ হইতে ভিন্ন নহে। উহা সেই কারণের পুনরাবির্ভাব মাত্র। তারপর আমরা শিখিলাম, এই ক্ষুদ্র বিশেষ বিশেষ রূপ সকল, যাহাদিগকে আমরা উদ্ভিদ্ বা তির্য্যগ্‌জাতি বা মানব বলি, তাহা অনন্তকাল ধরিয়া উঠিয়া পড়িয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। বীজ বৃক্ষ প্রসবিল। বৃক্ষ আবার বীজ হয়, আবার উহা আর এক বৃক্ষ হয়—আবার অন্য বীজ হয়,আবার আর এক বৃক্ষ হয়—এইরূপ চলিতেছে, ইহার শেষ নাই। জলবিন্দু পাহাড়ের গা গড়াইয়া সমুদ্রে যায়, আবার বাষ্প হইয়া উঠে—পাহাড়ে যায়, আবার নদীতে ফিরিয়া আসে। উঠিতেছে, পড়িতেছে—যুগচক্র চলিতেছে। সমুদয় জীবন সম্বন্ধেই এইরূপ—সমুদয় অস্তিত্ব

সংযত করিয়া সর্বদা ইচ্ছা ভয় ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিতে পারিবে সেই মুনি মুক্ত হইয়াই আছে (ইহা জানিবে)॥ ২৭—২৮॥

ভাষ্য।—সম্যগ্‌দর্শননিষ্ঠানাং সংন্যাসিনাং সদ্যোমুক্তিরুক্তা কর্ম্মযোগ শ্চেশ্বরার্পিত সর্ব্বভাবেন ঈশ্বরে ব্রহ্মণি আধায় ক্রিয়মাণঃ সত্ত্বশুদ্ধি জ্ঞানপ্রাপ্তি সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসক্রমেণ মোক্ষায়েতি ভগবান্ পাদে পদেহব্রবীদ্ বক্ষ্যতি চ অথেদানীং ধ্যানযোগং সম্যগ্‌দর্শনস্যান্তরঙ্গং বিস্তরেণ বক্ষ্যামীতি তস্য সূত্রস্থানীয়ান্ শ্লোকানুপদিশতি স্ম। স্পর্শান শব্দাদীন্ কৃত্বা বহির্বাহ্যান্ শ্রোত্রাদিদ্বারেণ অন্তর্বুদ্ধৌ প্রবেশিতাঃ শব্দাদয়োবিষয়াস্তানচিন্তয়তো বাহ্যা বহিরেব কৃতা ভবন্তি। তানেবং বহিঃকৃত্বা চক্ষুশ্চৈব অন্তরে ভ্রুবঃ কৃত্বেত্যনুষজ্যতে। তথা প্রাণাপানৌ নাসাভ্যন্তরচারিণৌ সমৌ কৃত্বা॥ ২৭॥

ভাষ্যানুবাদ।—সম্যগ্‌দর্শননিষ্ঠ সংন্যাসীগণের সদ্যঃ মুক্তি উক্ত হইয়াছে, ঈশ্বর ব্রহ্মে সর্ব্বভাবে (ফল) সমর্পণ সহকারে ক্রিয়মাণ কর্ম্মযোগ, ক্রমে সত্ত্বশুদ্ধি জ্ঞানপ্রাপ্তি ও সর্ব্ব কর্ম্ম সংন্যাস দ্বারা মোক্ষের কারণ হয়, এই কথা ভগবান্ পদে পদে বলিয়াছেন ও বলিবেন। অনন্তর এইক্ষণে সম্যগ্‌ দর্শনের অন্তরঙ্গসাধন ধ্যানযোগ, বিস্তরতঃ বলিব এই ভাবিয়া ভগবান্ ধ্যানযোগের সূত্রস্থানীয় কতকগুলি শ্লোকের উপদেশ করিতেছেন।

স্পর্শ (অর্থাৎ) শব্দাদি বাহ্য বিষয়কে বাহিরে করিয়া (ইহার তাৎপর্য্য এই যে) শ্রোত্রপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা বুদ্ধির মধ্যে বাহ্যশব্দাদি বিষয় প্রবেশিত হইলেও ঐ সকল বিষয়ের চিন্তা না করাই বাহ্যশব্দাদি বিষয়কে বাহিরে করা হয়) সেই শব্দাদি বিষয়কে বাহিরে রাখিয়া ও চক্ষু ভ্রূ দ্বয়ের মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া (এখানে কৃত্বা এই পদটীর অনুষঙ্গ করিতে হইবে) এবং প্রাণ ও অপান নামক বায়ুদ্বয়কে নাসাভ্যন্তরচারী ও সমান করিয়া॥ ২৭॥

ভাষ্য।—যতেন্দ্রিয় ইতি যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্যতানি সংযতানি ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিশ্চ যস্য স যতেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধির্মননান্মুনিঃ সংন্যাসী মোক্ষপরায়ণঃ এবং দেহসংস্থানো মোক্ষপরায়ণো মোক্ষএব পরময়নং পরাগতির্যস্য সোহয়ং মোক্ষপরায়ণো মুনির্ভবেৎ বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধ ইচ্ছা চ ভয়ং চ ক্রোধশ্চ ইচ্ছাভয়ক্রোধা বিগতা যস্মাৎ স বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ। য এবং বর্ত্ততে সদা সংন্যাসী মুক্ত এব স ন তস্য মোক্ষোহন্যঃ কর্ত্তব্যঃ অস্তি॥ ২৮॥

ভাষ্যানুবাদ।—যতেন্দ্রিয় ইত্যাদি (শ্লোকের অর্থ) "যতেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধি" ইন্দ্রিয়, মন, ও বুদ্ধি যাহার যত (অর্থাৎ) সংযত সেই যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধি

"মুনি" (আত্মার) মনন করা নিবন্ধন সংন্যাসীই মুনি (শব্দের দ্বারা অভিহিত হয়) "মোক্ষপরায়ণ" যাহার দেহের স্থিতি এই প্রকার এবং মোক্ষই যাহার পরম অয়ন (অর্থাৎ) পরাগতি সেই মোক্ষপরায়ণ মুনি হইবে। বিগতেচ্ছাভয়-ক্রোধ" ইচ্ছা ভয় এবং ক্রোধ এই তিনটী যাহার অপগত হইয়াছে সেই বিগ-তেচ্ছাভয়ক্রোধ যে সংন্যাসী সর্ব্বদা এই প্রকারে অবস্থান করিতে পারে, সেই ব্যক্তি মুক্তই হইয়া আছে (জানিবে) তাহার পক্ষে অন্য মোক্ষ কর্ত্তব্য (বলিয়া উপদিষ্ট) হইতে পারে না॥ ২৮॥

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥ ২৯॥

অন্বয়।—যজ্ঞতপসাং ভোক্তারং সর্ব্বভূতানাং সুহৃদং সর্ব্বলোকমহেশ্বরং মাং জ্ঞাত্বা (স সংন্যাসী) শান্তিমৃচ্ছতি॥ ২৯॥

মূলানুবাদ।—আমি, যজ্ঞ ও তপস্যা সমূহের ভোক্তা সকল ভূতের সুহৃদ্ এবং সর্ব্বলোকের মহেশ্বর আমাকে জানিয়াই (পূর্ব্বোক্ত সংন্যাসী) শান্তি লাভ করিয়া থাকে॥ ২৯॥

ভাষ্য।—এবং সমাহিতচিত্তেন কিং বিজ্ঞেয় মিত্যুচ্যতে ভোক্তারং যজ্ঞানাং তপসাঞ্চ কর্ত্তৃরূপেণ দেবতারূপেণ চ সর্ব্বলোকমহেশ্বরং সর্ব্বেষাং লোকানাং মহান্তমীশ্বরং সর্ব্বলোকমহেশ্বরং সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বপ্রাণিনাং প্রত্যুপকার নিরপেক্ষতয়োপকারিণং সর্ব্বভূতানাং হৃদয়েশ্বরং সর্ব্বকর্ম্মফলাধ্যক্ষং সর্ব্বপ্রত্যয়-সাক্ষিণং মাং নারায়ণং জ্ঞাত্বা শান্তিং সর্ব্বসংসারোপরতিং ঋচ্ছতি প্রাপ্নোতি॥২৮॥

ইতি শ্রীগীতাশাঙ্কর ভাষ্যে প্রকৃতিগর্ভোনাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ভাষ্যানুবাদ।—এই প্রকার সমাহিত চিত্ত হইয়া কি জানিতে হইবে তাহাই বলা যাইতেছে যে, 'যজ্ঞ এবং তপোনিচয়ের কর্ত্তা ও দেবতারূপে ভোক্তা' "সর্ব্বলোকমহেশ্বর" অর্থাৎ সকল লোকের মহান্ ঈশ্বর, এবং সর্ব্বভূতের (অর্থাৎ) সকল প্রাণীর সুহৃদ্ (অর্থাৎ) প্রত্যুপকারের অপেক্ষা নাই অথচ সর্ব্বদা উপকারনিরত, সকল প্রাণীর হৃদয়েশ্বর সকলের বুদ্ধির সাক্ষী ও সকল কর্ম্মফলের অধ্যক্ষ নারায়ণস্বরূপ আমাকে জানিয়া শান্তি (অর্থাৎ) সকল প্রকার সংসারের নিবৃত্তি (মোক্ষ) প্রাপ্ত হয়॥ ২৯॥

ইতি শ্রীগীতাশাঙ্করভাষ্যানুবাদে প্রকৃতিগর্ভনামক পঞ্চম অধ্যায়।

অথ ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।
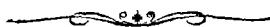
শ্রীভগবানুবাচ। অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্নচাক্রিয়ঃ॥ ১॥

অন্বয়।—যঃ কর্ম্মফলমনাশ্রিতঃ (সন্) কার্য্যং কর্ম্ম করোতি স সন্ন্যাসী চ যোগী চ (বিজ্ঞেয়ঃ) ন নিরগ্নিঃ ন (বা) অক্রিয়ঃ (এব সন্ন্যাসী যোগী বা ভবতি)॥ ১॥

মূলানুবাদ।—কর্ম্মফলের বাসনা পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে সে সন্ন্যাসী ও যোগী (বলিবা উক্ত হয়) যে ব্যক্তি অগ্নি পরিত্যাগ করিয়াছে বা ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে সেই যে সন্ন্যাসী বা যোগী হইবে তাহা নহে॥ ১॥

ভাষ্য।—অতীতানন্তরাধ্যায়ান্তে ধ্যানযোগস্য সম্যগ্‌দর্শনং প্রত্যন্তরঙ্গস্য সূত্রভূতাঃ শ্লোকাঃ-স্পর্শান্ কৃত্বা বহিরিত্যাদয় উপদিষ্টাঃ তেষাং বৃত্তিস্থানীয়োঽয়ং ষষ্ঠোঽধ্যায় আরভ্যতে। তত্র ধ্যানযোগস্য বহিরঙ্গং কর্ম্ম ইতি যাবদ্ধ্যানযোগা-রোহণাসমর্থঃ তাবৎগৃহস্থেন অধিকৃতেন কর্ত্তব্যং কর্ম্মেত্যত স্তৎস্তৌতি॥ ১॥

ভাষ্যানুবাদ।—অব্যবহিত অতীত অধ্যায়ের শেষে "স্পর্শান্ কৃত্বা বহিঃ" ইত্যাদি শ্লোক উপদিষ্ট হইয়াছে, "ধ্যানযোগ, আত্মতত্ত্বজ্ঞানের অন্তরঙ্গ উপায়" এই বিষয়ের উপদেশে ঐ কয়টী শ্লোক সূত্রস্থানীয় (অর্থাৎ ধ্যানযোগের বিষয়ে যাহা কিছু সারভূত তাহা অতি সংক্ষেপে এই কয়টী শ্লোকে বলা হইয়াছে) সেই কয়টী শ্লোকেরই বিশদ ব্যাখ্যার জন্যই এই ষষ্ঠ অধ্যায়ের আরম্ভ করা হইতেছে। সেই প্রসঙ্গে (ইহাও দেখিতে হইবে যে) কর্ম্ম ধ্যানযোগের বহিরঙ্গ সাধন, এই কারণ অধিকারী গৃহস্থ যে পর্য্যন্ত ধ্যানযোগে আরোহণ করিতে অসমর্থ হইবে, সে পর্য্যন্ত তাহার কর্ম্মই কর্ত্তব্য এই নিমিত্ত (এক্ষণে) (ভগবান্) কর্ম্মের প্রশংসা করিতেছেন॥ ১॥

ভাষ্য।—নমু কিমর্থং ধ্যানযোগারোহণসীমাকরণং যাবতা অনুষ্ঠেয় মেব বিহিতং কর্ম্ম যাবজ্জীবং? ন আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণ মুচ্যতে ইতি বিশেষণাৎ আরূঢ়স্য চ শমেনৈব সংবন্ধকরণাৎ। আরুরুক্ষোঃ আরূঢ়স্য চ শমঃ কর্ম্ম চোভয়ং কর্ত্তব্যত্বেনাভিপ্রেতং চেৎ স্যাৎ তদা আরুরুক্ষো রারূঢ়স্যেতি শম কর্ম্ম বিষয়ভেদেন বিশেষণং বিভাগকরণং চানর্থকং স্যাৎ॥ ১॥

ভাষ্যানুবাদ।—এই প্রকার শঙ্কা হইতে পারে যে, ধ্যানযোগে আরোহণই কর্ম্মানুষ্ঠানের সীমা, এই প্রকার নির্দ্দেশ করা নিরর্থক, কারণ ব্যক্তিমাত্রেরই যাবজ্জীবন বিহিত কর্ম্ম করিতেই হইবে। এপ্রকার শঙ্কা ঠিক নহে, কারণ ধ্যান-যোগে আরোহণ করিতে অভিলাষী সাধকের পক্ষে, বিহিত কর্ম্মই ধ্যানযোগ প্রাপ্তির উপায় এই প্রকার বাক্যের দ্বারা ধ্যানযোগে আরোহণেচ্ছু ব্যক্তির পক্ষেই বিশেষভাবে কর্ম্মের সম্বন্ধ প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং ধ্যানযোগারূঢ় ব্যক্তির পক্ষে শম (অর্থাৎ কর্ম্মনিবৃত্তি)র সম্বন্ধ প্রদর্শিত হইয়াছে। যদি যোগারোহণেচ্ছু ও যোগারূঢ় এই উভয়েরই অবিশেষে কর্ম্ম ও সন্ন্যাস এই দুইটী উপায়ই কর্ত্তব্যরূপে অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে, কর্ম্ম ও সন্ন্যাসরূপ বিষয় ভেদে যোগারোহণেচ্ছু ও যোগারূঢ় এই শব্দের দ্বারা দুই প্রকার সাধকের বিশেষণ ও বিভাগ করা অনর্থক হইত ॥ ১ ॥

ভাষ্য।—তত্রাশ্রমিণাং কশ্চিদ্যোগ মারুরুক্ষুর্ভবত্যারূঢ়শ্চ কশ্চিদন্যে নারু-রুক্ষবো ন চারূঢ়াস্তানপেক্ষ্য আরুরুক্ষো রারূঢ়স্য চেতি বিশেষণং বিভাগকরণং চ উপপদ্যতে এবেতি চেৎ ন তস্যৈব ইতি বচনাৎ পুনর্যোগগ্রহণাচ্চ যোগারূঢ়-স্যেতি য আসীৎ পূর্ব্বং যোগমারুরুক্ষুস্তস্যৈবারূঢ়স্য শমএব কর্ত্তব্যং কারণং যোগফলং প্রত্যুচ্যতে। অতো ন যাবজ্জীবং কর্ত্তব্যত্বপ্রাপ্তিঃ কস্যচিদপি কর্ম্মণঃ, যোগবিভ্রষ্টবচনাচ্চ। গৃহস্থস্য চেৎ কর্ম্মিণো যোগো বিহিতঃ ষষ্ঠেঽধ্যায়ে স যোগবিভ্রষ্টোঽপি কর্ম্মগতিং কর্ম্মফলং প্রাপ্নোতি ইতি তস্য নাশাশঙ্কানুপপন্না স্যাৎ অবশ্যং হি কৃতং কর্ম্ম কাম্যং নিত্যং বা মোক্ষস্য নিত্যত্বাদনারভ্যত্বে স্বং ফলং আরভতএব ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—এই ব্যবহার ক্ষেত্রে আশ্রমধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে কেহ যোগারোহণে অভিলাষী হয়, কেহ বা যোগারূঢ় হয়, আবার অনেক এমনও আছে; যাহারা যোগারোহণ করিতে চাহে না এবং যোগারূঢ়ও নহে, এই প্রকার যে সকল আশ্রমী তাহাদিগকে পৃথক্ করিবার জন্যই যোগারোহণেচ্ছু এবং যোগারূঢ় এই বিশেষণ দ্বয় ও বিভাগকরণ উপপন্ন হইতে পারে, এই প্রকার কল্পনা করাও উচিত নহে, কারণ ঐ শ্লোকে "তস্যৈব" (অর্থাৎ তাহারই) এই প্রকার নির্দ্দেশ হইয়াছে এবং "যোগারূঢ়স্য" এই বিশেষণের মধ্যে পুনর্ব্বার যোগ এই শব্দটার গ্রহণ করাও হইয়াছে (ইহা দ্বারা ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে, আরুরুক্ষো র্মুনের্যোগমিত্যাদি শ্লোকের দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে) যে ব্যক্তি পূর্ব্বে যোগারোহণাভিলাষী হয়,

সেই ব্যক্তিই যোগারূঢ় হইলে তাহার পক্ষে শম (সন্ন্যাসই) যোগফল (মোক্ষ) লাভের প্রতি কর্ত্তব্য কারণ বলিয়া উক্ত হইতেছে। এই কারণে কোন কর্ম্মেরই যাবজ্জীবন কর্ত্তব্যত্ব শাস্ত্রের দ্বারা প্রাপ্ত হইতে পারে না; যোগভ্রষ্ট বিষয়ে যাহা কিছু বলা হইয়াছে, তাহা দ্বারাও এই সিদ্ধান্তই দৃঢ়ীকৃত হয়, কারণ (পূর্ব্বপক্ষী-দিগের মতানুসারে) যদি ষষ্ঠ অধ্যায়ে গৃহস্থ অথচ কর্ম্মীর পক্ষে ধ্যানযোগ বিহিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই কর্ম্মী গৃহস্থ ধ্যানযোগ হইতে ভ্রষ্ট হইলেও নিজ গৃহস্থাশ্রম বিহিত কর্ম্মের গতি (অর্থাৎ) ফল নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইবে, সুতরাং তাহার নাশের আশঙ্কা একেবারে অনুপপন্ন হইয়া পড়ে, কারণ মোক্ষরূপ ফল নিত্য এইজন্য কর্ম্মের দ্বারা আরভ্য না হইলেও কাম্য বা নিত্য কর্ম্ম সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইলে তাহারা নিজ নিজ বিহিত ফল (সময়ে) অবশ্যই প্রদান করিবে (সুতরাং তোমাদের মতে নিত্যকর্ম্মনিরত ব্যক্তি যোগারূঢ় হইয়া, পরে যোগভ্রষ্ট হইলে তাহার একেবারে বিনাশের আশঙ্কা কি প্রকারে হইতে পারে ?) ॥ ১ ॥

ভাষ্য।—নিত্যস্য চ কর্ম্মণো বেদপ্রমাণাববুদ্ধত্বাৎ ফলেন ভবিতব্যমিত্যবোচাম অন্যথা বেদস্যানর্থক্যপ্রসঙ্গাদিতি ন চ কর্ম্মণি সতি উভয়বিভ্রষ্টবচনমর্থবৎ বিভ্রংশকারণানুপপত্তেঃ। কর্ম্মকৃতমীশ্বরেসংন্যস্যেত্যতঃ কর্ত্তরি কর্ম্মফলং নারভত ইতি চেন্ন ঈশ্বরে সন্ন্যাসস্যাধিকতরফলহেতুত্বোপপত্তেঃ। মোক্ষায়ৈবেতি চেৎ স্বকর্ম্মণাং কৃতানা মীশ্বরে ন্যাসো মোক্ষায়ৈব ন ফলান্তরায় যোগসহিতো যোগাচ্চ বিভ্রষ্ট ইত্যতস্তং প্রতিনাশাশঙ্কাযুক্তৈবেতি চেন্ন একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিত ইতি কর্ম্মসংন্যাস বিধানাৎ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—নিত্যকর্ম্ম, বেদরূপ প্রমাণের দ্বারা বোধিত হইয়াছে, এই কারণ তাহার ফল অবশ্যই হইবে ইহা আমরা বলিয়াছি তাহা না হইলে বেদ নিরর্থক হইয়া পড়ে। কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতেছে এইরূপ অবস্থায় উভয় (কর্ম্ম ও ধ্যানযোগ) হইতে বিভ্রষ্ট হইবার কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি বল ঈশ্বরে ফল অর্পণ করিয়া অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া, কর্ম্ম অনুষ্ঠাতার ফল উৎপাদন করিতে পারে না, তাহাও ঠিক্ নহে, কারণ ঈশ্বরে ফল অর্পন করিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে ঐ কর্ম্মের অধিকতর ফলই হইয়া থাকে। যদি বলা যায়, ঈশ্বরে কর্ম্মসন্ন্যাস মোক্ষেরই কারণ (অর্থাৎ) ধ্যানযোগের সহিত ঈশ্বরে কর্ম্ম সন্ন্যাস কেবল মোক্ষেরই কারণ হয়, তাহা অন্য কোন ফলের উৎপাদক হয় না, এরূপ হইলে ঐ ধ্যান যোগারূঢ় ব্যক্তি (কোন কারণে) যদি যোগভ্রষ্ট হয়, তাহা হইলে

বিনষ্ট হইবার আশঙ্কা যুক্তিসিদ্ধ হইয়া পড়ে (কারণ যোগভ্রষ্ট হওয়ায় তাহার মোক্ষ হইল না এবং যোগ সহকৃত কর্ম্ম মোক্ষব্যতিরিক্ত অন্য কোন ফলেরও জনক হইতে পারিল না। এই জন্য সে কর্ম্মফলও পাইল না, মোক্ষও পাইল না এই ভাবিয়াই অগ্রে অর্জ্জুন তাহার বিনাশ শঙ্কা করিয়াছেন এই প্রকার কল্পনা করিলে সকলেই যাবজ্জীবন বিহিত কর্ম্ম করিতে হইবে এই সিদ্ধান্তটাই যুক্তি-যুক্ত হইতে পারে) তাহাও ঠিক নহে "একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ" ও"ব্রহ্মচর্য্যব্রতেস্থিতঃ" ইত্যাদি শ্লোকে যোগারূঢ় ব্যক্তির পক্ষে বিহিত কর্ম্মেরও সন্ন্যাস বিহিত হইয়াছে ।। ১ ॥

ভাষ্য।—ন চাত্রধ্যানকালে স্ত্রীসহায়ত্বাশঙ্কা যেন একাকিত্বং বিধীয়তে নচ গৃহস্থস্য নিরাশীরপরিগ্রহ ইত্যাদি বচনমনুকূলং। উভয়বিভ্রষ্ট প্রশ্নানুপপত্তে-শ্চ। অনাশ্রিত ইত্যনেন কর্ম্মিণএবসন্ন্যাসিত্বং চোক্তং প্রতিষিদ্ধং চ নিরগ্নেরক্রিয়স্য চ সন্ন্যাসিত্বং যোগিত্বঞ্চেতি চেৎ ন ধ্যানযোগং প্রতি বহিরঙ্গস্য সতঃ কর্ম্মণঃ ফলাকাঙ্ক্ষা সন্ন্যাসস্তুতিপরত্বাৎ। ন কেবলং নিরগ্নিরক্রিয়এব সন্ন্যাসী যোগীচ কিন্তর্হি! কর্ম্মী অপি কর্ম্মফলাসঙ্গংসন্ন্যস্য কর্ম্মযোগমনুতিষ্ঠন্ সত্বশুদ্ধ্যর্থং স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ভবতীতি স্তূয়তে। ন চৈকেন বাক্যেন কর্ম্মফলাসঙ্গসন্ন্যাস স্তুতিশ্চতুর্থাশ্রমপ্রতিষেধশ্চ উপপদ্যতে। নচপ্রসিদ্ধং নিরগ্নে রক্রিয়স্য পরমার্থ-সন্ন্যাসিনঃ শ্রুতিস্মৃতিপুরাণেতিহাসযোগশাস্ত্রেষু প্রসিদ্ধং সন্ন্যাসিত্বং যোগিত্বঞ্চ প্রতিষেধতি ভগবান্। স্ববচনবিরোধাচ্চ। ১।

ভাষ্যানুবাদ।—এইপ্রকার সিদ্ধান্ত সাধু নহে (কারণ ঐ বচনে যে একাকি-ত্বের বিধান করা হইয়াছে, তাহা গৃহস্থের পক্ষে বিহিত হইতে পারে না) ধ্যান-যোগ কালে গৃহস্থের স্ত্রীসমাগমসম্ভাবনা প্রসক্ত নহে সুতরাং তাহার নিরাকরণ করিবার জন্য যে ঐ বাক্যে গৃহস্থের একাকিত্ব বিধান হইবার সম্ভাবনা কি? নিরাশীঃ অপরিগ্রহ এই দুইটী বিশেষণও গৃহস্থের পক্ষে অনুকূল হইতেছে না। এবং তাহার পক্ষে উভয় বিভ্রষ্টত্বের শঙ্কাও উক্তরূপে উপপন্ন হইতে পারেনা কারণ ধ্যান যোগসহকৃত বিহিতকর্ম্মের অনুষ্ঠান মোক্ষব্যতিরিক্ত অন্য কোন ফলের কারণ হয় না, এইপ্রকার কল্পনার অনুকূল কোন প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না,যদি বল অনশ্রিত ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা কর্ম্মপরায়ণ গৃহস্থেরই সন্ন্যাসিত্ব ও যোগিত্ব উক্ত হইয়াছে এবং নিরগ্নি এবং শাস্ত্রানুসারে কর্ম্মসন্ন্যাসকারীর সন্ন্যাসিত্ব ও যোগিত্ব,প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে,তাহাও ঠিক নহে কারণ ঐ বচনটীর দ্বারা ধ্যানযোগের বহিরঙ্গ সাধন কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগই প্রশংসিত হইয়াছে,

কেবল নিরগ্নি ও অক্রিয়ই যে সন্ন্যাসী ও যোগী তাহা নহে, কিন্তু কর্ম্মফলের আসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্ত্বশুদ্ধির জন্যই যে ব্যক্তি কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহাকেও সন্ন্যাসী ও যোগী বলিয়া জানিতে হইবে, এই প্রকার প্রতিপাদন করিয়া তাদৃশ কর্ম্মী ও গৃহস্থের স্তুতিই করা হইয়াছে। একটী বাক্য একবার প্রযুক্ত হইয়া, কর্ম্মফলাসঙ্গ পরিত্যাগের স্তুতি ও সন্ন্যাসাশ্রম পরিগ্রহের নিষেধ এই দ্বিবিধ অর্থ, যুগপৎ প্রতিপাদন করিতে পারে না। ভগবান্, নিরগ্নি এবং অক্রিয় পরমার্থসন্ন্যাসীর, শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ ও ইতিহাসে বিহিত এবং সর্ব্বলোকে প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসিত্ব ও যোগিত্বের প্রতিষেধ, করিতেছেন ইহা সম্ভবপর নহে এই প্রকার নিষেধ করিলে তাহা তাঁহার নিজের বচনের সহিতই বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে ॥ ১ ॥

ভাষ্য।—সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্য নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্নাস্তে মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেন চিদনিকেতঃ স্থিরমতি বিহায় কামান যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগীতি চ তত্র তত্র স্ববচনানি দর্শিতানি তৈর্বিরুধ্যেত চতুর্থাশ্রম প্রতিষেধঃ। তস্মান্মুনে। যোগমারুরুক্ষোঃ প্রতিপন্নগার্হস্থ্যস্য অগ্নিহোত্রাদি, ফলনিরপেক্ষ মনুষ্ঠীয়মানং ধ্যানযোগা রোহণ সাধনত্বং সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারেণ প্রতি-পদ্যতে ইতি স সন্ন্যাসী যোগীচেতি স্তূয়তে। ১।

ভাষ্যানুবাদ।—"সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্য নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্নাস্তে" সকল কর্ম্মেরই মনের দ্বারা সংন্যাস করিয়াও নিজে কোন প্রকার কর্ম্মের আরম্ভ না করিয়া বা কাহার দ্বারা না করাইয়া অবস্থান করিবে; "মৌনীসন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ" (মৌনীও যে কোন বস্তুতেই সন্তুষ্ট) "অনিকেতঃ স্থিরমতিঃ" আবাস-হীন ও স্থিরমতি "বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ" (যে পুরুষ সকল কাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিস্পৃহ হইয়া বিচরণ করে) সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী (সকলপ্রকার আরম্ভের পরিত্যাগকারী) ইত্যাদি প্রকারের যে সকল বচন ভগবান্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার সহিত সংন্যাস আশ্রমের প্রতিষেধ বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে এইজন্য সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস গীতার প্রতিপাদ্য নহে এই কথা বলা যাইতে পারেনা) সেই কারণে (ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে) যে ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রম স্বীকার করিয়াছে, অথচ ধ্যানযোগে আরোহণ করিতে অভিলাষী ও মননশীল তাহার পক্ষে ফলাকাঙ্ক্ষা পরিহার পূর্ব্বক অগ্নিহোত্রাদি, কর্ম্মের অনুষ্ঠান চিত্তশুদ্ধি দ্বারা ধ্যান যোগারোহণের সাধন হইয়া থাকে, এই কারণে তাহাকেই সন্ন্যাসী ও যোগী এই শব্দ দুইটী দ্বারা স্তুতি করা হইতেছে। ১।

ভাষ্য।—অনাশ্রিতঃ ন আশ্রিতঃ অনাশ্রিতঃ কিং? কর্ম্মফলং কর্ম্মণঃ ফলং

যংতং অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলতৃষ্ণাবিরহিত ইত্যর্থঃ। যোহি কর্ম্মফল তৃষ্ণাবান্ স কর্ম্মফল মাশ্রিতো ভবতি অয়ং তু তদ্বিপরীতোঽতোঽনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলম্ এবম্ভূতঃ সন্ কার্য্যং কর্ত্তব্যং নিত্যং কাম্যবিপরীতমগ্নিহোত্রাদিকং করোতি নির্ব্বর্ত্তয়তিযঃ কশ্চিদীদৃশঃ কর্ম্মী স কর্ম্ম্যন্তরেভ্যো বিশিষ্যতে ইত্যেবমর্থমাহ ন সংন্যাসী চ যোগী চেতি। সন্ন্যাসঃ পরিত্যাগঃ স যস্যাস্তি স সন্ন্যাসী চ যোগী চ যোগশ্চিত্তসমাধানং স যস্যাস্তি স যোগী চ ইত্যেবং গুণসম্পন্নোঽয়ং মন্তব্যো ন কেবলং নিরগ্নিরক্রিয় এব সংন্যাসী যোগীচ ইতি মন্তব্যঃ। নির্গতা অগ্নয়ঃ কর্ম্মাঙ্গভূতা যস্মাৎ সঃ নিরগ্নিরক্রিয়শ্চ অনগ্নি সাধনা অপ্যবিদ্যমানাঃ ক্রিয়াস্তপোদানাদিকা যস্য অসৌ অক্রিয়ঃ। ১।

ভাষ্যানুবাদ।—"অনাশ্রিত" (যে আশ্রয় করেনা) সেই অনাশ্রিত, কি? (আশ্রয় করে না তাহাই বলা হইতেছে যে) কর্ম্মফল (অর্থাৎ) কর্ম্মের যাহা ফল তাহা যে ব্যক্তি আশ্রয় না করে সেই অনাশ্রিত (শব্দের দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে) কর্ম্মফল তৃষ্ণাশূন্য ইহাই অর্থ। যাহার কর্ম্মফলে তৃষ্ণা আছে সেই কর্ম্মফলকে আশ্রয় করিয়া থাকে এই ব্যক্তি তাহা হইতে বিভিন্ন এই জন্যই কর্ম্মফলকে আশ্রয় করেনা এইপ্রকার হইয়া, কার্য্য অর্থাৎ কর্ত্তব্য নিত্য অর্থাৎ কাম্য বিপরীত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম করিয়া থাকে। যে কর্ম্মপরায়ণ অধিকারী এতাদৃশস্বভাবসম্পন্ন সে অন্যান্য কর্ম্মী হইতে বিশিষ্ট ইহাই বলা হইতেছে যে, সেই সন্ন্যাসী ও যোগী সন্ন্যাস শব্দের অর্থ পরিত্যাগ তাহা যাহার আছে সে সন্ন্যাসী "যোগী" যোগশব্দের অর্থ চিত্তসমাধান তাহা যাহার আছে সে যোগী এইপ্রকার গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকেও সন্ন্যাসী ও যোগী বলিয়া জানিবে কেবল নিরগ্নি ও অক্রিয় ব্যক্তিই যে যথাক্রমে সন্ন্যাসী ও যোগী হইয়া থাকে তাহা নহে। কর্ম্মের সাধন অগ্নিত্রয় যাহার নিকট হইতে নির্গত হইয়াছে, তাহাকে নিরগ্নি কহা যায়, অগ্নি দ্বারা যাহাদের সাধন না হয়, এই প্রকার তপঃ দান প্রভৃতি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান যে ব্যক্তি না করে, তাহাকে অক্রিয় বলা যায়। ১।

যংসন্ন্যাসমিতিপ্রাহু র্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
নহ্যসংন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন॥ ২॥

অন্বয়।—হে পাণ্ডব যংসন্ন্যাস মিতিপ্রাহুঃ তং যোগং বিদ্ধি হি যস্মাৎ) অসন্ন্যস্তসঙ্কল্প কশ্চন যোগী ন ভবতি॥ ২॥

ধর্ম্ম জ...

[স্বামী সচ্চিদানন্দ।]

মানুষের ভিতর অনন্ত ভাব বিদ্যমান; তার মধ্যে কতকগুলো প্রকাশ্য ভাবে, আর অবশিষ্টগুলো অপ্রকাশ্যভাবে। পুনর্জ্জন্মবাদ এই ভাব সমূহের এক একটীর বিকাশমাত্র। গাছ, পালা, পোকা, জানোয়ার, অসাধু, সাধু, দেব, দানব, ইত্যাদি ইত্যাদি যত রকমের অবস্থা আছে, সে সমুদায় মানুষের ভিতর আছে। এক এক সময়ে এক একটা ভাবের বিকাশ হ'য়ে গেছে; ভবিষ্যতে আবার এক এক সময়ে এক একটা ভাবের বিকাশ হবে। গাছ যে ভাবসমূহের সমষ্টি, যে জন্মে সেই ভাবসমূহ প্রকাশ ছিল, সে জন্মে মানুষ ছিল গাছ। যে ভাব সকল থাকলে পশু হয়, যে জন্মে সেই ভাব সকল প্রকাশ ছিল, সে জন্মে মানুষ ছিল পশু। বর্ত্তমান জন্মে অন্য সকল ভাব চাপা রয়েছে; কেবল যে ভাবসমষ্টি থাকলে মানুষ হয়, সেই ভাব সমূহ প্রকাশ রয়েছে; তাই আমরা মানুষরূপে রইছি। আবার যখন মানুষ হবার ভাবসমূহ চাপা পড়ে গিয়ে, যে ভাব সকল থাকলে দেবতা হয়, সেই সব ভাব জেগে উঠবে, তখন এই মানুষ হবে দেবতা। যদি কোন মানুষ অত্যন্ত কুৎসিত-ভাবাপন্ন হয়, এত কুৎসিত যে সে ভাবের সহিত পশুভাবের কোনও পার্থক্য না থাকে, তা হলে এই মানুষ পরজন্মে পশু হবে। বা'র থেকে কিছুই আনতে হয় না; সমস্তই মানুষের ভিতর আছে; কেবল সে গুলোকে জাগাতে হয়, এই মাত্র। ধর্ম্মভাব, ভগবদ্ভাব, মুক্তি, জ্ঞান, বিবেক, বৈরাগ্য প্রভৃতি উচ্চ উচ্চ ভাব মানুষের, প্রত্যেক মানুষের ভিতর আছে। 'ধর্ম্ম' অর্থ—এই উচ্চ উচ্চ ভিতরের ভাবগুলোকে জাগান।

শুধু মানুষ কেন? প্রত্যেক জীবাত্মা অনন্ত ভাবের আধার; আজ, না হয় কাল, সে অনন্ত ভাব বিকাশ হবে। অতি ক্ষুদ্র পোকাটীর ভিতরেও এত শক্তি গূঢ়ভাবে চাপা রয়েছে, যে শক্তি, বিকাশ হলে, সমস্ত দুনিয়া কাঁপিয়ে দিতে পারে।—হবেও সে শক্তির বিকাশ এক কালে; সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে, ঐ নগণ্য পিপীলিকা একদিন দাঁড়াবে নিজের পায়ের উপর, যখন তার মহাশক্তির সাম্নে সূর্য্যগ্রহোপগ্রহনক্ষত্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মহাসমুদ্রে বুদ্বুদের ন্যায় তুচ্ছ বোধ হবে। তবে, সকলের মধ্যে সে মহাশক্তি আছে সত্য, কিন্তু বিকাশের

তারতম্য রয়েছে। অনুকূল অবস্থা হলে, সে শক্তি জেগে উঠে; প্রতিকূল অবস্থায় চেপে যায়।

অবস্থার আনুকূল্য শক্তিবিকাশের মূল সহায়। গান গাইবার ভাব সকলকার ভিতরেই আছে, কিন্তু গায়কের কাছে না থাকলে সে ভাবের বিকাশ হয় না। লেখা পড়া শিখে বিদ্বান্ হবার ভাব সকলকার ভিতরেই আছে; ইচ্ছা করলেই সকলেই বিদ্বান্ হতে পারেন, কিন্তু তার জন্য পণ্ডিতের আবশ্যক। চোরের সঙ্গে বেশী দিন থাক্‌লে চোর হ'তে হয়, মাতালের সঙ্গে বেশী মিশলে মাতাল হতে হয়; সতের সঙ্গে সৎ, অসতের সঙ্গে অসৎ হওয়ার কথাও সর্ব্বসাধারণ-বিদিত। ধর্ম্মভাব সম্বন্ধেও ঐ এক কথা। ধর্ম্মভাব সকলের ভিতর থাক্‌লে কি হয়,—অবস্থার আনুকূল্য ছাড়া তাহার বিকাশ অসম্ভব। যে মানুষের কাছে থাক্‌লে, অন্তর্নিহিত ভগবদ্ভাবের উদ্দীপন হয়, তিনিই গুরুপদবাচ্য।

ধর্ম্মভাব-উদ্দীপনার আর একটু বিশেষত্ব আছে। যিনি লেখা পড়া, গান বাজনা, বা অন্য কোনও ঐ রকম ভাবের উদ্দীপন কর্‌তে চান, তাঁহার তৎ তৎ ভাবের শিক্ষকের কাছ থেকে উপদেশ নিয়ে কাজ করলেই ইষ্টসিদ্ধি হতে পারে। কিন্তু ধর্ম্মভাব জাগাতে হলে, যার তার কাছ থেকে ধর্ম্মভাব উদ্দীপনের সাধন পদ্ধতি জেনে নিয়ে নিজে নিজে সাধন কর্‌লে, সে ভাব প্রস্ফুটিত হয় না। এই রকম করে ধ্যান করতে হয়, এই রকম করে এই মন্ত্র জপ করতে হয়, এই রকম করে আসন, প্রাণায়ামাদি করতে হয়, ইত্যাদি বহুবিধ ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া তত কঠিন নয়; ঐ সমস্ত উপদেশ অনুসারে কাজ করাও সহজ। কিন্তু তাহাতে ভিতরের ভগবদ্ভাবের বিকাশ হয় না। যে ব্যক্তি স্বয়ং ভগবদ্ভাব প্রত্যক্ষ অনুভব করেছেন, তাঁহার নিকট হ'তে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শক্তি সঞ্চারের আবশ্যক। জমিতে নানান্ রকমের আগাছা থাকে; সে সব আগাছা পরিষ্কার ক'রে, জমিতে সার দিয়ে জমি ঠিক করতে হয়; কিন্তু যতদিন না শস্যের বীজ সে জমিতে পড়ে, ততদিন শস্য হয় না। সেইরূপ শক্তিসঞ্চারকারী গুরুলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত, যত সাধন ভজন করা যায়, তাহাতে কেবল জমি তৈয়ার, চিত্তশুদ্ধি, হতে থাকে; গুরুর নিকট হতে ধর্ম্মবীজ না আসলে ভগবদ্ভাবের বিকাশ হয় না। গুরু হ'তে শিষ্যে এই শক্তি সঞ্চারের নাম দীক্ষা।

কোন কোন সম্প্রদায় বলেন, আন্তরিক ব্যাকুলতা থাক্‌লে দীক্ষা ব্যতিরেকেও ভগবদ্‌লাভ সম্ভব। ভগবান্ অন্তর্যামী রূপে সকলের ভিতর বিদ্যমান; তাঁহাকে সরলভাবে ডাক্‌লে, তিনিই তাঁহাকে পাবার পথ জানিয়ে দেন।

দীক্ষার কোন বিশেষ নিয়ম নাই। কখন বা গুরু শিষ্যকে কোন বিশেষ মন্ত্র জপ করতে বলেন, সেই মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে শক্তি সঞ্চারিত হয়। কখন কেবল স্পর্শের দ্বারা, কখন "শক্তি সঞ্চার হউক" এই মাত্র গুরুর ইচ্ছা দ্বারা, কখন বা শক্তিমান্ গুরুর সঙ্গ, ইত্যাদি নানা উপায়ে ঐ শক্তি গুরু থেকে শিষ্যে আসতে পারে।

গুরু পরম্পরা থেকে ঐ শক্তি আবহমান কাল চলে আসছে। এক গুরু হতে তাঁর শিষ্যে, সেই শিষ্য হতে তাঁর প্রশিষ্যে, সে প্রশিষ্য হতে তাঁর শিষ্যে, এই রকম করে ধারাবাহিক ক্রমে এই শক্তি বহুপ্রাচীন কাল থেকে সঞ্চারিত হয়ে বর্ত্তমান সময়ে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে কাজ করছে। তাঁহারা ধর্ম্মপিপাসু শিষ্যের মধ্যে উহার বীজ রোপণ করলে, শিষ্যের ধর্ম্মভাব প্রকাশ হবে; নহিলে নয়। শ্রুতি বলেন, "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্"—ভগবান্‌কে জানতে হলে ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। সুকেশা-ভারদ্বাজ-প্রমুখ ব্রহ্মচারিগণ ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য মহর্ষি পিপ্পলাদের শরণাপন্ন হলেন; মহর্ষি তাঁহাদিগকে ব্রহ্ম বিষয়ে উপদেশ দিবার পর, তাঁহারা মহর্ষিকে অর্চ্চনা করে, "নমঃ পরমঋষিভ্যঃ, নমঃ পরমঋষিভ্যঃ" এই বাক্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুপরম্পরাকে উদ্দেশে প্রণাম করলেন—শ্রুতিতে ইহাও দেখা যায়।

এ গুরু পরম্পরার আদি গুরু কে?

'মুক্তি' মানে দেশ কাল নিমিত্তের পারে যাওয়া। যে মহামায়ার মহাশক্তির প্রভাবে দৃশ্যমান জগৎ ছায়াবৎ, স্বপ্নবৎ অলীক হলেও সুদৃঢ় সত্যবৎ অচল অটল প্রতীয়মান হয়, 'মুক্তি' মানে সেই প্রবঞ্চনার পারে যাওয়া, জগৎকে দূর ক'রে, তাড়িয়ে দিয়ে, নাশ করে, স্বপ্ন ভেঙ্গে, নিরবচ্ছিন্ন সত্তা রাজ্যে যাওয়া,—মহামায়ার শক্তির পারে যাওয়া। মহাশক্তির বিকাশ ভিন্ন এ কাজ অসম্ভব। সে আদি গুরু কে, যাঁর হতে এ শক্তির প্রথম প্রবাহ? কার উদ্দীপনায় মানুষের মধ্যে গূঢ় ভাবে স্থিত এই মহাশক্তি প্রথমে জেগে ওঠে? অবশ্য, মানুষের মধ্যে এই মহাশক্তি, মহামায়ার পারে যাবার শক্তি প্রচ্ছন্ন ভাবে আছে; প্রত্যেক মানুষ, জীব, জানোয়ার, সকলের ভিতরেই আছে। কি অবস্থার আনুকূল্যে, কোন আঘাত প্রতিঘাতের ফলে, সে শক্তি প্রথমে জেগে উঠে গুরুপরম্পরাক্রমে আজও পর্য্যন্ত চলে আসছে?

"ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥ ১ ॥
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥ ২ ॥ গীতা। ৪র্থ অঃ।

"আমি পূর্ব্বে আদিত্যকে এই অব্যয় যোগ কহিয়াছিলাম ; তৎপরে, আদিত্য মনুকে ও মনু ইক্ষ্বাকুকে কহিয়াছিলেন। এইরূপ, রাজর্ষিগণ পরম্পরাগত এই যোগ বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন ; অনন্তর কালক্রমে উহা বিলুপ্ত হইয়াছিল।" নিখিল বিশ্বনিয়ন্তা অনন্তশক্তির আধার ভগবান্ই এই শক্তির আদি প্রবর্ত্তক।

মানবেতিহাসের অতি প্রাচীন কাল হতে, অতি অসভ্য বর্ব্বর অবস্থা থেকে, মানুষের উপাসনার চেষ্টা, গাছ হ'ক, পাথর হ'ক, সাপ হ'ক, অন্য কোন জন্তু জানোয়ার হ'ক, কারুর না কারুর উদ্দেশে মস্তক অবনত ক'রবার চেষ্টা, মানুষের সর্ব্বকালেই দেখা যায়। বুদ্ধির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, হৃদয়ের ক্রমশঃ বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্য-সমাজের এমন এক অবস্থা হয়েছিল, যখন ভগবান্ বলে একটা ভাবের চিন্তা অনেকেরই আলোচনার বিষয় হয়। যে হৃদয় পূর্ব্বে গাছ-পাথরাদির উপসনায় সন্তুষ্ট থাকৃত, সে এখন অসীম অনন্তের দিকে ধাবমান। উপযুক্ত সময় বুঝে, উপযুক্ত আধারে, স্বয়ং শক্তীশ্বর এই মহাশক্তির উদ্দীপন করিয়ে দেন সেই আধার হতে শিষ্যানুশিষ্যক্রমে সে শক্তি কিছুকাল কাজ করে চলে আসে। আবার কাল ক্রমে তাঁহার প্রতাপের হ্রাস হয়। তখন আবার তাকে পুনঃ সঞ্জীবিত করতে হয় ; ফের, অবতারের দরকার হয়। ফের, "সৃজাম্যহম্" হয়, ফের, "সম্ভবামি যুগে যুগে" হয়।

অবতারই এই শক্তির মূল প্রস্রবণ। ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা অবতারদিগের পদস্পর্শ করতে সমর্থ হন। অবতার বিশেষ যাঁহাদের গুরু, তাঁহাদের অন্তঃস্থিত ভগবদ্ভাব সহজেই উদ্দীপিত হয়। সে সৌভাগ্য সকলের ভাগ্যে ঘটে না।

শক্তির তারতম্যভেদে, অবতার গুরু, জগদীশ্বর গুরু, ও জীবন্মুক্ত গুরু, এই তিন প্রকারের গুরু। অবতার গুরুর অপর নাম নিত্যেশ্বর গুরু। ভগবান্ অনাদি কাল হ'তে চিরকাল নিয়মের নিয়ন্তা ; তিনি কখনই নিয়মের বদ্ধ হন না ; দেশকালনিমিত্ত নিত্য তাঁহার অধীন। তিনি চিরকাল কর্ম্মের প্রভু ; কর্ম্মের দ্বারা তিনি কখনও বদ্ধ হন নাই। সুতরাং তিনি যখন স্বেচ্ছায়

মানুষরূপে অবতীর্ণ হন, তিনিই কেবল ইচ্ছা কর্‌লে বদ্ধ জীবের কর্ম্ম, সাধন ব্যতিরেকে, কাটিয়ে দিতে পারেন। অন্য গুরুর শিষ্যে হ'লে, দীক্ষার পর, নিজে সাধন করে কর্ম্ম ক্ষয় করে মুক্তি পেতে হয়। অবতার গুরুর দয়া হ'লে নিজে সাধন ভজন না করলেও, কেবল তাঁহার ইচ্ছামাত্রেই সমস্ত কর্ম্ম মুহূর্ত্তেক মধ্যে নাশ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তিনি যে সকলকেই ঐরূপে দয়া কর্‌বেন, তারও কোনও বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। অবতার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাঁহার উপর কোনও নিয়মই খাটে না। হয়ত এক শিষ্যকে ঐ রকমের দয়া করে কৃপা-কটাক্ষে তার সমস্ত কর্ম্ম নিমেষ মধ্যে কাটিয়ে দিলেন। আবার আর এক শিষ্যকে শক্তি সঞ্চার করলেন মাত্র; তার পর শিষ্যকে সাধন ভজন করে, নিজে খেটে খুটে, ক্রমে উন্নত হতে হতে, মুক্তি লাভ কর্‌তে হল। তবে তিনি ভগবান্ বলে, কখনও কর্ম্মের দ্বারা বদ্ধ হন নাই বলে, চিরকাল কর্ম্মে প্রভু বলে, বিনা সাধনে শিষ্যের কর্ম্ম নাশ করে দেবার শক্তি কেবল তাঁহাতেই সম্ভব, অন্য কোনও গুরুতে নয়।

অবতার গুরুর কোনও লক্ষণ করা যায় না। এই রকম হলে, এই এই গুণ থাক্‌লে, অবতার হবে, নইলে নয়,—এই রূপ কোনও সংজ্ঞা দ্বারা অবতার গুরুকে নির্দ্দেশ করা যায় না। তিনি সমস্ত লক্ষণের অতীত; তাঁহার কার্য্য কলাপ সমুদয় দুরবগম্য। তাঁহাকে ধরা ছোঁয়া অতি কঠিন। তিনি যাহার কাছে স্ব স্বরূপ প্রকাশ করেন, তিনিই কেবল তাঁকে বুঝ্‌তে পারেন; অন্যে নয়।

অবতার গুরুর পর জন্মেশ্বর গুরু। ইহাদিগকে যোগশাস্ত্রে "প্রকৃতিলয়" এবং বেদান্তে "আধিকারিক পুরুষ" কহে। ইঁহারা প্রথমে সাধারণ লোকের ন্যা বদ্ধ জীব ছিলেন; পরে সাধনার দ্বারা মুক্তি স্বায়ত্ত করেছেন, অর্থাৎ ইচ্ছ ক'রলেই, মুক্ত হতে পারেন, কিন্তু সংসারের মঙ্গলের জন্য, ইঁহারা মুক্তি গ্রহ করেন না এবং কেবল পরহিত ব্রতে, আত্মোৎসর্গ করেন। অবতার গুরু হ ইঁহাদের প্রভেদ এই যে, অবতার গুরু কখনও বদ্ধ হন নাই, কিন্তু জন্মেশ্ব গুরু এক কালে বদ্ধ ছিলেন, এক্ষণ সাধনার দ্বারা মুক্ত হয়েছেন। ইঁহারা ই করলেই শিষ্যের কর্ম্ম নাশ কর্‌তে পারেন না। ইঁহাদের কাছ থেকে সঞ্চার করে নিয়ে, নিজে সাধন করে, মুক্ত হ'তে হয়। জন্মেশ্বর গুরু প্রল কল্প নিজের অহংবুদ্ধি রেখে জগতের উপকারে ব্রতী থাকেন। কিন্তু কল্পান্তে যখন জগৎ অব্যক্ত সাম্যাবস্থায় পুনরায় ফিরে যায়, সেই সঙ্গে সঙ্গে ইঁহারা মুক্ত হয়ে যান।

জন্যেশ্বর গুরুর নীচে জীবন্মুক্ত গুরু। যিনি প্রথমে কর্ম্মের দ্বারা বদ্ধ ছিলেন, পরে সাধনার দ্বারা মুক্ত হয়ে গেছেন, কেবল তাঁহার শরীর ও মন পূর্ব্ব সংস্কারের বেগে কাজ করছে মাত্র, তিনি জীবন্মুক্ত। মনে কর, দু খানা চাকা মধ্যে একখানা লম্বা কাঠের দ্বারা পরস্পর যুক্ত, যেমন গাড়ির চাকা সাধারণতঃ হয়ে থাকে। এবং ঐ দু খানা চাকা এক রাস্তার উপর দিয়ে সমবেগে চলে যাচ্ছে। সহসা একখানা চাকা হাত দিয়ে ধরে, যদি সংযোজক লম্বা কাঠখানাকে কেটে দেওয়া যায়, তা হলে যে চাকাখানা হাত দিয়ে ধরা হয়েছে, সেখানা স্থির হয়ে থাকে, আর অপরখানা কিছুক্ষণ গড়িয়ে চলে গিয়ে তবে পড়ে যায়। জীবন্মুক্ত পুরুষের অবস্থাও তদ্রূপ। তাঁহার অহংকাররূপ এক খানা চাকা একেবারে ব্রহ্মে লীন হয়ে স্থির হয়ে গেছে, কর্ম্মসংযোজক রূপ কাষ্ঠখণ্ড চিরকালের জন্য ছিন্ন হয়ে গেছে, কেবল শরীর ও মনরূপ অপর চাকা পূর্ব্ব কর্ম্মের বেগে এখনও কাজ কচ্ছে। ইঁহাদের কাছ থেকেও শক্তি সঞ্চার করে নিয়ে নিজে সাধন ভজন করে, মুক্ত হতে হয়। ইঁহারাও অবতারের মত ইচ্ছামাত্র দ্বারা শিষ্যের কর্ম্মনাশ করতে পারেন না। শরীরত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে ইঁহাদের একেবারে নাশ হয়ে যায়। জন্মেশ্বর এক কল্প পর্য্যন্ত নিজেদের অহঙ্কার রেখে দেন। জীবন্মুক্ত গুরুর অহঙ্কার ত আগেই নাশ হয়ে গেছে ; মৃত্যু পর্য্যন্ত পূর্ব্ব কর্ম্মের বেগে তাঁহার শরীর ও মন দ্বারা, অহঙ্কারের দ্বারা নয়, যা কিছু কাজ হবার তা হয় ; মৃত্যুর পর তাঁহার সম্বন্ধে সব ফুরিয়ে যায়।

পূর্ব্বে বলেছি, অবতার গুরুর কোন বিশেষ লক্ষণ বা সংজ্ঞা হতে পারে না। জন্মেশ্বর ও জীবন্মুক্ত গুরুর সম্বন্ধেও তদ্রূপ, কেবল তাঁহারা পূর্ব্বে বদ্ধ ছিলেন, এক্ষণ মুক্ত হয়েছেন, অবতার কখনও বদ্ধ হন নাই, এই মাত্র প্রভেদ। ইঁহারা সকলই নিয়মের পারে গেছেন। সাধারণ বদ্ধ জীবের পক্ষে, যাহা ভাল মন্দ, এঁদের কাছে সে সব অন্য প্রকারের। পাপ পুণ্য, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য, উচিত অনুচিত, এ সব কথার এঁদের কাছে কোন অর্থ ই নাই। সংসারের চক্ষে এঁদের বিচার করা যায় না।

এঁদের কৃপাও অহৈতুকী। কাকে দয়া করবেন, কাকে দয়া করবেন না, কিছুই ঠিক নাই। হয়ত এক জন সারা জীবন প্রার্থনা করলে, তার দিকে ফিরেও চাইলেন না। আর এক জন ধর্ম্ম কর্ম্ম চায় না, নাস্তিকভাবাপন্ন, তাকে দয়া করে নিজের সর্ব্বস্ব দিয়ে দিলেন। এক মাঠে এক রাস্তার ধারে এক বালক বসে আছে, কতকগুলো মোহর কাপড়ে করে। রাস্তার ধার

দিয়ে কত লোক যাচ্ছে, মাথা কুটে মর্‌ছে, একটা মোহর পাবার জন্যে। বালক তার দিকে ফিরেও চাচ্ছে না। আবার এক জন বালকের দিকে না তাকিয়ে চলে যাচ্ছে; বালক নিজে উঠে গিয়ে তাকে হাতে ধরে সব মোহর গুলো দিয়ে দিলে। গুরুর স্বভাবও ঐ বালকের মত।

এই তিন থাকের গুরু ছাড়া আর কারও গুরু হবার অধিকার নাই। যে নিজে কর্ম্মের পারে যায় নি, তার কি সাধ্য অপরকে সেখানে নিয়ে যায়? কেবল শক্তি পেয়েই, সাধনার চরমাবস্থায় না গিয়েই, শিষ্য ক'রবার লোভ হলে, সে গুরু ও তাহার শিষ্য, উভয়েরই সর্ব্বনাশ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস-দেব বল্‌তেন, গুরু হ'লে শিষ্যের কর্ম্মের ভার নিতে হয়, শিষ্যের পাপ গুরুকে স্পর্শায়। যিনি শক্তিমান পুরুষ, তাঁহারই কেবল গুরু হওয়া সাজে। নহিলে এক সের চালের ভাত রেঁধে লক্ষ লোক নিমন্ত্রণ করা হয়ে দাঁড়ায়। নহিলে, গুরু শিষ্য জড়াজড়ি করে উভয়ে অন্ধ-কূপে পড়ে যায়। মহামায়ার শক্তির পারে নিয়ে যেতে হবে,—এ ছেলে খেলা নয়। গুরু হওয়া নয় ত,—জা'ত সাপ নিয়ে খেলা করা। দক্ষ সাপুড়ে না হ'লে, মরণ ধ্রুব নিশ্চিত। শক্তি-সঞ্চার করবার শক্তি না থাক্‌লে, গুরু হওয়া যায় না, এ কথা বলা বাহুল্য। গুরুর বিশেষ ভাব—স্বার্থত্যাগ। তিনি শিষ্যের কাছে এক কপর্দ্দকেরও আশা রাখেন না।

ধর্ম্মের একটা টান আছে, গুরুর একটা টান আছে। যেমন বেশ্যাদের একটা টান আছে, মদের একটা টান আছে, যে টানে পড়ে লোক কর্ত্তব্য ভুলে যায়, ভাল মন্দ ভুলে যায়, বাড়ি ঘর দোর আত্মীয় স্বজন ভুলে গিয়ে বারবনিতার ঘরে পড়ে থাকে, তেমনি গুরুর একটা টান আছে। সে টানে পড়লে, শিষ্যের সাধ্য কি স্থির থাকে। শত বিঘ্ন ঠেলে ফেলে, সমস্ত বন্ধন কেটে ফেলে, উন্মত্তের ন্যায়, শিষ্য গুরুর কাছে যেতে থাকে। কোনই প্রতি-বন্ধক তাকে বারণ করতে পারে না; নিজের ইচ্ছা না থাক্‌লে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও শিষ্য গুরুকে ছাড়তে পারে না। সব ভুলে গিয়ে গুরুর হয়ে যায়। তখনই শক্তি সঞ্চার হতে আরম্ভ হয়েছে; শিষ্যের আর মার নাই।

যতই শিষ্য আপনার হতে থাকে, ততই গুরুর স্বরূপ তার কাছে প্রকাশ হতে থাকে। আগে শিষ্য গুরুকে মানুষ বুদ্ধিতে দেখে। পরে দেখে, গুরু আর ইষ্ট অভেদ, গুরু আর ভগবান্ অভেদ। মনে মনে নয়, প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পায়, গুরুরূপী ভগবান্ তার সাম্‌নে বিরাজমান। ইহার নাম গুরু-লাভ।

তদিন না গুরুতে পাকা ভগবদ্বুদ্ধি হয়, ততদিন ঠিক গুরুলাভ হয় নি। রুতে ভগবদ্বুদ্ধি হ'লে, সাধনার শেষ। তারপর সেবা। যতদিন না ভগবদ্বুদ্ধি হয়, ততদিন গুরুর শিষ্যকে দেবার জিনিষ থাকে, তাকে আস্তে আস্তে, বাপ যেমন ছোট ছেলেটীকে হাত ধরে তোলে, সে রকম করে ধর্ম্মরাজ্যের সোপানের পর সোপানে তুলতে হয়। কিন্তু একবার ভগবদ্বুদ্ধি পাকা হয়ে গেলে, আর গুরুর শিষ্যকেও কিছু দিতে হয় না, শিষ্যকেও গুরুর কাছ থেকে আর কিছু পাবার অপেক্ষা থাকে না। এই অবস্থায় নিষ্কাম গুরুভক্তি, ঠিক ঠিক, যথার্থ নিষ্কাম গুরুসেবা সুরু হয়। এ সেবা মুক্ত পুরুষের সেবা।

শেষ কথা, এই রকম গুরুর আবির্ভাব জগতে সর্ব্বদা হয় না। আর এ রকম গুরু না হলে'ও নিস্তার নাই। তবে, তাই বলে, চুপ করে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। মুমুক্ষু ব্যক্তি পারেনও না চুপ করে বসে থাকতে। যার যেরূপ বিশ্বাস, তার সেই বিশ্বাসে দৃঢ় হ'য়ে, সরলতা বজায় রেখে, সাধন করে যেতে হবে। সময়ে সবই আসবে। "মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্‌যততি সিদ্ধয়ে। যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ"॥—এ কথা অতি সত্য; "ঘুড়ি লক্ষে দুটো একটা কাটে,"—এ কথা অতি সত্য।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত।*

শ্রীম——কথিত।] [১২১ পৃষ্ঠার পর।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[দক্ষিণেশ্বরে—ভক্তসঙ্গে]

আজ রবিবার, ২৬শে অক্টোবর, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ। হেমন্তকাল। কার্ত্তিকের শুক্লাসপ্তমী তিথি।

দুপুরবেলা। দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে ঠাকুরের সেই পূর্ব্বপরিচিত ঘরে ভক্তেরা সমবেত হইয়াছেন। সে ঘরের পশ্চিম গায়ে অর্দ্ধচন্দ্রাকার বারাণ্ডা। বারাণ্ডার পশ্চিমে উদ্যানের পথ উত্তর দক্ষিণে যাইতেছে। পথের পশ্চিমে মা

* প্রথম ভাগ ছাপা হইতেছে।

কালীর পুষ্পোদ্যান, তাহার পরে পোস্তা, তৎপরে পবিত্রসলিলা দক্ষিণ-বাহিনী গঙ্গা।

ভক্তেরা অনেকেই উপস্থিত আছেন। আজ আনন্দের হাট।। আনন্দময় ঠাকুর রামকৃষ্ণের ঈশ্বর-প্রেম ভক্ত-মুখদর্পণে মুকুরিত হইতেছিল। আশ্চর্য্য! আনন্দ কেবল ভক্ত মুখদর্পণে কেন—বাহিরের উদ্যানে, বৃক্ষে, নানাবিধ যে কুসুম ফুটিয়া রহিয়াছে তন্মধ্যে—বিশাল ভাগীরথী বক্ষে, রবিকর-প্রদীপ্ত নীল নভোমণ্ডলে, মুরারি চরণচ্যুত গঙ্গাবারি-কণবাহী শীতল সমীরণ মধ্যে—এই আনন্দ প্রতিভাসিত হইতেছিল। কি আশ্চর্য্য! সত্য সত্যই 'মধুমৎপার্থিবং রজঃ'—উদ্যানের ধূলি পর্য্যন্ত মধুময়! ইচ্ছা হয়, গোপনে বা ভক্তসঙ্গে এই ধূলির উপর গড়াগড়ি দিই। ইচ্ছা হয়, উদ্যানের একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া সমস্ত দিন এই মনোহারী বারি দর্শন করি। ইচ্ছা হয়, এই উদ্যানের তরুলতা-গুল্মপত্রপুষ্পশোভিত স্নিগ্ধোজ্জ্বল বৃক্ষগুলিকে আত্মীয়জ্ঞানে সাদর সম্ভাষণ ও প্রেমালিঙ্গন দান করি। এই ধূলির উপর দিয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণ কি পাদ চারণ করেন?—এই বৃক্ষ লতা গুল্ম মধ্য দিয়া তিনি কি অহঃরহ যাতায়াত করেন? ইচ্ছা করে, জ্যোতির্ম্ময় গগনপানে অনন্যদৃষ্টি হইয়া তাকাইয়া থাকি, কেন না, দেখিতেছি, ভূলোক দ্যুলোক সমস্তই প্রেমানন্দে ভাসিতেছে। ঠাকুরবাড়ীর পূজারি, দৌবারিক, পরিচারক, কেন সকলকে পরমাত্মীয় বোধ হইতেছে?—কেন ওস্থান, বহুদিনান্তে দৃষ্ট জন্মভূমির ন্যায়, মধুর লাগিতেছিল? আকাশ, গঙ্গা, দেবমন্দির, উদ্যানপথ, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, সেবকগণ, আসনে উপবিষ্ট ভক্ত-গণ, সকলে যেন এক জিনিসের তৈয়ারী বোধ হইতেছে। যে জিনিসের তৈয়ারী শ্রীরামকৃষ্ণ, এঁরাও বোধ হইতেছে, সেই জিনিসের হইবেন। যেন একটী মোমের বাগান, গাছপালা ফলপাতা, বাগানের পথ, বাগানের মালী, বাগানের নিবাসিগণ, ও বাগান-মধ্যস্থিত গৃহ—সমস্তই মোমের। এখানকার সমস্ত যেন আনন্দ দিয়ে গড়া।

শ্রীমনোমোহন, শ্রীযুক্ত মহিমাচরণ ও মাষ্টার উপস্থিত ছিলেন। ক্রমে ঈশান, হৃদয় ও হাজরা। এঁরা ছাড়া অনেক ভক্তেরা ছিলেন। বলরাম, রাখাল এঁরা তখন শ্রীবৃন্দাবনধামে। এই সময়ে নূতন ভক্তেরা আসেন যান—নারাণ, পল্টু, ছোট নরেন, তেজচন্দ্র, বিনোদ, হরিপদ। বাবুরাম আসিয়া মাঝে মাঝে থাকেন। রাম, সুরেশ, কেদার ও দেবেন্দ্রাদি ভক্তগণ প্রায় আসেন—কেহ কেহ সপ্তাহান্তে, কেহ দুই সপ্তাহের পর। লাটু থাকেন। যোগীনের বাড়ী

নিকট; তিনি প্রায় প্রত্যহ যাতায়াত করেন। নরেন্দ্র মাঝে মাঝে আসেন, এলেই আনন্দের হাট। নরেন্দ্র তাঁহার সেই দেবদুর্লভ কণ্ঠে ভগবানের নাম ও গুণ গান করিতেন, অমনি ঠাকুরের নানাবিধ ভাব ও সমাধি হইত। একটী যেন উৎসব পড়িয়া যাইত। তাঁরি ইচ্ছা, ছেলেদের মধ্যে কেহ তাঁর কাছে রাত্রি দিন থাকেন, কেননা, তারা সংসারে বিবাহাদি সূত্রে বা বিষয়-কর্ম্মে আবদ্ধ হয় নাই। বাবুরামকে থাকিতে বলেন, তিনি মাঝে মাঝে থাকেন। শ্রীযুক্ত অধর সেন প্রায় আসেন।

[THE DIFFERENTIATED]

ঘরের মধ্যে ভক্তেরা বসিয়া আছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বালকের ন্যায় দাঁড়িয়ে কি ভাবছেন; ভক্তেরা চেয়ে আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মনোমোহনের প্রতি) সব রাম দেখছি। তোমরা সব বসে আছ, দেখছি রামই সব এক একটী হয়েছেন।

মনোমোহন। রামই সব হয়েছেন; তবে আপনি যেমন বলেন—"আপো-নারায়ণ", কিন্তু কোন জল খাওয়া যায়, কোন জলে মুখ ধোয়া চলে,কোন জলে বাসন মাজা—

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ; কিন্তু দেখছি তিনিই সব। জীব জগৎ তিনিই হয়েছেন। এই কথা বলিতে বলিতে ছোট খাট্‌টীতে বসিলেন।

[সত্য কথা]

শ্রীরামকৃষ্ণ। (মহিমাচরণের প্রতি) হাঁগা, সত্য কথা কইতে হবে বলে কি—আমার শুচিবাই হলো নাকি! যদি হঠাৎ বলে ফেলি খাবনা, তবে খিদে পেলেও আর খাবার যো নাই। যদি বলি, অমুক লোক ঝাউতলায় আমার গাড়ু নিয়ে যাবে, তারেই নিয়ে যেতে হবে; আর কেউ নিয়ে গেলে তাকে আবার ফিরে যেতে বলতে হবে। একি হলো বাপু! এর কি কোন উপায় নাই?

[সঞ্চয় ও সন্ন্যাসী]

"আবার সঙ্গে করে কিছু আনবার যো নাই। পান, খাবার, কোনও জিনিস সঙ্গে করে আনবার যো নাই। তা হলে সঞ্চয় হলো কি না। হাতে মাটী নিয়ে আসবার যো নাই!

এই সময়ে একটী লোক আসিয়া বলিল, মহাশয় হৃদয়* যদু মল্লিকের

বাগানে এসেছে, ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে আছে, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ভক্তদের প্রতি) হৃদের সঙ্গে একবার দেখা করে আসি। তোমরা বোসো।

এই বলে বার্ণিস করা চটী জুতাটী প'রে তিনি পূর্ব্বদিকের ফটক-অভিমুখে চলিলেন। সঙ্গে কেবল মাষ্টার।

লাল সুরকীর উদ্যানপথ। সেই পথে ঠাকুর পূর্ব্বদিক হইয়া যাইতেছেন। পথে খাজাঞ্চী দাঁড়িয়েছিলেন, ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। দক্ষিণে উঠানের ফটক রহিল, সেখানে শ্মশ্রুবিশিষ্ট দোবারিকগণ বসিয়াছিল। বামে কুঠী। তৎপরে পথের দুই দিকে কুসুমবৃক্ষ—অদূরে পথের ঠিক দক্ষিণ দিকে গাজীতলা ও মা কালীর পুষ্করিণীর সোপানাবলীশোভিত ঘাট। ক্রমে—পূর্ব্বদ্বার, বামদিকে দ্বারবানদের ঘর, ও দক্ষিণে তুলসী-মঞ্চ। উদ্যানের বাহিরে আসিয়া দেখেন, যদুমল্লিকের বাগানের ফটকের কাছে হৃদয় দণ্ডায়মান।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[সেবক সন্নিকটে]

হৃদয় কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান। দর্শনমাত্র রাজপথের উপর দণ্ডের ন্যায় নিপতিত হইলেন। ঠাকুর উঠিতে বলিলেন, হৃদয় আবার হাতজোড় করিয়া বালকের মত কাঁদিতে লাগিলেন।

কি আশ্চর্য্য! ঠাকুর রামকৃষ্ণও কাঁদিতেছেন। চক্ষের কোণে কয়েক ফোঁটা জল দেখা দিল। তিনি অশ্রুবারি হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিলেন—যেন চক্ষে জল পড়ে নাই। যে হৃদয় তাঁকে কত যন্ত্রণা দিয়াছিল, তার জন্য ছুটে এসেছেন। আর কাঁদছেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ। এখন যে এলি?

হৃদয়। (কাঁদিতে কাঁদিতে) তোমার সঙ্গে দেখা করিতে এলাম। আমার দুঃখ আর কার কাছে বল্‌বো?

শ্রীরামকৃষ্ণ। (সান্ত্বনার্থ সহাস্যে) সংসারে এইরূপ দুঃখ আছে। সংসার

* হৃদয় মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে ঠাকুরের ভাগিনেয়। ঠাকুরের জন্মভূমি ৺কামারপুকুরের নিকট সিওড়ে বাড়ী। প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসর ঠাকুরের কাছে থাকিয়া দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে মা কালীর পূজা ও ঠাকুরের সেবা করিয়াছিলেন। তিনি বাগানের কর্ত্তৃপক্ষীয়দের অসন্তোষভাজন হওয়াতে, তাহার বাগানে প্রবেশ করিবার হুকুম ছিল না।

করতে গেলেই সুখ দুঃখ আছে। (মাষ্টারকে দেখাইয়া) এঁরা এক একবার তাই আসেন। এসে ঈশ্বরীয় কথা দুটো শুনলে মনে শান্তি হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তোর কিসের দুঃখ ?

হৃদয়। (কাঁদিতে কাঁদিতে) আপনার সঙ্গ ছাড়া, তাই দুঃখ ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুইতো বলেছিলি, 'তোমার ভাব তোমাতে থাক্, আমার ভাব আমাতে থাক্!'

হৃদয়। হাঁ, তাতো বলেছিলাম—আমি কি জানি ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। আজ এখন আয়, আর একদিন তখন বসে কথা হবে। আজ রবিবার অনেক লোক এসেছে, তারা বসে রয়েছে। এবার দেশে ধান-টান কেমন হয়েছে ?

হৃদয়। হাঁ, তা এক রকম মন্দ হয় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আজ তবে আয়, আবার একদিন আসিস্।

হৃদয় আবার সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণাম করিল। ঠাকুর সেই পথ দিয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন। সঙ্গে মাষ্টার।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (মাষ্টারের প্রতি) আমার সেবাও যত করেছে, যন্ত্রণাও তেমনি দিয়েছে। আমি যখন পেটের ব্যারামে দুখানা হাড় হয়ে গেছি—কিছু খেতে পাত্তেম না, তখন আপনি সেই সব জিনিস খেতে খেতে আমায় বল্লে, "এই দেখ, আমি কেমন খাই; তোমার মনের গুণে খেতে পাও না।" আবার বলতো, "বোকা—আমি না থাকলে তোমার সাধুগিরি বেরিয়ে যেতো!" এক দিন এ রকম করে এত যন্ত্রণা দিলে, যে পোস্তার উপর দাঁড়িয়ে জোয়ারের জলে দেহত্যাগ করতে গিয়েছিলাম।

মাষ্টার শুনিয়া অবাক হইয়া রহিলেন। বোধ হয় ভাবিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! এমন লোকের জন্য ইনি অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতেছিলেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। (মাষ্টারের প্রতি) "আচ্ছা অত সেবা কর্ত্তো, তবে কেন ওর এমন হলো ? ছেলেকে যেমন মানুষ করে, সেই রকম আমাকে দেখেছে। আমি তো রাত দিন বেহুঁস হয়ে থাক্তুম, তার উপর আবার অনেক দিন ধরে ব্যামোয় ভুগেছি। ও, যে রকম করে আমায় রাখতো, সেই রকমই আমি থাক্তুম।"

মাষ্টার কি বলিবেন, চুপ করিয়া রহিলেন। হয়ত ভাবিতেছিলেন যে, হৃদয় বুঝি নিষ্কাম হইয়া ঠাকুরের সেবা করেন নাই।

কথা কহিতে কহিতে ঠাকুর নিজের ঘরে আসিয়া পঁহুছিলেন। ভক্তেরা প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ঠাকুর আবার ছোট খাটটীতে উপবিষ্ট হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ভক্তসঙ্গে—ঈশ্বরলাভোপায় তত্ত্ববিচারে।

[ভাব, মহাভাবের গূঢ়তত্ত্ব]

শ্রীযুক্ত মহিমাচরণ ইত্যাদি ছাড়া কয়েকটী কোন্নগরের ভক্ত এসেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন ঠাকুর রামকৃষ্ণের সঙ্গে কিয়ৎকাল বিচার করেছিলেন।

কোন্নগরের ভক্ত—(শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)। মহাশয়! শুন্‌লাম যে, আপনার ভাব হয়, সমাধি হয়। কেন হয় আর কিরূপ হয়, আমাদের বুঝিয়ে দিন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীমতীর মহাভাব হতো, সখীরা কেহ ছুঁতে গেলে অন্য সখী বল্‌তো, 'কৃষ্ণবিলাসের অঙ্গ ছুঁস্‌নি এঁর দেহমধ্যে এখন কৃষ্ণ বিলাস করছেন।'

"ঈশ্বর অনুভব না হলে ভাব বা মহাভাব হয় না, গভীর জল থেকে মাছ এলে জলটা নড়ে—তেমন মাছ হলে জলটা তোলপাড় করে। তাই ভাবে 'হাঁসে, কাঁদে, নাচে গায়।'

"অনেকক্ষণ ভাবে থাকা যায় না। আয়নার কাছে বসে কেবল মুখ দেখ্‌লে লোকে পাগল মনে কর্‌বে।"

কোন্নগরের ভক্ত। শুনেছি, মহাশয় ঈশ্বর দর্শন করে থাকেন; তাহলে আমাদের দেখিয়ে দিন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সবই ঈশ্বরাধীন—মানুষে কি কর্‌বে? তাঁর নাম কর্‌তে কর্‌তে কখন ধরা পড়ে, কখন পড়ে না। তাঁর ধ্যান করতে করতে এক একদিন বেশ উদ্দীপন হয়—আবার একদিন কিছুই হলো না।

[কর্ম্মযোগ ও ঈশ্বর দর্শন]

শ্রীরামকৃষ্ণ। "কর্ম্ম চাই। তবে দর্শন হয়, একদিন ভাবে হা[লদা]র-পুকুর * দেখলুম। দেখি একজন ছোটলোক পানা-জল ঠেলে জল নিচ্চে, আর জল হাতে তুলে এক একবার দেখ্‌ছে। যেন দেখালে, পানা না ঠেল্‌লে জল দেখা যায় না

* হুগলি জেলার অন্তঃপাতী কামারপুকুর গ্রামে ঠাকুর রামকৃষ্ণের বাড়ী। তাহার সম্মুখে হালদার পুকুর—একটা দিঘী বিশেষ।

—কর্ম্ম না করলে ভক্তিলাভ হয় না, ঈশ্বর দর্শন হয় না। ধ্যান জপ এই সব কর্ম্ম, তাঁর নামগুণ কীর্ত্তনও কর্ম্ম। দান যজ্ঞ এই সবও কর্ম্ম।

"মাখম যদি চাও, তবে দুধকে দই পাৎতে হয়। তার পর নির্জ্জনে রাখ্‌তে হয়। তার পর দই বস্‌লে পরিশ্রম করে মন্থন করতে হয়। তবে মাখম তোলা হয়।

মহিমাচরণ। আজ্ঞা হাঁ কর্ম্ম চাই বই কি! অনেক খাট্‌তে হয়, তবে ভাল হয়। পড়্‌তেই—কত হয়! অনন্ত শাস্ত্র!

[আগে বিদ্যা (জ্ঞানবিচার) না আগে ঈশ্বরলাভ ?]

শ্রীরামকৃষ্ণ। (মহিমার প্রতি) শাস্ত্র কত পড়্‌বে ? শুধু বিচার করলে কি হবে ? আগে তাঁকে লাভ কর্‌বার চেষ্টা কর। গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে, কিছু কর্ম্ম কর। গুরু না থাকেন, তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর, তিনি কেমন— তিনিই জানিয়ে দেবেন।

"বই প'ড়ে কি জান্‌বে ? যতক্ষণ না হাটে পঁহুছান যায়, ততক্ষণ দূর হ'তে কেবল হো হো শব্দ। হাটে পঁহুছিলে আর একরকম। স্পষ্ট দেখ্‌তে পাবে, শুনতে পাবে। 'আলু নাও' 'পয়সা দাও' স্পষ্ট শুনতে পাবে।

"সমুদ্র দূর হ'তে হো হো শব্দ করছে। কাছে গেলে কত জাহাজ যাচ্চে, পাখী উড়ছে, ঢেউ হচ্চে দেখতে পাবে।

"বই পড়ে ঠিক অনুভব হয় না। অনেক তফাৎ। তাঁকে দর্শনের পর—বই, শাস্ত্র, সায়েন্স (science) সব খড় কুটো বোধ হয়।

"বড় বাবুর সঙ্গে আলাপ দরকার। তাঁর ক'খানা বাড়ী, ক'টা বাগান, কত কোম্পানির কাগজ, এ—আগে জানবার জন্য অত ব্যস্ত কেন? চাকরদের কাছে গেলে তারা দাঁড়াতেই দেয় না—কোম্পানির কাগজের খবর কি দেবে!

"কিন্তু যো সো করে বড় বাবুর সঙ্গে একবার আলাপ কর, তা ধাক্কা খেয়েই হোক্, আর বেড়া ডিঙ্গিয়েই হোক,—তখন কত বাড়ী, কত বাগান, কত কোম্পানির কাগজ, তিনিই বলে দেবেন। বাবুর সঙ্গে আলাপ হলে আবার চাকর, দারবান্ সব সেলাম কর্‌বে। (সকলের হাস্য)।

[কর্ম্মযোগ ও ঈশ্বরলাভ]

একজন ভক্ত। এখন বড় বাবুর সঙ্গে আলাপ কিসে হয়? (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাই কর্ম্ম চাই। ঈশ্বর আছেন বলে বসে থাকলে হবে না। যো সো ক'রে তাঁর কাছে যেতে হবে। নির্জ্জনে তাঁকে ডাকো, প্রার্থনা কর, 'দেখা দাও' বলে ব্যাকুল হয়ে কাঁদো। কামিনী-কাঞ্চনের জন্য পাগল হয়ে বেড়াতে পার, তবে তাঁর জন্য একটু পাগল হও। লোকে বলুক, যে ঈশ্বরের জন্য অমুক পাগল হয়ে গেছে। দিন কতক না হয় সব ত্যাগ করে তাঁকে একলা ডাকো।

"শুধু 'তিনি আছেন' বলে বসে থাকলে কি হবে ? হালদার পুকুরে বড় মাছ আছে। পুকুরের পাড়ে শুধু বসে থাকলে কি মাছ পাওয়া যায় ? চারা করো, চার ফেলো। ক্রমে গভীর জল থেকে মাছ আসবে, আর জল নড়বে। তখন আনন্দ হবে। হয় তো মাছটার খানিকটা একবার দেখা গেল মাছটা ধপাস্ করে উঠ্‌লো। যখন দেখা গেল, তখন আরো আনন্দ।

"দুধকে দই পেতে মন্থন করলে তবে তো মাখম পাবে।

(মহিম চরণের প্রতি) এ—তো ভাল বালাই হলো। ঈশ্বরকে দেখিয়ে দাও, আর উনি চুপ করে বসে থাকবেন। মাখম তুলে মুখের কাছে ধর! (সকলের হাস্য)।

"ভাল বালাই—মাছ ধ'রে হাতে দাও!

"এক জন রাজাকে দেখতে চায়। রাজা আছেন সাত দেউড়ীর পরে। প্রথম দেউড়ী পার না হতে হতে বলে, 'রাজা কই ?' যেমন আছে, এক একটা দেউড়ী তো পার হতে হবে!

(ঈশ্বরলাভের উপায়—ব্যাকুলতা)

মহিমাচরণ। কি কর্ম্মের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যেতে পারে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। এই কর্ম্মের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যাবে, আরও কর্ম্মের দ্বারা পাওয়া যাবে না, তা নয়। তাঁর কৃপার উপর সব নির্ভর। তবে ব্যাকুল হয়ে কিছু কর্ম্ম করে যেতে হয়। ব্যাকুলতা থাকলে হয়ে যায়। ব্যাকুলতা থাকলে তাঁর কৃপা হয়।

"একটা সুযোগ হওয়া চাই। সাধুসঙ্গ, বিবেক, সদগুরু লাভ। হয় তো একজন বড় ভাই সংসারের ভার নিলে ; হয় তো স্ত্রীটী বিদ্যাশক্তি, বড় ধার্ম্মিক ; কি বিবাহ আদপেই হ'ল না, সংসারে বদ্ধ হতে হ'ল না—এই এই সব যোগাযোগ হলে হয়ে যায়।

"একজনের বাড়ীতে ভারি অসুখ—যায় যায়। কেউ বল্লে, অমুক নক্ষত্রে বৃষ্টি পড়বে, সেই বৃষ্টির জল মড়ার মাথার খুলিতে থাক্‌বে, আর একটা সাপ ব্যাঙ্‌কে তেড়ে যাবে, ব্যাঙ্‌কে ছোবল মারার সময় ব্যাঙ্‌টা যেই লাফ দিয়া পালাবে, অমনি সেই সাপের বিষ মড়ার মাথার খুলিতে পড়ে যাবে; সেই বিষের ঔষধ তৈয়ার করে যদি খাওয়াতে পার, তবে বাঁচে। এখন যার বাড়ীতে অসুখ, সেই লোক দিন ক্ষণ নক্ষত্র দেখে বাড়ী থেকে বেরুলো, আর ব্যাকুল হয়ে ঐ সব খুঁজতে লাগল। মনে মনে ঈশ্বরকে ডাক্‌ছে, 'ঠাকুর! তুমি যদি জোট্ পাট্ করে দাও তবেই হয়।' এইরূপে যেতে যেতে সত্য সত্যই দেখ্‌তে পেলে, একটা মড়ার মাথার খুলি পড়ে রয়েছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে এক পসলা বৃষ্টি হল। তখন সে ব্যক্তি বলতে হে গুরুদেব! মড়ার মাথার খুলিও পেলুম, আবার সেই নক্ষত্রেও বৃষ্টিও হলো, সেই বৃষ্টির জলও ঐ খুলিতে পড়েছে, এখন কৃপা করে আর কয়টীর যোগাযোগ করে দাও? ব্যাকুল হয়ে ভাবছে এমন সময়ে দেখে, একটা বিষধর সর্প তখন সে লোকটীর ভারি আহ্লাদ হলো; আর এতো ব্যাকুল হলো যে, বুক দুড় দুড় করতে লাগলো; আর সে বলতে লাগলো, 'হে গুরুদেব! এবা সাপও এসেছে, অনেকগুলির যোগাযোগও হল।' কৃপা করে এখন আর গুলি বাকী আছে, সে গুলি করিয়ে দাও! বল্‌তে বল্‌তে ব্যাঙ এলো, সাপ ব্যাঙ্ তাড়া করে যেতে লাগলো, মড়ার মাথার খুলির কাছে এসে যাই ছোবল দিতে যাবে, অমনি ব্যাঙটা লাফিয়ে ওদিকে গিয়ে প'ড়লো, আর বিষ অমনি খুলির ভিতর পড়ে গেল। তখন লোকটী হাত তালি দিয়ে নাচ্‌তে লাগলো।

"তাই বলছি, ব্যাকুলতা থাকলে সব হয়ে যায়।"

[ঈশ্বরলাভ ও ত্যাগ; ঠিক সন্ন্যাসী কে?]

শ্রীরামকৃষ্ণ। মনথেকে সব ত্যাগ না হলে ঈশ্বরলাভ হয় না। যে লোক সাধু, সে সঞ্চয় করতে পারে না। সঞ্চয় "না করে পঞ্ছী আউর দরবেশ।" পাখী আর সাধু সঞ্চয় করে না।

"এখানকার ভাব—হাতে মাটী দেবার জন্য মাটী নিয়ে যেতে পারে না। বেটুয়াটা করে পান আনবার যো নাই। হৃদে যখন বড় যন্ত্রণা দিচ্চে, তখন এখান থেকে কাশী চলে যাব মৎলব হল। ভাবলুম, 'কাপড় লব কিন্তু টাকা কেমন করে লব?' আর কাশী যাওয়া হল না।

যাহা কিছু দেখিতে, ভাবিতে শুনিতে বা কল্পিতে পারি। যাহা কিছু আমাদের জ্ঞানের সীমার মধ্যে, তাহাই এইরূপেই চলিতেছে—ঠিক যেমন মনুষ্যদেহে নিশ্বাস প্রশ্বাস। সমুদয় সৃষ্টিই, সুতরাং, এইরূপে চলিয়াছে, একটী তরঙ্গ উঠিতেছে, একটী পড়িতেছে, আবার উঠিয়া আবার পড়িতেছে। প্রত্যেক তরঙ্গেরই সঙ্গে সঙ্গে একটী করিয়া অবনতি, প্রত্যেক অবনতির সঙ্গে সঙ্গে একটী করিয়া তরঙ্গ। সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডেই, উহার সমপ্রণালীকত্ব হেতু একই নিয়ম ঘটিবে। অতএব আমরা দেখিতেছি যে, সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডেরই যেন উহার কারণে লয়; সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা, পৃথিবী, মন,শরীর, যাহা কিছু এই ব্রহ্মাণ্ডে আছে, সকলেরই উহাদের সূক্ষ্ম কারণে লয়, তিরোভাব, আপাত দৃষ্টিতে যেন নাশ। বাস্তবিক কিন্তু উহারা উহাদের কারণে সূক্ষ্মরূপে থাকিবে। উহা হইতে আবার তাহারা বাহিরিবে, আবার পৃথিবী, চন্দ্র সূর্য্য তারা প্রসবিবে। এই উত্থান পতন সম্বন্ধে আর একটী বিষয় জানিবার আছে। বীজ বৃক্ষ হইতে আইসে। উহা অমনি তৎক্ষণাৎ বৃক্ষ হয় না। উহার কতকটা বিশ্রামের বা অতি অব্যক্ত কার্য্যের সময়ের আবশ্যক। বীজকে খানিকক্ষণ মাটির নীচে থাকিয়া কার্য্য করিতে হয়। উহাকে আপনাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতে হয়,যেন আপনাকে খানিকটা অবনত করিতে হয়, আর ঐ অবনতি হইতে উহার পুনরুন্নতি হইয়া থাকে। অতএব এই সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডকেই কিছু সময় অদৃশ্য অব্যক্তভাবে সূক্ষ্মরূপে কার্য্য করিতে হয়, যাহাকে প্রলয় বা সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা বলে, তাহার পর আবার পুনঃসৃষ্টি হয়। এই জগৎপ্রবাহের একটী প্রকাশকে— অর্থাৎ সূক্ষ্মভাবে পরিণতি, কিছুকাল তদবস্থায় অবস্থান, আবার পুনরাবির্ভাব—ইহাকেই কল্প বলে। সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডই এইরূপে কল্পে কল্পে চলিয়াছে—প্রকাণ্ডতম ব্রহ্মাণ্ড হইতে উহার অন্তর্ব্বর্ত্তী প্রত্যেক পরমাণু পর্য্যন্ত। সব জিনিষই এই তরঙ্গাকারে চলিয়াছে। এক্ষণে আবার একটী গুরুতর প্রশ্ন আসিল—বিশেষতঃ বর্ত্তমান কালের পক্ষে। আমরা দেখিতেছি, সূক্ষ্মতর রূপগুলি ধীরে ধীরে ব্যক্ত হইতেছে, ক্রমশঃ স্থূলাৎ স্থূলতর হইতেছে। আমরা দেখিয়াছি যে, কারণ ও কার্য্য অভেদ—কার্য্য কেবল কারণের রূপান্তরমাত্র। অতএব এই সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড শূন্য হইতে প্রসূত হইতে পারে না। কিছুই কারণ ব্যতীত আসিতে পারে না, শুধু তাহাই নহে, কারণটী কার্য্যে সূক্ষ্মরূপে বর্ত্তমান।

তবে এই ব্রহ্মাণ্ড কোন বস্তু হইতে প্রসূত হইয়াছে? পূর্ব্ববর্ত্তী সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণ্ড হইতে। মানুষ কোন্ বস্তু হইতে প্রসূত? পূর্ব্ববর্ত্তী সূক্ষ্মরূপ হইতে।

বৃক্ষ কাহা হইতে হইল ? বীজ হইতে। বৃক্ষটী সমুদয়, বীজে বর্ত্তমান ছিল। উহা ব্যক্ত হয় মাত্র। অতএব এই জগদ্ব্রহ্মাণ্ড এই জগতেরই সূক্ষ্মাবস্থা হইতে প্রসূত হইয়াছে। এক্ষণে উহা ব্যক্ত হইয়াছে মাত্র। উহা পুনরায় ঐ সূক্ষ্ম রূপে যাইবে, আবার ব্যক্ত হইবে। এক্ষণে আমরা দেখিলাম, সূক্ষ্মরূপগুলি ব্যক্ত হইয়া স্থূলাৎ স্থূলতর হয়, যতদিন না উহারা উহাদের চরমসীমায় পৌঁছে ; চরমে পৌঁছিলে, তাহারা আবার পালটিয়া সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতর হয়। সূক্ষ্ম হইতে ক্রমশঃ স্থূল হইতে স্থূলতররূপে পরিণতি, কেবল যেন উহাদের অংশগুলির অবস্থান পরিবর্ত্তন, তাহাকেই বর্ত্তমান কালে 'ক্রমবিকাশ' বাদ বলে। ইহা অতি সত্য, সম্পূর্ণরূপে সত্য ; আমরা আমাদের জীবনে উহা দেখিতেছি ; বিচারবান্ কোন ব্যক্তিরই এই 'ক্রমবিকাশ' বাদীদের সহিত বিবাদের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আমাদিগকে আরো একটী বিষয় জানিতে হইবে—তাহা এই যে, প্রত্যেক ক্রমবিকাশ, একটী ক্রমসঙ্কোচের দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তিত। বীজ বৃক্ষের জনক বটে, কিন্তু অপর এক বৃক্ষটী আবার ঐ বীজের জনক। বীজই সেই সূক্ষ্মরূপ, যাহা হইতে বৃহৎ বৃক্ষটী আসিয়াছে, আবার আর একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষ ঐ বীজে ক্রমসঙ্কুচিত হইয়াছে। সমুদয় বৃক্ষটীই ঐ বীজে বর্ত্তমান। শূন্য হইতে কোন বৃক্ষ জন্মিতে পারে না, কিন্তু আমরা দেখিতেছি, বৃক্ষ বীজ হইতে আর আর কতকগুলি বীজ কতকগুলি বৃক্ষই জন্মায়, অপর বৃক্ষ নহে। ইহা দেখাইতেছে যে, সেই বৃক্ষের কারণ ঐ বীজ—কেবল সেই বীজমাত্র ; আর ঐ বীজে সমুদয় বৃক্ষটীই রহিয়াছে। সমুদয় মনুষ্যত্ব ঐ এক জীবাণুর ভিতরে, উহা আবার ধীরে ধীরে ব্যক্ত হয়। সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডই—সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণ্ডে রহিয়াছে সমুদয় কারণে, উহার সূক্ষ্মরূপে রহিয়াছে। অতএব 'ক্রমবিকাশ' বাদ,—স্থূলাৎ স্থূলতররূপে ক্রমপ্রকাশ—এই মত অতি সত্য। উহা সম্পূর্ণরূপেই সত্য ; তবে প্রত্যেক ঘটনাটীই একটী ক্রমসঙ্কোচের দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তিত। অতএব যে ক্ষুদ্র অণুটী পরে মহাপুরুষ হইল, তিনি সেই ক্রমসঙ্কুচিত মহাপুরুষই ছিলেন, তিনি আবার মহাপুরুষরূপে ক্রমবিকাশ প্রাপ্ত হইবেন। যদি ইহাই সত্য হয়, তবে আমাদের ক্রমবিকাশবাদীদের সহিত কোন বিবাদ নাই, কারণ আমরা ক্রমশঃ দেখিব, যদি তাঁহারা এই ক্রমসঙ্কোচ প্রক্রিয়াটীর অঙ্গীকার করেন, তবে তাঁহারা ধর্ম্মের বিনাশকর্ত্তা না হইয়া উহার প্রবল সহায় হইবেন।

এতদূর আমরা দেখিলাম, শূন্য হইতে কিছুর উৎপত্তি হইল, এই হিসাবে সৃষ্টি হইতেই পারে না। সকল জিনিষই অনন্তকাল ধরিয়া রহিয়াছে এবং

অনন্ত কাল ধরিয়া থাকিবে। কেবল ক্রমবর্ত্তী তরঙ্গ ও অবনতি ক্রমে উহাদের গতি হয়। সূক্ষ্মভাবে একবার গতি, আবার স্থূলভাবে আগমন। সমুদয় প্রকৃতিতেই এই ক্রমসঙ্কোচ ও ক্রমবিকাশ প্রক্রিয়া চলিতেছে। সুতরাং সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশের পূর্ব্বে অবশ্যই ক্রমসঙ্কুচিত হইয়াছিল, আবার উহা এই সকল বিভিন্নরূপে আপনাকে ব্যক্ত করিবে—আবার আর একবার ক্রমসঙ্কুচিত হইবার জন্য। উদাহরণ স্বরূপ একটী ক্ষুদ্র উদ্ভিদের জীবন ধর। আমরা দেখিতেছি, দুইটী জিনিষ ঐ উদ্ভিদ রূপেই একত্বপ্রদান করিতেছে, উহার উৎপত্তি ও বিকাশ আর উহার ক্ষয় ও বিনাশ। এই দুইটী মিলিয়াই একটী একত্ব বিধান করিতেছে—উদ্ভিদ্ জীবন। অতএব ঐ উদ্ভিদ্ জীবনকে প্রাণ শৃঙ্খলের একটী অংশমাত্র ধরি। আমরা সমুদয় বস্তুরাশিকেই এক প্রাণ বলিয়া ধরিতে পারি—জীবাণু হইতে উহার আরম্ভ এক পূর্ণমানবে উহার সমাপ্তি। মানুষ ঐ শৃঙ্খলের একটী অংশ; আর যেমন ক্রমবিকাশবাদীরা বলেন, নানারূপ বানর তার পর আরো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী এবং উদ্ভিদ্গণ অন্য শৃঙ্খলাংশ। এক্ষণে যে ক্ষুদ্রতম খণ্ড হইতে আমরা আরম্ভ করিয়াছিলাম, তথা হইতে এই সমুদয়কে এক প্রাণ বলিয়া ধর; আর আমরা এই মাত্র যে নিয়ম পাইলাম, তাহা প্রয়োগ করিয়া দেখি যে, প্রত্যেক ক্রম বিকাশই পূর্ব্ববর্ত্তী কিছুর ক্রমসঙ্কোচ আর অতি নিম্নতম জন্তু হইতে সর্ব্বোচ্চ পূর্ণতম মানুষ পর্য্যন্ত সমুদয় শ্রেণীই অবশ্যই অপর কিছুর ক্রমসঙ্কোচ হইবে। কিসের ক্রমসঙ্কোচভাব? ইহাই প্রশ্ন। কোন্ পদার্থ ক্রমসঙ্কুচিত হইয়াছিল? ক্রমবিকাশবাদী তোমাদিগকে বলিবেন, তোমার ঈশ্বরধারণা ভুল। কারণ, তোমরা বল, চৈতন্যই জগতের স্রষ্টা, কিন্তু আমরা প্রতিদিন দেখিতেছি যে, চৈতন্য অনেক পরে আসে। মানুষে ও উচ্চতর জন্তুতেই কেবল আমরা চৈতন্য দেখিতে পাই, কিন্তু এই চৈতন্য জন্মিবার পূর্ব্বে এই জগতে লক্ষ লক্ষ বর্ষ অতীত হইয়াছে। ভয় পাইও না, তোমার নিজ মত খাটাও। বৃক্ষ বীজ হইতে আসে, আবার বীজে যায়—আরম্ভ ও পরিণাম সমান। পৃথিবী তাহার কারণ হইতে আসে আবার কারণে যায়। এই সমুদয় শৃঙ্খলের শেষ কি? আমরা জানি, আরম্ভ জানিতে পারিলে আমরা পরিণামও জানিতে পারিব। এইরূপ, অন্ত জানিতে পারিলেও আদি জানিতে পারিব। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে এই সমুদয় 'ক্রমবিকাশ'বাদ-সঙ্গত শ্রেণী লও, উহার এক প্রান্তে জীবাণু, অপর প্রান্তে পূর্ণ মানব। এই সমুদয় শ্রেণীটী এক প্রাণস্বরূপ। অন্তে পূর্ণ মানবকে দেখিতেছি, সুতরাং আদিতেও

ঐ হইবে। অতএব ঐ জীবাণু অবশ্যই উচ্চতম চৈতন্যের ক্রমসঙ্কুচিত অবস্থা। তোমরা ইহা দেখিতে না পার, কিন্তু সেই ক্রমসঙ্কুচিত চৈতন্যই আপনাকে ব্যক্ত করিতেছে, যতদিন না উহা সম্পূর্ণতম মানবরূপে প্রকাশিত হয়। ইহা সম্পূর্ণরূপে গণিতমতে প্রমাণ করা যাইতে পারে। যদি শক্তির অবিনশ্বরত্বের নিয়ম (Law of Conservation of Energy) সত্য হয়, তবে তুমি কোন যন্ত্র হইতে কিছু পাইতে পার না, যদি তুমি পূর্ব্বে উহাতে তাহা না দিয়া থাক। এঞ্জিন হইতে তুমি যতটুকু কার্য্য পাও, তাহা তুমি উহাতে জল কয়লারূপে যাহা দিয়াছিলে, ঠিক ততটুকু—এক চুল বেশীও নয় কমও নয়। আমি এক্ষণে যে কার্য্য করিতেছি, তাহা আমি আমার ভিতরে বায়ু, খাদ্য ও অন্যান্য পদার্থরূপে যাহা দিয়াছি, ঠিক ততটুকু। কেবল সেগুলি আর একরূপে পরিণত এই মাত্র। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এক বিন্দু জড় বা একটুকুও শক্তি বাড়াইতে অথবা কমাইতে পার. যায় না। যদি তাই হয়, তবে এই চৈতন্য কি? যদি উহা জীবাণুতে বর্ত্তমান না থাকে, তবে উহা অবশ্যই আকস্মিক বলিতে হইবে —অসৎ (কিছু না) হইতে সতের (কিছুর) উৎপত্তি হইল—যাহা অসম্ভব। তাহা হইলে ইহা একেবারে নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, যেমন অন্য অন্য বিষয়ে দেখি, যেখানে আরম্ভ, সেইখানেই শেষ, তবে কখন অব্যক্ত, কখন বা ব্যক্ত। এই শৃঙ্খলের এক প্রান্ত পূর্ণমানব মুক্তপুরুষ, দেবমানব, যিনি প্রকৃতির নিয়মের বাহিরে গিয়াছেন, যিনি সমুদয় অতিক্রম করিয়াছেন। তাঁহাকে এই জন্মমৃত্যুশৃঙ্খলের ভিতর দিয়া যাইতে হয় না। সেই মানব যাহাকে খ্রীষ্টিয়ানেরা খ্রীষ্টমানব বলেন, বৌদ্ধগণ বুদ্ধমানব বলেন, যোগীরা মুক্ত বলেন, সেই পূর্ণমানব এই শৃঙ্খলের এক প্রান্ত, আর সেই শরীরের ক্রমসঙ্কুচিত হইয়া এই জীবাণুতেও বর্ত্তমান।

এক্ষণে এই ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে কি হইল? এই জগতের শেষ উৎপন্ন কি? চৈতন্য—তাই নয় কি? জগতে সব শেষে হয় চৈতন্য। আর যখন ঐ চৈতন্য ক্রমবিকাশবাদীদের মতে, সৃষ্টির শেষ বস্তু হইল, তাহা হইলে চৈতন্যই আবার সৃষ্টির প্রভু—সৃষ্টির কারণ হইবেন। মানুষে জগৎসম্বন্ধে শেষ কি, ধারণা করিতে পারে? মানুষ এই ধারণা করিতে পারে যে, জগতের এক অংশ অপর অংশের সহিত সম্বদ্ধ—জগতের প্রত্যেক বস্তুতেই জ্ঞানের ক্রিয়া প্রকাশ—সেই প্রাচীন 'অভিপ্রায়বাদী' (Design theory) আমরা জড়বাদীদের সহিত মানিয়া লইতেছি যে, চৈতন্যই জগতের শেষ বস্তু—সৃষ্টিক্রমের ইহাই শেষবস্তু। বেশ

কথা, কিন্তু মানুষ জন্মিবার লক্ষ লক্ষ বর্ষ পূর্ব্বে জ্ঞান ছিল না, অর্থাৎ প্রকাশিত জ্ঞান ছিল না কিন্তু অব্যক্ত চৈতন্য ছিল—আর সৃষ্টির শেষ চৈতন্য—মানুষ। তবে আদি কি হইল? আদিও চৈতন্য। আদিতে সেই চৈতন্য ক্রমসঙ্কুচিত হয়, আবার পরিণামে উহাই ক্রমবিকশিত হয়। অতএব এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় জ্ঞানসমষ্টি অবশ্যই সেই ক্রমসঙ্কুচিত সর্ব্বব্যাপী সমষ্টি চৈতন্য। উহা ধীরে ধীরে আপনাকে ব্যক্ত করিতেছে। এই সর্ব্বব্যাপী বিশ্বজনীন চৈতন্যের নাম ঈশ্বর। উহাকে অন্য যে কোন নাম দাও না কেন, ইহা স্থির যে, আদিতে সেই অনন্ত বিশ্বব্যাপী চৈতন্য ছিলেন। সেই বিশ্বজনীন চৈতন্য ক্রম-সঙ্কুচিত হইয়া সূক্ষ্ম হইলেন, আবার সেই চৈতন্যই আপনাকে ক্রমশঃ ব্যক্ত করিতেছেন—যতদিন না তিনি পূর্ণ মানব, খ্রীষ্টমানব, বুদ্ধমানবে পরিণত হন। তখন তিনি নিজস্থানে ফিরিয়া আসেন। এই জন্যই সকল শাস্ত্রই বলেন, "আমরা তাঁহাতে জীবিত, তাঁহাতেই থাকিয়া চলিতেছি, তাঁহাতেই আমাদের সত্তা।" এই জন্যই সকলশাস্ত্রই বলেন, আমরা ঈশ্বর হইতে আসিয়াছি এবং তাঁহাতেই ফিরিয়া যাইব। শব্দে ভয় পাইও না, শব্দে যদি ভয় পাও, তবে তোমরা দার্শনিক হইবার যোগ্য নও। এই বিশ্বব্যাপী চৈতন্যকেই ব্রহ্মবাদীরা ঈশ্বর বলিয়া থাকেন।

আমাকে অনেকে অনেক বার জিজ্ঞাসিয়াছেন, আপনি পুরাতন 'ঈশ্বর' শব্দটী ব্যবহার করেন কেন? কারণ, যত কথা ব্যবহৃত হইতে পারে, তন্মধ্যে ইহাই সর্ব্বোত্তম। তাহার কারণ,—মানুষের সকল আশা ভরসা সকল সুখ ঐ এক শব্দের উপর কেন্দ্রীভূত। এখন ঐ শব্দ পরিবর্ত্তন করা অসম্ভব। যখন বড় বড় সাধু মহাত্মারা ঐরূপশব্দ গড়েন, তখন তাঁহারা উহাদের অর্থ খুব ভালরূপেই বুঝিতেন। ক্রমে সমাজে যখন ঐ শব্দগুলি প্রচারিত হইয়া পড়িল, তখন অজ্ঞলোকে ঐ শব্দগুলির ব্যবহার করিতে লাগিল। তাহার ফল এই হইল যে, শব্দগুলির মহিমা হ্রাস হইল। 'ঈশ্বর' শব্দটী স্মরণাতীত কাল হইতে আসিয়াছে আর যাহা কিছু মহৎ ও পবিত্র,আর এই সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যের ভাব, ঐ শব্দের ভিতর রহিয়াছে। কোন নির্ব্বোধ ঐ শব্দ ব্যবহারে আপত্তি করিলেই কি উহা ত্যজিতে বল? আর একজন আসিবে, বলিবে আমার এই শব্দটী লও, অপরে আবার তাহার শব্দ লইতে বলিবে। এরূপ হইলে ত এইরূপ বাজে শব্দের কিছু অন্ত থাকিবে না। তাই বলি, সেই প্রাচীন শব্দটীই ব্যবহার কর, কিন্তু উহাকে আরো ভালভাবে ব্যবহার কর, মন হইতে কুসংস্কার তাড়া-

ইয়া দাও, আর সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি কর, যে, এই মহৎ প্রাচীন শব্দের অর্থ কি? যদি তোমরা 'ভাবযোগবিধান' (Law of Association of ideas) কাহাকে বলে বুঝ, তবে জানিবে, এই শব্দগুলির সহিত নানাপ্রকার মহৎ মহৎ শক্তির ভাব যুক্ত আছে, লক্ষ লক্ষ মানব উহা ব্যবহার করিয়াছে। লক্ষ লক্ষ লোক ঐ শব্দগুলির পূজা করিয়াছে, আর উহাদের সহিত যাহা কিছু সর্ব্বোচ্চ ও সুন্দরতম, যাহা কিছু যুক্তিযুক্ত, যাহা কিছু প্রেমাস্পদ, মনুষ্যস্বভাবে যাহা কিছু মহৎ ও সুন্দর, তাহাই যোগ করিয়াছে। অতএব এই শব্দগুলি ঐ সমস্ত ভাবের উদ্দীপক কারণস্বরূপ হয়, সুতরাং উহাদিগকে ত্যাগ করিতে পারা যায় না। আমি যদি আপনাদিগকে শুধু এই বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিতাম যে, ঈশ্বর জগৎ সৃজিয়াছেন, তাহা হইলে উহা কোনরূপ অর্থ প্রকাশ করিত না। তথাপি এই সমুদায় বিচারাদির পর আমরা সেই প্রাচীন পুরুষের নিকটই পৌঁছিব।

তবে আমরা এক্ষণে কি দেখিলাম? যে জাগতিক শক্তির এই সকল বিকাশ— তাহাদিগকে যে নামই দাও না কেন, ভূত বা চিন্তাশক্তি বা শক্তি বা চৈতন্য তাহারা সেই বিশ্বব্যাপী চৈতন্যের প্রকাশ, অথবা আমরা ভবিষ্যতে তাঁহাকে যেরূপ বলিব—পরম প্রভু। যাহা কিছু দেখ, শোন, বা অনুভব কর, সবই তাঁহার সৃষ্টি, ঠিক বলিতে গেলে—তাঁহারই পরিণাম—আরো ঠিক বলিতে গেলে বলিতে হয়, প্রভু স্বয়ং। তিনিই সূর্য্য ও তারকারূপে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পাইতেছেন, তিনিই জননী ধরণী, তিনিই স্বয়ং সমুদ্র। তিনিই মৃদু বৃষ্টিধারারূপে পড়িতেছেন, তিনিই মৃদু বাতাস, যাহা আমরা শ্বাস লই, তিনিই শরীরে শক্তিরূপে কার্য্য করিতেছেন। তিনিই বক্তৃতা, তিনিই বক্তা, তিনিই এই শ্রোতৃমণ্ডলী। তিনিই সেই বেদী, যাহার উপর আমি দাঁড়াইয়া; তিনিই ঐ আলোক, যাহা দ্বারা আমি তোমাদের মুখ দেখিতেছি। এ সবই তিনি। তিনি জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ, আর তিনিই ক্রমসঙ্কুচিত হইয়া অণু হন, আবার ক্রমবিকশিত হইয়া ঈশ্বর হন। তিনিই অবনত হইয়া অতি নিম্নতম পরমাণু হন আবার ধীরে ধীরে নিজস্বরূপ প্রকাশিয়া নিজেতে যুক্ত হন। ইহাই জগতের রহস্য। তুমিই পুরুষ, তুমিই স্ত্রী, তুমিই যৌবনগর্ব্বে ভ্রমণশীল যুবা, তুমিই বৃদ্ধ—দণ্ড ধরিয়া ভ্রমিতেছ, তুমিই সকল বস্তুতে—হে প্রভু, তুমিই সকল। জগতের এই একমাত্র ব্যাখ্যা, যাহাতে মানবের যুক্তি তৃপ্ত। এক কথায় বলিতে গেলে, আমরা

তাঁহা হইতেই জন্মাই, তাঁহাতে বাঁচিয়া থাকি এবং তাঁহাতেই ফিরিয়া যাই।

জগৎ।

ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড।

মনুষ্যমন স্বভাবতই বাহিরে যাইতে চায়। মন যেন শরীরের বাহিরে ইন্দ্রিয়প্রণালী দিয়া উঁকি মারিতে চায়। চক্ষু অবশ্যই দেখিবে, কর্ণ অবশ্যই শুনিবে, ইন্দ্রিয়গণ অবশ্যই বহির্জগৎ প্রত্যক্ষ করিবে। তাই স্বভাবতঃই প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্ব মানুষের দৃষ্টি প্রথমেই আকর্ষণ করে। মানবাত্মা প্রথমেই বহির্জ্জগতের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিয়াছিল। আকাশ, নক্ষত্রপুঞ্জ, অন্তরীক্ষস্থ অন্যান্য পদার্থনিচয়, পৃথিবী, নদী, পর্ব্বত, সমুদ্র প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল, আর আমরা সকল প্রাচীন ধর্ম্মেই ইহার কিছু কিছু পরিচয় দেখিতে পাই, প্রথমে মানবমন অন্ধকারে হাতড়াইতে হাতড়াইতে, বাহিরের যাহা কিছু তাহাই, ধরিতে চেষ্টা করিয়াছিল। নদীর একজন দেবতা, আকাশের অধিষ্ঠাত্রী আর একজন, মেঘের অধিষ্ঠাত্রী একজন আবার বৃষ্টির অধিষ্ঠাত্রী আর এক জন। যাহাদিগকেই প্রকৃতির শক্তি বলিয়া জানি, তাহারাই সচেতন পদার্থরূপে পরিণত হইল। কিন্তু এই প্রশ্নের যতই গভীর হইতে গভীরতর অনুসন্ধান হইতে লাগিল, ততই এই বাহ্য দেবতাগণে মনুষ্যের আর তৃপ্তি হইল না। তখন মনুষ্যের সমুদয় শক্তি অন্তরে প্রবাহিত হইল—মানুষের নিজ আত্মা সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইতে লাগিল। বহির্জ্জগৎ হইতে ঐ প্রশ্ন গিয়া অন্তর্জ্জগতে পঁহুছিল। বহির্জ্জগৎ বিশ্লেষণ করিয়া শেষে মানুষ অন্তর্জ্জগৎ বিশ্লেষণ করিতে আরম্ভ করে। এই ভিতরের মানুষ সম্বন্ধে প্রশ্ন, ইহা আসে—উচ্চতর সভ্যতা হইতে, প্রকৃতি সম্বন্ধে গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি হইতে, উচ্চতর ভূমিতে উন্নতি হইলে।

এই ভিতরের মানুষই অদ্যকার বৈকালের আলোচ্য বিষয়। এই অন্তর্মানবসম্বন্ধে প্রশ্ন মানুষের যতদূর প্রিয় ও তাহার হৃদয়ের যত সন্নিহিত আর কিছুই তত নহে। কত লক্ষ বার, কত কত দেশে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছে। কি অরণ্যবাসী সন্ন্যাসী, কি রাজা, কি দরিদ্র কি ধনী, কি সাধু

কি পাপী, প্রত্যেক নর, প্রত্যেক নারী, সকলেই কোন না কোন সময়ে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিয়াছেন—এই ক্ষণভঙ্গুর মানবজীবনে কি নিত্য কিছু নাই? এই শরীর মরিলেও এমন কিছু কি নাই, যাহা মরে না? যখনি এই শরীর ধূলিমাত্রে পরিণত হয়, তখন কি কিছু জীবিত থাকে না? অগ্নি শরীরকে ভস্মসাৎ করিলে তাহার পর আর কিছু কি অবশিষ্ট থাকে না? যদি থাকে, তবে তাহার নিয়তি কি? উহা যায় কোথায়? কোথা হইতেই বা উহা আসিয়াছিল? এই প্রশ্নগুলি পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, আর যতদিন এই সৃষ্টি থাকিবে, ততদিন মানব-মস্তিষ্ক চিন্তিবে, ততদিনই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিতে হইবে। ইহার উত্তর যে আসে নাই, তাহা নহে, প্রতিবারই উত্তর আসিয়াছিল; আর যত সময় যাইবে, ততই উহা উত্তরোত্তর অধিক বল সংগ্রহ করিবে। সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে ঐ প্রশ্নের উত্তর একেবারেই প্রদত্ত হইয়াছিল; আর পরবর্ত্তী সময়ে ঐ উত্তরই পুনঃ কথিত, পুনঃ বিশদীকৃত, হইয়া আমাদের বুদ্ধির নিকট উজ্জ্বলতররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব আমাদের কেবল ঐ উত্তরের পুনঃকথন করিতে হইবে মাত্র। আমরা এই সর্ব্বগ্রাসী সমস্যাগুলি সম্বন্ধে নূতন আলোক প্রক্ষেপ করিব, এরূপ ভান করি না। আমাদের আকাঙ্ক্ষা এই যে, সেই প্রাচীন মহান্ সত্য বর্ত্তমান কালের ভাষায় প্রকাশিব, প্রাচীন দিগের চিন্তা আধুনিকদিগের ভাষায় প্রকাশিব, দার্শনিকদিগের চিন্তা লৌকিক ভাষায় বলিব—দেবতাদের চিন্তা মানবের ভাষায় বলিব, ঈশ্বরের চিন্তা দুর্ব্বল মানব-ভাষায় প্রকাশিব, যাহাতে লোকে উহা বুঝিতে পারে, কারণ আমরা পরে দেখিব, যে ঐশী সত্তা হইতে ঐ সকল ভাব প্রসূত, তাহা মানবেও বর্ত্তমান—যে সত্তা ঐ চিন্তাগুলি সৃজিয়াছিলেন, তিনিই মানুষে প্রকাশিত হইয়া নিজে উহা বুঝিবেন।

আমি তোমাদিগকে দেখিতেছি। এই দৃষ্টির জন্য কতকগুলি জিনিষের আবশ্যক? প্রথমতঃ চক্ষু—চক্ষু, অবশ্যই থাকাই চাই। আমি সর্ব্ব প্রকারে পূর্ণ হইতে পারি, কিন্তু যদি আমার চক্ষু না থাকে তবে আমি তোমাদিগকে দেখিতে পাইব না। অতএব, প্রথমতঃ আমার অবশ্যই চক্ষু থাকা আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ, চক্ষুর পশ্চাতে আর কিছু যাহা বাস্তবিক দর্শনেন্দ্রিয়, তাহা যদি না থাকে, তবে পর্য্যাপ্ত হইবে না। চক্ষু বাস্তবিক ইন্দ্রিয় নহে। উহা দর্শনের যন্ত্রমাত্র; ইন্দ্রিয় হইতেছে—মস্তিষ্কস্থ স্নায়ুকেন্দ্র বাস্তবিক তৎপশ্চাতে— যদি ঐ কেন্দ্রটী নষ্ট হয়, তবে

কোথায় এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ শুনা যায়? সংযুক্ত বর্ণে যেমন—অ+ই =ঐ, অ+উ=ঔ। সংযুক্ত বর্ণে (ঐ ঔ তে), বিবৃতত্ব উচ্চারণ হেতুই গ্রহণ হইবে না *।

ঐ ঔ এই সংযুক্ত বর্ণে যে অবর্ণ আছে, তাহা বিবৃততর প্রযত্ন বিশিষ্ট অন্য অবর্ণ হইতে পৃথক্ হইবে। আর ইহাতে যে ই বর্ণ এবং উ বর্ণ আছে তাহাও বিবৃততর প্রযত্ন বিশিষ্ট বলিয়া অন্যান্য বিবৃত প্রযত্ন বিশিষ্ট 'ই' 'উ'বর্ণ হইতে পৃথক্ হইবে। অতএব এই স্থলে যখন বিবৃত এবং বিবৃততর ভেদে প্রযত্নই ভিন্ন ভিন্নই হইল, তখন 'ঐ''ঔ' প্রভৃতি সংযুক্ত বর্ণে অ ই প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের গ্রহণ কিরূপে হইবে। অতএব বর্ণের একদেশ বর্ণ গ্রহণে কদাপি গৃহীত হইতে পারে না।

ভাষ্যমূল।—অথবা পুনর্ণ গ্রহ্যন্তে। অগ্রহণং চেন্নুড়্বিধি লাদেশবিনামেষু ঋকারগ্রহণম্ *। অগ্রহণং চেন্নুড্বিধাদেশ বিনামেষু ঋকার গ্রহণং কর্ত্তব্যম্। তস্মান্নুড্ দ্বিহলঃ। ঋকারে চেতি বক্তব্যম্। ইহাপি যথা স্যাৎ আনৃধতুঃ আনৃধুরিতি।

বঙ্গানুবাদ।—অথবা পুনঃ না হয়, অবয়বের গ্রহণ নাই করা যাউক! যদি অবয়বী গ্রহণে, অবয়বের গ্রহণ না করা যায়; তবে নুট্ বিধানে লকার আদেশে এবং বিনামে (ণত্ব বিধানে) ঋকারের গ্রহণ কর্ত্তব্য।*

অবয়বী গ্রহণে অবয়বের গ্রহণ না করিলে,নুট্ বিধানে, ঋ স্থানে ৯ আদেশে, ন স্থানে ণত্ব বিধানে, ঋকারের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। অন্যথা "তস্মান্নুড্ দ্বিহলঃ" ৭।৪।৭১। (দুইটী ব্যঞ্জনবর্ণ বিশিষ্ট ধাতুর দীর্ঘীকৃত আকারের পর নুট্ আগম হয়; যেমন—'অর্দ' ধাতুর রেফ এবং দ কার মিলিয়া, দুই ব্যঞ্জনবর্ণ বিশিষ্ট ধাতু হওয়াতে এবং লিটের পরে, অ কারের বৃদ্ধি আকার হইলে নুট্ আগম হইয়া "আনর্দ" পদ সিদ্ধ হইয়া থাকে) এই সূত্রে, ঋ বর্ণ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ সূত্রান্তে "ঋকারে চ" (ঋকার পরে থাকিলেও, পূর্ব্বোক্ত সূত্রানুসারে নুট্ আগম হয়) এইরূপ বার্ত্তিক করা কর্ত্তব্য। যেন ঋধু এই ধাতুর উত্তর নুট্ আগম করিয়া 'আনৃধতুঃ আনৃধুঃ' এই স্থলেও প্রয়োগ সিদ্ধ হইতে পারে। নতুবা 'ঋধু' ধাতুর 'ঋ' কারে, তদবয়ব স্বরূপ 'রকারের গ্রহণ না করিলে, ঋধু ধাতুতে দুই ব্যঞ্জনবর্ণও সিদ্ধ হইবে না, সূত্রানুসারে নুট্ আগমও সম্ভব হইবে না। নুট্ আগম কালে ঋ কারের গ্রহণ জন্য বার্ত্তিক করিলে, নুট্ আগম সিদ্ধ হইবে এবং 'আনৃধতুঃ' প্রয়োগও নিষ্পন্ন হইবে। তবে দোষ এই হইবে যে,

"ঋ তারেচ' এইরূপ একটী বৃহৎ অবয়ব বিশিষ্ট বার্ত্তিক প্রয়োগ নিবন্ধন গৌরব হইবে।

ভাষ্যমূল।—যস্য পুনর্গৃহ্যন্তে দ্বিহল ইত্যেব তস্য সিদ্ধম্। যস্যাপি ন গৃহ্যন্তে তস্যাপ্যেষ ন দোষঃ। দ্বিহল্‌গ্রহণং ন করিষ্যতে। তস্মান্নুড্ ভবতীত্যেব। যদি ন ক্রিয়তে। আটতুঃ, আটুরিত্যত্রাপি প্রাপ্নোতি। অশ্নোতিগ্রহণং নিয়মার্থং ভবিষ্যতি। অশ্নোতেরেক বর্ণোপধস্য নান্যস্যাবর্ণোপধস্যেতি।

বঙ্গানুবাদ।—যাহার মতে অবয়বীর গ্রহণে অবয়বের গ্রহণ হয় না, তাহার মতেও এইস্থলে দোষ হইবে না। কেননা, 'তস্মান্নুড্‌দ্বিহলঃ' সূত্রে 'দ্বিহল্' গ্রহণ করা হইবে না। কেবল মাত্র 'তস্মান্নুট্' (দীর্ঘকৃত আকারের পর নুট্ আগম হয়) 'ভবতি' এইরূপ সূত্র করিব। তাহা হইলেই ঋকার বিশিষ্ট ধাতুতে নুট্ বিধান হইয়া 'আনৃধতুঃ' পদসিদ্ধ হইবে। যদি সূত্রে দ্বিহল্' (দুই ব্যঞ্জন) গ্রহণ না করা হয়; তবে 'আটতুঃ' 'আটুঃ' এই সমস্ত একব্যঞ্জন বর্ণ বিশিষ্ট ধাতুর উত্তর নুট্ আগম হইবে। যথা সঙ্গত প্রয়োগ সিদ্ধি না হইয়া অসঙ্গত আনটতুঃ প্রভৃতি প্রয়োগ হইতে থাকিবে। "অশ্নোতেশ্চ" ৭।৪।৭২ (অভ্যাস (১) সংজ্ঞক দীর্ঘ আকারের পর নুট্ আগম হয়; যথা ;আনশে)। যদি সর্ব্বত্রই নুট্ আগম প্রাপ্ত হইত তাহা হইলে এই সূত্র অনাবশ্যক হইবে। এই সূত্র ব্যর্থ হইয়া এই নিয়ম করিবে যে, 'অশু' ধাতুর অ বর্ণ উপধা বিশিষ্টের ই নুট্ আগম হইবে, অন্য অবর্ণ উপধা বিশিষ্ট ধাতুর নুট্ আগম হইবে না।

ভাষ্যমূল।— কৃপো রোলঃ, ঋকারস্য চেতি বক্তব্যম্। লাদেশে চ ঋকার গ্রহণং কর্ত্তব্যম্। ইহাপি যথা স্যাৎক৯প্তঃ ক৯প্তবানিতি। যস্য পুনর্গৃহ্যন্তে র ইত্যেব তস্য সিদ্ধম্। যস্যাপি ন গৃহ্যন্তে তস্যাপ্যেষ ন দোষঃ। ঋকারোপাত্র নির্দিশ্যতে। কথম্। অবিভক্তিকো নির্দ্দেশঃ কৃপ উঃ রঃ লঃ কৃপো রোল ইতি। অথবা উভয়তঃ স্ফোটমাত্রং নির্দ্দিশ্যতে। রশ্রুতের্লশ্রুতি র্ভবতীতি। বিনাপে ঋকার গ্রহণং কর্ত্তব্যম্।

(১) কোনও শব্দের দ্বিত্ব হইলে তাহার পূর্ব্ব শব্দের অভ্যাস সংজ্ঞার যেমন ভূ ধাতুর লিটেতে ণল্ আদি প্রত্যয় আদেশ হইলে, তৎ পূর্ব্বস্থিত ধাতু দ্বিত্ব হইয়া ভূব্ ভূব্ এইরূপ আদেশ হয়। এই দুইবার উচ্চারিত ভূব্ এর পূর্ব্ব শব্দ অর্থাৎ ভূব্ এর অভ্যাস সংজ্ঞা হয়। অশ্ ধাতুরও এই স্থলে লিটের ণলে দ্বিত্ব হইয়া অশ্ অশ্ এইরূপ আদেশ হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে অশ্ ভাগের অভ্যাস সংজ্ঞা হইয়াছে।

রষাভ্যাং নোণঃ সমান পদে ঋকারাচ্চেতি বক্তব্যম্। ইহাপি যথা স্যাৎ। মাতৃণাং পিতৃণামিতি। যস্য পুনর্গৃহ্যন্তে রষাভ্যামিত্যেব তস্য সিদ্ধম্। ন সিদ্ধ্যতি। যত্তদ্রেফাৎ পরং ভক্তেঃ তেন ব্যবহিতত্বান্নপ্রাপ্নোতি। মাভূদেবম্। অট্‌বাবায়ইত্যেব সিদ্ধম্।

বঙ্গানুবাদ। 'লা দেশে' (র স্থানে ল আদেশে), ঋকার গ্রহণ করা কর্ত্তব্য 'কৃপোরোলঃ' এই সূত্রে, ঋকারের স্থানে ল কার আদেশ হইলেও সূত্রে, পুনঃ ঋ কারের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যেহেতু 'কৃপোরোলঃ' এই সূত্রে ঋকারস্থিত রেফ্‌ অংশের স্থানেই যদি ল্‌ আদেশ হয়; তাহা হইলে, 'সমগ্র ঋ কার' এইরূপ স্বরবর্ণ স্থানে, 'সমগ্র ৯ কার', এইরূপ স্বরবর্ণ আদেশ হওয়ার জন্য; "ঋকার স্থানে ৯ কার হয়" এইরূপ ও সূত্রের অতিরিক্ত বার্ত্তিক করিতে হইবে। যাহাতে কৃপ ধাতু হইতে ৯ কার আদেশ হইয়া 'ক৯প্ত' কৃ৯প্তবান প্রভৃতি পদ সিদ্ধি হইতে পারে। আর যাহার মতে অবয়বী গ্রহণে অংশাবয়বেরও গ্রহণ হইয়া থাকে, তাহার মতে ঋকারের অভ্যন্তরে রকার সিদ্ধই আছে; সুতরাং ঋকারাংশ রকার স্থানে ল কার হইয়া এবং তাহার সহিত ঋকারের অন্য স্বরাংশ যুক্ত হইয়া ৯ কার আদেশ হইবে। অতএব সকল প্রয়োগই অনায়াসে সিদ্ধ হইবে।

যাহার মতে অবয়বী গ্রহণে অবয়বের গ্রহণ হয় না, তাহার মতেও কোনও দোষ হইবে না। যেহেতু, 'কৃপোরোলঃ' এই সূত্রে ঋকারও নির্দ্দেশ করা হইবে। তাহা কি রূপে হইবে?

সূত্রটী কোনও বিভক্তি বিশেষ দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইবে না। "কৃপ উঃ রঃ লঃ" এইরূপ পদচ্ছেদ করিয়া কৃপোরোলঃ এইরূপ সূত্র করা হইবে। তাহা হইলেই এইরূপ অর্থ হইবে, যে কৃপ ধাতুর ঋকারের স্থানে, ল কার বিশিষ্ট স্বরবর্ণ অর্থাৎ ৯ কার এবং র কার স্থানে ল কার আদেশ হইবে। তাহা হইলেই ঋ স্থানে ৯ হইয়া 'কৃ৯প্ত' কৃ৯প্তবান্‌ প্রভৃতি প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে।

অথবা অবয়বী গ্রহণে অবয়বের গ্রহণ এবং অগ্রহণ, উভয় পক্ষেই স্ফোট বর্ণ (ব্যক্তবর্ণ) মাত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ যে স্থানে র্‌ শ্রবণ হইবে, সেই র্‌ স্থানে আদেশ হইলে, ল শ্রবণ হয় এইরূপ স্পষ্ট বর্ণ আদেশ হইবে। তাহা হইলে র কার শ্রবণীভূত ঋকার স্থানেও ল কার শ্রবণীভূত ৯কার অবশ্যই হইবে।

'বিনামে' (ন স্থানে ণত্ব বিধানে) ঋ কারের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। রষাভ্যাং নোণঃ সমানপদে" ৮।৪।১ (একবাক্যস্থিত রেফ্ এবং ষকারের পর যে ন কার, তাহার স্থানে ণকার হয়) এই সূত্রে ঋকারাচ্চ। অর্থাৎ ঋকারের পরে ণকার হয়, এইরূপ বলা কর্ত্তব্য। যেহেতু রষাভ্যাং সূত্রে—"রকার ষকারের পরে ন কার থাকিলে, ণকার হয়"। এইরূপই উল্লিখিত আছে; কিন্তু ঋকারের পরে ণকার হইবার কোনও উল্লেখ নাই যদি র কার গ্রহণে, ঋকারের অবয়বস্থিত রকারের গ্রহণ না হয়; তবে মাতৃণাম্ পিতৃণাম্ এই স্থলেও যাহাতে ণকার হইতে পারে, এই জন্য সূত্রে, ঋকারের পরে ন কারের স্থানেও ণ কার হয় এইরূপ বলিতে হইবে।

যাহার মতে অবয়বী গ্রহণে অবয়বের গ্রহণ হয়, তাহার মতে "রষাভ্যাং অর্থাৎ র কার ষকারের পরে ন স্থানে ণ হয়" এইরূপ বলিলেই, মাতৃণাম্ প্রভৃতি প্রয়োগ সিদ্ধি হইবে। যেহেতু 'মাতৃ'শব্দের 'ঋ'কারের অভ্যন্তরে যে রকার আছে, তাহাকে নিমিত্ত করিয়া 'নাম্' শব্দের 'ন'কার,'ণ' হইবে। সুতরাং 'মাতৃণাম্' প্রয়োগও সিদ্ধ হইবে।

এই রূপ করিলেও প্রয়োগ সিদ্ধি হইবে না। যেহেতু ঋকারে কেবল রকারই নাই উহার পূর্ব্বাংশ রকার এবং শেষাংশ ইকার সদৃশ কোনও স্বরবর্ণ। অতএব ঋকারের রেফ অংশের শেষ ভাগ, অন্য স্বরবর্ণ থাকাতে এবং রকারের পরে, সেই স্বরবর্ণ ব্যবধান থাকাতে, ঋকারের পরে, ন কার স্থানে ণ কার প্রাপ্তি হইবে না।

সুতরাং যাহারা অবয়বী গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহাদের মতে ত দোষ ঘটিবেই।

না, এই স্থলে দোষ ঘটিবে না। 'রষাভ্যাং' সূত্রের দ্বারা প্রয়োগ সিদ্ধি হইলেও, তৎপরবর্ত্তী অট্কুপ্বাঙ্নুম্ ব্যবায়েঽপি। ৮। ৪। ২। (অট্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ, ক বর্গ, প বর্গ, আঙ্ উপসর্গ, নুম্ অর্থাৎ অনুস্বার ইহারা পৃথক্ পৃথক্রূপে, অথবা একত্র মিলিত হইয়া, যথা সম্ভব রূপে ব্যবধান হইলেও র কার ষকারের পরস্থিত ন স্থানে ণ হয়) এই সূত্রানুসারে, স্বরবর্ণ মাত্রেরই অট্ প্রত্যাহার মধ্যে অন্তর্ভাব হেতু, ঋকারের অভ্যন্তরস্থিত র কারের পরবর্ত্তী 'ই'সদৃশ স্বরভাগও অট্ প্রত্যাহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং ঐ স্বরাংশ ব্যবধান থাকিলেও, রকারের পরস্থিত ন স্থানে ণ হয় বলিয়া, ঋর পরেও ণ" হইবেই।

ভাষ্যমূল।—ন সিদ্ধ্যতি বর্ণৈকদেশা কে বর্ণ গ্রহণেন গৃহ্যন্তে। যে ব্যপবৃক্তা অপি বর্ণা ভবন্তি। যচ্চাপি রেফাংপরং ভক্তেঃ ন তৎক্বচিদপি ব্যপবৃক্তং দৃশ্যতে। এবং তর্হি যোগ বিভাগঃ করিষ্যতে। রষাভ্যাং নোণঃ সমানপদে। ততো ব্যবায়ে। ব্যবায়ে চ রষাভ্যাং নোণঃ ভবতীতি। ততোঽট্কুপ্বাঙ্নুম্ভি রিতি। ইদমিদানীং কিমর্থম্। নিয়মার্থম্। এতৈরেবাক্ষরসমাম্নায়িকৈর্ব্যবায়ে নান্যৈরিতি।

বঙ্গানুবাদ।—এইরূপ করিলেও মাতৃণাম্ প্রভৃতি শব্দের ঋকারের পরে ণত্ব হইবে না যদিও ঋকারের মধ্যে, র্ কারাংশের শেষাংশ যে স্বর বর্ণ, তাহা অট্ প্রত্যাহার মধ্যে পাঠ হেতু, প্রয়োগসিদ্ধি সম্ভব বলা হইয়াছে, তাহাও হইবে না। বর্ণের এক অংশ, বর্ণগ্রহণে গৃহীত হয় বটে; কিন্তু কোন্ বর্ণ সকল বর্ণ গ্রহণে গৃহীত হয়। যাহারা ব্যপবৃক্ত অর্থাৎ পৃথককৃত হইলেও বর্ণ বলিয়া প্রতীতি হয়। যেমন র কার বা অকার ইহারা অন্য বর্ণের সহিত (র কার ঋকারের সহিত, মিলিত হইয়া থাকিলেও, পুনরায় স্বতন্ত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা 'রবি'শব্দে রকার 'অন্ত' শব্দে 'অ'কার পৃথক্ ব্যবহৃত হয়। এই স্থলে ঋ বর্ণের একাংশ যে রকার, তাহার অন্যত্র দৃষ্ট হয় বলিয়া ঋকার গ্রহণে 'র' গৃহীত হইলেও ঋকারের অপরাংশ যে স্বর বর্ণ, তাহার অন্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না বলিয়া, ঋকার গ্রহণে তাহার গ্রহণ হইতে পারে না। যেহেতু ঋকারস্থিত রেফের শেষাংশ কোনও বর্ণ বলিয়া স্পষ্ট প্রতীতি হয় না, যে, বর্ণাংশে উহার গ্রহণ হইবে। অর্থাৎ যেমন অকারের সবর্ণ আকার, ইকারের সবর্ণ ঈকার বলিয়া, আকার গ্রহণ করিলেই তাহার সবর্ণ আকারাদি অষ্টাদশ প্রকার অকারেরই গ্রহণ হইয়া থাকে, এবং সেই জন্যই অট্ প্রত্যাহার মধ্যেও সকল প্রকারের অকারই গৃহীত হয়, সেইরূপ ঋকারের শেষাংশ কাহার সবর্ণ যে, অট্ প্রত্যাহার মধ্যে গৃহীত হইবে; এবং সেই বর্ণাংশ ব্যবধান থাকিলেও রকারের পরস্থিত নকার স্থানে ণ কার হইবে? এইরূপে প্রয়োগ সিদ্ধি না হইলে, সূত্রে যোগ বিভাগ করা যাইবে। যেমন "রষাভ্যাং নোণঃ সমানপদে" একাংশ এইরূপ সূত্র করিয়া অট্কুপ্বাঙ্ নুম্ ব্যবায়েপি" এই সূত্রের শেষাংশ 'ব্যবায়েপি' এই টুকু মাত্র গ্রহণ করিয়া এইরূপ সূত্র করিব যে, 'রষাভ্যাং নোণঃ সমান পদে ব্যবায়েপি' এক্ষণে এই সূত্রের ইহাই মর্ম্ম হইবে যে, এক পদস্থিত রেফ এবং ষ কারের পরে, যে কোনও বর্ণই ব্যবধান থাকুক না

কেন, ন কারের পরে ণ কার হইবেই। সুতরাং ঋকারের অভ্যন্তরস্থিত র কারের পরে যে কোন বর্ণই ব্যবধান হউক তাহার পরেই ন স্থানে ণ হইবে। অতএব মাতৃণাম্ শব্দের ঋকারের পরেও ণকার প্রাপ্তি না হইবে না।

এইরূপ সূত্র করিবার পরে, পর, সূত্রের অপরাংশ যে পূর্ব্ব ভাগে, "অট্ কুপ্বাঙ্নুম্ভিঃ" গ্রহণ করিব। (তাহা হইলে অট্ প্রত্যাহারস্থিত বর্ণ ক বর্গ, পবর্গ, আঙ্ উপসর্গ ইহাদের দ্বারা ব্যবধান থাকিলেও র এবং ষ এর পরস্থিত ন স্থানে ণ হয়। এইরূপ অর্থ হইবে)। যদি এই রূপই হয় তবে, পূর্ব্ব কল্পিত সূত্রানুসারেই ত রেফ ও ষ কারের পরস্থিত ন স্থানে ণ সর্ব্বত্রই প্রাপ্ত হইবে? তবে পুনরায় "অট্কুপ্বাঙ্নুম্" (অট্প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ,কবর্গ, পবর্গ, ইহারা ব্যবধান থাকিলেও ণ হয়) এই সূত্র করিবার প্রয়োজন কি?

এইরূপ সূত্র নিয়ম বিধানের জন্য করিবার প্রয়োজন হইবে। সেই নিয়ম এই যে, যদি "অক্ষর সমাম্নায়িক" (১) স্থিত কোন বর্ণ ব্যবধান থাকিলে, র ও ষ এর পরস্থিত ন স্থানে ণ প্রাপ্তি হয়, তাহা হইলে অট্ প্রত্যাহারান্তর্গত বর্ণ (স্বরবর্ণ এবং যবরহ), কবর্গ প বর্গ, আঙ্ উপসর্গ, নুম্ (অনুস্বার) এই সকল বর্ণ দ্বারা ব্যবধান থাকিলেই হইবে। অন্য বর্ণ দ্বারা ব্যবধান থাকিলে হইবে না।

ভাষ্যমূল।—যদ্যপি গৃহান্তে তস্যাপ্যেষ ন দোষঃ। আচার্য্য প্রবৃত্তির্জ্ঞাপয়তি। ভবত্যকারান্নোণত্বমিতি। যদয়ং ক্ষুভ্নাদিষু নৃনমনশব্দং পঠতি। নৈতদস্তি জ্ঞাপকম্। বৃদ্ধ্যর্থমেতৎস্যাৎ। নার্ণমনিঃ। যত্তর্হি তৃপ্নোতি শব্দং পঠতি। যচ্চাপি নৃনমনশব্দং পঠতি। নন্বচোক্তং বৃদ্ধ্যর্থমেতৎস্যাৎ। বর্হিরঙ্গা বৃদ্ধিরন্ত রঙ্গং ণত্বম্। অসিদ্ধং বহিরঙ্গমন্তরঙ্গে।

(১) এইরূপ ইতিহাস প্রসিদ্ধ আছে যে, মহর্ষি পাণিনি ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রণয়ন জন্য দীর্ঘকাল মহাদেবের উপাসনা করিয়াছিলেন। মহাদেব উপাসনায় তুষ্ট হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। নৃত্যের শেষে প্রথমতঃ নয়বার এবং পরে পাঁচবার ডমরু-ধ্বনি করিয়াছিলেন, তাহা হইতে এই চতুর্দ্দশটী সূত্র বিনির্গত হইয়াছিল। সেই সূত্র এই,— অইউণ্। ১। ঋ৯ক্। ২। এওঙ্। ৩। ঐঔচ্। ৪। হযবরট্। ৫। লণ্। ৬। ঞমঙণনম্। ৭। ঝভঞ্। ৮। ঘঢধষ্। ৯। জবগডদশ্। ১০। খফছঠথচটতব্। ১১। কপয্। ১২। শষসর্। ১৩। হল্। ১৪। মহাদেবের নিকট হইতে এই অক্ষর সমূহ আগমন করার পরে, এই সকল অক্ষরের "আক্ষর সমাম্নায়িক" নাম হইয়াছে।

বঙ্গানুবাদ।—এইরূপ করিলে, যাহার মতে অবয়বী গ্রহণে অবয়বের গ্রহণ হয় না, তাহার মতেও দোষ হইবে না। কেন না ঋকারের পরে যে 'ন' কার স্থানে 'ণ' কার হয়, তাহা আচার্য্য পাণিনির প্রবৃত্তি অনুসারেই জানা যাইবে। যেহেতু তিনি "ক্ষুভ্নাদি গণ" মধ্যে, "নৃনমন" শব্দ পাঠ করিয়াছেন। যদি ঋকারের পরে 'ন' স্থানে 'ণ' না হইত; তবে স্বভাবতঃ 'নৃ' শব্দের 'ঋ'কারের পরে, নমন শব্দের 'ন'কার মূর্দ্ধন্য'ণ' হইত না। সুতরাং আচার্য্য পাণিনি 'ক্ষুভ্নাদি গণ "মধ্যে, 'ন'কারের স্থানে 'ণ'কার না হইবার জন্য, যখন নৃনমন শব্দ পাঠ করিয়াছেন, তখন তাহাতে ইহাই জানা যাইতেছে যে, ঋকারের পরে 'ন' কারের স্থানে 'ণ'কার হয় এই জন্যই শব্দের ঋকারের পরে 'নমন' শব্দের 'ন'কার মূর্দ্ধন্য 'ণ' হইয়া থাকে। আর তাহা যাহাতে না হইতে পারে, এই জন্যই ক্ষুভ্নাদিগণ মধ্যে নৃনমন শব্দ পাঠ করিয়াছেন। সুতরাং পাণিনির অভিপ্রায়ানুসারেই ঋকারের পরস্থিত ন স্থানে ণ হইবে।

ইহা কখনও জ্ঞাপক হইতে পারে না। কেন না ক্ষুভ্নাদিগণে যে, 'নৃনমন' শব্দ পাঠ করা হইয়াছে, তাহা 'ন' কার স্থানে 'ণ' কার নিষেধ করিবার জন্য নহে। তবে "ক্ষুভ্নাদিগণে" পাঠ করিবার ইহাই প্রয়োজন যে, যেরূপ 'ক্ষুভ্নাদি গণ পঠিত শব্দের আদ্য স্বরের বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ 'নৃনমন' শব্দেরও আদি স্বরের বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। তাহা হইলে, 'নৃনমন শব্দের স্থানেও ঋকারের বৃদ্ধি হইয়া, 'নার্নমনি' শব্দ সিদ্ধ হইবে।

যদি ক্ষুভ্নাদি গণে নৃনমন শব্দ, ঋকারের বৃদ্ধির জন্যই পাঠ হইয়া থাকে; তবে 'তৃপ্নোতি শব্দ ক্ষুভ্নাদিগণে কেন পাঠ করা হইয়াছে?

যে (বৃদ্ধির) জন্য 'নৃনমন শব্দে ক্ষুভ্নাদিগণে পাঠ করা হইয়াছে, 'তৃপ্নোতি শব্দও সেই জন্যই পাঠ করা হইয়াছে। যদি ইহাই বলা যায় যে, 'তৃপ্নোতি শব্দেরও ঋকারের বৃদ্ধি হওয়ার জন্যই ক্ষুভ্নাদিগণে পাঠ হইয়াছে; তাহা কখনও সঙ্গত হইতে পারে না। যেহেতু, বৃদ্ধি কার্য্য বহিরঙ্গ, ণত্ব বিধান অন্তরঙ্গ (১) অতএব "অন্তরঙ্গ কার্য্য কর্ত্তব্য হইলে, বহিরঙ্গ কার্য্য,

(১) যে কার্য্য বহু অপেক্ষা অর্থাৎ বহু নিমিত্ত থাকে, তাহাকে বহিরঙ্গ বলে। যে কার্য্যে অল্প নিমিত্ত থাকে তাহাকে অন্তরঙ্গ বলে। 'নৃনমন' শব্দে, 'ঞি' প্রত্যয় করিয়া "তদ্ধিতেষ্বচামাদেঃ ৭।২।১১৭ (ঞ ইং ণইং প্রত্যয় বিশিষ্ট তদ্ধিত পরে থাকিলে, শব্দের আদি স্বর বর্ণের বৃদ্ধি হয়) এই সূত্রানুসারে, ঋকারের বৃদ্ধি হইয়া 'নার্নমনি' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, 'ঞি' প্রত্যয় পরে থাকিলে আর সেই

অসিদ্ধই হইবে এই স্বতঃসিদ্ধ নিয়মানুসারেই, ক্ষুভ্নাদিগণে 'নৃনমন, ও তৃপ্নোতি শব্দের পাঠ, ম কার স্থানে ণ কার বিধানের জন্যই জানিতে হইবে বৃদ্ধির জন্য কদাপি ইহার উদ্দেশ্য হইতে পারে না।

ভাষ্যমূলম্।—অথবা উপরিষ্টাদ্যোগ বিভাগঃ করিষ্যতে। ঋতঃ নো ণো ভবতি। ততশ্ছন্দস্যবগ্রহাৎ। ঋত ইত্যেব। প্রুত্যাবৈচ ইদুতৌ। এতচ্চ বক্তব্যম্। যস্য পুনর্গৃহ্যন্তে গুরোস্টেরিত্যেব প্লুত্যা তস্য সিদ্ধম্। যস্যাপি ন গৃহ্যন্তে তস্যাপ্যেষ ন দোষঃ। ক্রিয়ত ন্যাস এব। তুল্যরূপে সংযোগে দ্বিব্যঞ্জন বিধিঃ *। তুল্যরূপে সংযোগে দ্বিব্যঞ্জনাশ্রয়ো বিধির্ন সিধ্যতি। কুক্কুটঃ। পিপ্পলী। পিত্তমিতি।

বঙ্গানুবাদ।—পক্ষান্তরে, যেমন পূর্ব্বে ২ সূত্র সকলে, যোগবিভাগ করা হইয়াছে সেই প্রকার "ছন্দস্যৃদবগ্রহাৎ" ৮। ৪। ২৬।
(ঋকারান্ত অবগ্রহের (১) পরেস্থিত ন কার স্থানে ণ কার হয়, বেদের প্রয়োগে) এই সূত্রেরও যোগ বিভাগ করা যাইবে। সেই যোগ বিভাগ এইরূপ করা হইবে যে সূত্রের একাংশ 'ঋতঃ' (ঋকারের পরস্থিত ন কার স্থানে ণ কার হইবে) নোণো ভবতি। তদনন্তর সূত্রের অপরাংশ এইরূপ করা হইবে যে 'ছন্দস্যবগ্রহাৎ (বেদে, অবগ্রহের পরস্থিত ন কার স্থানে ণ কার হয়) এক্ষণে সম্পূর্ণ সূত্র মিলিত হইয়া এইরূপ অর্থ হইবে যে, বেদের অবগ্রহের পরস্থিত নকার স্থানে যেখানে ণকার হইবে, সেইখানে ঋকারের পরস্থিত নকারেরই হইবে। আর ঐ সূত্রাংশ 'ঋতঃ', (যাহা এক্ষণে মূলসূত্র হইতে পৃথক করা হইয়াছে,) সেই সূত্রের অনুবৃত্তি আসিয়া রষাভ্যাং সূত্রে সংযুক্ত হওয়াতে এইরূপ অর্থ হইবে যে, রকার ষকার এবং ঋকারের পরস্থিত নকার স্থানে ণকার হয়) একই বাক্যে থাকিলে। সুতরাং ঋকারের এক অংশ রেফের ঋকারের মধ্যে গ্রহণ না করিলেও কোনও স্থলেই দোষ ঘটিবে না। [illegible] বর্ণের একাংশ, বর্ণ গ্রহণে গ্রহণ করিবার কোনও আবশ্যক নাই।

'ক্রি' ১ প্রত্যয় তদ্ধিত নিষ্পন্ন হইলে, ক্ষুভ্নাদিগণ পঠিত নৃনমন শব্দের ঋকারের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব ইহাতে ক্রি প্রত্যয়, [illegible] নিমিত্ত হওয়াতে এই বৃদ্ধি কার্য্য বাহিরঙ্গ হইয়াছে। আর 'নৃমমন' শব্দে [illegible] অব্যবহিত পরেই ন কার থাকাতে অন্তরঙ্গ এবং সকল বর্ণের শেষে, 'ক্রি' প্রত্যয় হওয়াতে শব্দের সর্ব্বাগ্র বর্ণে ঋকারের বৃদ্ধি হওয়াতে, ঋকারের বৃদ্ধি অনেকবর্ণ ব্যবধান হেতু, বহিরঙ্গ হইল।

(১) সংযুক্ত বা নিকটস্থ বর্ণ সমূহের পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অবস্থানকে অবগ্রহ বলে। যেমন—নিহোতা সং সি বর তি ষি।

শ্রীম——কথিত।] [২৮২ পৃষ্ঠার পর

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

[গৃহস্থাশ্রমধর্ম্ম-প্রসঙ্গে]

শ্রীরামকৃষ্ণ। (মহিমার প্রতি) তোমরা সংসারী, [illegible] ওও রাখ। সংসারও রাখ, ধর্ম্মও রাখ।

মহিমা। এ কি আর থাকে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি পঞ্চবটীর কাছে গঙ্গার ধারে টাকা মাটী, মাটীই টাকা ও টাকাই মাটী, এই বিচার করতে করতে যখন টাকা গঙ্গার জলে ফেলে দিলুম, তখন একটু ভয় হলো। ভাবলুম, আমি কি লক্ষ্মীছাড়া হলুম! মা লক্ষ্মী যদি খ্যাঁট বন্ধ করে দেন, তা হলে কি হবে! তখন হাজরার মত পাটোয়ারী করলুম। বল্লুম, মা! তুমি যেন হৃদয়ে থেকো। একজন তপস্যা করাতে ভগবতী সন্তুষ্ট হয়ে বল্লেন, তুমি বর লও। সে বল্লে, মা! যদি বর দেবে তবে এই কর, যেন আমি নাতির সঙ্গে সোনার থালে ভাত খাই! এক বরেতে নাতি, ঐশ্বর্য্য, সোনার থাল সব হল, (সকলের হাস্য)।

[সংসারী ও ত্যাগ, বদ্ধ ও মুক্ত]

"মন থেকে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ হলে ঈশ্বরে মন যায়, তাঁতে মন গিয়ে লিপ্ত হয়। যিনিই বদ্ধ, তিনিই মুক্ত হতে পারেন।

ঈশ্বর থেকে বিমুখ হলেই বদ্ধ;—নিকৃতির নীচের কাটা থেকে তফাৎ হয় কখন? যখন নিকৃতির বাটীতে কামিনী-কাঞ্চনের ভার পড়ে।

"ছেলে ভূমিষ্ঠ হয়ে কেন কাঁদে? 'গর্ভে ছিলাম, যোগে ছিলাম।' ভূমিষ্ঠ হয়ে এই ব'লে কাঁদে—কাঁহা এ কাঁহাএ কাঁহাএ—এ কোথায় এলুম, ঈশ্বরের পাদপদ্ম চিন্তা করছিলাম, এ আবার কোথায় এলুম।

"তোমাদের পক্ষে মনে ত্যাগ—সংসার অনাসক্ত হয়ে কর।

[সংসার ত্যাগ]

মহিমা। তাঁর উপর মন গেলে আর কি সংসার থাকে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। সে কি? সংসারে থাকবে না ত কোথায় যাবে? আমি দেখছি, যেখানে থাকি, রামের অযোধ্যায় আছি। এই জগৎ-সংসার রামের অযোধ্যা।

* প্রথম ভাগ ছাপা হইতেছে।

"রামচন্দ্র গুরুর কাছে জ্ঞান লাভ করিবার পর বল্লেন, আমি সংসার ত্যাগ করবো। দশরথ তাঁকে বুঝবার জন্য বশিষ্ঠকে পাঠালেন। বশিষ্ঠ দেখলেন, রামের তীব্র বৈরাগ্য। তখন বল্লেন, 'রাম! তুমি আগে আমার সঙ্গে বিচার কর, তারপর সংসার ত্যাগ কর। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, সংসার কি ঈশ্বর ছাড়া, তা যদি হয়, তা হলে তুমি ত্যাগ কর।' রাম দেখলেন যে, ঈশ্বরই জীব জগৎ সব হয়েছেন। তাঁর সত্তাতে সমস্ত সত্তাবান। তখন রামচন্দ্র চুপকরে রইলেন। "সংসারে কাম ক্রোধ এই সবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়, নানা বাসনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়, আসক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। যুদ্ধ কেল্লা থেকে হলেই সুবিধা। গৃহে থেকে যুদ্ধই ভাল, খাওয়া মেলে, ধর্ম্মপত্নী অনেক সাহায্য করে। কলিতে অন্নগত প্রাণ - সাত জায়গায় অন্নের জন্য ঘুরার চেয়ে এক জায়গাই ভাল। এই গৃহে যেন কেল্লার ভিতর থেকে যুদ্ধ করা।

"আর সংসারে থাকো, ঝড়ের এঁটোপাতা হয়ে। ঝড়ের এঁটোপাতাকে কখনও ঘরের ভিতর নিয়ে যায়, কখনও আঁস্তাকুড়ে। হাওয়া যে দিকে যায়, পাতাও সেই দিকে যায়। কখনও ভাল জায়গায়, কখনও মন্দ জায়গায়! তোমাকে এখন সংসারে ফেলেছেন, ভাল; এখন সেই খানেই থাক, আবার যখন সেখান থেকে তুলে ওর চেয়ে ভাল জায়গায় নিয়ে ফেলবেন, তখন যা হয় হবে।

"সংসারে রেখেছেন, তা কি করবে? সংসার ও আত্মসমর্পণ (Resignation) সমস্ত তাঁকে সমর্পণ কর, তাঁকে আত্মসমর্পণ কর—তাহলে আর কোন গোল থাকবে না। তখন দেখবে, তিনিই সব করছেন। সবই 'রামের ইচ্ছা'।

একজন ভক্ত। 'রামের ইচ্ছা' গল্পটী কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কোন এক গ্রামে একটী তাঁতী থাকে। বড় ধার্ম্মিক, সকলেই তাঁকে বিশ্বাস করে, আর ভালবাসে। তাঁতী হাটে গিয়ে কাপড় বিক্রী করে। খরিদদার দাম জিজ্ঞাসা করলে বলে, 'রামের ইচ্ছা, সুতার দাম এক টাকা, রামের ইচ্ছা মেহনতের দাম ।০আনা, রামের ইচ্ছা, মুনফা ৵০ আনা, কাপড়ের দাম রামের ইচ্ছা ১৵০। লোকের এতো বিশ্বাস যে, তৎক্ষণাৎ দাম ফেলে দিয়ে কাপড় কিনে নিত। লোকটী ভারি ভক্ত, রাত্রিতে খাওয়া দাওয়ার পর অনেকক্ষণ চণ্ডীমণ্ডপে বসে ঈশ্বর চিন্তা করে, তাঁর নামগুণ কীর্ত্তন করে। একদিন অনেক রাত হয়েছে, লোকটীর ঘুম হচ্চে না, বসে

আছে, এক একবার তামাক খাচ্ছে, এমন সময় সেই পথ দিয়ে এক দল ডাকাত ডাকাতি করতে যাচ্ছে। তাদের একজন মুটের অভাব হওয়াতে ঐ তাঁতীকে এসে বল্লে, 'আয় আমাদের সঙ্গে' এই বলে হাত ধরে টেনে নিয়ে চল্‌লো। তারপর একজন গৃহস্থের বাড়ী গিয়ে ডাকাতি ক'রলে। কতকগুলা জিনিষ তাঁতীর মাথায় দিলে। এমন সময় পুলিস এসে পড়ল। ডাকাতেরা পালাল, কেবল তাঁতীটি মাথায় মোট ধরা প'ড়ল। সে রাত্রি তাকে হাজতে রাখা হ'ল। তারপর দিন ম্যাজিষ্টার সাহেবের কাছে বিচার। কিন্তু গ্রামের লোকে জানতে পেরে সব এসে উপস্থিত। তারা সকলে বল্লে, হুজুর! এ লোক কখনও ডাকাতি করতে পারে না।

সাহেব তখন তাঁতীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি গো তুমি কি হয়েছে বল?

"তাঁতী বল্লে, হুজুর! রামের ইচ্ছা, আমি রাত্রিতে ভাত খেলুম। তারপর রামের ইচ্ছা, আমি চণ্ডিমণ্ডপে বসে আছি, রামের ইচ্ছা অনেক রাত হ'ল। আমি, রামের ইচ্ছা, ভগবানের চিন্তা করছিলাম আর তাঁর নাম গান করছিলাম এমন সময় রামের ইচ্ছা, একদল ডাকাত সেই পথ দিয়া যাচ্ছিল। রামের ইচ্ছা, তারা আমায় ধরে টেনে নিয়ে গেল। রামের ইচ্ছা, তারা এক গৃহস্থের বাড়ী ডাকাতি করে। রামের ইচ্ছা, আমার মাথায় মোট দিলে। এমন সময় রামের ইচ্ছা, পুলিস এসে প'ড়ল। রামের ইচ্ছা, আমি ধরা পড়লুম। তখন রামের ইচ্ছা, পুলিসের লোকেরা আমায় হাজতে দিলে। আজ সকালে রামের ইচ্ছা হুজুরের কাছে এনেছে।

অমন ধার্ম্মিক লোক দেখে সাহেব তাঁতীটিকে ছেড়ে দেবার হুকুম দিলেন। তাঁতী রাস্তায় বন্ধুদের বল্লে, রামের ইচ্ছা, আমায় ছেড়ে দিয়েছে।

"সংসার করা, সন্ন্যাস করা সবই রামের ইচ্ছা।" তাই তাঁর উপর সব ফেলে দিয়ে সংসারে কাজ কর

"তা না হ'লে আর কিইবা করবে?

"কেরাণী একজন জেলে গিছিল। জেল খাটা শেষ হলে, সে জেল থেকে বেরিয়ে এল। এখন জেল থেকে এসে, সে কেবল ধেই ধেই করে নাচবে না কি? না সে এসে কেরাণীগিরিই করবে।

"সংসারী যদি জীবন্মুক্ত হয়, সে মনে করলে অনায়াসে সংসারে থাকতে পারে। যার জ্ঞানলাভ হয়েছে, তার এখান সেখান নাই। তার সব সমান। যার সেখানে আছে, তার এখানেও আছে।

[কেশব সেন, সংসার ও জীবন্মুক্তি]

যখন কেশব সেনকে বাগানে প্রথম দেখলুম, বলেছিলাম; 'এরই ল্যাজ খসেছে দেখছি। সভাশুদ্ধ লোক হেসে উঠলো। কেশব বল্লে, 'তোমরা হেসো না, এর কিছু মানে আছে, এঁকে জিজ্ঞাসা করি।' আমি বল্লাম, যত দিন বেঙাচির ল্যাজ না খসে ততদিন কেবল জলে থাকতে হয়, আড়ায় উঠে ডাঙ্গায় বেড়াতে পারে না। যেই ল্যাজ খসে, অমনি লাফ দিয়ে ডাঙ্গায় পড়ে। তখন জলেও থাকে, আবার ডেঙ্গায়ও থাকে। তেমনি মানুষ যতদিন অবিদ্যার ল্যাজ না খসে, ততদিন সংসার, জলে প'ড়ে থাকে। অবিদ্যার ল্যাজ খস্‌লে—জ্ঞান হলে, তবে মুক্ত হযে বেড়াতে পারে, আবার ইচ্ছা হলে সংসারেও থাকতে পারে।

ভগবৎকৃপা ও সাধন।

(স্বামী প্রকাশানন্দ।)

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥

যে অবস্থা লাভ করিলে আর কিছু লাভ অধিক বলিয়া মনে হয় না এবং যে অবস্থায় থাকিয়া জীব সংসারের গুরুতর শোক তাপে বিচলিত হয় না, সেই অবস্থা-লাভের জন্য চেষ্টা করাই মানব-জীবনের উদ্দেশ্য, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অর্জ্জুনকে পুনঃ পুনঃ এই উপদেশ দিয়াছেন। যিনি সংসার-সমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গে আপনার জীবনতরী স্থিরভাবে চালাইতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, যিনি শোকতাপ যন্ত্রণার ঘাত প্রতিঘাতে বায়ুহীন স্থানে নিশ্চল দীপ-শিখার ন্যায় অবিচলিত থাকিতে সমর্থ হইয়াছেন, যাঁহার নিকট সংসারের বাহ্য চাকচিক্য ও "ইন্দ্রাদি সম্পদ সুখ" তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে, যিনি আপনার ভাবে আপনি বিভোর, আত্মতৃপ্ত, আত্মরতি, আত্মারাম সেই জীবই গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়াছেন। দুর্ল্লভ মানব জীবন ধারণ করিয়া সেই চরম অবস্থা লাভের জন্য একান্ত যত্ন করাই মনুষ্য জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন " মুখে সিদ্ধিসিদ্ধি বলিলে নেশা হইবে না, সিদ্ধি বাজার হইতে কিনিয়া আন, তৎপরে উহা বাটিয়া পান কর, তবে নেশা হইবে ;

ধর্ম্মজগতেও ঐরূপ, ধর্ম্মের কেবল উচ্চ উচ্চ কথা মুখে বলিলে জীবনে ধর্ম্মলাভ হয় না, সদ্গুরুর আশ্রয়লাভ করতঃ শাস্ত্রানুযায়ী অভ্যাস ও সাধন ব্যতীত ধর্ম্ম-জীবন লাভ অসম্ভব।" কেবল শাস্ত্র পড়িলে অথবা পণ্ডিত হইলে কি হইবে? ছেলেবেলা আমরা ত দ্বিতীয়ভাগে পড়িয়াছি, "মিথ্যা কথা কহিও না," কিন্তু কায়মনোবাক্যে সত্য পালন করা অতি কঠিন, হয় ত সারা জীবন কাটিয়া গেল, তথাপি কায়মনোবাক্যে সত্যপালন করিতে শিখিলাম না; আমরা সকলেই ধর্ম্মের কথা অনেক জানি, ধর্ম্মের সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিতে পারি, কিন্তু স্ব স্ব জীবনে সেই ধর্ম্মোপদেশগুলি প্রতিফলিত করাই কঠিন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনে এই তত্ত্বের অদ্ভুত বিকাশ আমরা শুনিতে পাই। তিনি নিরক্ষর ছিলেন, তিনি শাস্ত্রাদি পড়েন নাই, কিন্তু জ্ঞান ভক্তি যোগের চরম অবস্থা তাঁহার জীবনে অদ্ভুতভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে যাইলে আমরা দেখিতে পাই, কথা ও কাযে আকাশ পাতাল প্রভেদ। কথা, কাযে পরিণত করাই, জীবের কর্ত্তব্য। কথা কাযে পরিণত করার নামই সাধন। সাধন ব্যতীত সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। আমি বাটীতে বসিয়া কাশীর কথা বলিলে ত আর আমার কাশী দেখা হইবে না। আমাকে কষ্ট করিয়া কাশীতে যাইতে হইবে, তবে কাশী দেখার সাফল্য হইবে। বাল্যকাল হইতে সামান্য বিদ্যাশিক্ষার জন্য কত পরিশ্রম ও কত যত্ন করিতে হয়, এক এক পরীক্ষা দিতে অর্দ্ধেক পরমায়ু ক্ষয় হইয়া যায়, সামান্য অর্থোপার্জ্জনের জন্য কত চেষ্টা করিতে হয়, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া জীবনান্ত করিয়া তবে অর্থোপার্জ্জন করিতে হয়, আর যে বিদ্যা সকলের শ্রেষ্ঠ, সেই পরা বিদ্যা লাভ কি কেবল মুখের কথায় হইবে, না দুটো শাস্ত্রের শ্লোক মুখস্থ করিলেই হইবে,না দু একবার জপ বা উপাসনা অথবা একবার ধর্ম্মমন্দিরে যাইলেই হইবে। এই ভগবত্তত্ত্বলাভের আশায় পঞ্চমবর্ষীয় শিশু ধ্রুব, দুর্ভেদ্য মাতৃস্নেহমমতা দূরে বিসর্জ্জন দিয়া শ্বাপদসঙ্কুল বনমধ্যে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন,এই ধর্ম্মতত্ত্বলাভের জন্য রাজপুত্র শাক্যসিংহ রাজ-সিংহাসন তুচ্ছ করিয়া কঠোর সাধনে ব্রতী হইয়া বলিয়াছিলেন,—

অত্রাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্ল্লভাং
অত্রাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে।

আমি এই আসন করিয়া বসিলাম, আমার শরীর শুষ্ক হইয়া যাউক, আমার

ত্বক্ অস্থি মাংস চূর্ণীকৃত হইয়া যাউক, সেই নত বহু কল্পান্তরেও দুর্ল্লভ যে পরমজ্ঞান লাভ না করিয়া আমার শরীর এই আসন হইতে টলিবে না। কি কঠোর তপস্যা! কি তীব্র সাধন! কি অদ্ভুত ত্যাগ!

মহাপুরুষগণ জগতে আদর্শ জীবন লইয়া আবির্ভূত হন। যে আদর্শ-জীবন লাভ করা জীবের চরম লক্ষ্য, সেই আদর্শ-জীবন আমরা মহাপুরুষদিগের জীবনেই দেখিতে পাই। লোক শিক্ষার জন্যই তাঁহারা ধরণীতলে অবতরণ করেন; যখন জীবগণ ধর্ম্ম বিস্মৃত হয়, আদর্শ-জীবনলাভে জীবের ঘোর সন্দেহ ও অবিশ্বাস আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন প্রকৃতির অলৌকিক নিয়ম প্রভাবে, মহাত্মাগণের আবির্ভাব হয়; তাঁহারা নিজ জীবনে সাধনা করিয়া ধর্ম্মের চরম আদর্শ স্বীয় জীবনে প্রতিফলিত করিয়া জীবগণকে সন্মার্গে প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়াই শাস্ত্রে ও ধর্ম্মে বিশ্বাস হয়, হৃদয়ে নিরাশের স্থলে অদম্য উৎসাহ ও বিশ্বাস আসিয়া উপস্থিত হয়। আমরা এইরূপ মহাপুরুষগণের জীবনবেদ পাঠ করিয়া দেখি, সকলেরই কঠোর সাধক-জীবন, বাক্যের ছটা অল্প, কেবল বাক্যসকলকে কার্য্যে পরিণতির একান্ত চেষ্টা।

এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে পারে, নানা পথ, নানা মত; কোন পথ অনুসরণ করিব, কোন সাধন অবলম্বন করিব? কথা এই, লক্ষ্যস্থল সকলেরই এক। শুদ্ধজ্ঞান ও শুদ্ধভক্তিও একই কথা, ইহাই মহাপুরুষদিগের সিদ্ধান্ত বাক্য। চরম স্থল এক, কিন্তু সেই চরমস্থলে যাইবার বিভিন্ন পথ আছে। যেমন মই, বাঁশ সিঁড়ি বিভিন্ন প্রকার উপায় দ্বারা ছাদে উঠিতে পারা যায়, তদ্রূপ সেই পরমতত্ত্বলাভের বহু পথ আছে। রুচিভেদে, জীবের মানসিক অবস্থা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন মতের অবতারণা হইয়াছে। আমি হয়ত নৌকাযোগে হুগলী যাইতে ভালবাসি, তুমি হয়ত রেলযোগে অথবা অন্য কোন উপায়ে তথায় যাইতে আনন্দিত হও, ইহাই পার্থক্য। অপরকে ঘৃণা না করিয়া নিজ পথের উপর নিষ্ঠা করিয়া চলিয়া যাইতে হয়। জ্ঞানী হও, জ্ঞানের ক্ষুরধার পথে, ভক্ত হও ভক্তির কোমল পথে, যোগী হও যোগমার্গের সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক পথে, এবং কর্ম্মী হও ত কর্ম্মের কঠোর পথে তোমাকে চলিতে হইবে।

সাধকগণকে সাধারণতঃ চারি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে;—জ্ঞানী ভক্ত, যোগী ও কর্ম্মী। অদ্বৈতাচার্য্য শ্রীশঙ্কর ব্যাসসূত্র "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, সাধনচতুষ্টয় সম্পন্ন হইবার পর

তবে জীবের ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকার জন্মায়, ব্রহ্মজ্ঞান লাভার্থ চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে সাধন চতুষ্টয়, অর্থাৎ চারিটী সাধন, করিতে হইবে। প্রথম নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক—এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোন্ বস্তুই বা নিত্য, আর কোন্ বস্তুই বা অনিত্য ইহাই বিচার করা প্রথম সাধন। সমুদায় দৃশ্য অদৃশ্য যাহা কিছু—অনিত্য, নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল, দুদিনের জন্য, মরুভূমিতে মরীচিকার ন্যায় মিথ্যা; আর একমাত্র ব্রহ্ম বা ভগবান্ বা আত্মা—নিত্য, অবিনাশী ও অপরিবর্ত্তনশীল। অনিত্য বস্তুতে আসক্তি করিলেই দুঃখ, শোক ও যন্ত্রণা; কারণ পরিবর্ত্তনশীল যে বস্তুতেই আসক্ত হওনা কেন, দু'দিন বাদে তাহা তোমার সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইবে, দুদিন পরে তাহার পরিবর্ত্তন হইবে, ফল—তোমার কষ্ট ও যন্ত্রণা। সংসারে আমরা যে হাহাকার শুনিতে পাই, ইহার কারণ ঐ অনিত্য বস্তুর উপর আসক্তি; অনিত্য বস্তু হইতে মন গুড়াইয়া লইয়া সেই নিত্য বস্তুর উপর স্থাপন করিতে চেষ্টা কর। দ্বিতীয়—ইহামুত্রফলভোগবিরাগ। ইহ জগতের যাবতীয় ভোগ্য বস্তুতে এবং পরকালের স্বর্গাদি সুখবিলাসে একান্ত বিরক্তিই দ্বিতীয় সাধন। ইহ জগতের সুখবিলাসের বাহ্য চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়া দুঃখের উৎস খুলিয়া দেওয়ায় ফল কি? আর এক কথা, আমরা ধর্ম্ম করি, ইহ জগতের ভোগবিলাস ত্যাগ করি, ভবিষ্যতে মৃত্যুর পর স্বর্গে আরও অধিক সুখলিপ্সার জন্য। কি ভোগতৃষ্ণা! ইহজগতের ভোগ সুখ ছাড়িতে হইবে, এবং পর জগতের ভাবী সুখভোগলালসাও অতলতলে বিসর্জ্জন দিতে হইবে, তবে ব্রহ্মতত্ত্বের আভাস ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হইবে। তৃতীয়—শমদমাদিষট্‌সম্পত্তি দম, শম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা। বহিরিন্দ্রিয়গণকে ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে নিগ্রহ করার নাম দম। অন্তরেন্দ্রিয়গণকে ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে নিগ্রহ করার নাম শম। ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া ধ্যেয়বস্তুতে বিরাম করানর নাম উপরতি। প্রতিকারের চেষ্টা না করিয়া শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্ব সহ্যকার নাম তিতিক্ষা। চিত্তের একাগ্রতার নাম সমাধান। গুরু ও বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। চতুর্থ—মুমুক্ষুতা; পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মরণ জনিত শোকানলে সন্তপ্ত হইয়া জীবের এই ত্রিতাপ হইতে মুক্তি হইবার একান্ত ইচ্ছাই চতুর্থ সাধন। এই চারিসাধনে পরিপক্ব হইলে তবে ব্রহ্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসার অধিকারী হয়। জ্ঞানীর পক্ষে নেতি নেতি সাধন আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই, অর্থাৎ ন ইতি, ইহা নয়; আমরা যাহা দেখিতেছি, শুনিতেছি, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমুদায় পদার্থ

ব্রহ্ম নয়; শরীর, মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার ব্রহ্ম নয়; এইরূপ বিচার-সাধন করিতে করিতে, এইরূপে স্বস্বরূপের অনুসন্ধান করিতে করিতে জীব দেখে ও প্রত্যক্ষ অনুভব করে যে, সমস্ত জগৎব্রহ্মাণ্ড ইন্দ্রজাল স্বপ্নবৎ, মরুমরীচিকাবৎ মিথ্যা, একমাত্র ব্রহ্ম বা পরমাত্মা বা ভগবান্ সত্য এবং আপনার যথার্থ স্বরূপই সেই ব্রহ্ম; তখনই জ্ঞানী আনন্দে বিহ্বল হইয়া বলেন, "শিবকেবলোঽহং চিদানন্দরূপো শিবোঽহং শিবোঽহং"। তখনই তাঁহার শোকতাপ চলিয়া যায়, ভয় দূরে পলাইয়া যায়, সকল সন্দেহ মিটিয়া যায় ও সকল বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। ইহাই জ্ঞানীর চরম লক্ষ্য। এই প্রত্যক্ষানুভূতি বহুজন্মসাধন-সাপেক্ষ —"বহুনাম্ জন্মনাং অন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে"।

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ শরণং পাদসেবনং
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং।

ইহাই ভক্তের সাধন,—ভগবৎগুণ লীলাশ্রবণ, ভগবৎগুণকীর্ত্তন, ভগবৎ-পাদপদ্মে একান্ত শরণাগতি। তাঁহার সেবা, পূজা ও প্রণাম। দাস ও সখা প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবে তাঁহার উপাসনা। আপনাকে তাঁহার পাদপদ্মে একান্তরূপে উৎসর্গীকরণ।

অনন্যকর্ম্মা ও অনন্যচিত্ত হইয়া সেই প্রাণারাধ্যের অনুদিন ধ্যানই ভক্তের একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও সাধনা। ভগবৎপাদপদ্মের সুধাপান ব্যতীত ভক্তের অন্য চিন্তা নাই, অন্য কার্য্য নাই। ভগবানের নিরন্তর ধ্যান করিতে করিতে, ভক্তের সমস্ত জগৎ ভুল হইয়া যায়, প্রাণারামের সেই চিদ্ঘন মূর্ত্তি দর্শন করিতে করিতে ভক্ত আত্মহারা হইয়া যান, এবং তিনি ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান না। জ্ঞানীর আমি, ও ভক্তের তুমি বা তিনি, একই কথা।

চিত্তবৃত্তি নিরোধের নাম যোগ। যিনি চিত্তবৃত্তি সংযম করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারই নাম যোগী। জ্ঞান ও ভক্তের সাধনায় যোগের অঙ্গসকল থাকিলেও এই সাধনার সাধক, বিশেষ যোগী আখ্যা পাইয়াছেন। আমাদের মন অনবরত চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইতেছে, একদণ্ডও বিরাম নাই, চিত্তের এই বিভিন্ন মুখী গতি সংযত করিয়া এক ধ্যেয় বস্তুর দিকে সঞ্চালন করাই যোগীর কার্য্য। যেরূপ, বিভিন্নমুখী সূর্য্যকিরণ কেন্দ্রীভূত করিলে এক ভয়ানক তেজ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ বিভিন্নমুখী মানসিকবৃত্তি একমুখী করিলে অপূর্ব্ব শক্তির বিকাশ হয়। মনের সেই অবস্থায় সহজে তত্ত্বজ্ঞানের বিকাশ হইতে পারে। যোগশাস্ত্রে অষ্টাঙ্গ যোগের কথা লিখিত হইয়াছে। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার

ধ্যান, ধারণা, সমাধি। যে অবস্থায় চিত্তবৃত্তি স্থির হইয়া ধ্যেয় বস্তুতে একাগ্র ভাবে অবস্থান করে, যম নিয়মাদি যোগাঙ্গ সাধন দ্বারা সেই অবস্থা লাভ করাই যোগীর চরম লক্ষ্য। এই যোগসাধনা করিতে করিতে যোগীর কতকগুলি বিভূতি বা সিদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হয়। অনেক সাধক এই সিদ্ধিতে আসক্ত হইয়া চরম লক্ষ্য ভুলিয়া যায়। আমি যাইব একস্থানে, যদি পথিমধ্যে কোন তামাসা কিম্বা সৌন্দর্য্যময় স্থানে আকৃষ্টচিত্ত হইয়া তথায় রহিয়া যাই, তাহা হইলে আমার আর গন্তব্য স্থলে পৌঁছান হইল না। তবে ও সব ঘাইফুটের ন্যায় বুঝিতে হইবে। উহাতে আসক্ত না হইয়া বরং চরমস্থলের নিকটবর্ত্তী হইয়াছি মনে করিয়া খুব উদ্যমের সহিত সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। এই যোগসাধনা বড় কষ্টসাধ্য ও অভ্যাস সাপেক্ষ। এই দুর্দ্দম বারণতুল্য মনকে সংযত করা যে কত ধৈর্য্য ও কত দীর্ঘকাল অভ্যাসের প্রয়োজন, ভুক্তভোগী ভিন্ন কেহই বুঝিতে পারিবেন না।

কর্ম্মী বলেন, তুমি এক দণ্ড কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পার না, তোমাকে কর্ম্ম করিতেই হইবে, অতএব নিষ্কাম ও নিঃস্বার্থ হইয়া কর্ম্ম করিতে অভ্যাস কর, ভগবানের প্রীত্যর্থে কর্ম্ম কর। কর্ম্মফলে আসক্ত হইয়াই আমরা দুঃখ পাই। যাহা কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহাই করিয়া, কর্ম্মের ফলের জন্য ভাবিও না; ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন, "কর্ম্মেই তোমার অধিকার, কর্ম্মফলে নহে"; কর্ম্মফলে অনাসক্তিই মুক্তির কারণ। অসৎ কর্ম্ম কর, অসৎফল পাইবে, সৎ কর্ম্ম কর, সৎফল পাইবে। আমি কর্ত্তা নাই, ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব কার্য্য করিতেছে, এই বুদ্ধি আনিবার চেষ্টা কর, আর তোমাকে কর্ম্মে আবদ্ধ করিতে পারিবে না।

সাধনা কালে সদ্গুরুর একান্ত আবশ্যক। বাল্যকালে ক, খ শিক্ষা হইতে শিক্ষকের প্রয়োজন হয়। আর এই গুরুতর বিষয়ে, জীবন মরণের ব্যাপারে সদ্গুরু ব্যতীত শিক্ষা একেবারে অসম্ভব। "তীর্ণা স্বয়ং ভীমভবার্ণবং জনা-নহেতুনান্যানপি তারয়ন্তঃ", সদ্গুরু এই ভীম সংসার সমুদ্র পার হইয়াছেন, এবং অপর ব্যক্তিদিগকে অহেতু সংসার সাগরের পর পারে লইয়া যান। অনেকে সদ্গুরুর অভাবে অসদ্গুরুর হাতে পড়িয়া পথভ্রষ্ট হইয়াছেন। তজ্জন্য শ্রুতিতে আমরা পুনঃ পুনঃ সদ্গুরুর শরণ লইবার ও অসদ্গুরুর আশ্রয়ের বিষময় ফল বর্ণনা দেখিতে পাই। "প্রাপ্য বরান্ নিবোধত", "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং", শ্রেষ্ঠ গুরুগণের আশ্রয় লাভ করিয়া সেই পরতত্ত্ব

অবগত হও। সেই তত্ত্ব জানিবার জন্য কুশ হস্তে করিয়া বেদজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট যাইবে।

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।

অসদ্গুরুগণ আপনারা অবিদ্যায় মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে, অথচ আপনাদিগকে ধীর ও পণ্ডিত মনে করিয়া অহঙ্কারে আত্মহারা হইতেছে। একজন অন্ধ আর একজন অন্ধকে পথ দেখাইতে যাইয়া যেমন পথ না পাইয়া পথহারা হইয়া কেবল ঘুরিতে থাকে, ইহারাও সেইরূপ ধর্ম্মপথের পথিককে বিপথে লইয়া গিয়া কেবল ঘুরাইয়া মারে। অতএব সদ্গুরুলাভের জন্য ভগবানের নিকট একান্তমনে প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য। প্রাণের একান্ত ব্যাকুলতা হইলে সদ্গুরু আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হন। সদ্গুরুর যেমন আবশ্যক, শিষ্যও তেমনই সৎ হওয়া আবশ্যক। সৎশিষ্য সদ্গুরুর আশ্রয়ে সাধনায় অচিরে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে। তবে সদ্গুরুর আশ্রয়ে অসৎশিষ্যেরও দোষ সকল সত্বরেই শুধরাইয়া যায়।

সাধকের অনুরাগ ও ব্যাকুলতা একান্ত প্রয়োজন। পতঞ্জলি বলিয়াছেন, "তীব্রসম্বেগানাং আসন্নঃ", যাহাদের হৃদয়ে তীব্র আবেগ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদের সে শুভদিন অতি নিকটবর্ত্তী। কোন সময়ে একবৃদ্ধ এক মহাপুরুষকে জিজ্ঞাসা করেন, "প্রভু কবে আমার ভগবান্ লাভ হইবে?"। তদুত্তরে তিনি কিছুই বলিলেন না, তাহার হস্ত ধরিয়া নিকটবর্ত্তী সরোবরে লইয়া গিয়া তাহাকে চুবাইয়া ধরিলেন; যখন তাহার শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল, তখন তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "ভগবান্‌লাভের জন্য যখন এইরূপ প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইবে, তখনই তোমার ভগবান্ লাভ হইবে"। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "বিষয়ীর বিষয়ে যেরূপ টান, সতীর পতিতে যেরূপ টান, কৃপণের ধনে যেরূপ আসক্তি, ভগবানের প্রতি সেইরূপ অনুরক্তি উপস্থিত হইলে ভগবৎলাভের বিলম্ব হইবে না"। তাঁহার জীবনে আমরা অদ্ভুত ব্যাকুলতার কথা শুনিতে পাই। দিবাবসান হইয়া সন্ধ্যা আগত হইলে রামকৃষ্ণদেব মা মা বলিয়া কাঁদিতেন ও বলিতেন, "মা! রামপ্রসাদকে দেখা দিলি, আমায় দেখা দিবি না।"

এই কথা বলিতে বলিতে ছুটিয়া গঙ্গার ধারে যাইয়া জীব টানিয়া বাহির করিতেন। মধ্যে মধ্যে এত কাঁদিতেন যে লোকে বলিত, বালক একেবারে পাগল হইয়া গিয়াছে। এইরূপ পাগল হইতে হইবে, এইরূপ ব্যাকুল ও উন্মত্ত হইতে হইবে, তবে হইবে। ব্যাকুল সাধকের সঙ্গ না করিলে ব্যাকুলতা আসে না, তজ্জন্য সাধুসঙ্গ একান্ত আবশ্যক ও পরমকল্যাণকর বলিয়া শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন, সাধনার আবশ্যকতা কি, ভগবানের কৃপায় কালে সমস্ত হইবে, কিছুই করিবার আবশ্যকতা নাই। যে ব্যক্তি ভগবানের কৃপার উপর বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া, সংসারের ঘাত প্রতিঘাত অবাধে সহ্য করিয়া সর্ব্বাবস্থায় নিশ্চিন্তভাবে অবস্থান করিতে পারেন, তাঁহার পদধূলি আমি মস্তকে গ্রহণ করি; তিনি গন্তব্যস্থানে পৌছিয়াছেন, তাঁহার অবস্থা স্বতন্ত্র, তাঁহার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যাহারা সংসারের সমস্ত কার্য্যে চেষ্টা ও উদ্যম প্রকাশ করে, কিছুর অভাব হইলে অশান্তিতে যাহাদের হৃদয় ভরিয়া যায় এবং সেই অভাবপূরণের জন্য প্রাণপণ করে, কেবল ধর্ম্মের বেলা কোন চেষ্টা নাই, উদ্যম নাই, ভগবানের কৃপায় হইবে বলিয়া বসিয়া থাকে, সে ব্যক্তি কপট, অচিরে বা বিলম্বে সে নিজের গলদ বুঝিতে পারিবে।

পক্ষান্তরে যাঁহারা ভগবান্‌কে নিয়মাধীন করিয়া ফেলিতে চান, তাঁহারা বাতুল। অমুক মন্ত্র জপ করিলে ভগবান্ সাক্ষাৎকার হইবে ইত্যাদি বলিয়া তাঁহাকে গণ্ডির ভিতর আনা মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ ব্যতীত আর কিছুই বোধ হয় না। যিনি মহা স্বাধীন, যিনি নিয়মাতীত, যাঁহা হইতে সমস্ত নিয়ম, তাঁহাকে নিয়মের অধীন করা আস্পর্দ্ধার কথা ভিন্ন আর কি বলিব। রামকৃষ্ণদেব পুনঃ পুনঃ বলিতেন, "আমার ছাগল যদি আমি লেজের দিকে কাটি"। ভগবান্‌কে নিয়ম দ্বারা বদ্ধ করা যাইতে পারে না। তবে সাধন ও মন্ত্রাদি জপ, পূজা ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা ও রহস্য কি? যেরূপ আম্রবৃক্ষ হইতে কখন আম্র পড়িবে, তাহা কেহ জানে না, তবে যে বৃক্ষতলে থাকে, সে যে প্রথমে আম্র পাইবে, এ কথা নিশ্চিত—সাধন ভজন, যোগ, যাগ, জ্ঞান, কর্ম্ম, এই সকল দ্বারা সেই ভগবদ্রূপ আম্রবৃক্ষের তলায় যাওয়া। তাঁহার কৃপাতেই সমস্ত হয়, একথা অতি সত্য, তবে কবে তাঁহার কৃপা হবে কে জানে। "পাহারাওয়ালার হাতে আঁধারে থাকে, সে সকলকে দেখিতে পায়, কিন্তু তাহাকে কেহ দেখিতে পায় না, যদি পাহারাওয়ালা

সেই আঁধারে নিজের মুখের দিকে ধরে,তবেই তাহাকে সকলে দেখিতে পায়"। ভগবান্ কৃপা করিয়া নিজস্বরূপ প্রকাশিত না করিলে, তাঁহাকে বুঝিবার সাধ্য কাহারও নাই। শরণাগত হইয়া তাঁহার মুখপানে চাইয়া তাঁহার চরণ তলে পড়িয়া থাক। সময়ে তাঁহার কৃপালাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইবে।

শ্রীশ্রীরামানুজচরিত।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ।] [২য় বর্ষ, ৬২৪ পৃষ্ঠার পর।

জ্ঞানকাণ্ডের কিন্তু কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই, কারণ যথার্থ জ্ঞান নিত্যই একরূপ। ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণগুলি কোটি বৎসর পূর্ব্বে যেমন সত্য ছিল, কোটি বৎসর পরেও সেইরূপ সত্য থাকিবে। সেই অষ্টোত্তরশত উপনিষদ্ পূর্ব্বেও যেমন বর্ত্তমান ছিলেন, এখনও তদ্রূপ বর্ত্তমান আছেন, এবং ভবিষ্যতেও তদ্রূপ থাকিবেন। তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিতেছেন, "ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ", মহাত্মাগণ ত্যাগদ্বারাই জন্ম মৃত্যু অতিক্রম করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ত্যাগই মনুষ্যের অভাবরূপ ভ্রম দূর করিয়া তাঁহাকে পরমানন্দের অধিকারী করিতে সক্ষম।

যাহা বলা হইল, তদ্দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, জ্ঞানমার্গের পথিক পৃথিবীরাজ্যে অতি বিরল। যাঁহার কর্ম্মবাসনা বলবতী, তিনি উক্ত পথের পথিক হইতে চেষ্টা করিলে তাঁহার অনধিকারচর্চ্চা করা হইবে, এবং তদ্দ্বারা যে তাঁহার ও সমাজের বিশেষ ক্ষতি হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

কর্ম্মকাণ্ডের মূল ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্যপালন, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সুতরাং যিনি কর্ত্তব্যপালনপরাঙ্মুখ, তাঁহার কর্ম্মে অধিকার নাই। কর্ত্তব্যপরায়ণ মানব যে কর্ত্তব্য প্রতিপালনে সক্ষম হয়েন, তাহার কারণ, তিনি ইন্দ্রিয়গুলির উপর কিয়ৎ পরিমাণে আধিপত্য লাভ করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়দ্বারা নীয়মান ব্যক্তি সতত যথেচ্ছাচারী। পূর্ব্বে কোন সময়ে ঋত্বিক্ ও যাজ্ঞিককুল ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদের হস্তেই যজ্ঞাদির ভার ন্যস্ত ছিল। সুতরাং তাঁহারা স্বীয় উদরপূর্ত্তি ও ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার জন্য অতিরিক্ত-মদ্যমাংসময় হিংসাসাধ্য যজ্ঞের সৃষ্টি পূর্ব্বক তাহা বেদোক্ত বলিয়া জনসমাজে প্রচার করিলেন। ধর্ম্ম-মূলা ও ধর্ম্মজননী শ্রুতি আপনার ছায়াকে মানবসমাজে স্থাপন পূর্ব্বক লজ্জিতা হইয়া যেন হিমালয়-কন্দরে লুক্কায়িতা হইয়া পড়িলেন। এই ছায়া শ্রুতিকে অবলম্বনপূর্ব্বক, শ্রুত্যুক্ত দেবদেবীগণের নাম গ্রহণ করতঃ আসুরিক যাজ্ঞিককুল

পশুশোণিতে ভারতবক্ষ কলঙ্কিত করিতে লাগিলেন। ধর্ম্ম-জ্ঞান-ময় বেদ সর্ব্বত্রই অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। দুর্নীতি, পশ্বাচার, হিংসা, দ্বেষ ভারতকে যেন বন্যপশুর নিবাসভূমি করিয়া তুলিল। সাত্ত্বিক আচার, দয়া, দাক্ষিণ্য, উদারতার অভাব সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হইল। অভাব হইলেই তাহার পূর্ত্তি আছে, ইহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। সেই স্বাভাবিক নিয়মানুসারে, সত্ত্বগুণ, দয়া, দাক্ষিণ্য ও উদারতার মূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক সর্ব্বার্থসিদ্ধ বুদ্ধ নামে হিমালয়প্রান্তে উদিত হইলেন। জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষময় জীবনের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি বাণপ্রস্থী ও ভিক্ষুক হইলেন এবং পরিশেষে দুঃখলেশপরিশূন্য শান্তিধামের পথ আবিষ্কারপূর্ব্বক ত্রিতাপতপ্ত মানবকুলকে তৎপথের পথিক করিয়া আচণ্ডাল সকলকেই অমৃতের অধিকারী করিলেন। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত যাবতীয় জীবকুল সমভাবে তাঁহার সুবিশাল হৃদয়রাজ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল। ছাগশ্রুতির বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি ও যাজ্ঞিককপোলকল্পিত রাক্ষসতুল্য জগৎকর্ত্তা, এ দুইটিই কেবল তাঁহার দৃষ্টিতে হেয় বলিয়া বোধ হইয়াছিল। যে জগৎকর্ত্তা দুর্নীতি, পশ্বাচার, হিংসা, দ্বেষাদির পৃষ্ঠরক্ষস্বরূপ, সে কি কখন জগৎকর্ত্তার আসন গ্রহণ করিতে পারে? সুতরাং তিনি তাৎকালিক শ্রুতি ও ঈশ্বর উভয়কেই নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়া সৎকর্ম্মের পূজা প্রচার করিলেন। শুভাশুভ কর্ম্ম শুভাশুভ ফল প্রসব করে, অতএব হে মানব, শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, সুখে থাকিবে। অজ্ঞলোক বুদ্ধকে নাস্তিক বলে, কারণ তিনি ঈশ্বর মানেন নাই। তিনি যে ঈশ্বরকে মানেন নাই, সে ঈশ্বরকে না মানাই ভাল। ওরূপ ঈশ্বরকে মান্য করিয়া আস্তিক হওয়া অপেক্ষা যে নাস্তিক হওয়া সহস্র গুণে ভাল, ইহা পাঠকমাত্রই স্বীকার করিবেন। বস্তুতঃ বুদ্ধদেব কি নাস্তিক ছিলেন? তাঁহার ন্যায় ঈশ্বরপরায়ণ আস্তিক জগতে সাতিশয় বিরল। কারণ কর্ম্ম কর্ত্তা ব্যতীত কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। তিনি শুকর্ম্ম মানিয়াছেন, সুতরাং সৎকর্ত্তাকেও তৎসঙ্গে মানা হইয়াছে। ঈশ্বরই হেয়গুণরহিত, সর্ব্বকল্যাণগুণসমন্বিত সৎকর্ত্তা। অতএব বুদ্ধদেবকে নাস্তিক বলিব কি প্রকারে?

তাঁহার সর্ব্বতোমুখী উদার হৃদয় সমভাবে সর্ব্বজীবকুলের পর মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদাই জাগরূক থাকিত। সুতরাং অধিকারীনির্ব্বাচন তাঁহার পক্ষে এক প্রকার অসম্ভবপর হইয়াছিল। তিনি সাধু অসাধু, বালক বৃদ্ধ, স্ত্রী পুরুষ, ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ সকলকেই নির্ব্বাণপথের পথিক করিলেন। কিন্তু যেমন উদরাময় রোগগ্রস্ত প্রচুরঘৃতসিক্ত অন্ন পরিপাক করিতে সক্ষম হয় না,

সেইরূপ অনধিকারীগণও তৎপ্রদত্ত মহামূল্য উপদেশরাজি হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইল না। সুতরাং তাঁহার পরম পবিত্র আস্তিকধর্ম্ম নাস্তিকতায়, ও শূন্যবাদে পরিণত হইল। "সত্য মিথ্যা, ধর্ম্ম অধর্ম্ম সকলই মিথ্যা। জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা কেহই নাই, কাহাকে ভয় করিব?" এইরূপ ধারণা বশতঃ বৌদ্ধগণ যথেচ্ছাচারপরায়ণ হইলেন। জগতে পুনরায় সুখশান্তির অভাব হইল। পৃথিবী বৌদ্ধাসুরদলের ভারে পীড়া পাইতে লাগিলেন। সুতরাং জগতের দুঃখ অপনয়নের জন্য মঙ্গলময় বিধাতা শ্রীশ্রীশঙ্কর নাম গ্রহণ করিয়া লোকগুরু-রূপে অবতীর্ণ হইলন।

ভগবান শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্য যোড়শবর্ষীয় যুবকমাত্র। কিন্তু যেমন তরুণ তপনের সম্মুখে জগতের তমোরাশি কখনও অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ দিব্যপ্রতিভোদ্ভাসিতবদনমণ্ডল, পরম মনোহর সেই তেজস্বী যুবকের সম্মুখে নাস্তিকতা যথেচ্ছাচার প্রভৃতি কিছুই অবস্থান করিতে পারিল না। দিবাগমে তারকাবলির ন্যায় বৌদ্ধাসুরগণ ভারত গগন হইতে চিরদিনের জন্য অপসারিত হইল। নির্ম্মল জ্ঞানালোকে চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আর্য্যভূমিতে পুনরায় শান্তির রাজ্য সংস্থাপিত হইল। ধর্ম্মজ্ঞানজননী শ্রুতিদেবী হিমাদ্রি-কন্দর হইতে বহির্গতা হইয়া সেই দিব্যকান্তি, নবীন সন্ন্যাসীর কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ করতঃ তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিলেন। শ্রুতিসনাথ শঙ্কর অধিকারি-নির্ব্বাচন-পুরঃসর পুনরায় বেদমার্গ প্রকটিত করিলেন। সনাতনধর্ম্মের জয়পতাকা হিমাদ্রি হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই উড্ডীয়মান হইল। দেবপিতৃগণ স্বাহাস্বধামন্ত্রে পুনরায় তর্পিত হইতে লাগিলেন। চিরসুপ্ত,বিজ্ঞান-বিগ্রহ ঋষিকুল উপনিষদ্ সমূহের পবিত্র ধ্বনিতে পুনরায় জাগরূক হইয়া উঠিলেন। ভারত-মাতার আর আনন্দের সীমা রহিল না।

স্বকার্য্য সাধন পূর্ব্বক দ্বাত্রিংশৎ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে শঙ্করমূর্ত্তি শঙ্করদেব স্বকীয় পরমধামে গমন করিলেন। কাল এক দিকে যেমন সুন্দর সুন্দর নূতন বস্তুর আবির্ভাব করাইয়া সকলের চিত্তকে পুলকিত ও আকৃষ্ট করে, অন্য দিকে, আবার সেই চিত্তোৎফুল্লকর নবীন পদার্থকে ছিন্ন ভিন্ন বিশীর্ণ করিয়া দরিদ্রেরও হেয় করিয়া তুলে। ইহাই কালধর্ম্ম। সেই কালধর্ম্মানুসারে শঙ্কর-কথিত বেদচতুষ্টয়সার মহাবাক্যচতুষ্টয়ের দুরর্থ করিয়া তন্মতাবলম্বী অনেক সন্ন্যাসীবেশধারী ইন্দ্রিয়পরবশ মানব, আপনাদের উপর এবং সমাজের উপর বহু অনর্থ আনিয়া ফেলিলেন। "অহং ব্রহ্মাস্মি" বাক্যে তাঁহারা সার্দ্ধত্রিহস্ত-

পরিমিত, সপ্তধাতুময়, বিষ্ঠামূত্রবাহী, জন্মমৃত্যুজরাব্যাধির নিবাসভূমি, সঙ্কীর্ণ-দৃষ্টি, অধ্রুবনশ্বরজীবন, অতীতানাগত বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, এবং অকৃতবুদ্ধি মনুষ্যই অনাদি, অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বাশ্রয়, পরমানন্দধাম, অচ্যুত ব্রহ্ম এরূপ স্থির করিলেন। পদ্মপত্রে যেরূপ জল লগ্ন হইতে পারে না, ব্রহ্ম বস্তুতেও সেইরূপ পুণ্য পাপে, আচার অনাচার, সত্য মিথ্যা প্রভৃতি কিছুই সংশ্লিষ্ট হইতে পারে না। আমিই সেই ব্রহ্ম,—সুতরাং আমি যাহাই করি না কেন, আমাতে কোনও দাগ লাগিতে পারে না। ইহাপেক্ষা পৈশাচিক সিদ্ধান্ত আর কি হইতে পারে? এরূপ ধারণার বশবর্ত্তীগণ যে শীঘ্রই আপনাদের ও স্বদেশের সর্ব্বনাশের কারণ হইবে, তাহা কি আর বুঝিতে বিলম্ব হয়? বস্তুতঃই উক্ত স্বকপোলকল্পিতদুরর্থকারীগণ শঙ্করকথিত পরমনির্ম্মল ধর্ম্ম ধারণা করিতে না পারিয়া, পুনরায় ভারতবর্ষে, দুর্নীতি, হিংসা, দ্বেষ, অসত্য প্রভৃতির রাজ্য স্থাপন করিল। সুখ, শান্তি ও সত্যের অভাব সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। সেই অভাব দূর করিবার জন্য যে মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইলেন, হে পাঠক! এস এক্ষণে আমরা সেই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদপ্রচারকর্ত্তা ভগবান্ শ্রীশ্রীরামনুজাচার্য্যের নির্ম্মল জীবনচরিত্র আলোচনার জন্য অগ্রসর হই। এ ভাবরাজ্যে অভাব বস্তু থাকিতে পারে না। সুখ, শান্তি, সত্য, দাক্ষিণ্য, ধর্ম্ম প্রভৃতি ভাব বস্তু এবং দুঃখ, অশান্তি, মিথ্যা, হিংসা, সঙ্কীর্ণতা, ঈর্ষা, দ্বেষ, অধর্ম্ম প্রভৃতি অভাব বস্তু। যাহা না থাকিলে মনুষ্যের কষ্ট হয়, তাহাই ভাব পদার্থ। অতএব সুখ শান্তি প্রভৃতি ভাব বস্তু, এবং তৎসমুদয়ের অভাব, দুঃখ অশান্তি প্রভৃতি অভাব বস্তু। অভাব হইলেই ভাব আসিয়া তাহার প্রতিবিধান করে, ইহা পূর্ব্বে প্রমাণ করা হইয়াছে। সেই নিয়মানুসারেই ভারতভূমিতে শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অবির্ভাব হইল।

দ্বিতীয় ভাগ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মান্দ্রাজ হইতে সার্দ্ধ ত্রিযোজন নৈঋতে শ্রীপেরেম্‌বুদুর নামে একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম আছে। সংস্কৃত ভাষায় ইহার নাম শ্রীমহাভূতপুরী। গ্রামবাসীদের মধ্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক। একটি রমণীয় ও বিশাল বিষ্ণু-মন্দির অভ্যন্তরে অবস্থিত। তন্মধ্যে কেশব পেরুমল্ নাম ধারণ পূর্ব্বক ত্রিলোক-ভর্ত্তা বিষ্ণু সস্মিতবদনে, সকলের প্রতি সমভাবে কৃপাকটাক্ষ বিতরণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন। মন্দির প্রাঙ্গনের অপর পার্শ্বে অন্য একটি দেবগৃহ শোভা পাইতেছে। ইহাতে যতিরাজ, ভক্তবীর, ভক্তবৎসল, বেদান্তকমলভাস্কর, ভাষ্যকার শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য যুক্তকরে সেবকরাজের আসন গ্রহণ করিয়া

উপবিষ্ট আছেন। সম্মুখে একটী নির্ম্মলসলিলা, নিস্তরঙ্গা, সুবিশাল দীর্ঘিকা পবিত্রভক্তহৃদয়ের ন্যায় সেই বৈকুণ্ঠপ্রতিম সমগ্র দেবায়তনটিকে স্বীয় অভ্যন্তরে ধারণ করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত তত্রত্য নৈসর্গিক শোভা সকলেরই চিত্তকে আকর্ষণ করে। স্থানটি নানাবিধ বৃক্ষলতামণ্ডিত, বিহঙ্গকুলের মধুর কলরবে মুখরিত, মধ্যে মধ্যে প্রস্ফুটিত কুসুমকুল কর্ত্তৃক উদ্ভাসিত ও সৌরভিত, শান্তি-মাধুর্য্য-সৌন্দর্য্য-প্রচুর, এবং হৃষ্টপুষ্টজনাকীর্ণ। দেখিলে বোধ হয়, যেন বিশ্বের পালন-কার্য্যে নিরন্তর নিযুক্ত থাকায় মধ্যে মধ্যে পরিশ্রম অনুভব করিলে স্বীয় প্রিয়তম সেবকের সহিত কমলাপতি তথায় বিশ্রামলাভ করিবার জন্য আগমন করিয়া থাকেন। (ক্রমশঃ)

রামকৃষ্ণ-মিশন।

স্বামীবিবেকানন্দ।— ঢাকা হইতে স্বামীজি ৺ চন্দ্রনাথ ও শ্রীশ্রীকামাখ্যা দর্শন করিতে যান। কামাখ্যায় গৌহাটী সহরে তিনটী অতি সুন্দর বক্তৃতা করেন। গৌহাটীবাসিগণ আশাতীত সন্তোষলাভ করিয়াছিলেন। শরীর আরও বেশী অসুস্থ হওয়াতে স্বামীজি কয়েক দিবসের জন্য শীলঙে আসেন; সংবাদ পাইয়াই তথায় স্বয়ং শ্রীযুক্ত কটনসাহেব স্বামীজিকে যাহার পর নাই খাতির যত্ন ও অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন; সেখানেও স্বামীজির একটী বক্তৃতা হয়। প্রায় যাবতীয় ইংরাজ কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতা শুনিয়া শ্রীযুক্ত কটন সাহেব অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। সকলকারই নিকট শতমুখে প্রশংসা করিতেছেন। প্রজারঞ্জক কটন সাহেবের অসাধারণ নম্রতা ভদ্রতা এবং গুণগ্রাহিতা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। স্বামীজি এক্ষণে মঠে প্রত্যাগমন করিয়াছেন; শরীর তত সুস্থ নয়।

সিস্‌টার নিবেদিতা।— ইংলণ্ডে রামকৃষ্ণ-মিশনের প্রচার-কার্য্য খুবই হইতেছে। ইংলণ্ডের বড় বড় সভায় এবং সম্প্রদায়ে ব্রহ্মচারিণী নিবেদিতা অতি সাদরে ও সাগ্রহে আহূত হইতেছেন। তথায় তিনি ভারতের সমাজচিত্র এবং গার্হস্থ্য ও পারিবারিক চিত্র আশ্চর্য্য ক্ষমতার সহিত অঙ্কিত করিয়া সকল নর নারীর সমক্ষে দেখাইতেছেন যে, ভারতের গৌরব কত উজ্জ্বল, কত মহিমান্বিত, এবং কত অনুকরণীয়। ভারতের নিন্দুকগণ ব্রহ্মচারিণীর নিকট নির্ব্বাক্ হইয়া যাইতেছেন। ক্রমশঃ সকলেই ভারতের গুণ গ্রহণ করিতেছেন। শ্রীযুক্ত রমেশ বাবু একস্থলে শ্রীমতী নিবেদিতার সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি ও বলিবার-কহিবার ক্ষমতা অলোকসামান্য। এরূপ ব্যক্তি আর কিছু দিন ইংলণ্ডে থাকিলে ভারতের প্রভূত মঙ্গল সন্দেহ নাই। শুনিলাম, সিস্‌টার, বর্ত্তমান ভারত সম্বন্ধে এমন একখানি সুন্দর পুস্তক প্রণয়ন করিতেছেন যে, তাহার দ্বারা ইংরাজগণ প্রচুর উপকৃত হইবেন এবং ভারতেরও যথেষ্ট গৌরব বৃদ্ধি হইবে। এরূপ উচ্চধরণের বহি নাকি আর এ পর্য্যন্ত কেহ বাহির করিতে পারেন নাই। প্রার্থনা করি, তিনি শীঘ্রই কৃতকার্য্য হউন।

মানুষের অতি নির্ম্মল চক্ষুদ্বয় থাকিতে পারে, কিন্তু সে কিছুই দেখিতে পাইবে না। অতএব, ইহা বিশেষ আবশ্যক যে, প্রকৃত ইন্দ্রিয়টী যেন থাকে। আমাদের প্রত্যেক ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেও তদ্রূপ। বাহিরের কর্ণ কেবল ভিতরে শব্দ লইয়া যাইবার যন্ত্রমাত্র; উহা মস্তিষ্কস্থ কেন্দ্রে যাওয়া চাই। তবু ইহাই পর্য্যাপ্ত নহে। কখন কখন এরূপ হয়, তুমি তোমার পুস্তকাগারে বসিয়া একাগ্রমনে কোন পুস্তক পড়িতেছ, এমন সময় ঘড়িতে বারটা বাজিল, কিন্তু তুমি তাহা শুনিতে পাইলে না। এখানে কিসের অভাব? মন উহাতে ছিল না। অতএব আমরা দেখিতেছি, তৃতীয়তঃ, মন অবশ্যই থাকা চাই। প্রথম, বাহ্য যন্ত্র; তার পর এই বাহ্য যন্ত্রটী ইন্দ্রিয়ের নিকট যেন ঐ বিষয়কে বহন করিয়া লইয়া যায়; তারপর আবার মন ইন্দ্রিয়ে যুক্ত হওয়া চাই। যখন মন ঐ মস্তিষ্কস্থ কেন্দ্রে যুক্ত না থাকে, তখন কর্ণ যন্ত্রে এবং মস্তিষ্কস্থ কেন্দ্রে বিষয়ের ছাপ পড়িতে পারে, কিন্তু আমরা উহা বুঝিতে পারিব না। মনও কেবল বাহক মাত্র, উহাকে ঐ বিষয়ের ছাপ আরো ভিতরে বহন করিয়া বুদ্ধিকে প্রদান করিতে হয়। বুদ্ধি উহার সম্বন্ধে নিশ্চয় করে। তথাপি কিন্তু পর্য্যাপ্ত হইল না। বুদ্ধিকে আবার আরো ভিতরে লইয়া গিয়া এই শরীরের রাজা আত্মার নিকট সমর্পণ করিতে হয়। তাঁহার নিকট পঁহুছিলে, তিনি তবে আদেশ করেন, "কর" অথবা "করিও না।" তখন যে যে ক্রমে উহা ভিতরে গিয়াছিল, সেই সেই ক্রমে আবার বহির্যন্ত্রে আইসে,— প্রথমে বুদ্ধিতে, তার পর মনে, তারপর মস্তিষ্ককেন্দ্রে, তারপর বহির্যন্ত্রে, তখনই বিষয়-জ্ঞান সম্পূর্ণ হইল বলা যায়।

যন্ত্রগুলি মানুষের স্থূলদেহে অবস্থিত। মন কিন্তু তাহা নহে, বুদ্ধিও নহে। হিন্দুশাস্ত্রে উহাদের নাম সূক্ষ্ম শরীর, খৃষ্টিয়ান শাস্ত্রে আধ্যাত্মিক শরীর। উহা এই শরীর হইতে অনেক সূক্ষ্ম বটে, কিন্তু উহা আত্মা নহে। আত্মা এই সকলের অতীত। স্থূলশরীর অল্প দিনেই ধ্বংস হইয়া যায়—খুব সামান্য কারণে উহার ভিতরে গোলযোগ ঘটে ও উহার ধ্বংস হইতে পারে। সূক্ষ্ম শরীর এত সহজে নষ্ট হয় না। কিন্তু উহাও কখন সবল, কখন বা দুর্ব্বল হয়। আমরা দেখিতে পাই, বৃদ্ধ লোকের ভিতর মনের তত বল থাকে না, আবার শরীর সবল থাকিলে মনও সবল থাকে, নানাবিধ ঔষধ মনের উপর কার্য্য করে, বাহিরের সকল বস্তুই উহার উপর কার্য্য করে, আবার উহাও বাহ্য জগতের উপর কার্য্য করিয়া থাকে। যেমন শরীরের উন্নতি অবনতি আছে, তেমনি মনেরও সবলতা দুর্ব্বলতা আছে, অতএব মন কখন আত্মা হইতে পারে না, কারণ আত্মা অবিমিশ্র ও ক্ষয়রহিত।

আমরা কিরূপে উহা জানিতে পারি? আমরা কি করিয়া জানিতে পারি যে, মনের পশ্চাতে আরো কিছু আছে? স্বপ্রকাশ জ্ঞান কখন জড়ের ধর্ম্ম হইতে পারে না। এমন কোন জড় বস্তু দেখা যায় নাই, জ্ঞানই যাহার স্বরূপ জড় ভূত কখন আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে না। জ্ঞানই সমুদয় জড়কে প্রকাশ করে। এই যে সম্মুখে হল hall দেখিতেছি, জ্ঞানই ইহার মূল বলিতে হইবে, কারণ কোন না কোন জ্ঞানের সহায়তা ব্যতিরেকে উহার অস্তিত্বই উপলব্ধ হইত না। এই শরীর স্বপ্রকাশ নহে। যদি তাহাই হইত, তবে মৃত ব্যক্তির দেহও স্বপ্রকাশ হইত। মন অথবা আধ্যাত্মিক শরীরও স্বপ্রকাশ হইতে পারে না। উহা জ্ঞানস্বরূপ নহে। যাহা স্বপ্রকাশ, তাহার কখন ধ্বংস হয় না। যাহা অপরের আলোক লইয়া আলোকিত, তাহার আলোক কখন থাকে, কখন থাকে না। কিন্তু যাহা আলোকস্বরূপ, তাহার আসা যাওয়া, সবলতা দুর্ব্বলতা আবার কি? আমরা দেখিতে পাই, চন্দ্রের ক্ষয় হয়, আবার উহার কলা বৃদ্ধি হইতে থাকে,—তাহার কারণ, উহা সূর্য্যের আলোকে আলোকিত। যদি অগ্নিতে লৌহপিণ্ড ফেলিয়া দেওয়া যায়, আর যদি উহাকে লোহিতোত্তপ্ত করা যায়, তবে উহা আলোক বিকিরণ করিতে থাকিবে, কিন্তু ঐ আলোক অপরের বলিয়া উহা চলিয়া যাইবে। অতএব ক্ষয় কেবল সেই আলোকেই সম্ভব, যাহা অপরের নিকট হইতে গৃহীত, যাহা স্বপ্রকাশ আলোক নহে।

এক্ষণে আমরা দেখিলাম, এই স্থূলদেহ স্বপ্রকাশ নহে, উহা আপনাকে আপনি জানিতে পারে না। মনও আপনাকে আপনি জানিতে পারে না। কেন? কারণ, মনের শক্তির হ্রাসবৃদ্ধি আছে, কখন উহা সবল কখন আবার দুর্ব্বল হয়, কারণ বাহ্য সকল বস্তুই উহার উপর কার্য্য করিয়া উহাকে সবলও করিতে পারে, দুর্ব্বলও করিতে পারে। অতএব মনের মধ্য দিয়া যে আলোক আসিতেছে, তাহা উহার নিজের নহে। তবে উহা কাহার? উহা এমন কাহারও আলোক অবশ্য হইবে, যাহার পক্ষে উহা ধার করা আলোক নহে, অথবা অপর আলোকের প্রতিবিম্ব নহে, কিন্তু যাহা আলোকস্বরূপ; অতএব সেই পুরুষের স্বরূপভূত যে জ্ঞান, তাহার কখন নাশ বা ক্ষয় হয় না, উহা কখন প্রবল কখন বা মৃদু হইতে পারে না। উহা স্বপ্রকাশ—উহা আলোকস্বরূপ। আত্মা জানেন, তাহা নহে, আত্মা জ্ঞানস্বরূপ; আত্মার অস্তিত্ব আছে, তাহা নহে, আত্মা অস্তিত্বস্বরূপ; আত্মা যে সুখী, তাহা নহে, আত্মা সুখস্বরূপ। যে

সুখী, তাহার সুখ অপর কাহারও নিকট প্রাপ্ত—উহা আর কাহারও প্রতিবিম্ব। যাহার জ্ঞান আছে, সে অপর কাহারও নিকট জ্ঞানলাভ করিয়াছে, উহা প্রতিবিম্বস্বরূপ। যাহার অস্তিত্ব আছে, তাহার সেই অস্তিত্ব অপর কাহারও অস্তিত্বের উপর নির্ভর করিতেছে। যেখানেই গুণ ও গুণীর ভেদ আছে, সেখানেই বুঝিতে হইবে, সেই গুণগুলি গুণীর উপর প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। কিন্তু জ্ঞান, অস্তিত্ব বা আনন্দ এ গুলি আত্মার ধর্ম্ম নহে—উহারা আত্মার স্বরূপ।

পুনরায় প্রশ্ন হইতে পারে, আমরা এ কথা স্বীকার করিয়া লইব কেন? কেন আমরা স্বীকার করিব যে, আনন্দ, অস্তিত্ব, স্বপ্রকাশিতা আত্মার স্বরূপ, আত্মার ধর্ম্ম নহে? ইহার উত্তর এইঃ—যেমন আমরা দেখিয়াছি, শরীরের প্রকাশ মনের প্রকাশে, যতক্ষণ মন থাকে, ততক্ষণ উহার প্রকাশ, মন চলিয়া গেলে দেহেরও প্রকাশ আর থাকে না। চক্ষু হইতে মন চলিয়া গেলে, আমি তোমার দিকে চাহিয়া থাকিতে পারি, কিন্তু তোমায় দেখিতে পাইব না; অথবা শ্রবণেন্দ্রিয় হইতে উহা চলিয়া গেলে, তোমাদের কথা একবিন্দুও শুনিতে পাইব না। সকল ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেই এইরূপ। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইলাম, শরীরের প্রকাশ—মনের প্রকাশে। আবার মন সম্বন্ধেও তদ্রূপ। বহির্জ্জগতের সকল বস্তুই উহার উপর কার্য্য করিতেছে, সামান্য কারণেই উহার পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে, মস্তিষ্কের মধ্যে একটু সামান্য গোলমাল হইলেই উহার পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে। অতএব মনও স্বপ্রকাশ হইতে পারে না, কারণ আমরা সমুদয় প্রকৃতিতেই দেখিতেছি, যাহা কোন বস্তুর স্বরূপ, তাহার পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। কেবল যে গুলি অপর বস্তুর ধর্ম্ম, যাহা অপর বস্তুর প্রতিবিম্বস্বরূপ, তাহারই পরিবর্ত্তন হয়। কিন্তু তর্ক হইতে পারে, আত্মার প্রকাশ, আত্মার জ্ঞান, আত্মার আনন্দও কেন ঐরূপ অপরের নিকট হইতে গৃহীত হউক না? এরূপ স্বীকারে দোষ এই হইবে যে, ইহার অন্ত কিছু পাওয়া যাইবে না;—এরূপ প্রশ্ন উঠিবে, উহা আবার কাহার নিকট হইতে আলোক প্রাপ্ত হইল? যদি বল, 'অপর কোন আত্মা হইতে,' তবে আবার প্রশ্ন উঠিবে—উহাই বা কোথা হইতে আলোক পাইল? অতএব অবশেষে আমাদিগকে এমন এক জায়গায় থামিতে হইবে, যাহার আলোক অপরের নিকট প্রাপ্ত নহে। অতএব ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত এই, যেখানে প্রথমেই স্বপ্রকাশিতা দেখিতে পাই, সেখানেই থামি, আর অধিক অগ্রসর না হওয়া।

অতএব আমরা দেখিলাম, মানুষের প্রথমতঃ এই স্থূল দেহ, তৎপরে সূক্ষ্ম শরীর—উহার পশ্চাতে মানুষের প্রকৃত স্বরূপ আত্মা রহিয়াছেন। আমরা দেখিয়াছি, স্থূলদেহের সমুদয় শক্তি মন হইতে গৃহীত—মন আবার আত্মার আলোকে আলোকিত।

আত্মার স্বরূপসম্বন্ধে আবার নানা প্রশ্ন উঠিতেছে। আত্মা স্বপ্রকাশ, সচ্চিদানন্দই আত্মার স্বরূপ, এই যুক্তি হইতে যদি আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, তবে স্বভাবতঃই ইহা প্রমাণিত হইতেছে, যে, উহা শূন্য হইতে সৃষ্ট হইতে পারে না। যাহা স্বপ্রকাশ, অপরবস্তু-নিরপেক্ষ, তাহা কখন শূন্য হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। আমরা দেখিয়াছি, এই জড়জগতও শূন্য হইতে হয় নাই—আত্মা ত দূরের কথা। অতএব উহার সর্ব্বদাই অস্তিত্ব ছিল। এমন সময় কখন ছিল না, যখন উহার অস্তিত্ব ছিল না, কারণ যদি আত্মার অস্তিত্ব ছিল না, তবে কাল কোথায় ছিল? কাল আত্মার ভিতরে। যখন আত্মার শক্তি মনের উপর প্রতিবিম্বিত হয়, আর মন চিন্তা করে, তখনই কালের উৎপত্তি। যখন আত্মা ছিল না, তখন সুতরাং চিন্তাও ছিল না, আর চিন্তা না থাকিলে, কালও থাকিতে পারে না। অতএব যখন কাল আত্মাতে রহিয়াছে, তখন আত্মা এক সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, কি করিয়া বলা যাইতে পারে? উহার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই, উহা কেবল বিভিন্ন সোপানের মধ্য দিয়া চলিতেছে মাত্র। উহা ধীরে ধীরে আপনাকে নিম্ন অবস্থা হইতে উচ্চ ভাবে প্রকাশ করিতেছে। উহা মনের ভিতর দিয়া শরীরের উপর কার্য্য করিয়া আপনার মহিমা বিকাশ করিতেছে, আর শরীর দ্বারা বাহ্য জগৎ গ্রহণ করিতেছে ও উহাকে বুঝিতেছে। উহা একটী শরীর গ্রহণ করিয়া উহাকে ব্যবহার করিতেছে, আর যখন সেই শরীর দ্বারা আর কোন কায হইবার সম্ভাবনা থাকে না, তখন আর এক এক শরীর গ্রহণ করে।

এক্ষণে আবার আত্মার পুনর্জ্জন্মসম্বন্ধে প্রশ্ন আসিল। অনেক সময় লোকে এই পুনর্জ্জন্মের কথা শুনিলেই ভয় পায়, আর লোকের কুসংস্কার এত প্রবল যে, চিন্তাশীল লোকেও বরং বিশ্বাস করিবে যে, আমরা শূন্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছি, তারপর আবার মহা যুক্তির সহিত সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে চেষ্টা করিবে যে, যদিও আমরা শূন্য হইতে উৎপন্ন, কিন্তু পরে আমরা অনন্তকাল ধরিয়া থাকিব। যাহারা শূন্য হইতে আসিয়াছে, তাহারা অবশ্যই শূন্যে যাইবে। তুমি আমি বা উপস্থিত কেহই শূন্য হইতে আইসে নাই, সুতরাং শূন্যে যাইবেও

না। আমরা অনন্তকাল ধরিয়া রহিয়াছি এবং থাকিব, আর জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন শক্তি নাই, যাহা তোমার অথবা আমার অস্তিত্ব উড়াইয়া দিতে পারে। এই পুনর্জ্জন্মবাদে কোন ভয় পাইবার কারণ নাই, উহাই মানুষের নৈতিক উন্নতির প্রধান সহায়ক। চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের ইহাই ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত। যদি পরে তোমার অনন্তকাল অস্তিত্ব সম্ভব হয়,তবে ইহাও সত্য যে, তুমি অনন্তকাল ধরিয়া ছিলে; আর কোনরূপ হইতে পারে না। এই মতের বিরুদ্ধে যে কতকগুলি আপত্তি শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার নিরাকরণ করিতে চেষ্টা করিতেছি। যদিও তোমরা অনেকে এই আপত্তিগুলিকে অকিঞ্চিৎকর বোধ করিবে, কিন্তু তথাপি আমাদিগকে উহাদের উত্তর দিতে হইবে, কারণ, কখন কখন আমরা দেখিতে পাই, খুব চিন্তাশীল লোকেও খুব মূর্খোচিত কথা সকল বলিয়া থাকে। লোকে যে বলিয়া থাকে, 'এমন অসঙ্গত মতই নাই, যাহা সমর্থন করিবার জন্য কোন না কোন দার্শনিক উঠেন,' এ কথা অতি সত্য। প্রথম আপত্তি এই, আমাদের ভূত জন্মের কথা স্মরণ থাকে না কেন? তাহাতে জিজ্ঞাস্য এই,আমরা আমাদের এই জন্মের অতীত ঘটনাই কি সব স্মরণ করিতে পারি? তোমাদের মধ্যে কয়জনের শৈশবকালের কথা স্মরণ হয়? শৈশবকালের কথা তোমাদের কাহারই স্মরণ হয় না; আর যদি স্মৃতিশক্তির উপর অস্তিত্ব নির্ভর করে, তবে তোমার উহা স্মরণ নাই বলিয়া, ঐ শৈশবাবস্থায় তোমার অস্তিত্বও ছিল না বলিতে হইবে। কেহ যদি স্মরণ করিবার থাকে, তবে তাহারই উপর অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে বলা কেবল বৃথা প্রলাপমাত্র। আমাদের ভূত জন্মের কথা স্মরণ থাকিবার প্রয়োজন কি? সেই মস্তিষ্কও নাই, উহা একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, আর নূতন প্রকার মস্তিষ্ক রচিত হইয়াছে। অতীতকালের সংস্কারসমষ্টি আমাদের মস্তিষ্কে আসিয়াছে—উহা লইয়াই মন এই শরীরে বাস করিতে আসিয়াছে।

আমি এক্ষণে যেরূপ, তাহা আমার অনন্ত অতীত কালের কর্ম্মফলস্বরূপ। আর সমুহ অতীত স্মরণ করিবারই বা আমার কি প্রয়োজন? কুসংস্কারের এমনি প্রভাব যে, যাহারা এই পুনর্জ্জন্মবাদ অস্বীকার করে, তাহারাই বিশ্বাস করে, এক সময়ে আমরা বানর ছিলাম, কিন্তু তাহাদের বানরজন্ম কেন স্মরণ হয় না, তাহা জিজ্ঞাসিতে ভরসা করে না। যখন কোন প্রাচীন ঋষি বা সাধু সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন শুনি, আমরা তাঁহাকে ভ্রান্ত বলিয়া থাকি; কিন্তু হাক্‌সলি ইহা বলিয়াছেন, টিণ্ড্যাল ইহা বলিয়াছেন, তবে ইহা অবশ্যই সত্য

হইবে তখন আমরা উহা অমনি মানিয়া লই। প্রাচীন কুসংস্কারের পরিবর্ত্তে আমরা আধুনিক কুসংস্কার আনিয়াছি, ধর্ম্মের প্রাচীন পোপের পরিবর্ত্তে আমরা বিজ্ঞানের আধুনিক পোপ বসাইয়াছি। অতএব আমরা দেখিলাম, এই স্মৃতিসম্বন্ধে যে আপত্তি, তাহা সত্য নহে। আর এই পুনর্জ্জন্মসম্বন্ধে যে সকল আপত্তি হইয়া থাকে, তন্মধ্যে ইহাই একমাত্র আপত্তি, যৎসম্বন্ধে বিজ্ঞ লোকে আলোচনা করিতে পারেন। যদিও পুনর্জ্জন্মবাদ প্রমাণ করিতে হইলে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিও থাকিবে, ইহা প্রমাণ করার কোন প্রয়োজন নাই, ইহা আমরা দেখিয়াছি, তথাপি আমরা ইহা দৃঢ়ভাবে বলিতে পারি যে, অনেকের এইরূপ স্মৃতি আসিয়াছে, আর তোমরাও সকলে যে জন্মে মুক্তি লাভ করিবে, সেই জন্মে এই স্মৃতি লাভ করিবে। তখনই কেবল তুমি জানিতে পারিবে যে, জগৎ স্বপ্নমাত্র, তখনই তুমি অন্তরের অন্তরে বুঝিবে যে, তোমরা এই জগতে নট মাত্র, আর এই জগৎ রঙ্গভূমিমাত্র, তখনই অনাসক্তির ভাব তোমাদের ভিতর বজ্রবেগে আসিবে, তখনই যত ভোগতৃষ্ণা, জীবনের উপর এই মহা আগ্রহ—এই সংসার চিরকালের জন্য উঠিয়া যাইবে। তখন তুমি স্পষ্টই দেখিবে, তুমি জগতে কতবার আসিয়াছ, কত লক্ষ লক্ষ বার তোমরা পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, স্বামী, স্ত্রী, বন্ধু, ঐশ্বর্য্য, শক্তি লইয়া কাটাইয়াছ। এই সকল কতবার আসিয়া কতবার চলিয়া গিয়াছে। কতবার তুমি সংসার তরঙ্গের উচ্চ চূড়ায় উঠিয়াছ, আবার কতবার তুমি নৈরাশ্যের গভীর গহ্বরে নিমজ্জিত হইয়াছ। যখন স্মৃতি তোমার নিকট এই সকল আনিয়া দিবে, তখনই কেবল তুমি বীরের ন্যায় দাঁড়াইবে, আর জগৎ যখন তোমায় ভ্রূভঙ্গী করিবে, তখন তুমি হাস্য করিবে। তখনই তুমি বীরের ন্যায় দাঁড়াইয়া বলিতে পারিবে, "মৃত্যু, তোমাকেও আমি গ্রাহ্য করি না, তুমি আমাকে কি ভয় দেখাও?" যখন তুমি জানিতে পারিবে, মৃত্যুর তোমার উপর কোন শক্তি নাই, তখনই তুমি মৃত্যুকে জয় করিতে পারিবে। সকলেই এই জ্ঞানলাভ করিবে।

আত্মার যে পুনর্জ্জন্ম হয়, তাহার কি কোন যুক্তিযুক্ত প্রমাণ আছে? এতক্ষণ আমরা কেবল শঙ্কা নিরাস করিতেছিলাম, দেখাইতেছিলাম যে এই পুনর্জ্জন্মবাদ অপ্রমাণ করিবার যে যুক্তিগুলি, তাহা অকিঞ্চিৎকর। এক্ষণে উহার সপক্ষে যে যে যুক্তি আছে, তাহা বিবৃত হইতেছে। পুনর্জ্জন্মবাদ ব্যতীত জ্ঞান অসম্ভব। মনে কর, আমি রাস্তায় গিয়া একটা কুকুরকে দেখিলাম। উহাকে কুকুর বলিয়া জানিলাম কিরূপে? আমি মনের দিকে তাকাইলাম—

সেখানে আমার সমুদয় পূর্ব্বসংস্কারগুলি যেন স্তরে স্তরে সজ্জীকৃত রহিয়াছে। নূতন কোন বিষয় আসিবামাত্রই আমি ঐ টাকে সেই প্রাচীন সংস্কারগুলির সহিত মিলাইলাম। যখনই দেখিলাম, সেইরূপ ভাবের আর কতকগুলি সংস্কার রহিয়াছে, অমনি আমি উহাদিগকে তাহাদের সহিত মিলাইলাম, অমনি আমার তৃপ্তি আসিল। আমি তখন উহাকে কুকুর বলিয়া জানিতে পারিলাম, কারণ, উহা পূর্ব্বাবস্থিত কতকগুলি সংস্কারের সহিত মিলিল। যখন আমি উহার তুল্য সংস্কার আমার ভিতরে না দেখিতে পাই, তখনই আমার অতৃপ্তি আইসে। এইরূপ হইলে উহাকে 'অজ্ঞান' বলে। আর তৃপ্তি হইলেই উহাকে 'জ্ঞান' বলে। যখন একটা আপেল (apple) পড়িল,তখন মানুষের অতৃপ্তি আসিল। তারপর মানুষ ক্রমশঃ ঐরূপ কতকগুলি ঘটনা—যেন একটী শৃঙ্খল, দেখিতে পাইল। কি সে শৃঙ্খল? সেই শৃঙ্খল এই যে, সকল আপেলই পড়িয়া থাকে। মানুষ উহার মাধ্যাকর্ষণ সংজ্ঞা দিল। অতএব আমরা দেখিলাম, পূর্ব্বে কতকগুলি অনুভূতি না থাকিলে নূতন অনুভূতি অসম্ভব, কারণ, ঐ নূতন অনুভূতির সহিত মিলাইবার আর কিছু পাওয়া যাইবে না। অতএব, কতকগুলি ইউরোপীয় দার্শনিকের মত, "বালক ভূমিষ্ঠ হইবার সময় সংস্কারশূন্য মন লইয়া আসে" একথা যদি সত্য হয়, তবে তাহাকে সংস্কারশূন্য মন লইয়া যাইতে হইবে। কারণ, তাহার ঐ নূতন অনুভূতি মিলাইবার জন্যে আর কোন সংস্কার রহিল না। অতএব দেখিলাম, এই পূর্ব্বসঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার ব্যতীত নূতন কোন জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। বাস্তবিক কিন্তু আমাদের সকলকেই পূর্ব্বসঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিতে হইয়াছে। জ্ঞান কেবল ভূয়োদর্শনলব্ধ, জানিবার আর কোন পথ নাই। যদি আমরা এখানে ঐ জ্ঞানলাভ না করিয়া থাকি, আমরা অবশ্যই অপর কোথাও উহা লাভ করিয়া থাকিব। মৃত্যুভয় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই কেন? একটী কপোত এইমাত্র ডিম্ব হইতে বাহির হইয়াছে—একটী শ্যেন আসিল অমনি সে ভয়ে মায়ের কাছে পলাইয়া গেল। কোথা হইতে ঐ কপোতটী শিখিল যে, কপোত শ্যেনের ভক্ষ্য; ইহার একটী পুরাতন ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু উহাকে ব্যাখ্যাই বলা যাইতে পারে না। উহাকে স্বাভাবিক জ্ঞান বলা হইত। যে ক্ষুদ্র কপোতটী এইমাত্র ডিম্ব হইতে বাহির হইয়াছে, তাহার এরূপ মরণভীতি আসে কোথা হইতে? সদ্য ডিম্ব হইতে বহির্গত হংস জলের নিকট আসিলেই জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে, এবং সাঁতার দিতে থাকে কেন? উহা কখন সন্তরণ করে নাই,অথবা কাহাকেও সন্তরণ দিতে

দেখে নাই। লোকে বলে উহা স্বাভাবিক জ্ঞান। উহা একটা মস্ত কথা, কিন্তু উহা আমাদিগের নূতন কিছুই শিখাইল না। এই স্বাভাবিক জ্ঞান কি, তাহা আলোচনা করা যাক। আমাদের নিজেদের ভিতরই শত প্রকারে স্বাভাবিক জ্ঞান রহিয়াছে। প্রথমে কোন ব্যক্তি পিয়ানো বাজাইতে শিখিতে লাগিলেন। প্রথমে তাঁহাকে প্রত্যেক পরদার দিকে নজর রাখিয়া তবে উহাদের উপর অঙ্গুলি প্রয়োগ করিতে হয়; কিন্তু অনেক মাস, অনেক বৎসর অভ্যাস করিতে করিতে উহা স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়, আপনা আপনি হইতে থাকে। এক সময়ে যাহাতে ইচ্ছার প্রয়োজন হইত, তাহাতে আর জ্ঞানপূর্ব্বক ইচ্ছার প্রয়োজন থাকে না, কিন্তু উহা জ্ঞানপূর্ব্বক ইচ্ছা ব্যতীতই নিষ্পন্ন হইতে পারে, উহাকেই বলে স্বাভাবিক জ্ঞান। প্রথমে উহা ইচ্ছাসহকৃত ছিল, পরিশেষে আর ইচ্ছার উহাতে প্রয়োজন রহিল না। এখনও সম্পূর্ণ প্রমাণ হইল না। অর্দ্ধেক প্রমাণ এখনও বাকি। ঐ অর্দ্ধেক প্রমাণ এই যে, প্রায় সমুদয় কার্য্যই, যাহা এক্ষণে আমাদের স্বাভাবিক, তাহাদিগকে ইচ্ছার অধীনে আনয়ন করা যাইতে পারে। শরীরের প্রত্যেক পেশীই আমাদের অধীনে আনয়ন করা যাইতে পারে। এ বিষয়ে সাধারণে উত্তমরূপেই জ্ঞাত আছেন। অতএব অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী দুই উপায়েই প্রমাণ হইল যে, যাহাকে আমরা স্বাভাবিক জ্ঞান বলি, তাহা ইচ্ছাকৃত কার্য্যের অবনত ভাব মাত্র। অতএব যদি সমুদয় সৃষ্টিতেই এই এক সাদৃশ্য প্রয়োগ করা যায়, যদি সমুদয় প্রকৃতিই সমপ্রণালীক হয়, তবে মনুষ্যে এবং তির্য্যগ্ জাতিতে যাহা স্বাভাবিক জ্ঞান, তাহা ইচ্ছার অবনত ভাব মাত্র।

আমরা বহির্জ্জগতে যে নিয়ম পাইয়াছিলাম, অর্থাৎ প্রত্যেক ক্রমবিকাশ প্রক্রিয়ার পূর্ব্বেই একটী ক্রমসঙ্কোচ প্রক্রিয়া বর্ত্তমান? আর ক্রমসঙ্কোচ হইলেই তৎসঙ্গে সঙ্গে ক্রমবিকাশও থাকিবে, এই নিয়ম খাটাইয়া আমরা স্বাভাবিক জ্ঞানের কি ব্যাখ্যা পাইতে পারি? স্বাভাবিক জ্ঞান তাহা হইলে বিচারপূর্ব্বক কার্য্যের ক্রমসঙ্কোচভাব হইয়া দাঁড়াইল। অতএব মানুষে বা পশুতে যাহাকে স্বাভাবিক জ্ঞান বলি, তাহা অবশ্যই পূর্ব্ববর্ত্তী ইচ্ছাকৃত কার্য্যের ক্রমসঙ্কোচভাব হইবে। আর ইচ্ছাকৃত কার্য্য বলিলেই পূর্ব্বে আমরা বাস্তবিক কার্য্য করিয়াছিলাম, স্বীকার করা হইল। পূর্ব্বকৃত কার্য্য হইতেই ঐ সংস্কার আসিয়াছিল, আর ঐ সংস্কারও রহিয়াছে। এই মৃত্যুভীতি, এই জন্মিবামাত্র জলে সন্তরণ, আর মনুষ্যের মধ্যে যাহা কিছু অনিচ্ছাকৃত স্বাভাবিক কার্য্য রহিয়াছে,

মূলানুবাদ।—হে পাণ্ডব, যাহাকেই (প্রাচীন ঋষিগণ) সন্ন্যাস বলিয়াছেন, তাহাকেই তুমি যোগ বলিয়া জানিবে, কারণ যে ব্যক্তি সঙ্কল্পের সন্ন্যাস করে নাই, সে কখনও যোগী হইতে পারে না॥ ২॥

ভাষ্য।—নহু চ নিরগ্নেরক্রিয়স্যৈব শ্রুতিস্মৃতিযোগশাস্ত্রেষু সন্ন্যাসিত্বং যোগিত্বং চ প্রসিদ্ধং, কথমিহ সাগ্নেঃ সক্রিয়স্য সন্ন্যাসিত্বং যোগিত্বঞ্চাপ্রসিদ্ধমুচ্যতে ইতি নৈষ দোষঃ কয়াচিদ্ গুণবৃত্ত্যা উভয়স্য সংপিপাদয়িষিতত্বাৎ তৎ কথং? কর্ম্মফল-সঙ্কল্পসংন্যাসাৎ সংন্যাসিত্বং, যোগাঙ্গত্বেন কর্ম্মানুষ্ঠানাৎ কর্ম্মফলসঙ্কল্পস্য বা চিত্ত-বিক্ষেপহেতোঃ পরিত্যাগাদ্‌যোগিত্বং চেতি গৌণমুভয়ং ন পুনর্ম্মুখ্যং সংন্যাসিত্বং যোগিত্বং চাভিপ্রেতমিত্যেতমর্থং দর্শয়িতুমাহ॥ ২॥

ভাষ্যানুবাদ।—এক্ষণে আশঙ্কা এই প্রকার হইতে পারে যে, শ্রুতি স্মৃতি এবং যোগশাস্ত্রে নিরগ্নি এবং অক্রিয় ব্যক্তিরই সন্ন্যাসিত্ব ও যোগিত্ব প্রসিদ্ধ আছে; এই স্থলে কেন সাগ্নিক ও সক্রিয় ব্যক্তির সন্ন্যাসিত্ব ও যোগিত্ব অপ্রসিদ্ধ হইলেও উক্ত হইতেছে?। এই প্রকার উক্তিতে (বাস্তবিক) কোন দোষ নাই। কারণ গৌণীলক্ষণাদ্বারা এই উভয়কে প্রতিপাদন করিবার ইচ্ছাতেই এই প্রকার বলা হইয়াছে; তাহা কি প্রকার? কর্ম্মফলবিষয়ে সংকল্প পরিত্যাগ করা হয় বলিয়া (তাদৃশ কর্ম্মীর) সন্ন্যাসিত্ব (উক্ত হইয়াছে); ধ্যানযোগের সাধন বলিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয় বলিয়াই হউক, অথবা চিত্তবিক্ষেপের হেতু কর্ম্মফলসংকল্পের পরিত্যাগ করা হয় বলিয়া, তাহার যোগিত্ব (শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে)। এই সন্ন্যাসিত্ব ও যোগিত্ব গৌণ,মুখ্য সন্ন্যাসিত্ব ও যোগিত্ব এ স্থলের অভিপ্রেত নহে, এই বিষয়টী দেখাইবার জন্য (ভগবান্) বলিতেছেন (যে)॥ ২॥

ভাষ্য।—যং সর্ব্বকর্ম্মফলপরিত্যাগলক্ষণং পরমার্থসন্ন্যাসমিতি প্রাহুঃ শ্রুতি-স্মৃতিবিদঃ যোগং কর্ম্মানুষ্ঠানলক্ষণং তং পরমার্থসংন্যাসং বিদ্ধি জানীহি হে পাণ্ডব। কর্ম্মযোগস্য প্রবৃত্তিলক্ষণস্য তদ্বিপরীতেন নিবৃত্তিলক্ষণেন পরমার্থ-সংন্যাসেন কীদৃশং সামান্যমঙ্গীকৃত্য তদ্ভাব উচ্যত ইত্যপেক্ষায়াং ইদমুচ্যতে। অস্তি পরমার্থসন্ন্যাসেন সাদৃশ্যং কর্ত্তৃদ্বারকং কর্ম্মযোগস্য। যোহি পরমার্থসংন্যা-সী স ত্যক্তসর্ব্বকর্ম্মসাধনতয়া সর্ব্বকর্ম্মতৎফলবিষয়ং সঙ্কল্পং প্রবৃত্তিহেতুকাম-কারণং সংন্যস্যতি। অয়মপি কর্ম্মযোগী কর্ম্মকুর্ব্বাণএব ফলবিষয়ং সঙ্কল্পং সংন্যস্যতীত্যেতমর্থং দর্শয়ন্নাহ নহি যস্মাৎ অসন্ন্যস্তসঙ্কল্পোঽসন্ন্যস্তোঽপরিত্যক্তঃ ফলবিষয়ঃ সঙ্কল্পোঽভিসন্ধির্যেনসোঽসন্ন্যস্তসঙ্কল্পঃ কশ্চন কশ্চিদপি কর্ম্মী যোগী সমাধানবান্ ন সম্ভবতীত্যর্থঃ। ফলসঙ্কল্পস্য চিত্তবিক্ষেপহেতুত্বাৎ। তস্মাদ্ যঃ

কশ্চন কশ্চিদপি কর্ম্মী সংন্যস্তকর্ম্মফলসংকল্পোভবেৎ স যোগী সমাধানবান্ অবিক্ষিপ্তচিত্তোভবেৎ চিত্তবিক্ষেপহেতোঃ ফলসঙ্কল্পস্য সন্ন্যস্তত্বাদিত্যভিপ্রায়ঃ। এবং পরমার্থসন্ন্যাসকর্ম্মযোগয়োঃ কর্ত্তৃদ্বারকং সংন্যাসসামান্যমপেক্ষ্য "যং সংন্যাসমিতিপ্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব", ইতি কর্ম্মযোগস্য স্তুত্যর্থং সংন্যাসত্বমুক্তম্॥ ২॥

ভাষ্যানুবাদ।—শ্রুতি ও স্মৃতির বেত্তাগণ, যে সর্ব্বকর্ম্মফল পরিত্যাগরূপ পরমার্থ সন্ন্যাস বলিয়া থাকেন কর্ম্মানুষ্ঠানলক্ষণ যোগকেও সেই পরমার্থ সন্ন্যাস বলিয়াই তুমি জানিও, হে পাণ্ডব! প্রবৃত্তি লক্ষণ কর্ম্মযোগের ও তাহার বিপরীত নিবৃত্তিলক্ষণ পরমার্থ সন্ন্যাসের কোন সাধর্ম্ম্যকে অবলম্বন করিয়া উভয়ের একরূপতা কথিত হইয়াছে, এই প্রকার প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য এই বলা হইতেছে, যে পরমার্থ সন্ন্যাসের সহিত কর্ম্মযোগের কর্ত্তৃদ্বারক সাদৃশ্য আছে; (কর্ত্তৃদ্বারক সাদৃশ্য কিপ্রকার তাহা বলা হইতেছে যে যেব্যক্তি পরমার্থ-সন্ন্যাসী, সে সকল কর্ম্মরূপ সাধন পরিত্যাগ করে, এই জন্য প্রবৃত্তি হেতু কামের কারণ, সকল প্রকার কর্ম্ম ও তৎফলবিষয়ে সঙ্কল্পের সন্ন্যাস করিয়া থাকে; (পূর্ব্বোক্ত) এই কর্ম্মযোগীও কর্ম্মের অনুষ্ঠান কালেই ফলবিষয়ে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া থাকে। এই প্রকার পরস্পর সাদৃশ্য প্রতিপাদন করিবার জন্য বলা হইতেছে যে, যে কারণ "অসন্ন্যস্তসঙ্কল্প" (ফলবিষয়ে সঙ্কল্প অর্থাৎ অভিসন্ধিকে যে ব্যক্তি পরিত্যাগ করে না,) কোন ব্যক্তি যোগী অর্থাৎ সমাহিতচেতা হইতে পারে না, কারণ ফলবিষয়ক সঙ্কল্প, চিত্তের বিক্ষেপের প্রতি হেতু, সেই কারণ যে কোন কর্ম্মী কর্ম্মফলের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছে, সে সমাহিতচেতা (অর্থাৎ) অবিক্ষিপ্তচিত্ত হয়, কারণ চিত্তবিক্ষেপের হেতু ফলবিষয়ক সঙ্কল্প সে পরিত্যাগ করিয়াছে। ইহাই অভিপ্রায়। এ পরমার্থ সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগের এই প্রকার কর্ত্তৃদ্বারক সন্ন্যাসরূপ সাধারণ ধর্ম্মকে অপেক্ষা করিয়া যাহাকে সন্ন্যাস বলিয়াছেন, তাহাকেই তুমি যোগ বলিয়া জানিবে, হে পাণ্ডব!" এই বাক্যের দ্বারা কর্ম্মযোগেরই স্তুতির জন্য তাহার সন্ন্যাসত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে॥ ২ ॥

আরুরুক্ষো র্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥ ৩॥

অন্বয়।—যোগং আরুরুক্ষোঃ মুনেঃ কর্ম্ম কারণম্ উচ্যতে তস্যৈব (পুনঃ) যোগারূঢ়স্য শমঃ কারণম্ উচ্যতে ॥ ৩॥

মূলানুবাদ।—ধ্যানযোগে আরোহণার্থী মননশীল ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্মই (ধ্যান যোগ লাভের কারণ (বলিয়া) উক্ত হয়। সেই ব্যক্তিই যোগারূঢ় হইলে তাহার পক্ষে শম (অর্থাৎ) সর্ব্বকর্ম্মনিবৃত্তিই (ইষ্টসিদ্ধির) কারণ (বলিয়া) কীর্ত্তিত হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

ভাষ্য।—ধ্যানযোগস্য ফলনিরপেক্ষঃ কর্ম্মযোগঃ বহিরঙ্গসাধনমিতি তং সন্ন্যাসত্বেন স্তুত্বা অধুনা কর্ম্মযোগস্য ধ্যানযোগসাধনত্বং দর্শয়তি আরুরুক্ষো-রারোঢ়ুমিচ্ছতোঽনারূঢ়স্য ধ্যানযোগেঽবস্থাতুমশক্তস্যৈব ইত্যর্থঃ কস্যা-রুরুক্ষোঃ? মুনেঃ কর্ম্মফলসন্ন্যাসিনঃ ইত্যর্থঃ। কিমারুরুক্ষোঃ? যোগং। কর্ম্ম কারণং সাধনমুচ্যতে। যোগারূঢ়স্য পুনস্তস্যৈব শমঃ সর্ব্বকর্ম্মভ্যো নিবৃত্তিঃ কারণং যোগারূঢ়ত্বস্য সাধনমুচ্যত ইত্যর্থঃ। যাবদ্‌যাবৎ কর্ম্মভ্য উপরমতে তাবৎ তাবৎ নিরায়াসস্য জিতেন্দ্রিয়স্য চিত্তং সমাধীয়তে। তথা সতি সঝটিতি যোগারূঢ়ো ভবতি। তথাচোক্তং ব্যাসেন

"নৈতাদৃশং ব্রাহ্মণস্যাস্তি বিত্তং যথৈকতা সমতা সত্যতা চ।
শীলং স্থিতির্দণ্ডনিধানমার্জ্জবং ততস্ততশ্চোপরমঃ ক্রিয়াভ্যঃ॥" ইতি ৩॥

ভাষ্যানুবাদ।—ফলনিরপেক্ষ কর্ম্মযোগ, ধ্যানযোগের বহিরঙ্গ সাধন (ধ্যান যোগের বিষয় ধ্যেয় বস্তু, কর্ম্মযোগের বিষয় নহে, অথচ কর্ম্মযোগ চিত্তশুদ্ধি দ্বারা ধ্যানযোগের কারণ হয়, এই জন্য ধ্যানযোগের বহিরঙ্গ সাধন বলিয়া শাস্ত্রে কর্ম্মযোগের নির্দ্দেশ হয়), এই কারণ সন্ন্যাসরূপে স্তুতি করিয়া এক্ষণে কর্ম্ম-যোগ যে ধ্যানযোগের সাধন, তাহাই দেখাইতেছেন, 'আরুরুক্ষু' আরোহণ করিতে অভিলাষী, অনারূঢ় (অর্থাৎ) ধ্যানযোগে অবস্থিতি করিতে অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষে ইহাই অর্থ। আরুরুক্ষু কিরূপ? মুনি, অর্থাৎ কর্ম্মফল সন্ন্যাসী কিসে আরোহণ করিতে অভিলাষী? যোগে, (এই প্রকার ব্যক্তির) কর্ম্মই কারণ (অর্থাৎ) সাধন উক্ত হয়। সেই ব্যক্তিই যোগারূঢ় হইলে (তাহার পক্ষে) "শম" উপশম (অর্থাৎ) সর্ব্ব কর্ম্ম হইতেই নিবৃত্তিই কারণ (অর্থাৎ) যোগা-রূঢ়ত্বের সাধন উক্ত হয়। যেমন যেমন কর্ম্ম হইতে উপরত হয়, সেই প্রকারে নিরাকুল ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির চিত্ত সমাহিত হয়, এইরূপ হইলে সে শীঘ্র যোগা-রূঢ় হইয়া থাকে, ব্যাসও এই প্রকারই বলিয়াছেন যে একত্বপ্রত্যয়, সমতা,

সত্যব্যবহার, শীল, স্থৈর্য্য, অহিংসা, সারল্য এবং ক্রমে ক্রমে ক্রিয়ানিচয় হইতে উপরতি, এই কয়টীর ন্যায় ব্রাহ্মণের পক্ষে অন্য কোন ধন নাই॥ ৩॥

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে॥ ৪॥

অন্বয়।—যদা সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী ইন্দ্রিয়ার্থেষু কর্ম্মসু ন অনুষজ্জতে তদা যোগারূঢ় উচ্যতে॥ ৪॥

মূলানুবাদ।—যে সময় সর্ব্বপ্রকার সঙ্কল্পের পরিত্যাগকারী (কর্ম্মী) ইন্দ্রিয়ার্থ কর্ম্মসমূহে কর্ত্তব্যত্ব জ্ঞান করে না, সেই সময় সেই ব্যক্তি যোগারূঢ় বলিয়া কথিত হয়॥ ৪॥

ভাষ্য।—অথেদানীং কদা যোগারূঢ়োভবতীত্যুচ্যতে। যদা সমাধীয়মানচিত্তো যোগী হি ইন্দ্রিয়ার্থেষু ইন্দ্রিয়াণামর্থাঃ শব্দাদয়স্তেষু ইন্দ্রিয়ার্থেষু কর্ম্মসু চ নিত্য নৈমিত্তিককাম্যপ্রতিষিদ্ধেষু প্রয়োজনাভাববুদ্ধ্যা নানুষজ্জতে অনুষঙ্গং কর্ত্তব্যতাবুদ্ধিং ন করোতি ইত্যর্থঃ সর্ব্বসংকল্পসংন্যাসী সর্ব্বান্ সঙ্কল্পান্ ইহামুত্রার্থকামহেতূন্ সংন্যসিতুং শীলমস্যেতি সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়ঃ প্রাপ্তযোগ ত্যুতং তদা তস্মিন্ কালে উচ্যতে। সর্ব্বসংকল্পসংন্যাসীতি বচনাৎ সর্ব্বাংশ্চ কামান্ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যেদিত্যর্থঃ। সঙ্কল্পমূলা হি সর্ব্বে কামাঃ—

সংকল্পমূলঃ কামোবৈ যজ্ঞাঃ সঙ্কল্পসম্ভবাঃ।
কাম জানামি তে মূলং সংকল্পাত্ত্বং হি জায়সে।
ন ত্বাং সঙ্কল্পয়িষ্যামি তে মে ন ভবিষ্যসি॥

ইত্যাদিস্মৃতেঃ।

সর্ব্বকামপরিত্যাগে চ সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসঃ সিদ্ধোভবতি"স যথাকামো ভবতি তৎ ক্রতুর্ভবতি যত্ক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম্ম কুরুতে।" ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ।

যদ্যদ্ধি কুরুতে কর্ম্ম তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতম্॥

ইত্যাদিস্মৃতিভ্যশ্চ।

ন্যায়াচ্চ নহি সর্ব্বসংকল্পসংন্যাসে কশ্চিৎ স্পন্দিতুমপি শক্তঃ। তস্মাত্ সর্ব্বসংকল্পসন্ন্যাসীতি বচনাৎ সর্ব্বান্ কামান্ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি চ ত্যাজয়তি ভগবান্॥ ৪॥

ভাষ্যানুবাদ।—অনন্তর এইক্ষণে কোন সময়ে যোগারূঢ় হয় তাহাই বলা হইতেছে—যে সময় সমাধীয়মানহৃদয় যোগী, ইন্দ্রিয়ার্থ সমূহে (ইন্দ্রিয়ের অর্থ

(অর্থাৎ) শব্দাদি বিষয়ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া এই দ্বিবিধ পদার্থই ইন্দ্রিয়ার্থ শব্দের দ্বারা এইস্থানে অভিহিত হইতেছে) এবং নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য ও প্রতিষিদ্ধ কর্ম্মসমূহে, নিষ্প্রয়োজনত্ব জ্ঞাননিবন্ধন অনুষক্ত হয় না অর্থাৎ অনুষঙ্গ" কর্ত্তব্যত্ব বোধ করে না। (এবং) "সর্ব্বসঙ্কল্পসংন্যাসী" ঐহিক ও পারত্রিক সকল প্রকার কামের হেতু সংকল্পনিচয়কে পরিত্যাগ করাই যাহার স্বভাব, সেই সর্ব্বসংকল্পসংন্যাসী (এই প্রকার হইলে) সেই সময়ে (ঐ ব্যক্তি) যোগারূঢ় (অর্থাৎ) লব্ধযোগ বলিয়া উক্ত হয়। সর্ব্বসংকল্পসন্ন্যাসী এই বিশেষণটী দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে যে, সকল প্রকার সঙ্কল্প ও সকল কর্ম্মের সন্ন্যাস করিতে হইবে, কারণ সংকল্পই সকল কামের মূল।

"সকল প্রকার কাম সংকল্প হইতে উৎপন্ন হয়। হে কাম, আমি তোমার মূল কারণকে জানি। তুমি সঙ্কল্প হইতে উৎপন্ন হও। তোমাকে আমি আর সংকল্পের বিষয় করিব না, তাহা হইলেই তুমি আমার (হৃদয়ে) উৎপন্ন হইতে পারিবে না।"। এই প্রকারের বাক্য, স্মৃতি শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

সর্ব্বকাম পরিত্যাগ করিলে সর্ব্বকর্ম্মের সংন্যাস সিদ্ধ হয়। "সেই পুরুষ যে প্রকার কামনা করে, সেইরূপ যাগকে সাধনবুদ্ধিতে গ্রহণ করে, যে প্রকার যাগাদি ক্রিয়াকে সাধন বুদ্ধির বিষয় করে, সে সেই প্রকার যাগাদিকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে", এই প্রকার শ্রুতিবাক্য দ্বারাও ইহা প্রমাণ হইতেছে—

"লোক যাহা কিছু কর্ম্ম করে, তাহা সকলই কামেরই বিলাস মাত্র", এই প্রকার স্মৃতিবাক্যও ইহাতে প্রমাণ হইয়া থাকে। যুক্তিবলেও ইহা সিদ্ধ হইতে পারে, কারণ সর্ব্বপ্রকার সংকল্পের সন্ন্যাস হইলে জীব স্পন্দিত হইতেও পারে না। সেই কারণে (স্থির করিতে হইবে যে, যোগারূঢ় ব্যক্তির পক্ষে) সর্ব্ব-সংকল্প-সংন্যাসী এই পদটী উল্লেখ দ্বারা ভগবান্ সকল প্রকার কাম ও সকল প্রকার কর্ম্মের পরিত্যাগ করাইতেছেন ॥ ৪ ॥

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়।—আত্মনা আত্মানং উদ্ধরেৎ। ন আত্মানং অবসাদয়েৎ হি (যতঃ) আত্মা এব আত্মনঃ বন্ধুঃ (তথা আত্মাএব) আত্মনঃ রিপুঃ ॥ ৫ ॥

মূলানুবাদ।—আপনি আপনার উদ্ধার করিবে, আপনাকে অবসন্ন করিবে না, আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মার রিপু হয়॥ ৫॥

ভাষ্য।— যদৈবং যোগারূঢ়স্তদা তেন আত্মা আত্মনা উদ্ধৃতো ভবতি সংসারাদনর্থজাতাৎ অতঃ। উদ্ধরেৎ সংসারসাগরে নিমগ্নমাত্মনাত্মানং তত উৎ উর্দ্ধং হরেদুদ্ধরেৎ। যোগারূঢ়তামাপাদয়েদিত্যর্থঃ। ন আত্মানমবসাদয়েন্নাধো নয়েন্নাধোগময়েৎ। আত্মৈব হি যস্মাৎ আত্মনোবন্ধুঃ। নহ্যন্যঃ কশ্চিদ্বন্ধুর্যঃ সংসারমুক্তয়ে ভবতি। বন্ধুরপিতাবৎ মোক্ষং প্রতি প্রতিকূল এব স্নেহাদি বন্ধনায়তনত্বাত্তস্মাদ্যুক্তমবধারণমাত্মৈব হ্যাত্মনোবন্ধুরিতি। আত্মৈব রিপুঃ শত্রুর্যোহন্যোঽপকারী বাহ্যঃ শত্রুঃ সোঽপ্যাত্মপ্রযুক্ত এবেতি যুক্তমেবাবধারণ-মাত্মৈব রিপুরাত্মন ইতি॥ ৫॥

ভাষ্যানুবাদ।—যে কালে এই প্রকার যোগারূঢ় হইবে, সেই সময় (সাধক) অনর্থসমূহপূর্ণ সংসার হইতে আপনা হইতেই উদ্ধৃত হয়। (ইহাই বলা হইতেছে) সংসারনিমগ্ন আত্মাকে আত্মার সাহায্যেই সেই সংসার হইতে উর্দ্ধে উঠাইবে অর্থাৎ ধ্যানযোগে আরূঢ় করিবে। আত্মাকে অবসন্ন করিবে না অর্থাৎ অধঃপতিত করিবে না, কারণ আত্মাই আত্মার বন্ধু; (লোকপ্রসিদ্ধ) বন্ধু প্রকৃত পক্ষে মোক্ষের প্রতিকূলই হয়, কারণ ঐ বন্ধু স্নেহরূপ সংসারবন্ধনের হেতু। এই জন্য অবধারণ করা হইয়াছে যে, আত্মাই আত্মার বন্ধু (অপর ব্যক্তি বন্ধু) নহে, আত্মাই আত্মার শত্রু, বাহিরের যদি কেহ অপকারী শত্রু হয়, সে আত্ম-ব্যবহারেই শত্রু হয়, এই কারণে (এস্থলেও) অবধারণ করা হইতেছে যে, আত্মাই আত্মার শত্রু (অপর কেহ নহে)॥ ৫॥

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ॥ ৬॥

অন্বয়।—যেন আত্মনা এব আত্মা জিতঃ তস্য আত্মা আত্মনঃ বন্ধুঃ অনাত্মনঃ (অজিতেন্দ্রিয়স্য) আত্মা এব শত্রুবৎ শত্রুত্বে বর্ত্তেত॥ ৬॥

মূলানুবাদ।—যে ব্যক্তি আত্মার বলে দেহাদি জয় করিতে পারিয়াছে, সেই ব্যক্তির আত্মাই আপনার বন্ধু হয়, যে ব্যক্তি অজিতেন্দ্রিয় তাহার আত্মাই শত্রু-বৎ আত্মার অহিতাচরণ করিয়া থাকে॥ ৬॥

ভাষ্য।—আত্মৈব বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মন ইত্যুক্তং তত্র কিং লক্ষণ আত্মানো-বন্ধু কিংলক্ষণোবাত্মনো রিপুরিত্যুচ্যতে। বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য তস্য আত্মনঃ স

আত্মা বন্ধুঃ যেন আত্মনা আত্মৈব জিতঃ আত্মা কার্য্যকারণসঙ্ঘাতঃ যেন বশীকৃতঃ জিতেন্দ্রিয় ইত্যর্থঃ। অনাত্মনস্তু অজিতাত্মনস্তু শত্রুত্বে শত্রুভাবে বর্ত্তেত আত্মৈব শত্রুবদ্ যথা অনাত্মা শত্রুরাত্মনোঽপকারী তথা আত্মা আত্মনোঽপকারে বর্ত্তেত ইত্যর্থঃ॥ ৬॥

ভাষ্যানুবাদ। আত্মাই আত্মার বন্ধু ও শত্রু ইহা বলা হইয়াছে। কিরূপ আত্মা আত্মার বন্ধু এবং কিরূপে আত্মাইবা আত্মার শত্রু হয়, তাহাই বলা হইতেছে। সেই আত্মাই আত্মার বন্ধু, যে আত্মার দ্বারা আত্মা জিত অর্থাৎ বশীকৃত হইয়াছে, এই স্থলে আত্মা এই শব্দটীর অর্থ দেহ ও ইন্দ্রিয় সমূহ। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির আত্মাই আত্মার বন্ধু (ইহাই তাৎপর্য্য); অনাত্মা (অর্থাৎ) অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির আত্মাই শত্রুর ন্যায় শত্রুভাব (অর্থাৎ) অপকার করিতে প্রবৃত্ত হয়। অজিতেন্দ্রিয় আত্মা আপনিই আপনার অপকার করিয়া থাকে ইহাই অর্থ॥ ৬॥

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ॥ ৭॥

অন্বয়।—জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য (সংন্যাসিনঃ) শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ পরমাত্মা সমাহিতঃ (সাক্ষাদাত্মভাবেন প্রকাশিতঃ) ভবতি॥ ৭॥

মূলানুবাদ।—দেহ ও ইন্দ্রিয় সকলকে যে জয় করিতে পারিয়াছে ও যাহার অন্তঃকরণ প্রসন্ন, সেই সন্ন্যাসীর শীত উষ্ণ ও তজ্জনিত সুখ ও দুঃখ সম্পর্কে এবং মান বা অপমানেও পরমাত্মা সাক্ষাৎ আত্মভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকেন॥ ৭॥

ভাষ্য।—জিতাত্মন ইতি। জিতাত্মনঃ কার্য্যকারণাদিসঙ্ঘাত আত্মা জিতো যেন স জিতাত্মা তস্য জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য প্রসন্নান্তঃকরণস্য সতঃ সংন্যাসিনঃ পরমাত্মা সমাহিতঃ সাক্ষাদাত্মভাবেন বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। কিংচ শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানে চ অপমানে চ মানাপমানয়োঃ পূজাপরিভবয়োঃ॥ ৭॥

ভাষ্যানুবাদ।—জিতাত্মন ইত্যাদি (শ্লোকের অর্থ) "জিতাত্মা" দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির সমষ্টিরূপ আত্মা জিত হইয়াছে যৎকর্ত্তৃক, সেই জিতাত্মা "প্রশান্ত" প্রসন্নচিত্ত, জিতাত্মা ও প্রসন্নচিত্ত হইলে সংন্যাসীর পরমাত্মা সমাহিত (হয়) অর্থাৎ সাক্ষাৎ আত্মভাবে প্রকাশ পায়, শীত উষ্ণ (ও তজ্জনিত) সুখ দুঃখ সমূহে এবং মানে বা অপমানে (সকল অবস্থাতেই পরমাত্মা সমাহিত হয়); মান ও অপমান শব্দের অর্থ পূজা ও পরিভব॥ ৭॥

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থোবিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়।—জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থঃ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনো- যোগী যুক্তঃ (সমাহিতঃ) ইতি উচ্যতে ॥ ৮ ॥

মূলানুবাদ।—জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দ্বারা যাহার আত্মা তৃপ্ত, যে কূটস্থ (অপ্রকম্পিত) যাহার ইন্দ্রিয়নিচয় বশীকৃত, লোষ্ট প্রস্তর ও কাঞ্চনে যাহার সমতাবুদ্ধি হইয়াছে, সেই যোগীই যুক্ত (অর্থাৎ সমাহিত) বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় ॥ ৮ ॥

ভাষ্য।—জ্ঞানেতি! জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা জ্ঞানং শাস্ত্রোক্তপদার্থানাং পরিজ্ঞানং বিজ্ঞানং তু শাস্ত্রতো জ্ঞাতানাং তথৈব স্বানুভবকরণং। তাভ্যাং জ্ঞানবিজ্ঞানাভ্যাং তৃপ্তঃ সংজাতালং প্রত্যয়ঃ আত্মা অন্তঃকরণং যস্য স জ্ঞান- বিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থোঽপ্রকম্পো ভবতীত্যর্থঃ। বিজিতেন্দ্রিয়শ্চ। য ঈদৃশঃ যুক্তঃ সমাহিত ইতি স উচ্যতে কথ্যতে। স যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ লোষ্টাশ্মকাঞ্চনানি সমানি যস্য সঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—জ্ঞান ইত্যাদি (শ্লোকের অর্থ) "জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা", জ্ঞান (শব্দের অর্থ) শাস্ত্রীয় বিষয় সমূহের পরিজ্ঞান; বিজ্ঞান (শব্দের অর্থ) শাস্ত্রের দ্বারা পরিজ্ঞাত সেই, পদার্থ সমূহের সেই ভাবে নিজের অনুভবের বিষয়ীকরণ, এই প্রকার জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দ্বারা যাহার আত্ম. (অর্থাৎ অন্তঃকরণ) তৃপ্ত হই- য়াছে (অর্থাৎ) অন্য সকল বস্তুর প্রতি অপেক্ষণীয়তা নাই, এই প্রকার বুদ্ধি যুক্ত হইয়াছে, সেহ জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা (এই শব্দের দ্বারা অভিহিত হইতেছে)। এবং "কূটস্থ" অপ্রকম্প হয়। বিজিতেন্দ্রিয়, যেব্যক্তি ঈদৃশ হয়, সেই যুক্ত (অর্থাৎ) সমাহিত উক্ত হইয়া থাকে। সেই যোগী "সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চন" লোষ্ট (ঢেলা) অশ্ম (প্রস্তর) কাঞ্চন (স্বর্ণ) এই তিনটী বস্তুই যাহার সমান [illegible] সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চন ॥ ৮ ॥
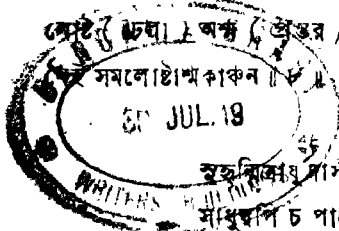
সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥ ৯ ॥

অন্বয়।—সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীন মধ্যস্থ দ্বেষ্যবন্ধুষু সাধুষু অপি চ পাপেষু সমবুদ্ধিঃ (যোগী) বিশিষ্যতে (সর্ব্বোৎকৃষ্টোভবতীত্যর্থঃ) ॥ ৯ ॥

মূলানুবাদ।—সুহৃৎ, মিত্র, অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য, বন্ধু, সাধু ও

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। *

[শ্রীম——কথিত।]

শ্রীশ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণের সহিত শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার সরকার, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ ইত্যাদির কথোপকথন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[গৃহস্থাশ্রম কথাপ্রসঙ্গে।]
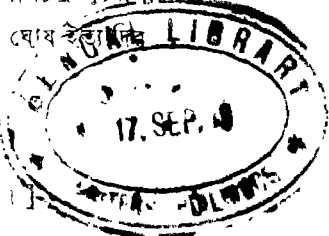
আশ্বিন মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশী তিথি। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিন দিন ধরিয়া মহামায়ার পূজা মহোৎসব হইয়া গিয়াছে। দশমীতে বিজয়া ও তদুপলক্ষে পরস্পরের প্রেমালিঙ্গন ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে কলিকাতার অন্তর্বর্ত্তী শ্যামপুকুর নামক পল্লীতে বাস করিতেছেন। শরীরে কঠিন ব্যাধি, গলায় ক্যান্সার। চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন। বলরামের বাড়ীতে যখন ছিলেন, কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ দেখিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে পরমহংসদেব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এ রোগ সাধ্য, না অসাধ্য। কবিরাজ এ প্রশ্নের উত্তর দেন নাই, চুপ করিয়া ছিলেন। ইংরাজী ডাক্তারেরাও রোগটী অসাধ্য, এ কথা ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে ডাক্তার সরকার চিকিৎসা করিতেছেন।

আজ বৃহস্পতিবার, ২২শে অক্টোবর, ১৮৮৫ সাল। শ্যামপুকুরস্থিত একটী দ্বিতল গৃহমধ্যে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ, একটী দুতলাঘরের মধ্যে শয্যা রচনা হইয়াছে, তাহাতে উপবিষ্ট। ডাক্তার সরকার, শ্রীযুত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও ভক্তেরা সম্মুখে এবং চারিদিকে সমাসীন। ঈশান বড় দাতা, পেন্সন লইয়াও দান করেন, ঋণ করিয়া দান করেন, আর সর্ব্বদাই ঈশ্বর চিন্তায় থাকেন। পীড়া শুনিয়া তিনি দেখিতে আসিয়াছেন। ডাক্তার সরকার চিকিৎসা করিতে আসিয়া ৬। ৭ ঘণ্টা করিয়া থাকেন—ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণকে সাতিশয় ভক্তিশ্রদ্ধা করেন, ও ভক্তদের সহিত পরম আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করেন।

রাত্রি প্রায় ৭টা। বাহিরে জ্যোৎস্না—পূর্ণাবয়ব নিশানাথ যেন চারিদিকে সুধা ঢালিয়াছেন। ভিতরে দীপালোক। ঘরে অনেক লোক, অনেকে

---

* প্রথম ভাগ ছাপা হইতেছে।

মহাপুরুষ দর্শন করিতে আসিয়াছেন। সকলেই এক দৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন,—শুনিবেন, তিনি কি বলেন। দেখিবেন, তিনি কি করেন। ঈশানকে দেখিয়া পরমহংসদেব বলিতে লাগিলেন,—

(নির্লিপ্ত সংসারী)

"যে সংসারী ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি রেখে সংসার করে, সে ধন্য, সে বীরপুরুষ। যেমন কারুর মাথায় দু মন বোঝা আছে, আর বর যাচ্ছে, মাথায় বোঝা, তবুও সে দেখ্‌ছে। খুব শক্তি না থাকলে হয় না।

"যেমন পাঁকাল মাছ পাঁকে থাকে, কিন্তু গায়ে একটুও পাঁক নাই। পানকৌটি জলে সর্ব্বদা ডুব মারে কিন্তু পাখা একবার ঝাড়া দিলেই, আর গায়ে জল থাকে না।

(নির্লিপ্ত হ'বার উপায়)

"কিন্তু সংসারে নির্লিপ্তভাবে থাক্‌তে গেলে, কিছু সাধন করা চাই। দিন কতক নির্জ্জনে থাকা দরকার, তা এক বছর হোক, ছ মাস হোক, তিন মাস হোক, বা এক মাস হোক। সেই নির্জ্জনে ঈশ্বর চিন্তা কর্‌তে হয়, সর্ব্বদা তাঁহাকে ব্যাকুল হয়ে, ভক্তির জন্য প্রার্থনা করতে হয়। আর মনে মনে বল্‌তে হয়, 'আমার এ সংসারে কেউ নাই, যাদের আপনার বলি, তারা দু দিনের জন্য, ভগবান্ আমার একমাত্র আপনার লোক, তিনিই আমার সর্ব্বস্ব, হায়! কেমন করে তাঁরে পাব।'

"ভক্তিলাভের পর সংসার করা যায়। যেমন হাতে তেল মেখে কাঁটাল ভাঙ্গলে, হাতে আর আটা লাগে না।

"সংসার জলের স্বরূপ, আর মানুষের মনটী যেন দুধ। জলে যদি দুধ রাখতে যাও, দুধে জলে এক হয়ে যাবে। তাই নির্জ্জন স্থানে দই পাততে হয়। দই পেতে মাখম তুল্‌তে হয়। মাখম তুলে যদি জলে রাখ, তা'হলে জলে মিশবে না, নির্লিপ্ত হয়ে ভাস্‌তে থাক্‌বে।

"ব্রহ্মজ্ঞানীরা আমায় বলেছিল, মহাশয় আমাদের জনক রাজার মত। তাঁর মতন নির্লিপ্তভাবে আমরা সংসার করবো। আমি বল্লুম, নির্লিপ্তভাবে সংসার করা বড় কঠিন, মুখে বল্লেই জনক রাজা হওয়া যায় না।

"জনক রাজা হেটমুণ্ড হয়ে, ঊর্দ্ধ পদ করে কত তপস্যা করেছিলেন। তোমাদের হেটমুণ্ড বা ঊর্দ্ধপদ হতে হবে না, কিন্তু সাধন চাই, নির্জ্জনে বাস

চাই। নির্জ্জনে জ্ঞানলাভ, ভক্তিলাভ করে, তবে গিয়ে সংসার করতে হয়। দই নির্জ্জনে পাত্‌তে হয়। ঠেলাঠেলি নাড়ানাড়ি করলে দই বসে না।

"জনক নির্লিপ্ত বলে তাঁর একটী নাম বিদেহ—কি না দেহে দেহবুদ্ধি নাই। সংসারে থেকেও জীবন্মুক্ত হয়ে বেড়াতেন। কিন্তু দেহবুদ্ধি যাওয়া অনেক দূরের কথা। খুব সাধন চাই।

"জনক ভারী বীরপুরুষ। দুখানা তলোয়ার ঘুরুতেন। একখানা জ্ঞান, একখানা কর্ম্ম।

(সংসার আশ্রমের জ্ঞান ও সন্ন্যাস আশ্রমের জ্ঞান)

"যদি বল, সংসার আশ্রমের জ্ঞানী, আর সন্ন্যাস আশ্রমের জ্ঞানী, এ দুয়ের তফাৎ আছে কি না। তার উত্তর এই যে, দুই-ই এক জিনিষ। এটীও জ্ঞান, উটীও জ্ঞান—এক জিনিষ। তবে সংসারে জ্ঞানীরও ভয় আছে। কামিনী কাঞ্চনের ভিতর থাকৃতে গেলেই একটু না একটু ভয় আছে। কাজলের ঘরে থাকৃতে গেলে যত সিয়ানাই হও না কেন, কাল দাগ একটু না একটু গায়ে লাগ্‌বে।

"মাখম তুলে যদি নূতন হাঁড়িতে রাখ, তা হলে মাখম নষ্ট হবার কোনও সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু যদি ঘোলের হাঁড়িতে রাখ, তা হলে সন্দেহ হয়।

"খই যখন ভাজা হয়, দু চারটে খই খোলা থেকে টপ্‌ টপ্‌ করে লাফিয়ে পড়ে। সেগুলি যেন মল্লিকা ফুলের মত, গায়ে একটুও দাগ থাকে না। খোলার উপর যে সব খই থাকে, সেও বেশ খই, তবে অত ফুলের মত হয় না, একটু গায়ে দাগ থাকে। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী যদি জ্ঞানলাভ করেন, তবে ঠিক এই মল্লিকে ফুলের মতন দাগশূন্য হয়। আর জ্ঞানের পর সংসার খোলায় থাকলে, একটু গায়ে লাল্‌চে দাগ হতে পারে। জনকরাজার সভায় এক ভৈরবী এসেছিল। স্ত্রীলোক দেখে জনকরাজা হেঁটমুখ হয়ে, চোখ নীচু করেছিলেন। ভৈরবী তাই দেখে বলেছিলেন, হে জনক! তোমার এখন স্ত্রীলোক দেখে ভয়! পূর্ণজ্ঞান হলে পাঁচ বছরের ছেলের স্বভাব হয়—তখন স্ত্রীপুরুষ বলে ভেদ বুদ্ধি থাকে না।

"যাই হোক, যদিও সংসারের জ্ঞানীর গায়ে দাগ থাকতে পারে, সে দাগে কোনও ক্ষতি হয় না। চন্দ্রে কলঙ্ক আছে বটে, কিন্তু আলোর ব্যাঘাত হয় না।

(জ্ঞানের পর কর্ম্ম লোকসংগ্রহার্থ)

"কেউ কেউ জ্ঞানলাভের পর লোকশিক্ষার জন্য কর্ম্ম করে, যেমন জনক ও

নারদাদি। লোক-শিক্ষার জন্য শক্তি থাকা চাই। ঋষিরা নিজের নিজের জ্ঞানের জন্য ব্যস্ত ছিলেন। নারদাদি আচার্য্য লোকের হিতের জন্য বিচরণ করে বেড়াতেন ; তাঁরা বীর পুরুষ।

"হাবাতে কাঠ যখন ভেসে যায়, একটী পাখী বসলে ডুবে যায় ; কিন্তু বাহাদুরি কাঠ যখন ভেসে যায়, তখন গরু, মানুষ, এমন কি, হাতী পর্য্যন্ত তার উপর যেতে পারে। Steam boat আপনি ও পারে যায়, আবার কত মানুষকে পার করে দেয়।

"নারদাদি আচার্য্য ওই বাহাদুরি কাঠের মত, ওই steam-boatএর মত।

"কেউ আম খেয়ে গামছা দিয়ে মুখ পুঁচে বসে থাকে, পাছে কেউ টের পায়। আবার কেউ কেউ একটী আম পেলে, কেটে একটু একটু সকলকে দেয়, আর আপনিও খাও।

"নারদাদি আচার্য্য সকলের মঙ্গলের জন্য জ্ঞানলাভের পরও ভক্তি নিয়ে ছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[ভক্তিযোগ—যুগধর্ম্ম কথা প্রসঙ্গে]

জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ।

ডাক্তার। জ্ঞানে মানুষ অবাক্ হয়, চক্ষু বুজে যায়, আর চক্ষে জল আসে ; তখন ভক্তির দরকার হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ভক্তি মেয়ে মানুষ, তাই অন্তঃপুর পর্য্যন্ত যেতে পারে। জ্ঞান বারবাড়ী পর্য্যন্ত যায়।

ডাক্তার। কিন্তু অন্তঃপুরে যাকে তাকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। বেশ্যারা ঢুকতে পারে না। জ্ঞান চাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঠিক পথ জানে না, কিন্তু ঈশ্বরে ভক্তি আছে, তাঁকে জানবার ইচ্ছা আছে, এরূপ লোক কেবল ভক্তির জোরে ঈশ্বর লাভ করে। একজন ভারি ভক্ত জগন্নাথ দর্শন করতে বেরিয়েছিল, পুরীর কোন্ পথ সে জানতো না, দক্ষিণ দিকে না গিয়ে পশ্চিম দিকে গিছিল। পথ ভুলেছিল বটে, কিন্তু ব্যাকুল হয়ে লোকদের জিজ্ঞাসা করতো। তারা বলে দিলে, 'এ পথ নয়, ঐ পথে যাও।' ভক্তটী শেষে পুরীতে গিয়ে জগন্নাথ দর্শন করলে। না জানলেও কেউ না কেউ বলে দেয়।

ডাক্তার। সে ভুলে তো গিছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, তা হয় বটে, কিন্তু শেষে পায়।

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, ঈশ্বর সাকার না নিরাকার।

(ঈশ্বর সাকার না নিরাকার)

শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি সাকার, আবার নিরাকার। একজন সন্ন্যাসী জগন্নাথ দর্শন করতে গিছিল। জগন্নাথ দর্শন করে সন্দেহ হল, ঈশ্বর সাকার, না নিরাকার। হাতে দণ্ড ছিল, সেই দণ্ড দিয়ে, দেখ্‌তে লাগ্‌ল—জগন্নাথের গায়ে ঠাকে কিনা। একবার এধার থেকে ওধারে দণ্ডটী নিয়ে যাবার সময় দেখলে যে, জগন্নাথের গায়ে ঠেক্‌লো না—যেন সেখানে ঠাকুরের মূর্ত্তি নাই। পুনর্ব্বার দণ্ড এধার থেকে ওধারে নিয়ে যাবার সময় বিগ্রহের গায়ে ঠেকল। তখন সন্ন্যাসী বুঝ্‌ল, যে ঈশ্বর সাকার, আবার নিরাকার। কিন্তু এটী ধারণা করা বড় শক্ত। 'যিনি নিরাকার, তিনি আবার সাকার কিরূপে হবেন?' এ সন্দেহ মনে উঠে। আবার সাকার যদি হন, তো এত নানারূপ কেন?

ডাক্তার। যিনি আকার করেছেন, তিনি সাকার। তিনি আবার মন করেচেন, তাই তিনি নিরাকার; তিনি সবই হতে পারেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বরকে লাভ না করতে পারলে, এ সব বুঝা যায় না। সাধকের জন্য তিনি নানাভাবে নানারূপে দেখা দেন।

"একজনের এক গামলা রঙ্‌ ছিল। অনেকে তার কাছে কাপড় রঙ্‌ কর্‌তে আস্‌তো। সে লোকটী জিজ্ঞাসা করতো, 'তুমি কি রঙে ছোপাতে চাও'। একজন হয়তো বল্লে, 'আমি লাল রঙে ছোপাতে চাই?' অমনি সেই লোকটী গামলার রঙে সেই কাপড় খানি ছুপিয়ে বলতো, 'এই নাও তোমার লাল রঙে ছোপান কাপড়।' আর একজন হয়তো বল্লে, 'আমার হল্‌দে রঙে ছোপান চাই।' অমনি সেই লোকটী সেই গামলায় কাপড় খানি ডুবিয়ে বলতো, 'এই নাও তোমার হল্‌দে রঙ।' নীলরঙে ছোপাতে চাইলে, আবার সেই একই গামলায় ডুবিয়ে সেই কথা, 'এই নাও তোমার নীলরঙে ছোপান কাপড়।' এই রকমে যে, যে রঙে ছোপাতে চাইতো, তার কাপড় সেই রঙে সেই একই গামলা হতে ছোপান হ'ত। একজন লোক এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখ্‌ছিল। যার গামলা, সে জিজ্ঞাসা করলে, 'কেমন হে! তোমার কি রঙে ছোপাতে হবে?' তখন সে বললে, 'ভাই! তুমি যে রঙে রঙেছ, আমায় সেই রঙ দাও।' (সকলের হাস্য)

"একজন বাহ্যে গিছিল—দেখলে, গাছের উপর একটী সুন্দর জানোয়ার রয়েছে। সে এসে আর একজনকে বল্লে, 'ভাই! অমুখ গাছে আমি একটী লালরঙের জানোয়ার দেখে এলুম।' সে লোকটী বললে, 'আমিও দেখে এসেছি, তা সে লাল রঙ হতে যাবে কেন, সে যে সবুজ রঙ।' আর একজন বললে, 'না না, সে সবুজ হতে যাবে কেন, সে যে হল্‌দে।' এইরূপে আরও কেউ কেউ বললে বেগুনি, নীল, কাল ইত্যাদি। শেষে ঝগড়া। তখন তারা গাছতলায় গিয়ে দেখে, একজন লোক বসে আছে। তাকে জিজ্ঞাসা করায়, সে বললে, 'আমি এই গাছতলায় থাকি, আমি সে জানোয়ারটীকে বেশ জানি। তোমরা যা যা বলছো, সব সত্য, সে কখন লাল, কখন সবুজ, কখন নীল কখন হলদে, আরও সব কত কি হয়। কখন দেখি, কোন রঙই নাই।'

"যে ব্যক্তি সদাসর্ব্বদা ঈশ্বর চিন্তা করে, সেই জানতে পারে, তাঁর স্বরূপ কি? সে ব্যক্তিই জানে যে, ঈশ্বর নানারূপে দেখা দেন। নানাভাবে দেখা দেন। তিনি সগুণ, আবার নির্গুণ (The Absolute)। যে গাছতলায় থাকে, সেই জানে যে, বহুরূপীর নানারঙ, আবার কখন কখন কোন রঙ্গই থাকে না। অন্য লোকে কেবল তর্ক ঝগড়া করে কষ্ট পায়। তিনি সাকার, তিনি নিরাকার। কি রকম জান? যেন সচ্চিদানন্দ সমুদ্র, কুল কিনারা নাই। ভক্তি হিমে এই সমুদ্রের স্থানে স্থানে জল বরফ হয়ে যায়, যেন জল বরফ আকারে জমাট বাঁধে, অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি ব্যক্ত Personal God হয়ে, কখন কখন সাকার রূপ হয়ে দেখা দেন। আবার জ্ঞানসূর্য্য উঠলে সে বরফ গলে যায়।"

ডাক্তার। সূর্য্য উঠলে বরফ গলে জল হয়, আবার জানেন, জল আবার নিরাকার বাষ্প হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ। অর্থাৎ 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' এই বিচারের পর সমাধি হলে রূপ টুপ উড়ে যায়। তখন আর ঈশ্বরকে ব্যক্ত (Personal God) বলে বোধ হয় না। কি তিনি, মুখে বলা যায় না। কে বলবে? যিনি বলবেন, তিনিই নাই। তিনি তাঁর আমি আর খুঁজে পান না। তখন ব্রহ্ম নির্গুণ (The Absolute)। তখন তিনি কেবল বোধে বোধ হন। মন, বুদ্ধি দ্বারা তাঁকে ধরা যায় না (The unknown and the unknowable)।

"তাই বলে ভক্তি চন্দ্র, জ্ঞান সূর্য্য। শুনেছি, খুব উত্তরে আর দক্ষিণে

সমুদ্র আছে। এত ঠাণ্ডা যে, জল মাঝে মাঝে বরফের চাই হয়। জাহাজ চলে না। সেখানে গিয়ে আটকে যায়।

ডাক্তার। ভক্তিপথে মানুষ আটকে যায় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, তা যায় বটে, কিন্তু তাতে হানি হয় না, কেন না, সেই সচ্চিদানন্দ সাগরের জলই জমে বরফ হয়েছে। যদি আরও বিচার করতে চাও, যদি 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' এই বিচার কর, তাতেও ক্ষতি নাই, জ্ঞান-সূর্য্যে বরফ গলে যাবে—তবে সেই সচ্চিদানন্দ সাগরই রইল।

(কাঁচা আমি ও পাকা আমি, ভক্তের আমি)

"জ্ঞানবিচারের শেষে সমাধি হলে, আমি টামি কিছু থাকে না। কিন্তু সমাধি হওয়া বড় কঠিন। 'আমি' কোন মতে যেতে চায় না। আর যেতে চায় না বলে, ফিরে ফিরে এই সংসারে আসতে হয়। "গরু হাম্বা হাম্বা (আমি, আমি) করে, তাই এত দুঃখ। সমস্ত দিন লাঙ্গল দিতে হয়—গ্রীষ্ম নাই, বর্ষা নাই। কিম্বা কসাইয়ে কাটে। তাতেও নিস্তার নাই। চামারে চামড়া করে, জুতো তৈয়ার করে। অবশেষ নাড়ী ভুঁড়ী থেকে তাঁত হয়। ধুনুরির হাতে পড়ে যখন তুঁহুঁ তুঁহুঁ (তুমি তুমি) করে, তখন গরুর নিস্তার হয়।

"যখন জীব বলে, 'নাহং', 'নাহং' 'আমি কেহ নই, আমি কর্ত্তা নই, হে ঈশ্বর ! তুমি কর্ত্তা, আমি দাস, তুমি প্রভু', তখন নিস্তার, তখনই মুক্তি।"

ডাক্তার। কিন্তু ধুনুরির হাতে পড়া চাই। (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ। যদি একান্ত 'আমি' না যায়, তবে থাক্ শালা 'দাস আমি' হয়ে। (সকলের হাস্য)

"সমাধির পর কাহারও কাহারও আমি থাকে,—দাস আমি, ভক্তের আমি। শঙ্করাচার্য্য বিদ্যার 'আমি' লোক শিক্ষার জন্য রেখে দিছিলেন।

"দাস আমি,' 'বিদ্যার আমি,' 'ভক্তের আমি,' এরই নাম 'পাকা আমি,'। 'কাঁচা আমি' কি জান ? আমি কর্ত্তা, আমি এত বড় লোকের ছেলে, আমি বিদ্বান্, আমি ধনবান্, আমাকে এমন কথা বলে ? এই সব ভাব। যদি কেউ বাড়ীতে চুরি করে, তাকে যদি ধরতে পারে, তাহলে প্রথমে জিনিষ পত্র কেড়ে নেয়, তার পর উত্তম মধ্যম মারে, তারপর পুলিশে দেয়। বলে, 'কি ! জানে না, কার চুরি করেছে।'

(বালকের আমি)

"ঈশ্বর লাভ হলে পাঁচ বছরের বালকের স্বভাব হয়, 'বালকের আমি'ও

'পাকা আমি।' বালক কোন গুণের বশ নয়। ত্রিগুণাতীত। সত্ত্ব. রজঃ, তমঃ কোন গুণের বশ নয়। দেখ, ছেলে তমোগুণের বশ নয়। এই মাত্র ঝগড়া মারামারি করলে, আবার তৎক্ষণাৎ তারই গলা ধরে কত ভাব, কত খেলা। আবার রজোগুণেরও বশ নয়। এই খেলা-ঘর পাতলে, কত বন্দোবস্ত, আবার কিছুক্ষণ পরেই সব পড়ে রইলো। মার কাছে ছুটেছে। হয়ত একখানি সুন্দর কাপড় পরে বেড়াচ্চে। খানিকক্ষণ পরে কাপড় খুলে পড়ে গেছে। হয় কাপড়ের কথা একেবারে ভুলে গেল—নয়, বগলদাবায় করে বেড়াচ্চে। যদি ছেলেটীকে বল, 'বেশ কাপড় খানি, কার কাপড় রে?' সে বলে, 'আমার কাপড়, আমার বাবা দিয়েচে।' যদি বল, 'লক্ষ্মী ছেলে, আমায় কাপড় খানি দাও না।' সে বলে, 'না, আমার কাপড়, আমার বাবা দিয়েছে, না, আমি দোব না।' তারপর ভুলিয়ে একটী পুঁতুল, কি একটী বাঁশি যদি হাতে দাও, তা হলে পাঁচ টাকা দামের কাপড় খানি তোমায় দিয়ে চলে যাবে। আবার পাঁচ বছরের ছেলের সত্ত্বগুণেরও আঁট নাই। এই পাড়ার খেলুড়েদের সঙ্গে কত ভালবাসা, একদণ্ড না দেখলে থাকতে পারে না। কিন্তু বাপ মার সঙ্গে যখন অন্য জায়গায় চলে গেল, তখন নূতন খেলুড়ে হ'ল। তাদের উপর তখন সব ভালবাসা পড়লো। পুরাণো খেলুড়েদের এক রকম একেবারে ভুলে গেল। তারপর জাত অভিমান নাই। মা বলে দিয়েছে, 'ও তোর দাদা হয়,' তা সে ষোল আনা জানে যে, এ আমার ঠিক দাদা। তা একজন যদি বামুনের ছেলে হয়, আর একজন যদি কামারের ছেলে হয়, তো একপাতে বসে ভাত খাবে। আর শুচি অশুচি নাই, হেগো পোঁদে খাবে। আবার লোক লজ্জা নাই, ছোঁচাবার পর যাকে তাকে পেছন ফিরে বলে, 'দেখ দেখি, আমার ছোঁচান হয়েছে কিনা?'

"আবার 'বুড়োর আমি' আছে (ডাক্তারের হাস্য)। বুড়োর অনেক গুলি পাশ। জাতি অভিমান, লজ্জা, ঘৃণা, ভয় ইত্যাদি। বিষয় বুদ্ধি, পাটোয়ারি, কপটতা। যদি কারুর উপর আক্রোশ হয়, তো সহজে যায় না, হয়তো যতদিন বাঁচে, ততদিন যায় না। তারপর পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার; এই সব 'বুড়োর আমি' কাঁচা আমি।

(জ্ঞান কাহাদের হয় না)

শ্রীরামকৃষ্ণ। ৪।৫ জনের জ্ঞান হয় না। যার বিদ্যের অহঙ্কার, যার পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, যার ধনের অহঙ্কার, তার জ্ঞান হয় না। এসব লোককে

যদি বলা যায় যে, অমুখ জায়গায় বেশ একটী সাধু আছে, দেখ্‌তে যাবে? অমনি নানা ওজর করে বলে, যাব না। আর মনে মনে বলে, আমি এত বড় লোক, আমি যাব?

(সত্ত্বগুণ ও ঈশ্বরলাভ ; ইন্দ্রিয় সংযমের উপায়)

"তমোগুণের স্বভাব অহঙ্কার। অহঙ্কার অজ্ঞান থেকে হয়, তমোগুণ থেকে হয়।

"পুরাণে আছে, রাবণের রজোগুণ, কুম্ভকর্ণের তমোগুণ, বিভীষণের সত্ত্বগুণ। বিভীষণ রামচন্দ্রকে লাভ করেছিলেন। তমোগুণের আর একটী লক্ষণ—ক্রোধ। ক্রোধে দিক্ বিদিক্ জ্ঞান থাকে না। হনুমান লঙ্কা পুড়ালেন, এ জ্ঞান নাই যে, সীতার কুটীর নষ্ট হবে।

"আবার তমোগুণের আর একটী লক্ষণ—কাম। পাথুরেঘাটার গিরীন্দ্র ঘোষ বলেছিল, কাম ক্রোধাদি রিপু এরাতো যাবেনা, এদের মোড় ফিরিয়ে দাও। ঈশ্বরের কামনা কর। সচ্চিদানন্দের সহিত রমণ কর। আর ক্রোধ যদি না যায়, তবে ভক্তির তমঃ আন। কি! আমি দুর্গানাম করেছি, উদ্ধার হ'ব না। আমার আবার পাপ কি? আমার আবার বন্ধন কি? তারপর ঈশ্বর লাভ করবার লোভ কর। ঈশ্বরের রূপে মুগ্ধ হও। আমি ঈশ্বরের দাস, আমি ঈশ্বরের ছেলে, যদি অহঙ্কার করতে হয়, তো এই অহঙ্কার কর। এই রকমে ছয় রিপুর মোড় ফিরিয়ে দিতে হয়।

ডাক্তার। ইন্দ্রিয় সংযম করা বড় শক্ত। ঘোড়ার চক্ষের দুদিকে ঠুলি দাও। কোন কোন ঘোড়ার চক্ষু একেবারে বন্ধ করিতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর যদি একবার কৃপা হয়, ঈশ্বরের যদি একবার দর্শন লাভ হয়, আত্মার যদি একবার সাক্ষাৎকার হয়, তা হলে আর কোন ভয় নাই—তখন ছয়রিপু আর কিছু করতে পারবে না।

"নারদ, প্রহ্লাদ এই সব নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষদের অত করে চক্ষের দুদিকে ঠুলি দিতে হয় না। যে ছেলে নিজে বাপের হাত ধরে মাঠের আলপথে চল্‌ছে, সে ছেলে বরং অনবধান হয়ে বাপের হাত ছেড়ে দিয়ে খানায় পড়্‌তে পারে। কিন্তু বাপ যে ছেলের হাত ধরে, সে কখনও খানায় পড়ে না।

ডাক্তার। কিন্তু বাপ ছেলের হাত ধরা ভাল নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তা নয়। মহাপুরুষদের বালকস্বভাব। ঈশ্বরের কাছে

তাহারা সর্ব্বদাই বালক। তাঁদের অহঙ্কার থাকে না। তাঁদের সবশক্তি ঈশ্বরের শক্তি, বাপের শক্তি, নিজের কিছুই নয়।

(বিচারপথ ও আনন্দপথ ; জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ)

ডাক্তার। আগে ঘোড়ার চক্ষের দুদিকে ঠুলি না দিলে, ঘোড়া কি এগুতে চায় ? রিপু বশ না হলে, কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুমি যা বলচো, ওকে বিচার-পথ বলে—জ্ঞানযোগ বলে। ও পথেও ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। জ্ঞানীরা বলে, আগে চিত্তশুদ্ধি হওয়া দরকার। আগে সাধন চাই, তবে জ্ঞান হবে।

"আবার ভক্তিপথেও তাঁহাকে পাওয়া যায়। যদি ঈশ্বরের পাদ-পদ্মে একবার ভক্তি হয়, যদি তাঁর নামগুণ গান কর্‌তে ভাল লাগে, তাহলে ইন্দ্রিয় সংযম আর চেষ্টা করে কর্‌তে হয় না। রিপু বশ আপনা আপনি হয়ে যায়।

"যদি কাহারও পুত্র শোক হয়, সে দিন সে কি আর লোকের সঙ্গে ঝগড়া কর্‌তে পারে, না নিমন্ত্রণে গিয়ে খেতে পারে ? সে কি লোকের সাম্‌নে অহঙ্কার করে বেড়াতে পারে, না সুখ সম্ভোগ কর্‌তে পারে ? বাদুলে পোকা যদি একবার আলো দেখ্‌তে পায়, তা হ'লে কি সে আর অন্ধকারে থাকে ?

ডাক্তার। তা পুড়েই মরুক সেও স্বীকার।

শ্রীরামকৃষ্ণ। নাগো, ভক্ত কিন্তু বাদুলে পোকার মত পুড়ে মরে না। ভক্ত যে আলো দেখে ছুটে যায়, সে যে মণির আলো। মণির আলো খুব উজ্জ্বল বটে, কিন্তু স্নিগ্ধ আর শীতল, এ আলোতে গা পুড়ে না, এ আলোতে শান্তি হয়, আনন্দ হয়।

(জ্ঞানযোগ বড় কঠিন)

"বিচারপথে, জ্ঞানযোগের পথে, তাঁহাকে পাওয়া যায়। কিন্তু এ পথ বড় কঠিন। আমি শরীর নই, মন নই, বুদ্ধি নই, আমার রোগ নাই, শোক নাই, অশান্তি নাই, আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ, আমি সুখদুঃখের অতীত, আমি ইন্দ্রিয়ের বশ নই, এ সব কথা মুখে বলা খুব সোজা। কাজে করা, ধারণা হওয়া, বড় কঠিন। কাঁটাতে হাত কেটে যাচ্চে, দর্‌দর্‌ করে রক্ত পড়ছে, অথচ বলছি, 'কই, কাঁটায় আমার হাত কাটে নাই, আমি বেশ আছি।' এ সব কথা বলা সাজে না, আগে ঐ কাঁটাকে জ্ঞানাগ্নি দিয়া পোড়াতে হবে তো ?

(বই পড়া জ্ঞান বা পাণ্ডিত্য ; শিক্ষাপ্রণালী)

"অনেকে মনে করে, বই না পড়ে বুঝি জ্ঞান হয় না, বিদ্যা হয় না। কিন্তু

পড়ার চেয়ে শুনা ভাল, শুনার চেয়ে দেখা ভাল। কাশীর বিষয়ে পড়া, কাশীর বিষয়ে শুনা, আর কাশী দর্শন করা অনেক তফাৎ।

"আবার যারা নিজে সতরঞ্চ খেলে, তারা চাল তত বুঝে না, কিন্তু যারা না খেলে, উপর চাল বলে দেয়, তাদের চাল ওদের চেয়ে অনেকটা ঠিক ঠিক হয়। সংসারী লোক মনে করে, আমরা বড় বুদ্ধিমান্। কিন্তু তারা বিষয়াসক্ত। নিজে খেলচে। নিজেদের চাল ঠিক বুঝতে পারে না। কিন্তু সংসারত্যাগী সাধুলোক বিষয়ে অনাসক্ত। তারা সংসারীদের চেয়ে বুদ্ধিমান্। নিজে খেলে না, তাই উপর চাল ঠিক বলে দিতে পারে।

ডাক্তার। (ভক্তদিগের প্রতি) বই পড়লে এ ব্যক্তির (পরমহংসদেবের) এত জ্ঞান হতো না। Faraday communed with nature. প্রকৃতিকে ফেরাডে নিজে দর্শন করতো, তাই অতো Scientific truth discover করতে পেরেছিল। বই পড়ে বিদ্যা হলে, অত হত না। Mathematical formulae only throw the brain into confusion. Original inquiryর পথে বড় বিঘ্ন এনে দেয়।

(ঈশ্বর প্রদত্ত জ্ঞান ও মানুষের পাণ্ডিত্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ। (ডাক্তারের প্রতি) যখন পঞ্চবটীতে মাটীতে পড়ে পড়ে আমি মাকে ডাকতুম, আমি মাকে বলেছিলাম, মা! আমায় দেখিয়ে দাও, কর্ম্মীরা কর্ম্ম করে যা পেয়েছে, যোগীরা যোগ করে যা দেখেছে, জ্ঞানীরা বিচার করে যা জেনেছে, আরও কত কি, তা কি বলবো।

"আহা! কি অবস্থাই গেছে। ঘুম যায়। এই বলিয়া পরমহংসদেব গান করিয়া বলিতে লাগিলেন;—

ঘুম ভেঙ্গেছে আর কি ঘুমাই,
যোগে যাগে জেগে আছি।
এখন যোগ নিদ্রা তোরে পেয়ে মা,
ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি।

"আমি তো বই টই কিছুই পড়িনি, কিন্তু দেখ, মার নাম করি বলে, আমায় সবাই মানে। শম্ভু মল্লিক আমায় বলেছিল, ঢাল নাই, তরোয়াল নাই, শান্তিরাম সিং। (সকলের হাস্য)

শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষের 'বুদ্ধদেব চরিত' অভিনয় কথা হইতে লাগিল।

তিনি ডাক্তারকে নিমন্ত্রণ করাইয়া ঐ অভিনয় দেখাইয়াছিলেন। ডাক্তার উহা দেখিয়া যারপর নাই আনন্দিত হইয়াছিলেন।

ডাক্তার। (গিরীশের প্রতি) তুমি বড় বদ্‌লোক! আমায় কি রোজ থিয়েটার যেতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি বলছো, আমি বুঝতে পারছি না।

মাষ্টার। ওঁর থিয়েটার বড় ভাল লেগেছে। (ক্রমশঃ।)

শ্রীশ্রীরামানুজচরিত।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ।] [৩০৪ পৃষ্ঠার পর।

প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আস্থরি কেশবাচার্য্য নামে এক ইষ্টনিষ্ঠ সদ্‌ব্রাহ্মণ এই গ্রামে বাস করিতেন। সেই সময় শ্রীমদ্ যামুনাচার্য্য বা আল্‌ওয়ান্দার রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া নম্বির শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে অত্যাশ্রমী-ভিক্ষুকবেশে অবস্থান করিতেছেন। গুরুর বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হইলে, আল্‌ওয়ান্দরই তৎকালিক সমগ্র বৈষ্ণবমণ্ডলীর নেতৃরূপে পরিগৃহীত হইলেন। তাঁহার অসাধারণ ত্যাগ, বৈরাগ্য, পাণ্ডিত্য, নম্রতা, ইষ্টনিষ্ঠা প্রভৃতি, সকল বৈষ্ণবেরই অনুকরণীয় হইয়া উঠিল। তদ্রচিত সুমধুর স্তোত্র সকল সজ্জনই সাদরে কণ্ঠস্থ ও হৃদয়স্থ করিয়া আপনাদের কৃতকৃত্য মনে করিলেন। বস্তুতঃই, মহাত্মা যামুনাচার্য্য উক্ত স্তোত্রে এরূপ উৎকট ভক্তি ও প্রীতির সহিত শ্রীমদ্‌ভগবৎপাদপদ্মে সরলভাবে আত্মনিবেদন করিয়াছেন যে, তাহা পাঠ করিলে পাষণ্ডহৃদয়েও ভক্তির সঞ্চার হয়। চতুর্দ্দিক্ হইতে দলে দলে ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ বৈষ্ণবগণ আসিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক আপনাদিগকে পরম ভাগ্যবান্ বলিয়া জ্ঞান করিলেন। তন্মধ্যে দুই, একজন তাঁহার ন্যায় ভিক্ষুকাশ্রম গ্রহণ পূর্ব্বক নিরন্তর তৎসহবাসে ও তৎসেবায় কালাতিপাত করিয়া আপনাদের সর্ব্বতোভাবে কৃতার্থ বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন।

পেরিয়া তিরু মলাই নম্বি বা বৃদ্ধ শ্রীশৈলপূর্ণ যামুনাচার্য্যের সর্ব্বপ্রধান শিষ্য ছিলেন। তিনি জীবনের শেষভাগে গার্হস্থ্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া উক্ত মহাপুরুষের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ও তৎসহবাসে কালাতিপাত করেন। তাঁহার দুইটি ভগ্নী ছিলেন। জ্যেষ্ঠার নাম ভূমি পেরাট্টি', ভূদেবী, বা কান্তিমতী। কনিষ্ঠার নাম পেরিয়া পেরাট্টি বা মহাদেবী।

শ্রীপেরেমবুদুর নিবাসী আসুরি কেশবাচার্য্য কান্তিমতীর পাণিগ্রহণ করেন। কনিষ্ঠা মহাদেবী নিকটস্থ আহরম্ গ্রামনিবাসী কমলনয়ন ভট্টের সহিত উদ্বাহশৃঙ্খলে বদ্ধা হয়েন। ভগ্নীদ্বয়ের উদ্বাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেলে শ্রীশৈল-পূর্ণ নিশ্চিন্ত মনে ভগবদ্ধ্যানপরায়ণ হইলেন এবং পরিশেষে মহাত্মা যামুনা-চার্য্যের ন্যায় সদ্‌গুরুলাভ করিয়া বৃদ্ধাবস্থায় তৎসহবাসে পরমানন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

আসুরি কেশবাচার্য্য সাতিশয় যজ্ঞনিষ্ঠ ছিলেন বলিয়া পণ্ডিতগণ তাঁহার "সর্ব্বক্রতু" উপাধি দিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার পূর্ণনাম, শ্রীমদাসুরি সর্ব্ব-ক্রতু কেশবদীক্ষিত। বিবাহের পর দম্পতি বহু বৎসর শ্রীপেরেম্বুদুরে সুখে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাদের কোনও সন্তান না হওয়ায় ভক্ত কেশবাচার্য্য কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্নমনাঃ হইলেন। পরিশেষে যজ্ঞদ্বারা শ্রীভগবান্‌কে প্রীত করিয়া তৎকৃপায় পুত্রসন্তান লাভ করিবার আশা তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক হইল।

যজ্ঞ এব পরোধর্ম্মো ভগবৎপ্রীতিকারকঃ।
অভীষ্টকর্ম্মধুগ্ যজ্ঞস্তস্মাৎ যজ্ঞঃ পরাগতিঃ॥

ইত্যাদি সন্তাপচ্ছেদী শাস্ত্রবাক্য সমূহও সেই আশাকে বলবতী করিয়া তুলিল। তিনি মহোদধিতীরবর্ত্তী-বৃন্দারণ্যনিবাসী শ্রীমৎপার্থসারথির সমীপে গমন পূর্ব্বক স্বীয় মনোভাব নিবেদন করিয়া তদুদ্দেশে যজ্ঞ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। তদনুসারে তিনি সস্ত্রীক বৃন্দারণ্যে উপস্থিত হইলেন ও শ্রীপার্থ-সারথির কুমুদসরোবর বা তিরুইল্লি কেণির (তিরু-শ্রী, ইল্লি-কুমুদ, কেণি-সরোবর) তীরে পুত্রকামনায় যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন। অধুনা আমরা যে স্থানকে ট্রিপ্লিকেন্ বলি, তাহা ঐ তিরুইল্লি কেণির ইংরাজি অপভ্রংশ। যাহা পূর্ব্বে বৃন্দারণ্য নামে খ্যাত ছিল, তাহা এক্ষণে ঐ সরোবরের নামানুসারে ট্রিপ্লি-কেন আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। মাদ্রাজ, মদুরা বা মথুরার অপভ্রংশ। ইহা বৃন্দারণ্য বা ট্রিপ্লিকেনের উত্তরে।

যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে নিশাকালে কেশবাচার্য্য নিদ্রিতাবস্থায় শ্রীমৎ পার্থ-সারথিকে স্বপ্ন দেখিলেন। স্বপ্নে ভগবান্ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে সর্ব্বক্রতো, আমি তোমার সদাচার, নিষ্ঠা, ও ভক্তিতে সাতিশয় পরিতুষ্ট হইয়াছি। তুমি উদ্বিগ্ন হইও না। আমিই তোমার পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিব। মনুষ্যগণ দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ পূর্ব্বাচার্য্যগণের যথার্থ অভিপ্রায় অবগত হইতে

না পারিয়া আপনাদিগকে ঈশ্বর মনে করিতেছে, এবং অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া কুকর্ম্মপরায়ণ ও যথেচ্ছাচারী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং আচার্য্য রূপে আমি অবতীর্ণ না হইলে তাহাদের কোনও গতি নাই। তুমি স্ত্রীর সহিত গৃহে প্রতিগমন কর। শীঘ্রই সিদ্ধকাম হইবে।” এরূপ সুস্বপ্ন দেখিয়া দেখিয়া কেশবাচার্য্যের আর উল্লাসের সীমা রহিল না। তিনি পত্নীকে সকলই কহিলেন এবং পরদিন প্রত্যুষে উভয়ে স্বগ্রামাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

এই ঘটনার এক বৎসর পরে ভাগ্যবতী কান্তিমতী সর্ব্বসুলক্ষণ-সম্পন্ন এক পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন। ৪১১৮ কল্যব্দে, ৯৩৯ শকাব্দে, বা ১০১৭ খৃষ্টাব্দে আর্দ্রানক্ষত্রযুক্ত চৈত্র মাসের দ্বাদশ দিবসে, শুক্ল পঞ্চমী তিথিতে, কর্কট লগ্নে, বৃহস্পতিবারে, পিঙ্গলা নামক বৎসরে, হারিতগোত্রীয়, যজুঃশাখাধ্যায়ী ভগবান্ শ্রীরামানুজাচার্য্য তরুণ তপনের ন্যায় অজ্ঞান অন্ধকার বিদূরিত করিয়া সর্ব্বলোক সমক্ষে সমুদিত হইলেন। তাঁহার জন্মে দুর্ব্বুদ্ধির নাশ হইয়া সদ্বুদ্ধির বিকাশ হইয়াছিল বলিয়া, পণ্ডিতগণ “ধীলর্দ্ধা” এই বাক্য দ্বারা তাঁহার জন্মকাল নির্ণয় করিয়াছেন। “অঙ্কস্য বামা গতিঃ” এই ন্যায়ানুসারে উক্ত বাক্যে ধ, ল, এবং ধ, এই তিন প্রধান অক্ষর আছে। কাদি নব, টাদি নব, ও যাদি নব এই কয় অক্ষর মালা এক হইতে নয় পর্য্যন্ত সংখ্যার জ্ঞাপক। টাদি নবের মধ্যে ধ নবম স্থানীয় বলিয়া নয় সংখ্যা বুঝাইবে। এবং যাদি নবের মধ্যে ল তৃতীয় স্থানীয় বলিয়া তিন সংখ্যা বুঝাইবে। অতএব ধ, ল, এবং ধ, এই অক্ষরত্রয় ৯৩৯ শকাব্দ বুঝাইল।

সেই সময় কনিষ্ঠা ভগ্নী মহাদেবীও এক পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন। সূতিকা গৃহ হইতে বহির্গতা হইয়া কিয়দ্দিবস পরে তিনি নবজাত পুত্রের সহিত জ্যেষ্ঠা কান্তিমতীর পুত্র সন্দর্শন বাসনায় শ্রীপেরেমবুদুরে আগমন করিলেন। ভগ্নীদ্বয় পরস্পরের সন্ততিমুখাবলোকনে যৎপরোনাস্তি আনন্দিতা হইলেন। ইত্যবসরে লোকমুখে বার্ত্তা পাইয়া শ্রীরঙ্গক্ষেত্র হইতে বৃদ্ধ শ্রীশৈলপূর্ণও নবপ্রসূত ভাগিনেয়দ্বয়কে দর্শন করিবার মানসে তথায় উপনীত হইলেন। বহুকালের পর ভ্রাতাকে পাইয়া কান্তিমতী ও মহাদেবী উভয়েই পরম নির্ব্বৃতি লাভ করিলেন। সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত শিশুদ্বয়কে দেখিয়া বৃদ্ধ সন্ন্যাসীও পরম প্রীত হইলেন। কান্তিমতীর পুত্রের নানাবিধ দৈবলক্ষণ দর্শন করিয়া তাঁহার নম্মা আলোয়ার কথিত উক্ত সময়ে শ্রীপেরেমবুদুরে আদিশেষাবতারের কথা স্মরণ হইল। বৃহৎ পদ্মপুরাণের দ্বাত্রিংশৎ অধ্যায়, নারদ পুরাণ, স্কন্দ পুরাণের

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়, এবং শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে কলিযুগে যে অনন্ত দেবের কথা বর্ণিত আছে, এই শিশুই যে সেই লক্ষ্মণাবতার, তাহাতে তাঁহার আর কোনও সন্দেহ রহিল না। তদনুসারে তিনি উহাঁর নাম শ্রীরামানুজ রাখিলেন, এবং মহাদেবীর পুত্রকে গোবিন্দ আখ্যা প্রদান করিলেন। মহাদেবী ভবিষ্যতে আর একটী পুত্র প্রসব করেন, তাঁহার নাম ছোট গোবিন্দ।

আদি কবি মহর্ষি বাল্মিকী লিখিতেছেন যে,

সার্প্যে জাতৌ তু সৌমিত্রী কুলীরেহভ্যুদিতে রবৌ।

চৈত্র মাসের অশ্লেষা নক্ষত্রে, রবি কর্কট রাশিতে গমন করিলে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন জন্মগ্রহণ করিলেন। শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যেরও জন্মমাস এবং রাশি সুমিত্রানন্দনদ্বয়ের তুল্য।

শিশু দুইটী চারি মাসের হইলে, তাহাদিগকে অঙ্কে লইয়া মাতৃদ্বয় গৃহ হইতে নিষ্ক্রমণ করিলেন, ও আদিত্য দর্শন করাইলেন। পরে যথা সময়ে তাহাদের অন্নপ্রাশন, কর্ণবেধ, চূড়াকরণ, বিদ্যারম্ভ ও উপনয়ন কর্ম্ম সম্পন্ন হইল। বাল্যকাল হইতেই রামানুজ অসাধারণ ধীশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। শিক্ষকের মুখ হইতে একবার শুনিলেই, যেরূপ দুরূহ পাঠ হউক না কেন, তিনি অনায়াসে তাহার অর্থবোধ করিতে পারিতেন। এজন্য সকল শিক্ষকেরই সাতিশয় প্রিয় ছিলেন।

তাঁহার ধীশক্তি কেবল যে বহির্মুখী ছিল তাহা নহে। দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের সূচীর ন্যায় ইহা উত্তর দক্ষিণ রূপ ধর্ম্ম অর্থ উভয়কেই সমভাগে দেখাইয়া দিত। ধর্ম্মের অনুশীলন ও ধার্ম্মিকের সহবাস তাঁহার সাতিশয় প্রিয়কর ছিল। সুবিধা পাইলেই তিনি সাধুসঙ্গ করিতে বিলম্ব করিতেন না।

সেই সময় শ্রীকাঞ্চিপূর্ণ নামে এক পরম ভাগবত কাঞ্চি নগরীর প্রধানতম রত্ন বলিয়া সর্ব্বজন পরিচিত ছিলেন। উক্ত মহাশয় প্রতিদিন কাঞ্চি হইতে দেব পূজার্থ পুনামেলি নামক গ্রামে গমন করিতেন। শ্রীপেরেম্বুদুর, ঐ স্থানদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী। সুতরাং তিনি রামানুজের বাটির পার্শ্ব দিয়া প্রতিদিন গমনাগমন করিতেন। জাতিতে শূদ্র হইলেও তাঁহার প্রগাঢ় ঈশ্বরানুরাগ দেখিয়া ব্রাহ্মণগণও তাঁহাকে সমুচিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। একদা সায়ং-কালে রামানুজ অধ্যাপক গৃহ হইতে আগমন কালীন এই ভাগবতোত্তমের সহিত পথিমধ্যে সহসা মিলিত হইলেন, এবং তদীয় দিব্য মুখজ্যোতিঃ নিরীক্ষণ করিয়া স্বতঃই তাঁহার দিকে সাতিশয় আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। তিনি অতি

বিনীতভাবে তাঁহাকে সেই রজনী তাঁহার আলয়ে ভিক্ষা করিতে অনুনয় করিলেন। শ্রীকাঞ্চিপূর্ণও বালকের দিব্যকান্তি ও ভগবল্লক্ষণ দেখিয়া আমন্ত্রণ অস্বীকার করিতে পারিলেন না। পরমভাগবতকে অতিথি পাইয়া রামানুজের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহাকে সুচারুরূপে ভিক্ষা করাইয়া, তদীয় পাদসম্বাহন করিতে উদ্যত হইলেন। অতিথি কিন্তু স্বীকৃত হইলেন না। কহিলেন, "আমি নীচ, শূদ্র। আপনি ব্রাহ্মণ ও পরম বৈষ্ণব। কোথায় আমি আপনার পদসেবা করিব, তাহা না হইয়া আপনি কি না দাসের সেবা করিতে চাহিতেছেন?" শ্রীরামানুজ তাহাতে দুঃখিত হইয়া কহিলেন, "বুঝিলাম, আমার অদৃষ্ট মন্দ। তজ্জন্যই আপনার ন্যায় মহাপুরুষের সেবাধিকার পাইলাম না। মহাশয়, উপবীত ধারণ করিলেই কি ব্রাহ্মণ হয়? যিনি হরিভক্তিপরায়ণ, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। দেখুন তিরুপ্পান আলোয়ার চণ্ডাল হইয়াও ব্রাহ্মণের পূজ্য হইয়াছেন।"

বালকের ঈদৃশী ভক্তি দেখিয়া শ্রীকাঞ্চিপূর্ণ তাঁহাকে মনুষ্যজ্ঞান করিতে পারিলেন না। নানাবিধ সদালাপের পর রজনীতে রামানুজগৃহে বিশ্রামসুখ অনুভব করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে স্বস্থানে গমন করিলেন। সেই দিবস হইতে উভয়ে উভয়ের প্রেমে চিরদিনের জন্য বদ্ধ হইয়া পড়িলেন।

পূর্ব্বাচার্য্যগণ রামানুজকে কেন যে লক্ষ্মণাবতার বলিয়াছেন, তাহা তাঁহারা পুরাণপ্রমাণানুসারে দেখাইয়াছেন, ইহা পূর্ব্বে ইঙ্গিত করিয়াছি। সৌমিত্রির স্বভাবের সহিত কেশবনন্দনের স্বভাব তুলনা করিলেও আমরা অনেক সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাই। লক্ষ্মীবর্দ্ধন লক্ষ্মণের কর্ত্তব্যপরায়ণতা, সত্যনিষ্ঠা, রামভক্তি, জিতেন্দ্রিয়তা, ও ধর্ম্মপরায়ণতা জগতীতলে অতুলনীয়। তাঁহার হৃদয়রাজ্যের শ্রীরামচন্দ্রই একমাত্র অধীশ্বর ছিলেন। রামরস ভিন্ন ইতর রসে তাঁহার আস্বামাত্রই ছিল না। সুতরাং তিনি যে পার্থিব প্রলোভন হইতে সুদূরে অবস্থান করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ, আমরা "বাল্মীকিগিরিসম্ভূতা, রামসাগরগামিনী", রামায়ণী গঙ্গায় অবগাহন করিলে প্রাপ্ত হই। যখন মায়াময় স্বর্ণমৃগ, রমণীকুলের গৌরবস্বরূপিণী জনকনন্দিনীকে মোহিত করিয়া, সর্ব্বকল্যাণগুণসমন্বিত ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকেও বিমোহিত করিয়াছিল, সেই সময় শ্রীমান্ লক্ষ্মণ তাঁহার হৃদয়ের একমাত্র অভিষ্টদেবকে এইরূপে সাবধান করিতেছেন।

(ক্রমশঃ)

সবই পূর্ব্ব কার্য্য, পূর্ব্ব অনুভূতির ফল, উহারা এক্ষণে স্বাভাবিক জ্ঞানরূপে পরিণত হইয়াছে। এতক্ষণ আমরা বেশ আসিলাম, আর এতদূর পর্য্যন্ত আধুনিক বিজ্ঞানও আমাদের সহায় রহিলেন, কিন্তু আর এক গোল আসিতেছে। আধুনিক বিজ্ঞানবিদেরা প্রাচীন ঋষিদের সহিত একমত হইতেছেন এবং তাঁহাদের যতখানি প্রাচীন ঋষিদের সঙ্গে মিল, ততখানি কোন গোল নাই। বৈজ্ঞানিকেরা স্বীকার করেন যে, প্রত্যেক মানুষ এবং প্রত্যেক জন্তুই কতকগুলি অনুভূতি সমষ্টি লইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাঁহারা ইহাও মানেন যে, মনের এই সকল কার্য্য পূর্ব্ব অনুভূতির ফল; কিন্তু তাঁহারা বলেন, ঐ অনুভূতিগুলি যে আত্মার, ইহা বলিবার আবশ্যকতা কি? উহা কেবল শরীরেরই ধর্ম্ম, তাহা বলিলেইত হয়। উহা বংশানুক্রমিক সঞ্চার বলিলেইত হয়। ইহাই শেষ প্রশ্ন: আমি যে সকল সংস্কার লইয়া জন্মিয়াছি, তাহা আমার পূর্ব্বপুরুষদের সঞ্চিত সংস্কার, ইহাই বল না কেন? ক্ষুদ্র জীবাণু হইতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনুষ্য পর্য্যন্ত সকলেরই কর্ম্মসংস্কার আমার ভিতরে রহিয়াছে, কিন্তু উহা বংশানুক্রমিক সঞ্চারের বশেই আমাতে আসিয়াছে। এরূপ হইলে আর কি গোল থাকে? এই প্রশ্নটী অতি সূক্ষ্ম। আমরা এই বংশানুক্রমিক সঞ্চারের কতক অংশ মানিয়াও থাকি। কতটুকু মানি? মানি কেবল আত্মার বাসোপযোগী গৃহ দান করা পর্য্যন্ত। আমরা আমাদের পূর্ব্ব কর্ম্মের দ্বারা কোন বিশেষ শরীর আশ্রয় করিয়া থাকি। আর যাঁহারা আপনাদিগকে সেই আত্মাকে সন্তানরূপে লাভ করিবার উপযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতেই তিনি উপযুক্ত উপাদান গ্রহণ করিয়া থাকেন।

বংশানুক্রমিক-ক্রমবিকাশবাদ প্রমাণ ব্যতীতই একটী অদ্ভুত প্রতিজ্ঞা স্বীকার করিয়া থাকেন যে, মনের সংস্কাররাশির ছাপ জড়ে থাকিতে পারে। যখন আমি তোমার দিকে তাকাই, তখন আমার চিত্তহ্রদে একটী তরঙ্গ উঠে। ঐ তরঙ্গ চলিয়া যায়, কিন্তু সূক্ষ্মরূপে তরঙ্গাকারে থাকে। আমরা উহা বুঝিতে পারি। ভৌতিক সংস্কার যে শরীরে থাকিতে পারে, তাহা আমরা বুঝি। কিন্তু শরীর ভগ্ন হইলেও যে মানসিক সংস্কার শরীরে বাস করে, তাহার প্রমাণ কি? কিসের দ্বারা ঐ সংস্কার সঞ্চারিত হয়? মনে কর, যেন মনের প্রত্যেক সংস্কার শরীরে বাস করা সম্ভব; মনে কর, আদিম মনুষ্য হইতে আরম্ভ হইয়া বংশানুক্রমে সকল পূর্ব্বপুরুষের সংস্কার আমার পিতার শরীরে রহিয়াছে এবং পিতার শরীর হইতে আমাতে আসিতেছে। কি করিয়া? জীবাণুকোষের

(Bio-plasmic cell) দ্বারা। কিন্তু কি করিয়া ইহা সম্ভব হইবে, কারণ, পিতার শরীর সম্পূর্ণ সন্তানে আইসে না। একই পিতামাতার অনেকগুলি সন্তানসন্ততি থাকিতে পারে, তাহা হইলে এই বংশানুক্রমিক সঙ্কারবাদ হইতে ইহা নিঃসংশয়ভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, এখানে সঙ্কারক ও সঙ্কার্য্য এক, অর্থাৎ ভৌতিক বলিয়া পিতামাতা তাঁহাদের নিজ মনোবৃত্তির কিঞ্চিদংশ খোয়াইবেন, আর যদি তাঁহাদের সমুদয় মনোবৃত্তিই আইসে, তবে প্রথম সন্তানের জন্মের পর তাঁহাদের মন শূন্যস্বরূপ হইবে।

আবার যদি জীবাণুকোষে চিরকালের অনন্ত সংস্কারসমষ্টি থাকে, তবে জিজ্ঞাস্য এই, উহা কোথায় ও কিরূপেই বা থাকে? ইহা একটী অত্যন্ত অসম্ভব প্রতিজ্ঞা, আর যতদিন না এই জড়বাদীরা প্রমাণ করিতে পারেন, কি করিয়া ঐ সংস্কার ঐ কোষে থাকিতে পারে, আর কোথায়ই বা থাকিতে পারে, এবং মনোবৃত্তি ভৌতিক কোষে নিদ্রিত থাকে, ইহার অর্থ কি, বুঝাইতে পারেন, ততদিন তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে না। এইটুকু বেশ স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে যে এই সংস্কার মনের মধ্যে, মনই জন্মজন্মান্তর গ্রহণ করিতে আইসে, মনই আপন উপযোগী উপাদান গ্রহণ করে, আর যে মন আপনাকে কোন বিশেষ প্রকার শরীর ধারণ করিবার উপযুক্ত কর্ম্ম করিয়াছে, যতদিন পর্য্যন্ত না উহা সেই উপাদান পাইতেছে, ততদিন উহাকে অপেক্ষা করিতে হইবে। ইহা আমরা বুঝিতে পারি। অতএব দাঁড়াইল এই টুকু যে, আত্মার দেহগঠনোপযোগী উপাদান প্রস্তুত করা পর্য্যন্তই বংশানুক্রমিক সঙ্কারানুসারে পিতামাতার কার্য্য। আত্মা কিন্তু দেহের পর দেহ গ্রহণ করেন—শরীরের পর শরীর প্রস্তুত করেন; আমরা যে কোন কার্য্য করি, তাহাই সূক্ষ্মভাবে রহিয়া যায়, আবার সময় পাইলেই উহারা প্রকাশ পাইতে প্রস্তুত হয়। যখনই আমি তোমার দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখনই আমার মনে একটী তরঙ্গ উঠে। উহা যেন চিত্তহ্রদের ভিতর ডুবিয়া যায়, সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতর হইতে থাকে, কিন্তু উহা একেবারে নাশ হইয়া যায় না। উহা আবার তরঙ্গাকারে উঠিতে প্রস্তুত হইয়া থাকে—উহার নাম স্মৃতি। দেখা গেল, সমুদয় সংস্কারসমষ্টি আমার মনে রহিয়াছে, মৃত্যু হইলে এই সমুদয় সংস্কারের সমবেত সমষ্টি আমার উপর থাকে। একটী বল রহিয়াছে, আর আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই হাতে একটী ছড়ি লইয়া সব দিক্ হইতে উহাকে মারিতে আরম্ভ করিলাম; বলটী ঘরের এক ধার হইতে আর এক ধারে যাইতে আরম্ভ হয়, দরজার

কাছে পঁহুছিলেই উহা পলাইয়া যায়। উহা কোন্ শক্তিতে বাহিরে চলিয়া যায়? যতগুলি ছড়ি মারা হইতেছিল, তাহাদের সমবেত শক্তিতে। উহার দিক্‌ও ঐ সকলের সমবেত ফলে নির্ণীত হইবে। এইরূপ, শরীরের পতন হইলে আত্মাকে চালায় কে? উহা—যে সকল কার্য্য করিয়াছে, যে সকল চিন্তা করিয়াছে, উহা ঐ সকল শক্তি লইয়া চলিবে। যদি সমবেত কর্ম্মসমষ্টি এরূপ হয় যে, পুনর্ব্বার ভোগের জন্য উহাকে নূতন শরীর গড়িতে হয়, তবে উহা সেই সকল পিতামাতার নিকট যাইবে, যাঁহাদের নিকট হইতে সেই শরীর গঠনের উপযোগী উপাদান পাওয় যাইবে—তখনই উহা একটী নূতন শরীর গ্রহণ করে। এইরূপে উহা দেহ হইতে দেহান্তরে যায়, স্বর্গে যায়, আবার পৃথিবীতে আইসে, মানুষ হয়, অথবা উচ্চতর বা নিম্নতর শরীর গ্রহণ করে। এইরূপেই উহা চলিতে থাকে, যতদিন না উহার ভোগ শেষ হইয়া আবার ঘুরিয়া পূর্ব্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হয়। উহা তখন নিজের স্বরূপ জানিতে পারে, নিজে কি তাহা জানিতে পারে, অজ্ঞান চলিয়া যায়, উহার শক্তি সমূহ প্রকাশিত হয়, উহা তখন সিদ্ধ হইয়া যায়, আর উহার পক্ষে স্থূল শরীরের কোন আবশ্যকতা থাকে না—সূক্ষ্ম শরীরেরও আবশ্যকতা থাকে না। উহা নিজ আলোকে নিজে প্রকাশিত হয়, মুক্ত হইয়া যায়, উহার আর জন্ম বা মৃত্যুর আবশ্যকতা থাকে না।

আমরা এ সম্বন্ধে এক্ষণে আর বিশেষ আলোচনা করিব না। কিন্তু এই পুনর্জ্জন্মবাদ সম্বন্ধে আর একটী কথা বলিয়াই নিবৃত্ত হইব। এই মতই কেবল জীবাত্মার স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া থাকেন। উহা আমাদের সমুদয় দুর্ব্বলতার কারণ অপর কাহারও ঘাড়ে চাপায় না—যাহা একটী সাধারণ মানবীয় দুর্ব্বলতা। আমরা আমাদের নিজেদের দোষ দেখিতে পাই না। চক্ষু কখন আপনাকে দেখিতে পায় না। উহারা আর সকলের চক্ষু দেখিতে পায়। আমরা আমাদের দুর্ব্বলতা স্বীকার করিতে বড় নারাজ, আমারা অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাইতে পারি। সাধারণ মানব অপর লোকের উপর সমুদয় দোষ চাপাইয়া থাকে; তাহা যদি না পারে, তবে ঈশ্বরের ঘাড়ে দোষ চাপায়; তাহা না হইলে অদৃষ্ট নামক একটী ভূতের সৃষ্টি করে। অদৃষ্ট আবার কি? উহা কোথায়? আমরা যাহা বপন করি, আমরা তাহাই পাইয়া থাকি।

আমরাই আমাদের অদৃষ্টের সৃষ্টিকর্ত্তা। আমাদের অদৃষ্ট মন্দ হইলেও কাহাকেও দোষ দিবার নাই, আবার ভাল হইলেও কাহাকেও প্রশংসা করিবার

নাই। বাতাস সর্ব্বদাই চলিতেছে। যে সকল জাহাজের পাল খাটানো থাকে, সেই গুলিতেই বাতাস লাগে—তাহারাই পাল ভরে এগিয়ে যায়। যাহাদের পাল গুটানো থাকে, তাহাদিগের বাতাস লাগে না—তবে কি ইহা বায়ুর দোষ হইল? আমরা যে, কেহ সুখী, কেহ বা দুঃখী, ইহা কি সেই করুণাময় পিতার দোষ, যাঁহার কৃপা পবন দিবারাত্রি অবিরত বহিতেছে—যাঁহার দয়ার কোন ক্ষয় নাই? আমরাই আমাদের অদৃষ্টের রচয়িতা। তাঁহার সূর্য্য দুর্ব্বল বলবান সকলের জন্য উদিত। তাঁহার বায়ু সাধু পাপী সকলের জন্যই সমান বহিতেছে। তিনি সকলের প্রভু, সকলের পিতা, দয়াময়, সমদর্শী। তোমরা কি মনে কর, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু আমরা যে দৃষ্টিতে দেখি, তিনিও সেই দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন? ভগবৎ-সম্বন্ধে ইহা কি ক্ষুদ্র ধারণা। আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুতুল এখানে নানা বিষয়ের জন্য অতি আগ্রহের সহিত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছি, আর নির্ব্বোধের মত মনে করিতেছি, ভগবানও ঐ বিষয়গুলি ঠিক সেইরূপ সত্য বলিয়াই গ্রহণ করিবেন। তিনি জানেন, এ পুতুল খেলার অর্থ কি! তাঁহার প্রতি সব দোষ চাপান, তাঁহাকে দণ্ড পুরস্কারের কর্ত্তা বলা, কেবল নির্ব্বোধের কথা মাত্র। তিনি কাহারও দণ্ড বিধানও করেন না, কাহাকেও পুরস্কারও দেন না। সর্ব্ব দেশে, সর্ব্বকালে, সর্ব্ব অবস্থায় তাঁহার অনন্ত দয়া পাইবার সকলেই অধিকারী। উহার ব্যবহার কিরূপ করিব, তাহা আমাদিগের উপর নির্ভর করিতেছে। মানুষ ঈশ্বর বা আর কাহারও দোষ দিও না। যখন নিজ কষ্ট পাও, তখন আপনাকেই নিন্দা কর, এবং যাহাতে আপনার মঙ্গল, তাহারই চেষ্টা কর।

পূর্ব্বোক্ত সমস্যার ইহাই মীমাংসা। যাহারা নিজেদের কষ্টের জন্য অপরের নিন্দা করে (দুঃখের বিষয়, এরূপ লোকের সংখ্যাই দিন দিন বাড়িতেছে), তাহারা সাধারণতঃ হতভাগ্য দুর্ব্বল মস্তিষ্ক; ইহারা নিজেদের কর্ম্মদোষে এ অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছে, এক্ষণে তাহারা অপরের নিন্দা করিতেছে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় না, উহাতে তাহাদের কিছুমাত্র উপকার হয় না; বরং অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাইবার এই চেষ্টাতে তাহাদিগকে আরও দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। অতএব কাহাকেও তোমার নিজের দোষের জন্য নিন্দা করিও না, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াও, সমুদয় দায়িত্ব তোমার নিজের ঘাড়ে লও। বল, আমি যে কষ্ট ভোগ করিতেছি, তাহা আমারই কৃতকর্ম্মের ফল—তাহা হইতেই প্রমাণিত হইতেছে, উহা আমারই

দ্বারা নাশও হইতে পারে। যাহা আমি সৃষ্টি করিয়াছি, তাহা আমি ধ্বংস করিতে পারি, যাহা অপর কেহ সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা আমি কখন নাশ করিতে সমর্থ হইব না। অতএব উঠ, সাহসী হও, বীর্য্যবান্ হও। সমুদয় দায়িত্ব আপনার ঘাড়ে লও—জানিয়া রাখ, তুমিই তোমার অদৃষ্টের সৃজনকর্ত্তা। তুমি যে কিছু বল বা সহায়তা চাও, তাহা তোমার ভিতরেই রহিয়াছে। অতএব তুমি এক্ষণে জানিয়া নিজের ভবিষ্যৎ গঠন করিতে থাক। 'গতস্য শোচনা নাস্তি'—এক্ষণে সমুদায় অনন্ত ভবিষ্যৎ তোমার সম্মুখে। সর্ব্বদাই ইহা মনে রাখিবে, তোমার প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক কার্য্যই সঞ্চিত থাকিবে। মনে মনে এই আশা রাখিবে, যেমন অসৎ চিন্তা, অসৎ কার্য্য সমুদয় তোমার উপর ব্যাঘ্রের ন্যায় লাফাইয়া পড়িতে উদ্যত, সেইরূপ সৎচিন্তা, সৎকার্য্যগুলি সহস্র দেবতার বলসম্পন্ন হইয়া তোমাকে সদা রক্ষা করিতে উদ্যত থাকিবে।

অমৃতত্ত্ব।

কোন্ প্রশ্ন মানব এতবার জিজ্ঞাসা করিয়াছে, কোন তত্ত্বের রহস্য উদ্ঘাটন করিতে মানুষ সমুদায় জগৎ খুঁজিয়াছে, কোন প্রশ্ন মানব-হৃদয়ের এত অন্তরতর ও প্রিয়তর, কোন প্রশ্ন আমাদের অস্তিত্বের সহিত এত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত যত এই মানবাত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন? কবিদিগের ইহা কল্পনার বিষয় হইয়াছে, সাধু মহাত্মা জ্ঞানী সকলেরই ইহা মহা চিন্তার বিষয় হইয়াছে, সিংহাসনোপবিষ্ট রাজগণ ইহার বিচার করিয়াছেন, পথিমধ্যস্থ অতি দরিদ্রও এই অমরত্বের স্বপ্ন দেখিয়াছে। শ্রেষ্ঠ মানবগণ এই প্রশ্নের উত্তর প্রায় স্পর্শ করিয়াছেন—অতি হীন মানবগণও ইহার আশা করিয়াছে। এই বিষয়ে লোকের আগ্রহ এখনও নষ্ট হয় নাই, এবং যতদিন মানব প্রকৃতি বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন নষ্ট হইবেও না। জগতে এই সম্বন্ধে অনেক অনেক উত্তর দিয়াছেন। আবার ঐতিহাসিক প্রতি যুগেই দেখা যায় যে, সহস্র সহস্র ব্যক্তি এই প্রশ্ন একেবারে অনাবশ্যক বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি উহা সেইরূপই নূতন রহিয়াছে। অনেক সময় জীবন সংগ্রামে ব্যস্ত থাকিয়া এই প্রশ্ন যেন ভুলিয়া যাইতে হয়। হঠাৎ কেহ কালগ্রাসে পতিত হইল—এমন কেহ, যাহাকে আমি হয়ত খুব ভাল বাসিতাম, আমার অন্তরের অন্তরতম কেহ হঠাৎ যম আমাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইলেন, তখন যেন মুহূর্ত্তের

জন্য এই সংসারের কোলাহল, সব গোলমাল থামিয়া গেল, সব যেন নিস্তব্ধ হইল, আর আত্মার গভীরতম প্রদেশ হইতে সেই প্রাচীন প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইতে লাগিল—ইহার পর আর কি আছে? আত্মার কি গতি হয়? ঠেকিয়াই মানুষ সমুদয় শিক্ষা করে। আমাদের বিচারও এই কতকগুলি সাধারণ অনুভূতির উপর নির্ভর করে। আমাদের চতুর্দ্দিকে নয়ন বিস্ফারিত করিয়া আমরা কি দেখিতে পাই? ক্রমাগত পরিবর্ত্তন! বীজ বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন হয়—আবার বৃক্ষ হইতে বীজ হয়। বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বৃক্ষ হয়—আবার ঘুরিয়া বীজরূপে পরিণত হয়। কোন জীব উৎপন্ন হইল—কিছুদিন রহিল—আবার ফিরিয়া মরিয়া গেল—এই রূপে একটী বৃত্ত সম্পূর্ণ হইল। মানুষের সম্বন্ধেও তদ্রূপ। পর্ব্বত সকল ধীরে অথচ নিশ্চিত রূপে গুঁড়াইয়া যাইতেছে, নদী সকল ধীরে অথচ নিশ্চিত শুকাইয়া যাইতেছে। সমুদ্র হইতে বৃষ্টি আসিতেছে, আবার উহা সমুদ্রে যাইতেছে। সর্ব্বত্রই একটী একটী বৃত্ত—জন্ম, বৃদ্ধি ও নাশ যেন গণিতের ন্যায় সঠিকভাবে একটীর পর আর একটী আসিতেছে। ইহাই আমাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা। এই সকলেরই অভ্যন্তর-দেশে ক্ষুদ্রতম পরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া অনন্ত প্রকারের অনন্ত আকৃতিযুক্ত উচ্চতম সিদ্ধপুরুষ পর্য্যন্ত মহান্ বস্তুরাশির পশ্চাতে আমরা একটী একত্ব দেখিতে পাই। প্রতিদিনই আমরা দেখিতে পাই, যে দুর্ভেদ্য প্রাচীর এক পদার্থ হইতে আর এক পদার্থকে পৃথক্ করিতেছে, লোকে ভাবিত, তাহা ভঙ্গ হইয়া যাইতেছে—আর আধুনিক বিজ্ঞান সমুদয় ভূতকেই এক পদার্থ বলিয়া বুঝিতেছে—কেবল যেন সেই এক প্রাণশক্তিই নানারূপে ও নানা আকারে প্রকাশ পাইতেছে—উহা যেন সমুদয়ের মধ্যে এক শৃঙ্খলরূপে বিদ্যমান—এই সকল বিভিন্নরূপ যেন তাহার এক একটী অংশ—অনন্তরূপে বিস্তৃত, অথচ সেই এক শৃঙ্খলেরই অংশ। ইহাকেই ক্রমোন্নতিবাদ বলে। এই ধারণা অতি প্রাচীন—মনুষ্যসমাজ যত প্রাচীন, এই ধারণাও তত প্রাচীন। কেবল মানুষের জ্ঞান যত বর্দ্ধিত হইতেছে, ততই উহা যেন আমাদের চক্ষে আরও উজ্জ্বলতররূপে প্রতিভাত হইতেছে। প্রাচীনেরা আর একটী বিষয় বিশেষরূপ বুঝিতেন—ক্রমসঙ্কোচ। কিন্তু আধুনিকেরা এই তত্ত্বটী তত ভালরূপ বুঝেন না। বীজই বৃক্ষ হয়, এক বিন্দু বালুকণা কখন বৃক্ষ হয় না। পিতাই পুত্র হয়, মৃত্তিকাখণ্ড কখন সন্তানরূপে জন্মায় না। কোথা হইতে এই ক্রমবিকাশ হয়, ইহাই প্রশ্ন। বীজ পূর্ব্বে কি ছিল? উহা সেই বৃক্ষরূপ ছিল। ঐ বীজে

ভবিষ্যৎ একটী বৃক্ষের সম্ভবনীয়তা রহিয়াছে। ক্ষুদ্র শিশুতে ভবিষ্যৎ মানুষের সমুদয় শক্তি অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। সর্ব্বপ্রকার ভবিষ্যৎ জীবনই অব্যক্তভাবে উহাদের বীজে রহিয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য কি? ভারতের প্রাচীন দার্শনিকেরা ইহাকে 'ক্রমসঙ্কোচ' বলিতেন। অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি, প্রত্যেক ক্রমবিকাশের আদিতেই একটী 'ক্রমসঙ্কোচ' প্রক্রিয়া রহিয়াছে। যাহা পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান নহে, তাহার কখন ক্রমবিকাশ হইতে পারে না। এখানেও আধুনিক বিজ্ঞান আমাদিগকে সাহায্য করিয়া থাকেন। গণিতের যুক্তি দ্বারা সঠিকভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, জগতে যত শক্তির বিকাশ দেখা যায়, তাহাদের সমষ্টি সর্ব্বদাই সমান। তুমি এক বিন্দু জড় বা এক বিন্দু শক্তি বাড়াইতে বা কমাইতে পার না। অতএব শূন্য হইতে কখনই ক্রমবিকাশ হয় নাই। তবে কোথা হইতে হইল? অবশ্য ইহার পূর্ব্বে ক্রমসঙ্কোচ প্রক্রিয়া হইয়া থাকিবে। পূর্ণবয়স্ক মানুষের ক্রম সঙ্কোচে শিশুর উৎপত্তি, আবার শিশু হইতে ক্রমবিকাশ প্রক্রিয়ায় মানুষের উৎপত্তি। সর্ব্বপ্রকার জীবনের উৎপত্তির সম্ভবনীয়তা তাহাদের বীজে রহিয়াছে। এখন এই সমস্যা যেন কিছু সরল হইয়া আসিতেছে। ইহার সহিত পূর্ব্বোক্ত সমুদয় জীবনের একত্বের ভাব ধর। ক্ষুদ্রতম জীবাণু হইতে পূর্ণতম মানব পর্য্যন্ত বাস্তবিক এক সত্তা, এক জীবনই বর্ত্তমান। যেমন এক জীবনেই আমরা শৈশব, যৌবন, বার্দ্ধক্য প্রভৃতি বিবিধ অবস্থা দেখিতে পাই, এই তত্ত্বটীকেই আর একটু অগ্রসর হইয়া আর একটু বিস্তারিত করিয়া দেখ,—ঐ শৈশব অবস্থার পশ্চাতে—তাহার পশ্চাতে—তাহার পশ্চাতে—কি আছে দেখ, যতক্ষণ না তুমি জীবাণুতে উপনীত হও। এইরূপে ঐ জীবাণু হইতে পূর্ণতম মানব পর্য্যন্ত যেন এক জীবন-সূত্র বিরাজমান। ইহাকেই ক্রমবিকাশ বলে এবং আমরা দেখিয়াছি, প্রত্যেক ক্রমবিকাশের পূর্ব্বেই একটী ক্রমসঙ্কোচ রহিয়াছে। যে জীবনীশক্তি এই ক্ষুদ্র জীবাণু হইতে আরম্ভ করিয়া ধীরে ধীরে পূর্ণতম মানব অথবা এই জগতস্থ ঈশ্বরাবতার রূপে ক্রমবিকশিত হয়,—এই সমুদয় গুলিই অবশ্যই জীবাণুতে সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করিতেছিল। সমুদয় শক্তি—এমন কি, স্বয়ং ঈশ্বর উহার মধ্যে অন্তর্নিহিত ছিল—ধীরে ধীরে অতি ধীরে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে থাকে। সর্ব্বোচ্চ প্রকাশও অবশ্যই বীজভাবে সূক্ষ্মভাবে উহার ভিতরে ছিল—তাহা হইলে উহা কাহার ক্রমসঙ্কোচ হইল? সেই সর্ব্বব্যাপী জগন্ময় জীবনীশক্তির ক্রমসঙ্কোচ। এই এক চৈতন্যরাশি যাহা জীবাণু হইতে পূর্ণতম মানব পর্য্যন্ত

বিদ্যমান, তাহা ধীরে ধীরে প্রকাশিত হইতেছে। উহা—কি? উহা সেই সর্ব্বব্যাপী জগন্ময় চৈতন্যের অংশ– উহা ঐ জীবাণুতে ক্রমসঙ্কুচিত হইয়া বর্ত্তমান ছিল। উহা সমুদয়ই পূর্ণভাবে বর্ত্তমান ছিল। উহা যে জন্মায়, তাহা নহে। জন্মানোর ভাব সমুদয় মন হইতে সরাইয়া দেও। জন্মানো বা বৃদ্ধির সঙ্গে এই ভাবের যোগ আছে, যেন কিছু বাহির হইতে আসিতেছে। ইহা মানিলে পূর্ব্বোক্ত গণিতসঙ্গত প্রমাণ অর্থাৎ জগতে শক্তি সর্ব্বদাই সর্ব্বত্রই সমান থাকে, ইহা সিদ্ধ হয় না। উহা ভিতরেই থাকে, কেবল উহা আপনাকে প্রকাশ করে মাত্র। বিনাশের অর্থ কি? এই একটী গ্লাস রহিয়াছে। আমি উহা ভূমিতে ফেলিয়া দিলাম, উহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। উহা কি হইল? উহা সূক্ষ্মরূপে পরিণত হইল মাত্র। তবে বিনাশ কি হইল? স্থূলের সূক্ষ্মভাবে পরিণতি। উহার উপাদান পরমাণুগুলি একত্র হইয়া গ্লাস নামক এই কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল। উহারা আবার উহাদের কারণে চলিয়া যায়, আর নাশ ইহারই নাম—কারণে লয়। কার্য্য কি? না, কারণের ব্যক্তভাব। কার্য্য ও কারণে স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই। আবার ঐ গ্লাসের কথাই ধর। উহার উপাদানগুলি এবং উহার নির্ম্মাতার ইচ্ছা সংযোগে উহা উৎপন্ন। এই দুইটীই উহার কারণ এবং উহাতে বর্ত্তমান। নির্ম্মাতার ইচ্ছাশক্তি এক্ষণে উহাতে কি ভাবে বর্ত্তমান? সংহতিশক্তিরূপে। ঐ শক্তি না থাকিলে উহার প্রত্যেক পরমাণু পৃথক্ পৃথক্ হইয়া যাইত। তবে এক্ষণে কার্য্যটী কি হইল? না, উহার কারণের সহিত অভেদ, কেবল উহা আর এক রূপ ধরিয়াছে মাত্র। যখন কারণই কিছু কালের জন্য পরিণাম প্রাপ্ত হয়, অথবা কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানের ভিতর সঙ্কুচিত আকারে অবস্থান করে, তখন ঐ কারণটীকেই কার্য্য বলে। আমাদের ইহা মনে করিয়া রাখা উচিত। এই তত্ত্বটীকে আমাদের জীবনের ধারণা সম্বন্ধে প্রযুক্ত করিয়া দেখিতে পাই যে, জীবাণু হইতে সম্পূর্ণতম মানব পর্য্যন্ত সমুদয় শ্রেণীই অবশ্য সেই বিশ্বব্যাপী প্রাণশক্তির সহিত অভেদ। কিন্তু অমৃতত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন এখানেও মিটিল না। আমরা কি পাইলাম? আমরা পূর্ব্বোক্ত বিচার হইতে এই টুকু মাত্র পাইলাম যে, জগতের কিছুরই ধ্বংস হয় না। নূতন কিছুই নাই—কিছু হইবেও না। সেই একই প্রকারের বস্তুরাশি চক্রের ন্যায় পুনঃ পুনঃ উপস্থিত হইতেছে। জগতে যত গতি আছে, সবই তরঙ্গাকারে একবার উঠিতেছে, একবার পড়িতেছে। কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড সূক্ষ্মতর রূপ হইতে প্রসূত হইতেছে—